বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবম খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ(২২০০), জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০
তৃতীয় মুদ্রণ (২২০০), ভাদ্র ১৩৮৫

উপদেষ্টা পরিষদ :
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকালিদাস রায়
ডঃ সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. কে. পাল কর্তৃক শ্রীসারদা প্রেস,
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত

।। সূচীপত্র ।।



পুত্র তারাদাস সহ বিভূতিভূষণ

ভূমিকা

গুণ-জ্ঞানের সব সম্মান, সব অভিমান খুলে ফেলে দিয়ে মানব-চেতনার একেবারে মূলে যদি পৌঁছনো যায়, দেখা যাবে সেইখানেই শিশু-সাহিত্য দানা বাঁধছে। এ যে-সে লেখকের কর্ম নয়। অতি দক্ষ যে রবীন্দ্রনাথ, তিনিও এ ব্যাপারে ততখানি সাফল্য লাভ করেন নি, যতখানি করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার। বিভূতিভূষণও এঁদের দলের, যদিও সবাই কিছু সমান ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তবু যেমন করেই হক ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনার মূল মন্ত্র তাঁদের সবার জানা ছিল।

গোড়া থেকেই অসুবিধা। দেখতে হবে সুকুমার সুনির্মল চোখ দিয়ে, অথচ লিখতে হবে এমন পাকা হাতে যে একটি বাড়তি কথার প্রয়োজন হবে না, এইটুকু বাক্-চাতুরির সাহায্য লাগবে না। এ ধরণের লেখার উদ্দেশ্য শুধুই শিক্ষা-দানের চেয়ে অনেক বড়। এর ফলে ছোট ছেলেদের মনের পাপড়িগুলি একে একে খুলে যায় আর নির্মল অরুণালোক অন্তরকে স্পর্শ করে। কোনো অধীত বিদ্যা দিয়ে, কোনো গভীর অভিজ্ঞতা দিয়ে এ বিদ্যা লাভ করা যায় না। এই নিয়ে কেউ জন্মায়, কেউ জন্মায় না। যে এ গুণ নিয়ে জন্মায় না, সে যে হাজার তপস্যা করেও তাকে আয়ত্ত করতে পারে না, তার শত শত শোচনীয় প্রমাণ, একটু তাকালেই সব ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়, খুঁজতেও হয় না। এ ক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকও হতাশ হয়েছেন। তাদের কথা ছেড়েই দিলাম যারা সরলভাবে বিশ্বাস করে যে বড়দের জন্য বই লেখা ব্যাপারে কড়ি না পেলেও, ছোটরা অত বোঝে-সোঝে না, তাদের ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে নেমে পড়া যায়। হাত-ও পাকবে, নাম-ও হবে—আর ঘরে দু'পয়সা এলে তো আরো ভালো!

কিন্তু ঐ যে মানব-চেতনার মূলের কথা বলা হল, সেখানে অনুকৃত, কৃত্রিম, বা চেষ্টা-করে খাড়া-করা কোনো কিছুর জায়গা নেই। সেখানে কেমন একটা সহজ, আদিম, প্রাথমিক ভাব থাকে যে খাঁটি জিনিস ছাড়া কিছু নেয় না। সেখানে ভদ্রতার আড়াল বলেও কিছু নেই; যাকে যেমন দেখা যায়, তাকে ঠিক তেমনি করেই দেখানো হয়। খুব যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হয়, তাও নয়। কারণ খাঁটি জিনিস ছাড়া সেখানে কিছু থাকার কথাই নয়। অবিশ্যি গল্প কাহিনীর চরিত্রদের মধ্যে অনেক ভুলচুক, দোষ-দুর্বলতা পার পেয়ে যায়, কারণ ন্যায়-অন্যায়ের মান সেখানে আলাদা। সেখানে যে-সব মন্দ লোকদের ক্ষমা করা হয়, তারা বাইরে মন্দ হলেও হৃদয়ে মন্দ নয়। সেখানকার নিয়মে যারা দুঃখী তারা কখনো একেবারে মন্দ হতে পারে না।

অনিয়মের রাজ্য নয় সেটা; ছোটদের মনে এক ধরণের পরিচ্ছন্নতা বিরাজ করে। সৃজনের কাজ চলে সেখানে, মানুষের ছেলেমেয়েদের মন তৈরী হয়, খেলো অকেজো কিছু থাকলে চলবে কেন। ছোটরা যা দিয়ে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বড় হবে, হাতে পায়ে শক্তি,

চোখে দৃষ্টি, মনে উদারতা, বুকে বল, চিত্তে আনন্দ পাবে, শুধু তাই দিতে হবে। চুপ করে পড়ে থাকাও চলবে না; কেবলি বাড়া, কেবলি জানা, কেবলি চলা, চোখে কেবলি নব নব বিস্ময়ের উন্মেষ।

এত কথা মনে রেখে ছোটদের সাহিত্য রচিত হয়। বিচিত্র ব্যবস্থা সে রাজ্যে। জড়তার ঠাঁই নেই। মামুলী জীবন-যাত্রাও যে রস-রহস্যে ভরপুর, সেটুকু দেখাতে না পারলে সব বাতিল হয়ে যায়। ভয়ের জিনিসের সঙ্গে লড়াই করা হয়। নিষ্ঠুররা কঠিন সাজা পায়। বিশ্বাসঘাতকরা বাঁচে না। ভীতুরা কষ্ট পেয়ে সাহসী হয়। ভালোদের ভালো হয়। সাদা-কালো মোটামুটি ভাগ করা থাকে। সত্য সেখানে অ-নড়, যদিও বাস্তব আর কল্পনা মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। তাছাড়া সবটার মধ্যে এক রকম প্রবলতা বিরাজ করে, যাকে কেউ বাগ মানাতে পারে না। এত সব অলিখিত নিয়মকানুন কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। বেনে-বৌ পাখির মতো আপনা থেকেই গলায় ডাক আসা চাই।

যদিও বিভূতিভূষণ ছোটদের জন্য গ্রন্থ-রচনায় খুব বেশি সময় দিতে পারেন নি এবং যেটুকু লিখেছেন তার সবগুলিও সমান নয়, তবু তিনি সহৃদয় শিক্ষক ছিলেন, ছোট ছেলে ঘেঁটে তাঁর জীবন কেটেছিল। বন-জঙ্গল, পল্লী-জীবন, গাছপালা ভালোবাসতেন। উদ্ভিদ-তত্ত্ব পড়তেন, শত শত গুল্ম-লতা বুনো গাছের নাম জানতেন, চিনতে পারতেন। পাখি দেখতেন, জন্তু-জানোয়ার দেখতেন, বনবাসীরা কি খায়, কি রকম জীবন কাটায়, তাও দেখতেন। ঘোর বনে গভীর রাতে চাঁদের আলোয় বসে থাকতেন। নির্জনতা তাঁর কাছে নৈঃসঙ্গ ছিল না। সমস্ত প্রকৃতি জগৎ তাঁকে সঙ্গ দিত। এ-সব মানুষরাই কবি হয়, এরাই ছোট ছেলেমেয়ে চেনে।

অভাবনীয় সব ভাবনা তাদের মনে জাগে। মনে হয় অগম্যের পরপারে গন্তব্য পথের নিশানা খুঁজে পাওয়া যাবে। মাঝখানে শুধু এই অলঙ্ঘ্য বাধাটুকু পার হলেই হল। তার পরেই নব নব দিগন্ত চোখের সামনে খুলে যাবে। তবে এ-সব জিনিস বর্ণনা দিয়ে, ভাষা দিয়ে বোঝাবার নয়; এদের মনের মধ্যে উপলব্ধি করতে না পারলে, কিছুই হয় না। সব বয়স্ক লোকেরা তা পারে না। যারা নিজেদের ছোটবেলার কথা ভুলে গেছে, তারা পারে না। যারা শুধু ছোটবেলাকার ঘটনাগুলি মনে রেখেছে, তখনকার মনটিকে কোথায় ফেলে রেখে চলে এসেছে, তারাও পারে না। তুচ্ছ কারণে সে-সব তীব্র বেদনার কথা তারা কি বুঝবে? ঘাসের উপর শিশির-বিন্দুতে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব তারা কি করে দেখবে? পোকাদের পিঁপড়েদের দরকারি কথার তারা কি খোঁজ রাখে? শিশু-মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, তাঁরাও এ বিষয়ের ধার ধারেন না।

আর কেউ না জানলেও বিভূতিভূষণরা জানতেন। তা না হলে শুধু ঘটনা দিয়ে ছোটদের জন্য লেখা যায় না। তাঁরা জানেন যে ছোটদের মনের মধ্যে এক রকম সমগ্রতা, সম্পূর্ণতা থাকে, যার মধ্যে থেকে কোনো কিছুকে বাদ দেওয়া চলে না। জলের উপর বাতাসে ভেসে থাকা স্থির অচঞ্চল ড্রাগন-ফ্লাইয়ের স্বচ্ছ মসৃণ ডানাতে সূর্য-কিরণের প্রতিফলনও যেমন

ছোটদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে, তেমনি জগতের ভয়ঙ্করতম সর্বনাশও তারা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করে। পৃথিবীর বেবাক শিশু-কাহিনী ঘাঁটলেও এই কথাই মনে হয়। যদি ভেবে দেখা যায় যাবতীয় লোক-কথার, রূপ-কথার পরীদের শিশুপাঠ্য গল্পের বিষয়-বস্তু কি, তা হলে এই সত্য আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হতে হয় যে সেগুলির সঙ্গে ছোটদের জীবনের কম-ই সম্বন্ধ থাকে। সেগুলির বিষয়বস্তুই হল বড়দের লোভ, হিংসা, দ্বেষ, ব্যর্থ প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশোধ, নিষ্ঠুরতা। এর কোনটিকে শিশুদের কোমল মনের উপযুক্ত বলা চলে? অথচ এই গল্পগুলিই আমাদের ছোটবেলায় নিশ্বাস বন্ধ করে পাঠ করে আমরা হাসি-কান্নার আনন্দ-সাগরে ভেসেছি। আসলে বিষয়গত অর্থের চেয়ে মর্মগত অর্থটি ছোটদের মনকে বেশি অধিকার করে। দুঃখীদের হারানো ছেলেমেয়ে ফিরে আসে, বুভুক্ষুরা পেট ভরে খেতে পায়, ডুবন্ত নৌকো আবার উদ্ধার হয়, ওদের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

এই গ্রন্থে বিভূতিভূষণের পাঁচটি ছোটদের বই সম্বলিত হয়েছে। তার মধ্যে চারটি নিছক দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প, ইংরিজিতে যাকে বলে অ্যাডভেঞ্চার স্টরি। একটি হল ছোট গল্পের সংগ্রহ, তার মধ্যেও রহস্য ও রোমাঞ্চের অভাব নেই। এ ধরণের কাহিনীর প্রধান উপজীব্যই হল রহস্য ও রোমাঞ্চ এবং প্রধান অবলম্বন হল সাহসিকতা। এদের একটা মোটামুটি মামুলী কাঠামোও দেখতে পাওয়া যায়, যদিও ঘটনাগুলি বিচিত্র। হয়তো এক বা একাধিক উৎসাহী কিম্বা ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ির নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ছেড়ে বিষম বিপদ-সঙ্কুল পথে, রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতার আশায়, কিম্বা অবাস্তব আলেয়ার পিছনে বেরিয়ে পড়ে। সব সময় বেরোতেও হয় না; বিপদ আর লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতা আপনি এসে ঘাড়ে চাপে। নায়ক গোড়াতে খুব ইচ্ছুক বা সাহসী না-ও হতে পারে। কিন্তু পাকে-চক্রে পড়ে তার মনুষ্যত্ব প্রকট হয়, কিম্বা তার অযোগ্যতা প্রমাণ হয়। শেষ পর্যন্ত গুপ্তধনটিকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

অনেক অভিভাবক এই সব মন-গড়া অভিযানের কাহিনী পছন্দ করেন না। বিশেষ করে যখন পৃথিবীর বাস্তব ইতিহাসে দুঃসাহসিক ঘটনার অভাব নেই। তাঁদের মতে এ-ধরণের আজগুবি গল্প তরুণ পাঠকের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটায়, এতে বাস্তবের পথ ছেড়ে মনকে মরীচিকার পিছনে ধাবিত করানো হয়। তবু মনে হয় আজগুবি ও অবাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করলে বিশ্বসাহিত্য কানা হয়ে যাবে। কোনটা বাস্তব সত্য আর কোনটা কল্পনা এটুকু জানলেই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়ই গল্পের ভূমিকাতে সে-কথা স্পষ্ট করে বলে দেওয়াই থাকে। ১৩৪৪ সালে লেখা 'চাঁদের পাহাড়ে'র ভূমিকায় বিভূতিভূষণ বলছেন, 'চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি...কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।.. এই গল্পে উল্লিখিত রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা মধ্য-আফ্রিকার অতি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী এবং ডিঙ্গোনাক ও বুনিপের প্রবাদ

জুলুল্যাণ্ডের বহু আরণ্য অঞ্চলে আজ-ও প্রচলিত।' বাস্তব ইতিহাস ভূগোলের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে, কাল্পনিক ঘটনা দিয়েই বিশ্বের শিশু-সাহিত্যের বহু ভালো ভালো রোমাঞ্চ কাহিনী তৈরি হয়েছে। এর দরকারও আছে।

মনে পড়ে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, এম্‌-এ পাস করেই এক বছর ধরে শান্তিনিকেতনে ইংরিজি সাহিত্য পড়িয়েছিলাম। এক দিন বারো তেরো বছরের ছেলে-মেয়েদের ক্লাস নিতে গিয়ে দেখি একটা রোগা ছেলে আমার দিকে প্রায় পিঠ ফিরিয়ে, গাছে ঠেস দিয়ে বসে কি একটা রংচঙে বই গিলছে। ক্লাসে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। বেজায় চটে গিয়ে তার কাছ থেকে বইটা নিলাম। পাতলা কাগজের মলাট দেওয়া চটি এক বাংলা বই, নাম তার 'তিব্বতী গুহায় ভয়ঙ্কর'। মলাটের রংচঙে ছবিতে দেখি ভীষণ অন্ধকার গুহা থেকে একটা বিকট দানবের মুখ বেরিয়ে আছে। তার নিচে লেখা 'রোমাঞ্চ সিরিজ ২২ নং' অমনি আমার বিরক্তি দূর হয়ে গেছিল। আমি জানতাম এ-জিনিসের জন্যেও ঐ বয়সে একটা খিদে থাকে। তাই ভালো বই না পেলে শেষটা বাজে বই পড়তে হয়। সে-সময়ে ইংরিজিতে বহু দুঃসাহসিক কাহিনী পাওয়া যেত, কিন্তু ঐ হতভাগ্য ছেলের সম্ভবতঃ এতটা বিদ্যা ছিল না যে ইংরিজি বইয়ের রস গ্রহণ করতে পারে। 'চাঁদের পাহাড়' হয়তো এই ঘটনার তিন চার বছরের মধ্যেই লেখা হয়েছিল, যদিও আমি আরো পরে সিগনেট প্রেসে প্রকাশিত সংস্করণ পড়েছিলাম। এবং ঐ ছেলের কথা মনে করে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম।

আসলে শুধু প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম ও মামুলী ঘটনা, অর্থাৎ শুধু কাজের জিনিস মনে রঙ ধরায় না; তাই দিয়ে শিশু সাহিত্য রচনা করতে হলে তার মধ্যে গ্রন্থকারের মনের রঙ ঢালতে হয়। শুধু রূপ থাকলেই তো আর হল না, তাকে দেখার চোখও তৈরি হওয়া চাই। সেই রূপকে সব সময় পৃথিবীতে বাস্তব আকৃতি নিয়ে যে থাকতেই হবে, তাই বা কি করে বলা যায়। মনগড়া রূপও বড় কম যায় না। পাঠকের মনের উপর তার প্রতিক্রিয়াও বাস্তব রূপের চেয়েও কম নয়। তবে সেই রূপকে সর্বদা সত্যের বাহন হতে হবে। এই জন্যই ফ্যান্টাসির সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এ-সব গল্পে বিভূতিভূষণ ও-পথ ধরেন নি। যতখানি সম্ভব তিনি বাস্তবকেই অবলম্বন করেছেন। ঘটনা অবিশ্যি বানানো। প্রকৃতির বর্ণনা 'চাঁদের পাহাড়' গল্পের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন বিভূতিভূষণ প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন বটে, কিন্তু সে হল তাঁর দেশের গ্রামের, কিম্বা প্রিয় ছোটনাগপুর, সিংভূম মানভূমের চেনা-জানা প্রকৃতি। এতে কিন্তু যথেষ্ট বলা হয় না। বর্তমান গ্রন্থের অকুস্থল মধ্য আফ্রিকা, সে সব জায়গা তিনি কখনো চোখে দেখেন নি। শুনেছি শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকারীরা নিজেদের দেখা জায়গা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে অপরকে দেখাতে পারেন। বিভূতিভূষণ আরো এক-কাটি বাড়া। না-দেখা জায়গাও তিনি অপরের সামনে জীবন্ত ছবির ম.তা তুলে ধরেছেন।

এর অবশ্য একটা কারণও আছে। গল্পের নায়ক শঙ্করের গ্রামের বাড়ির দারিদ্র্যক্লিষ্ট বৈচিত্র্য-বিহীন জীবনের সঙ্গে অন্য নামের গাঁয়ে হলেও গ্রন্থকারের যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

শঙ্করদের গাঁয়ের একজন ফেরারী জামাই আফ্রিকাতে নতুন রেলের লাইনের কাজে তাকে ঢুকিয়ে দিল। কাজটা অবিশ্যি নামে স্টেশন-মাস্টারি হলেও কেরানীগিরি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই নির্জ্জন বনভূমিতে সিংহ ও সাপের অধ্যুষিত লীলাভূমির কেরানীও সাধারণ কেরানী হতে পারে না। তার উপর নির্জনতা আর সূর্য ডুবলেই গাঢ় অন্ধকার। রাতে সিংহের ভয়ে ট্রেনও চলত না। সে সব দিন-রাতের ভীষণ-সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। চোখের সামনে যেন দেখা যায়। মনে হয় শুধু বই-এ পড়া মন-গড়া পরিবেশ এ নয়। হয়তো কেউ চাক্ষুষ দেখে এসে তাঁকে মুখে মুখে বলেছিল। বার্ড কোম্পানির ভূ-বিদ্যা বিষয়ের শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে বিভূতিভূষণের যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। শ্যামলকৃষ্ণের শৈশব ও প্রথম যৌবন আফ্রিকায় কেটেছিল, ঠিক ঐ পরিবেশেই। হয়তো স্পর্শকাতর রেকর্ডিং যন্ত্রের মতো শ্যামল-কৃষ্ণের সেই অনুভূতি বিভূতিভূষণের মনের ওপর প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। তাই অল্প কথায় বলা সেই কাল্পনিক অভিজ্ঞতার বিষয় পড়ে গায়ে কাঁটা দেয়। নায়ক অবিশ্যি সেখানে বেশি-দিন থাকে নি, গুপ্তধনের সন্ধানে বিদেশী সঙ্গীর সঙ্গে দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হয়ে ফিরেছিল।

"চাঁদের পাহাড়" নামটিও মন-গড়া নয়, সত্যিকার আফ্রিকার সত্যিকার পাহাড়ের স্থানীয় নামের অনুবাদ মাত্র। গল্পে বর্ণিত গাছ-পালা, পশু-পাখি, ভূ-গর্ভের সম্পদ, স্থানীয় অধিবাসীদের আচার, আচরণ, আহার-বিহার সব-ই বাস্তবানুগ। বনময় পাহাড় চড়ার ক্লেশ-ক্লান্তি পর্যন্ত বাস্তব এবং রচয়িতার অভিজ্ঞতা-প্রসূত। যদিও যে অভিজ্ঞতা মানভূমে সিংভূমে আহৃত, আফ্রিকাতে নয়।

একজন সাহিত্যিকের মধ্যে একটি সমগ্র মননশীলতা থাকে, যদিও তাঁর প্রতিভা নানান্ দিকে বিচিত্রভাবে বিচ্ছুরিত হতে পারে। বলিষ্ঠ লেখকের নিজের সাহিত্য-সত্তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। যে বিভূতিভূষণ "পথের পাঁচালী" "আরণ্যক" লিখেছেন, তিনিই, এবং একমাত্র তিনিই নিঃসন্দেহে ছোটদের জন্য এই কাহিনীগুলি রচনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বর্তমান রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকাতে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের উক্তির কথা মনে পড়ে। বিভূতিভূষণের মূল সাহিত্য-পরিচয়ের বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "...তার মূল সূত্রগুলি...একবার নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।...জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সহজ বিস্ময়-দৃষ্টি, কতকটা তা কবি-সুলভ, কতকটা শিশু-সুলভ, কিন্তু সততায় সুস্থির ; অকৃত্রিম নিসর্গানুভূতি বা প্রকৃতি-প্রীতি ; অকুণ্ঠিত রহস্যানুভূতি বা অন্তর্মুখিতা এবং সাধারণ জীবনযাত্রার শ্রী ও মাধুর্য-বোধ—এই চার সীমায় বিভূতিভূষণের মূল সাহিত্য পরিচয়কে স্থাপিত করা যায়।'

কথাগুলি অনুশীলন করলেই বোঝা যায় যে ঠিক এই উপাদানেই শিশু-সাহিত্যও তৈরি হয়। সমরসেট ম'ম এক জায়গায় লিখেছিলেন যে গল্পের আদর থাকে চল্লিশ বছর, কিন্তু কাব্যের আদর চিরন্তন। অর্থাৎ চল্লিশ বছরের মধ্যে যে কোনো গল্পের বইয়ের বিষয়-বস্তু পুরনো ও সে-কেলে হয়ে যায়, কাজেই পাঠকদের আর আকৃষ্ট করে না। কিন্তু কাব্য লেখা হয় হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী দিয়ে ; সেগুলি স্থান-কাল-পাত্রের হিসাবের বাইরে। এই

প্রসঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে গদ্যে লিখিত কয়েক শ্রেণীর রচনা আছে, যে-গুলি কাব্য-ধর্মী ; তাদের আদরও সহজে ফুরোয় না। উত্তম রস-রচনা, ভ্রমণ-কাহিনী, দিন-পঞ্জিকা ও শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য এই পর্যায়ে পড়ে।

তবে কথাটা শুধু সেরা লেখার বেলাতেই খাটে। শ্রীবুদ্ধদেব বসু অযোগ্য লেখার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "কালের নির্মম সম্মার্জনী" তাদের ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। ছোটদের বইয়ের বেলাতেও তাই। শুধু শ্রেষ্ঠগুলিই টিকে থাকবে। "চাঁদের পাহাড়" এমনি একটি বই। শুধু এই সংগ্রহেই নয়, বিশ্বের শিশু-সাহিত্যের যে-কোনো দরবারে এ রচনা সম্মান পেতে পারে।

নানান্ দিক দিয়ে অসাধারণ মনে হয় এই বইটিকে। শেষের দিকে একটি প্রাচীন চৈনিক প্রবাদ উদ্ধৃত আছে, তার মধ্যে দুনিয়ার দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের মনের কথার সারমর্ম বিধৃত—

"ছাদের আলসের চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে, স্ফটিক পাথর হয়ে ভেঙে যাওয়া অনেক ভালো, অনেক ভালো, অনেক ভালো।"

শ্রীগোপাল হালদারের উক্তিতে বিভূতিভূষণের সাহিত্য পরিচয়ের মূল সূত্রগুলির মধ্যে অন্তর্মুখিতাকে একটি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। তাঁর ছোটদের জন্য লেখা বইগুলি সম্পর্কে এটা সত্য নয়। আসলে শিশু সাহিত্য আদৌ অন্তর্মুখী নয় এবং হতেও পারে না। শিশু-সাহিত্যের গতিই হল বাইরের দিকে, বিশেষ করে রহস্য ও দুঃসাহসিক অভিযানের গল্পে।

হয়তো উক্ত সমালোচক বিভূতিভূষণের রচিত ছোটদের গল্প পড়েন নি। কিম্বা আরো শত শত বঙ্গীয় সাহিত্যরসিকদের মতো সেগুলি পড়েছেন বটে, কিন্তু তাদের তিনি স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা দিতে চান না। তাঁর পরবর্তী মন্তব্য থেকে সেই রকমই মনে হয়। তিনি লিখেছেন, "ঘটনার ঘনঘটা বিভূতিভূষণের কোনো উপন্যাসে বিশেষ নেই।" আমরা তো দেখি তাঁর লেখা ছোটদের গল্পগুলি ঘটনার উর্মিমালার শিখরদেশের ফেনপুঞ্জের মতো বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে অট্টহাস্য করতে করতে একেবারে পাঠকের হৃদয়ের তটে এসে আছড়িয়ে পড়ে।

সেই সঙ্গে আরো মনে হয় ছোটদের বই হবে জাপানী বাগানের মতো। শিল্পী সেখানে একটি বাড়তি পাতা, বা বোঁটা বা ফুল রাখেন না। কেটেছেঁটে সব বাদ দিয়ে, শুধু সৌন্দর্যের অন্তরের অন্তঃকরণকে রক্ষা করার জন্য যেটুকু না হলেই নয়, কেবলমাত্র তাকেই রাখেন। তখন যদি দৈবাৎ বাতাস লেগে একটি পাতা বা কুঁড়ি বা ফুল খসে পড়ে যায়, বাকি সবটা তার জন্য হাহাকার করতে থাকবে।

ছোটদের জন্য লেখার বেলাও তাই হবে। এতটুকু বাহুল্য থাকবে না। শুধু কাহিনীর এগিয়ে চলার জন্য, পরিস্থিতি প্রস্ফুটিত করার জন্য, সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, রসকে ঘনীভূত করার জন্য যতটুকু দরকার, তাই থাকবে। বড় বেশি প্রগল্‌ভতা ছোটদের গল্পে জায়গা পাবে না।

নিজের থেকেই এ-সব কথা বিভূতিভূষণের জানা ছিল। তাঁর গল্পের আরম্ভের শৈলীই বা

কি মনোহর। কোনো অবাস্তর ধানাই পানাই নেই; এক পদক্ষেপেই রচয়িতা পাঠককে গল্পের সিং-দরজা পার করিয়ে দেন। তারপর তার জন্য আর কাউকে ভাবতে হয় না, ঘটনার প্রবলতাই তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় উপন্যাসের নাম 'মরণের ডঙ্কা বাজে' গল্প শুরু হচ্ছে, 'চাঁদপাল ঘাট থেকে রেঙ্গুনগামী মেল স্টিমার ছাড়ছে। বহু লোকজনের ভিড় ...' আর দেখতে হয় না। নায়ক 'সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসে নি, কারণ কলকাতায় তার জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই। সবে সে চাকরিটা পেয়েছে, একটা বড় ঔষধ-ব্যবসায়ী ফার্মের ক্যানভাসার হয়ে সে যাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর।' অমনি সুরেশ্বরের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের নৌকো-ও পাল তুলে দিল। কোনো গল্পের-ই কোথাও কৃত্রিমতার একটুকু খাদ নেই। অতি সহজ সরল কথা বলার ভাষা। চরিত্রগুলি যেন জীবন থেকে সদ্য তুলে নেওয়া। ঘটনাচক্রও যেন বড়ই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বাকি যা-কিছু সে-সব রহস্যের মেঘের আড়াল থেকে পাঠককে বিস্ময়ে বিমোহিত করে।

তার-ই মধ্যে রয়েছে গল্পকারের শ্রেষ্ঠ গুণ। সেটি হল এক ধরণের বলিষ্ঠ সততা, যার জোরে যা অভাবনীয় তাও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। প্রায় সর্বদাই মন গড়া দেশ কাল না নিয়ে, বিভূতিভূষণ সাম্প্রতিক ও প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, জ্ঞান বিজ্ঞানের নানান তথ্য ও বিবরণী নির্ভুল ভাবে ব্যবহার করেন। তাঁর অনুশীলনের বিস্তার দেখে আশ্চর্য হতে হয়। যে জায়গার কথাই লেখেন, সেখানকার খুঁটিনাটি থাকে তাঁর নখাগ্রে। সেখানকার বন-জঙ্গলের গাছপালার নাম, বর্ণনা, স্বাদ-গন্ধ কিছু বাকি রাখেন না। এ গল্পে বর্মার জাহাজের যাত্রীদের দৈনিক জীবনযাত্রা কারো সত্যিকার দিনপঞ্জিকার মতো শোনায়। সত্যিই লেখাপড়া শেষ করে কার্যব্যপদেশে বিভূতিভূষণ ঐ সব অঞ্চলে ঘুরেছিলেন। অবিশ্যি না ঘুরলেও, যেমন করে সম্ভব তথ্যগুলি নিশ্চয়ই সংগ্রহ না করে ছাড়তেন না।

দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী হলেও, এ গল্পের মেজাজ তাঁর অন্যান্য কিশোর-পাঠ্য উপন্যাস থেকে আলাদা। চীন-জাপানের যুদ্ধ ও চীনদেশের বিপ্লবের সূত্রপাতের তথ্য অবলম্বন করে এ বই লেখা হয়েছিল। বড় বেশি বাস্তব-আশ্রয়ী, তথ্য-বহুল, তাই মন বড়ই ক্লিষ্ট হয়। আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণকে যেন এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া দায় হয়। কামানের গোলা, বোমা, বারুদের গন্ধ, আকস্মিক আক্রমণ, শোচনীয় মৃত্যু, নিষ্ঠুর অত্যাচার, এ-সব আদপেই বিভূতিভূষণের মনের-মেজাজ-মতো জিনিস নয়। তবু মনে হয় জীবনের এই রূঢ়, নির্মম, সংহারের দিকটাকে শিশু-সাহিত্যে উপেক্ষা করলেও চলবে না। মানুষ তৈরির এ-ও একটা উপাদান। মানুষের মনে মানবতার প্রতিষ্ঠা হয় শৈশবে কৈশোরে, যে বয়সের ছেলে-মেয়েরা এ বই পড়বে।

এই পাঁচটি বইয়ের মধ্যে 'মিসমীদের কবচ'কে সব চাইতে দুর্বল রচনা বলে মনে হয়। ডিটেক্‌টিভ গল্প, কিশোর সাহিত্যে যার জনপ্রিয়তার তুলনা হয় না। কাহিনীর অকুস্থলটি মন্দ নয়। বিভূতিভূষণের প্রিয় বাংলার পাড়া-গাঁ। অবিশ্যি সেখানকার সাধারণ অধিবাসীরা তাঁর হাতে পড়ে একটু অসাধারণত্ব লাভ করেছে। ঘটনাটিও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার নয়।

একজন নিঃসঙ্গ নিরুপদ্রব বৃদ্ধ রাতে খুন হয়েছেন। লোকে বলত নাকি বেজায় কঞ্জুষ। রান্নাঘরের মেজে খোঁড়া। চারদিকে সন্দেহের জাল নামল। দুঃখের বিষয় জালটি গোড়া থেকেই ছেঁড়া ছিল। খুনের উদ্দেশ্য, টাকা লুকোবার জায়গা, সাস্পেক্টদের মধ্যে কে বেশি সন্দেহজনক সব-ই বড় বেশি প্রকট।

কাজেই ডিটেক্‌টিভ গল্পের প্রাণরস সেই সাসপেন্স, সেটিই জমতে পারে নি। সেই দিক দিয়ে পাঠক হতাশ হলেও, মিসমিদের কবচের ব্যাপারটা রোমাঞ্চময়। পাড়াগাঁর পরিবেশটিও খুব ভালো। গাঙ্গুলীমশায়ের মাছ-ধরার প্রস্তুতি বড় মনোহর। গল্পের আরম্ভটিও বেশ, কিন্তু তবু পাকা হাতের ডিটেকটিভ গল্প এ নয়।

"তালনবমী" হল ছোটদের ছোট গল্পের সংগ্রহ। এই দশটি ছোট গল্পের সবগুলিকে হয়তো বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পের তালিকা-ভুক্ত করা যাবে না, কিন্তু এগুলির বিচিত্র বিষয় ও প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে বিভূতিভূষণের বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে চারটি অলৌকিকের কাহিনী আছে; তার মধ্যে রঙ্কিনীদেবীর খড়্গ—পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির দিক থেকে প্রশংসনীয়। মেডেল ও গঙ্গাধরের বিপদ্‌ও ভৌতিক গল্প। শুধু মশলাভূতের গল্পটি তেমন উৎরোয় নি। অলৌকিকের প্রতি লেখকের আকর্ষণের কথা সবাই জানে।

ছোটদের জন্য লেখা অধিকাংশ রহস্য ও রোমাঞ্চের গল্পের বিষয়-বস্তুই হল খুন, চুরি; ডাকাতি, ছেলেধরার কারসাজি, গুপ্তধন, অসাধ্য-সাধন ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে আকস্মিকের অবদান অনেকখানি। "বামা" গল্পে একজন ফাঁস্‌ড়ে তার শিকারকে ভুলিয়ে এনে বাড়ীতে তুললেও, তার দয়াময়ী বৌমার সুবুদ্ধির জন্য কাজ হাসিল করতে পারল না। বামাচরণের কাহিনীর বিষয় সেই চির-নূতন গুপ্তধন। এই বইয়ের বাকি চারটির মধ্যে তিনটি গল্প; "তালনবমী" "চাউল" ও "অরণ্যে" অপূর্ব ও অদ্বিতীয়। তালনবমী হল পাড়াগাঁয়ের গরীব ছেলের সাত পুরুষের জমানো খিদের গল্প। "চাউল"ও সেই জাতের-ই গল্প, তবে এতে ট্র্যাজেডির ভূমিকা বড়। পাথর ফাটাবার জন্য ডিনামাইট ব্যবহারের ফলে দরিদ্র শিশুর এক-মাত্র সহায় তার বাপের গুরুতরভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে যাওয়া, তাঁর স্মৃতি-কথায় বর্ণিত বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়াপাতে বেদনায় বিধুর। "অরণ্যে" গল্প সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি। স্থান লেখকের প্রিয় বিচরণভূমি গালুডির প্রতিবেশী অঞ্চল। আখ্যান কিছু নেই, রাখা মাইন্সের কাছে ঘোর জঙ্গলে পাহাড়ে নদীর ধারের বিপদ-সঙ্কুল স্থানে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ। পড়ে মনে হয় বিভূতিভূষণের স্মৃতি-রেখা থেকে ভেঙ্গে আনা টুকরো, রসে ভরপুর, ভাবে গম্ভীর। একমাত্র "রাজপুত্র" হল রূপকথা।

গ্রন্থের পঞ্চম কাহিনীর নাম শুনে কান মুগ্ধ হয়। "হীরামানিক জ্বলে"। যেমন নাম, তেমনি গল্পও বটে। গ্রামের ছেলের দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প। গ্রামের নাম সুন্দরপুর ছেলের নাম সুশীল। এক কালের ধনী পরিবারের গরীব বংশধর। পয়সাকড়ি না থাকলেও হাল-চাল বজায় আছে। বি-এ পাস করেও ছেলেকে বসিয়ে রাখা হয়েছে; ওদের বাড়ির কেউ নাকি পরের চাকরি করে না। ছেলেটিকে ভালোমানুষ মনে হত। কিন্তু যেই সুযোগ

এসে ডাক দিল, অমনি দড়াদড়ি কেটে সুশীল ভেসে পড়ল।

অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু অসাধারণ। যে কোনো পাঠকের মনে হতে পারে যে এ-রকম রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতা তার বরাতেও লেখা থাকতে পারে। রোমাঞ্চ যেন বড় কাছাকাছি এসে পড়ে। একজন দৈবাৎ-দেখা-হওয়া নাবিকের প্ররোচনায়, ভারত মহাসাগরে স্থিত, কাহিনী-কথিত চম্পাদ্বীপের রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হল। বাধা, বিপদ, দুর্ভাগ্য যে থাকবেই—সে তো জানা কথা। তবু সে সবের সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম, অবিরাম পরিশ্রম, রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কার, তার জন্য দুঃখময় দাম দেওয়া, পরিশেষে একটি প্রিয়জনকে রেখে ঘরে ফেরা। অসাধারণ কিন্তু অসম্ভব নয়। এমন ছেলে তো কতই আছে, এমন ঘটনা সত্যি ঘটবে না-ই বা কেন? চম্পাদ্বীপের কিংবদন্তীও আছে। যদিও কাহিনীতে তার সঙ্গে ওঙ্কারধামের খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়। তবু বলব আশ্চর্য রোমাঞ্চময় এ গল্প, ছোটবড় সকলের উপভোগ্য। সার্থক শিশু-সাহিত্যের এ-ও আরেকটি পরীক্ষা, বড়দের পাকা বিচারেও উৎরোয় কি না। বাংলা শিশু-সাহিত্য এইরকম তথ্য-সমৃদ্ধ, কল্পনা-সুন্দর, রোমাঞ্চময়, দুঃসাহসিক অভিযানের আরো কাহিনীর জন্য আজও অপেক্ষা করে রয়েছে।

লীলা মজুমদার

আমার চোখে বাবার শিশু সাহিত্য

শৈশবের রাতগুলো, প্রত্যেক মানুষের, কাটা উচিত হ্যারিকেনের আলোয়। হ্যারিকেনের মৃদু আলো, যা অন্ধকারকে যতটা দূরীভূত করে তার চেয়ে বেশি করে তোলে রহস্যময়, বিশেষ করে শিশুর মনে এক আশ্চর্য জগৎ তৈরী করে দেয়। আলোর সঙ্কীর্ণ বৃত্তের বাইরে সে যেন এক না-দেখা পৃথিবী, এক রোমাঞ্চকর জগৎ। আমার ছোটবেলা কেটেছে হ্যারিকেনের আলোয় আর বাবার বই পড়ে। রাত্তিরে যখন মাঝে মাঝে পড়বার ঘরে খাটের ওপর 'চাঁদের পাহাড়' নিয়ে বসতাম, পড়তে পড়তে আসতাম বুনিপ-এর প্রসঙ্গে, মনে আছে তখন ভয়ে আর খাট থেকে পা নামাতে পারতাম না। যেন পা নামানো মাত্র খাটের নিচে থেকে কেউ খপ্ করে পা ধরে টেনে নেবে। খাটের তলাটা নিতান্ত পরিচিত স্থান, সে বয়সে লুকোচুরি খেলবার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হতো। অথচ রাত্তিরে সেটাই ভীষণ ভয়ের জায়গা হয়ে উঠতো। তখন বোধহয় দু'আনা (আমার তৎকালীন দৈনিক হাতখরচ—দাদামশাই দিতেন) জরিমানা দিতে অনায়াসে রাজী হতাম, কিন্তু জ্যামিতির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার ভয় দেখিয়েও কেউ আমাকে খাটের তলায় ঢোকাতে পারতো না। এখন তো চারদিক বৈদ্যুতিক আলোয় আলো হয়ে গেছে—বাচ্চারা আর হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশুনো করে না। সব অন্ধকার পালিয়ে গিয়ে বাসা বেঁধেছে পৃথিবীর কিছু মানুষের মনে। সেখানে খুব অন্ধকার। প্রাত্যহিক খবরের কাগজ খুললেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে আর বেঁচে নেই—এতে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি অসামান্য হলেও আর একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। এসব দেখে যেতে হয় নি। দুঃখ পেতেন।

ছোটদের জন্য লেখা (শুধুই কি ছোটদের জন্য?) বাবার সব বইয়ের মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় 'চাঁদের পাহাড়'। বস্তুতঃ আমাকে রোম্যান্সপ্রিয় করে তুলেছে এ বই। সাত-আট-বছর বয়স থেকে কতবার, কত জায়গায় এবং কত অবস্থায় যে এ বই পড়েছি তা আর কি বলবো! বইটার প্রায় পুরো আখ্যানভাগ আমার মুখস্থ এবং আমি অনেক বন্ধুর কাছে গল্পটা কিছুটা অভিনয় করে বহুবার বলেছি। গল্প বলতে গেলে আমার একটু অভিনয়ের ঢঙ্ এসে যায়। ঠাকুরদা কথক ছিলেন। রক্তের প্রভাব বড় সাঙ্ঘাতিক।

বাবার লেখা আমাকে অনেকবার অনেকভাবে সাহায্য করেছে। একটা ঘটনার উল্লেখ করতে খুব ইচ্ছে করছে।

তখন ক্লাস নাইন-পড়ি—রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম-এর হোস্টেলে থাকি। একদিন বিকেলে শিক্ষক বনাম ছাত্রদের ক্রিকেট ম্যাচ্ দেখতে দেখতে অনুভব করলাম জ্বর এসেছে। গ্যালারী থেকে উঠে হাসপাতালে গেলাম। আমাদের স্কুলেরই হাসপাতাল—নিজস্ব। ডাক্তারবাবু একনজর দেখেই বললেন—হাম হয়েছে। আর হোস্টেলে যেতে হবে না, শুয়ে পড়ো বেডে। বেড দেখিয়ে দেওয়া হল। যথাদিষ্ট সে রকমই করলাম।

সমস্ত ঘরে আর কেউ নেই, কেবল লম্বা হলের প্রায় শেষ প্রান্তে একটি ছেলে ছাড়া। তার নাম সাধন তালুকদার। পা ভেঙে পড়ে ছিল। সারাদিন একাকীত্ব ভুসো কম্বলের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরতো। একা থাকার অভ্যেস নেই মোটে। তখন নতুন গেছি হোস্টেলে। একদিন আর থাকতে না পেরে কনুই-এ ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বললাম—ভাই সাধন, একটা গল্প শুনবি?

শুরু করলাম 'চাঁদের পাহাড'। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনদিন ধরে বলেছিলাম। দাঁড়ি-কমাও বোধহয় বাদ দিই নি আর তার সঙ্গে ফাঁকে-ফোকরে নিজের কিছু মালমশলাও ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। একাজ আমি এখনো করে থাকি। যে কারণেই হোক, বন্ধুরা আমার মুখে গল্প শুনতে ভালোবাসে। বলার সময় গল্পটা আমার এত নিজের দাঁড়িয়ে যায় যে আমার রয়্যালটির ভাগ পাওয়া উচিত। চেকভ্, মোপাসাঁ—কাউকে বাদ দিই না।

যাই হোক্, একথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, মৃত্যুর বারো বছর পরেও বাবা হাসপাতালে রোগশয্যায় শায়িত এবং একাকীত্বের দ্বারা বিপর্যস্ত তাঁর সন্তানকে আনন্দিত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। গল্প শেষ করার পরের দিনই অন্ন পথ্য পেয়েছিলাম।

বাবার অস্তিত্ব মোড়া ছিল একটা কবিত্বের আবরণে। ছোটদের জন্য লেখা বইয়েও তার অভাব নেই। আলভারেজ যখন জ্বরের ঘোরে বলে যাচ্ছে তার জীবনকাহিনী—সে ঘটনাটাই বা কম কিসে? জিম কার্টারের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের এক জায়গায় তাঁবু ফেলেছে আলভারেজ। জিম আক্রান্ত হয়েছে বুনিপ-এর হাতে—যার পায়ে তিনটে মাত্র আঙুল। জিম মারা গেলে আলভারেজ তিন আঙুল-বিশিষ্ট অপদেবতার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে হাজির হয়েছে এক গুহামুখে। তখন বিশালদেহ গাছেদের মাথায় শেষবেলার পড়ন্ত রাঙা রোদ্দুর। যাঁরা আমার এই লেখা পড়ছেন, তাঁরা দয়া করে 'চাঁদের পাহাড়'-এর ঐ বিশেষ অংশটুকু ভালো করে পড়ে দেখবেন। একে কবিত্ব না বললে কবিত্ব আর কাকে বলে তা আমার জানা নেই।

আলভারেজকে বড়ো ভালো লাগে। তার সেই রোদে পোড়া তামাটে মুখ, দৃঢ় চিবুক, ঋজু দেহ—এসব মনে ভীষণ এক ছাপ ফেলেছে। ডিয়েগো আলভারেজ—যে শয়তানকেও ভয় করে না। যে ক্র্যাক্-শট, অব্যর্থ লক্ষ্যে যে উড়িয়ে দিতে পারে মাটাবেল সর্দারের মাথার খুলি তার উইন্‌চেস্টার রিপিটার দিয়ে। এমন মানুষকে ভালো না বেসে উপায় নেই। বোধহয় আমরা অনেকেই অনেক দিক দিয়ে দুর্বল বলে আমাদের অবচেতন মন খোঁজ করে এমন একজন দৃঢ়চেতা মানুষের।

বেশি কথা বলে লাভ নেই। মোটের ওপর বলি, বইখানা আমার এমনই প্রিয় যে, কেউ যদি বলে—তারাদাস, তোমাকে এখুনি এককোটি টাকা দিচ্ছি, যেমনভাবে ইচ্ছে খরচ করতে পারো—কিন্তু একটি শর্তে, আর কখনো 'চাঁদের পাহাড়' পড়তে পাবে না, তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ সেই লোকটিকে জাহান্নমে যেতে অনুরোধ করবো এবং আবার বসে যাবো 'চাঁদের পাহাড়' নিয়ে।

'হীরামাণিক জ্বলে' সম্বন্ধে ঐ একই কথা খাটে। জামাতুল্লা-বর্ণিত বিন্ধমুনির দেশের কথা চোখবুজে একা বসে ভাবলে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দেয়। বাবা ছিলেন কবিত্বের আবরণের মধ্যে enveloped, encased—চাঁদ, ফুল এবং শাড়ির আঁচল নিয়ে ন্যাকা কাব্য নয়, ক্ষুরধার অসিহাতে অজানার আহ্বানে লাল কাঁকড়া অধ্যুষিত বেলাভূমি দিয়ে ঘেরা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে থাকা এক জনহীন দূরপ্রাচ্যের দ্বীপে যাত্রা করার মধ্যে যে রোম্যান্টিক কাব্য আছে—এ হচ্ছে তাই। মাঝে মাঝে আমার নিজেরই অবাক লাগে। বাবা বাঙালী, বাঙলাদেশের এক সাধারণ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এই ভীষণ জীবনীশক্তি এবং সুদূর-প্রসারী কল্পনা তাঁর মধ্যে কিভাবে এলো। একজন গড়পড়তা বাঙালী এতদূর কল্পনা করার সাহসই পাবে না। বাবা যদিও নিজে এমন কোনো অভিযান করেন নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুযোগ পেলেই বাবা এ ধরণের ঝুঁকি নিতে একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। এ ব্যাপারে বাবাকে আমি থর হেইয়েরডালের সমকক্ষ মনে করি।

খলচরিত্র বাবার লেখায় নেই বললেই হয়। 'হীরামানিক জ্বলে'—উপন্যাসে ইয়ার হোসেন-এর চরিত্রটিকে বাবা বোধহয় খলচরিত্র হিসেবে আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে ইয়ার হোসেনও যেন যথেষ্ট খল হয়ে উঠতে পারে নি। আসলে বাবার ভেতরে ঘোরপ্যাঁচ এতই কম ছিল যে মনের সুখে খলচরিত্র সৃষ্টি করা আর তাঁর দ্বারা হয়ে ওঠে নি। উপন্যাসের শেষে ইয়ার হোসেন যেন অনেকটা নরম হয়ে আসে, পূর্বের সে দাপট কমে যায়। বরং একটু কষ্টই লাগে তার জন্য।

বিন্ধমুনির দেশে জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে এক দুঃস্বপ্ন দেখেছিল সুশীল। সে জায়গাটা আমার ভারি ভালো লাগে। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আত্মা এসে যেন ডাক দিয়েছে সুশীলকে, তার পেছনে পেছনে সে হেঁটে চলেছে ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী' ছাড়া এমন বর্ণনা এ্যাড্‌ভেঞ্চার গল্পে কখনো পড়ি নি। আমাদের দেশে ছোটদের জন্য এ্যাড্‌ভেঞ্চার বই লেখার নিয়মই যেন—যত পারা যায় খুনখারাপি, উড়োচিঠি, মারপিট, গুপ্তের ম্যাপ—এইসব দিয়ে বইখানা ঠেসে দেওয়া। কিন্তু বাচ্চাদের চোখ খুলে দেবার, কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তোলবার দায়িত্বও যে শিশুসাহিত্য-রচয়িতার। বাবার লেখার যে poetie fantasy আর grotesque-এর সন্ধান আছে, তাতেই কিশোর-দের মন যে স্বপ্নে বুঁদ হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত আর একজন আছেন। তিনি শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী লীলা মজুমদার। তাঁর 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' পড়তে পড়তে ছোটবেলায় একটা বেশ বড় মার্বেল প্রায় গিলে ফেলেছিলাম অন্যমনস্কভাবে। শিশুসাহিত্যের স্বীকৃত ও ক্লাসিক লেখকদের নাম আর করলাম না—তাঁরা তো হৃদয়ে আছেনই।

বাবা বড় নিষ্ঠুর লেখক ছিলেন। 'হীরামানিক জ্বলে' উপন্যাসের শেষে অমন থাঁচাকলে ফেলে সনৎ-কে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলে দেবার কোনো মানে হয়! মনটা হায় হায় করে ওঠে সনৎ না ফেরায়। ছোটবেলায় ঐ জায়গাটা পড়বার সময় চোখে জল আসতো। এখনো

সমুদ্রের ধারে কোথাও বেড়াতে গেলেই আমার স্থলু সাগরের সে বিষ্ণুমুনির দেশের কথা মনে পড়বেই। বেলাভূমিতে চোখ নিচু করে লাল কাঁকড়া খুঁজতে খুঁজতে কতবার ভেবেছি চোখ তুললেই নজরে পড়বে জঙ্গল, আর ভেতরে পড়ে আছে বিশাল ধ্বংসস্তূপ—রাত্তিরে যেখানে হিন্দু সভ্যতার অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়।

'মরণের ডঙ্কা বাজে' ছোট লেখা। চীন-জাপানের যুদ্ধে দুই বাঙালী ছেলে গিয়েছিল জাপানী আক্রমণের সামনে কম্পমান চীনকে সাহায্য করতে। এ বইটায় আমার সবচেয়ে ভাল লাগে কতকগুলো ডিটেলের ব্যবহার। ছোটবেলায়—তখনও 'অল কোয়ায়েট' পড়ি নি —'যুদ্ধ' বলতেই মনে পড়তো 'মরণের ডঙ্কা বাজে'-এর ঘটনাগুলো। বাবাও সম্ভবতঃ স্বচক্ষে যুদ্ধ দেখেন নি। কিন্তু কাওয়াসাকি বম্বার-এর ধ্বংসলীলার কথা পড়লে মনে হয় লেখক ঘটনাস্থলে বসে নোট নিচ্ছিলেন। দু'একটা ডিটেলের কথা না বলে থাকতে পারছি না। এ থেকেই বোঝা যায় বাবা কাব্যের ঘোরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লিখতেন না। চারিদিকে ভীষণ সতর্ক নজর ছিল। যুদ্ধের মধ্যে বিমল আর সুরেশ্বর এক কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, তিনি বসে আছেন একটা উল্টো কলসীর ওপর। ব্যাপারটা আমার এখনো মনে আছে। যুদ্ধের অত ঘনঘটার বর্ণনার মধ্যে লেখক ভুলে যাননি যে কম্যাণ্ডারের উল্টো কলসীর ওপরে বসে থাকার কথাটাও লিখতে হবে। এক জায়গায় বিমলকে জাপানীরা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখুনি তাকে গুলি করে মারা হবে (অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে গেল)। বিমলের সামনে তার আগে দু'জন চীনাম্যানকে গুলি করা হোলো। সেই জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মা-বাবা-দেশ-গ্রাম-জীবন কোন কিছুই মনে হোলো না। শুধু মনে হোলো—জাপানী রাইফেলে তো খুব কম ধোঁয়া হয়। আশ্চর্য লেখক! আশ্চর্য কৌশল! একটু কাঁচা লোকের হাতে পড়লেই এখানে হরেক রকম আগড়ম-বাগড়ম লেখা হোতো। কিন্তু অভিজ্ঞ লেখক জানেন, নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে মানুষ bennmbed হয়ে যায়, বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। তখন বরং ঐ তুচ্ছ জিনিসগুলোই চোখে পড়ে আরো বেশি করে। ডিটেলের কাজ আর এক জায়গায় আছে খুব চমৎকারভাবে। 'অপরাজিত'-এ অপুর যখন বিয়ে হচ্ছে—তখনকার ঘটনা। বিয়ের রাত্তিরের অনেক ঘটনাই অপু ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু একটা কথা মনে ছিল অনেকদিন। শামিয়ানার একধারে কে যেন একটা ডাব কাটছিল। ডাবটা গোল ও রাঙা, কাটারির হাতলটা বাঁশের। বিয়ের অত প্রয়োজনীয় গোলমালের মধ্যে অপুর চোখে পড়ল এবং মনে রইল শুধু একটা ডাব কাটার দৃশ্য। মানবমনের অতলে কি আছে সে সন্ধান না জানলে এত সহজে এ কথা লেখা যায় না।

'মরণের ডঙ্কা বাজে'-তে পাতায় পাতায় বর্ণনা আছে বিমল আর সুরেশ্বর সবুজ চা আর কুমড়োর বিচির কেক খাচ্ছে। দোকানে দোকানে ইঁদুর-ভাজা ঝোলানো। বার বার বইটা পড়ে আমার ছোটবেলায় প্রায়ই কুমড়োর বিচির কেক খাবার ইচ্ছে হোতো এবং সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই, একবার ইঁদুর-ভাজা খাবার শখও হয়েছিলো।

'পিজিন ইংরিজি' কথাটাও প্রথম পাই এখানে। চীনের সব রিক্শাওয়ালা বা দোকানদারই পিজিন ইংরিজিতে কথা বলতো সে সময়। এখনো বলে কিনা জানি না। সে ভাষা পড়ে খুব মজা লাগতো।

'তালনবমী' একটি ছোটগল্পের সঙ্কলন। তন্মধ্যে 'তালনবমী' গল্পটি আমার বিশেষ প্রিয়। ভোজ খাবার জন্য আশা করে থেকে, শেষ পর্যন্ত ভোজে নিমন্ত্রিত না হলে একটি বাচ্চার কেমন লাগতে পারে, তা আমি ছোটবেলায় মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম। ফার্স্ট ইয়ারে যখন পড়ি, তখন 'দি ফেসটিভ্যাল' নাম দিয়ে এর একটা অনুবাদও করেছিলাম বলে মনে পড়ে— এতই ভালো লাগতো গল্পটি। অবশ্য সে অনুবাদ কখনো কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং কোনোদিন যে হবে, সে ব্যাপারে আমার চেয়ে নৈরাশ্যবাদী বোধহয় আর কেউ নেই।

'তালনবমীর' অন্যান্য গল্পগুলি সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলবার নেই। সবগুলিই আমার কাছে অতীব সুখপাঠ্য ব'লে প্রতীত হয়। 'মশলাভূত,' 'বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি', এসব গল্প শৈশবে বড় বড় চোখ করে পড়তাম। পেছন থেকে কেউ ঠেলা দিলে গড়িয়ে পড়ে যেতাম হয়তো এবং সে অবস্থাতেও পড়ে যেতাম গল্পগুলো।

বাবার কোনো রচনাই সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে পড়িনি—পড়েছি রসিকের মন নিয়ে। ফলে সব কটিই ভীষণ ভালো লাগে। নিজের বাবাকে বার বার 'ভালো সাহিত্যিক' বলে জিগির দেবার ব্যাপারটা লোকচক্ষে হাস্যকর জানি, সেজন্যই সবাইকে অনুরোধ, কেউ দয়া করে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না আমার প্রিয় লেখক কে; কারণ তাহলে লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে বাবার নামটাই করতে হবে।

আমার মন্ত্রগুরু : বিভূতিভূষণ

বাবার সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে অসুবিধের ব্যাপার। তার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, বাবাকে এখনো আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। বাবার শিল্পীসত্তা আমার বোধশক্তির যে গণ্ডী--তার বাইরে। সে অনেক বড়ো জিনিস। দ্বিতীয় কারণটা ব্যক্তিগত। সেটা এই : বাবার সম্বন্ধে আমি কখনোই নিরপেক্ষ নই। সব সময়েই আমি বাবার দলে। ছোটবেলায়, আড়াই কি তিন বছর বয়সে, বাবার সঙ্গে আমার নানা-রকম খেলা জমে উঠতো। সে এক অদ্ভুত খেলা, কারণ বাবা তাতে আমার প্রতিপক্ষ ছিলেন না। দু'জনে একই দলে খেলতাম। সেই থেকেই আমি সব ব্যাপারে ভীষণভাবে বাবার দলে। খুব মজার কথা সন্দেহ নেই। আমি বাবার বিশাল প্রতিভাকে সম্যক বুঝি না, তবুও সবার কাছে জাঁক করে বেড়াই—বাবা একজন বিরাট লেখক। মনে মনে (এবং কখনো কখনো প্রকাশ্যভাবেই) বাবাকে শেক্সপীয়র, কালিদাস কিম্বা টলস্টয়ের সঙ্গে একা-

মনে বসাই। কেউ যদি অত্যন্ত সঙ্গতকারণেও বাবার কোনো রচনা সম্বন্ধে বিদ্রূপ মন্তব্য করেন, তাহলে আমি চেঁচামেচি করে ছেলেমানুষের মতো তার প্রতিবাদ করি এবং সে মন্তব্য বিশ্বাস করি না। কারণ আড়াই বছর যখন আমার বয়স, তখন থেকে বাবা আমার দলের লোক—আমার বাল্যবন্ধু, আমার খেলার সঙ্গী। বাবা বলে ততটা নয়, যতটা বাল্যবন্ধু বলে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা আমার খুব গায়ে লেগে যায়।

ছোটবেলা থেকে বাবার বই পড়ে পড়ে আমার জীবন মোটামুটিভাবে বাবার দর্শনের ছায়াতেই গড়ে উঠেছে। আমি এটাকে আশীর্বাদ বলে মেনে নিয়েছি ঠিকই কিন্তু এতে একটা অসুবিধা হয়েছে। আমাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে যুগটা দৌড়ে এগিয়ে গেছে বহুদূর। অনেক পিছিয়ে পড়েছি এ যুগের চেয়ে। একজন নিয়ানডার্থালি মানুষকে হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ্‌ এভেন্যুতে এনে ফেললে তার যে বিস্ময় হতে পারত—এ যুগের প্রতি আমার দৃষ্টি ঠিক তেমনি বিস্ময়াকুল। বিভূতিভূষণের সাহিত্য পাঠ করে যে পৃথিবীকে ভালোবেসেছি, সে পৃথিবী এখন কোথায়? সেই নদী, সেই অরণ্য, সেই গ্রহজগৎ এবং আনীহারিকাসৌরচরাচরব্যাপী বিশ্বটা ঠিকই আছে। কিন্তু এসব যার পটভূমি সেই মানবজগত বড়ো বদলে গেছে। কোথায় সে সব মানুষ যারা বিভূতিভূষণের রচনায় দুই জেলার প্রান্তে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জেলা কেমন করে শেষ হয় দেখে অবাক হয়ে যেত, অথবা শুধুই বনের শোভা বাড়ানোর জন্য নিজের পয়সা খরচ করে গাছ লাগাতো লবটুলিয়ার জঙ্গলে?

মানুষ বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু সান্ত্বনাও আছে--বিভূতিভূষণের রচনাতেই আছে। যে কালে আমরা বাস করি সেই বর্তমান কাল সময়ের পারাপারহীন সমুদ্রের একটা ছোট্ট উর্মি মাত্র। কোটি বছরের ব্যাপ্তিতে যে জীবনের পথ বিসর্পিত তার বাঁকে বাঁকে অনেক দুঃসময় অনেক মন্বন্তর। সে সব পার হয়েই অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হতে হয়। এখন দুঃসময়। তাতে কি? সামনে নিশ্চয়ই নতুন আলোর দিন। বাবার লেখা পড়ে এ বিশ্বাস আমার হয়েছে।

বাবা যখন মারা যান আমার তখন তিন বছর বয়স। অত শৈশবের স্মৃতি সাধারণত স্মরণ করা যায় না। কিন্তু বাবার সম্বন্ধে স্মৃতির ভাণ্ডার অত্যন্ত স্বল্প উপাদানে তৈরী বলেই বোধ হয় তা খুব তীব্র। ফলে চেষ্টা করলে আমি বিচ্ছিন্ন কতকগুলো ঘটনা মনে করতে পারি। বাবার কাঁধে চেপে ঘাটশিলার শালবনে বেড়ানো, বোম্বে মেল দেখতে যাওয়া—এসব খুব মনে পড়ে। দেশের বাড়ির বারান্দায় বাবা বসে আছেন, আমি তিনবছরের শিশু, বারান্দার ধারের কি একটা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে আনছি আর বাবাকে বলছি—বাবা, আলুভাজা খা। বাবা নকল খাওয়ার ভঙ্গি করছেন—এ দৃশ্যটাও খুব মনে পড়ে। বস্তুতঃ ছোটোবেলায় যেন বাবার অভাবটা ততখানি অনুভব করতে পারিনি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে বয়স বাড়ছে, কতই মনের গোপন কোণে এক বীণা খাদের সুরে বার বার কেঁদে বলছে—নেই—নেই—নেই। আমার বয়স খুব বেশি নয় বলে আমার জীবনে সমস্যা নেই এটা ঠিক নয়। আশ্চর্য সব জাগতিক এবং নীতিগত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যখন অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করি, তখন বাবার জন্য প্রাণটা কেঁদে

ওঠে। কোথায় মাকে আমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেল মানুষটা। অনেক আত্মীয়ের মধ্যেও একা লাগে যে!

যখন কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম পুরী। মা আর বাবা পুরী বেড়াতে এসেছিলেন বহুদিন আগে। তখন আমার জন্ম হয় নি। সঙ্গে ছিলেন গজেনকাকু (সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র) এবং আরও অনেকে। মার কাছে সে গল্প অনেকবার শুনেছি রাত্রিরে-দুপুরে মার বুকের কাছে শুয়ে। পুরীর সমুদ্রবেলায় চাঁদের আলোয় একা বেড়াতে বেড়াতে আমার সে কথা মনে পড়েছিল। কবে সমুদ্র রূঢ় হাতে মুছে দিয়েছে বেলাভূমিতে সাতাশ বছর আগে আঁকা পাশাপাশি বাবা-মার পায়ের ছাপ। অথচ আজকের দিনটা যেমন সত্য—সেদিনটাও ঠিক তেমনি সত্য ছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ঢেউ-এর মাথায় জ্বলে ওঠা স্বতঃপ্রভ আলো দেখতে দেখতে মন আবার খুব স্বাভাবিক হয়ে এল। ভেবে দেখলাম এটাই নিয়ম। আমিই কি চিরকাল থাকতে এসেছি? আজ চল্লিশ বছর পরে হয়ত আমারই উত্তরপুরুষ এই পুরীর বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারাক্রান্ত মনে আমাকে স্মরণ করবে। আমি তখন পঞ্চভূতে মিশে গেছি। যে নিয়মের প্রতিকার নেই, শান্তি পাবার উপায় বোধ হয় তাকে শান্তভাবে মেনে নেওয়া।

নিবন্ধের মধ্যপথে বোধ হয় একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। আমি এই ক'পাতায় বাবার রচনার কোনো সমালোচনা করবো না বা সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথাও বলবো না। কারণ সে রকম যোগ্যতা আমার নেই আর বাবার সব লেখাই আমার ভালো লাগে। এই নিবন্ধে বাবার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ক'টি স্মৃতি এবং অনুভূতির কথাই বলবো মাত্র। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন রচনা এগিয়ে যাচ্ছে অথচ লেখক এখনো আসল কথায় আসছে না কেন! আসল কথা আমি বহুক্ষণ শুরু করে দিয়েছি।

বাবাই মাকে প্রথম সমুদ্র দেখান। সেই কারণে সমুদ্র সম্বন্ধে মায়ের একটা দুর্বলতা আছে। ১৯৭১-এর জুন মাসে মাকে দীঘা বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। দুপুর বারোটায় দীঘা পৌঁছে একেবারে গাড়িসুদ্ধ বেলাভূমিতে নেমে পড়লাম। পথশ্রমের পর সামনেই সমুদ্র দেখে খুশীমনে সবাই এগুচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল হলো সঙ্গে মা নেই। মা কই? মা ছাড়া আমার কোনো আনন্দই সম্পূর্ণ হয় না। গাড়িতে ফিরে দেখি মা সামনের সীটের ওপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছেন। হঠাৎ আমার সেই দ্বিপ্রহরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল—বাবা দেখো তোমাকে আমরা ভুলিনি। মা-ও না আমিও না। আমরা তোমাকে মনে রাখবো। যতদিন বেঁচে আছি, যতদিন পৃথিবীর পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে এক একটি শান্ত আনন্দের সামনে দাঁড়াবো, তখনই তোমাকে মনে করবো। পার্থিব জীবনের চেয়ে অনেক বেশী করে তুমি আমাদের মধ্যে বেঁচে আছো।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্ল্যানচেট করা আমার রীতিমত নেশা ছিল। জন কেপলার থেকে শুরু করে ১৮২৭ সালে মৃত বৃটিশ যোদ্ধা ক্যাপটেন এন. পি. গ্র্যাণ্ট্ পর্যন্ত অনেকের

সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু বাবাকে বিশেষ কখনো আনবার চেষ্টা করি নি, যাঁকে হৃদয়ের ভেতরে অহরহ পাচ্ছি, তাঁকে ঘটা করে প্ল্যানচেটে ডাকার সার্থকতা খুঁজে পাই নি।

আমার স্বল্প স্মৃতি এবং মায়ের কাছে শোনা গল্পের ওপর নির্ভর করে বাবার একটি ভাবমূর্তি আমার মনে গড়ে উঠেছে। বাবাকে তো বেশিদিন পাই নি। ঐ ভাবমূর্তি দিয়েই বেশ কাজ চলে যায়। রাত্তিরে মায়ের কাছে শুয়ে গল্প শুনি। রাত্রি গভীর হয়, কথা বলতে বলতে মায়ের স্বর অশ্রুতে ভারি হয়ে আসে। আমি অবাক হয়ে শুনি নানা সাধারণ কথা। কেমন করে মা রান্না করে বাবাকে রোজ খেতে দিতেন, স্নান করতে যেতেন ইছামতী নদীতে। তারপর আছে বাবা-মার দেশভ্রমণের গল্প। বাবা মজা করতে ওস্তাদ ছিলেন। একবার মাকে বললেন—চলো, সালানপুর বেড়িয়ে আসি। অনেকদিন বেরুনো হয় না। অনেকদিন মানে অবশ্য মাস দুই। বাবা ঐ রকমই ছিলেন। চলতি কথায় যাকে বলে পায়ের নিচে সরষে থাকা, বাবার ছিল তাই। এক জায়গায় দু'মাস থাকলে একেবারে ভীষণ হাঁপিয়ে উঠতেন। একটা nomadic মন বাবাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতো।

সালানপুর জায়গাটা বর্ধমান থেকে খুব কাছে। মা রাগ করে বললেন—আর বেড়াবার জায়গা পেলে না? লোকে বেড়াতে যায় দিল্লী—বেনারস—হরিদ্বার, আর তুমি চললে সালানপুর?

বাবা বললেন—আহা চলোই না কেন, সব সময় খালি দূরে বেড়াতে যেতে হবে তার কি কোন ধরাবাঁধা নিয়ম আছে নাকি? কাছে কি দেখবার জিনিস নেই?

অতঃপর সালানপুরের দ্রষ্টব্য বস্তু সম্পর্কে বাবা মাকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে পরের দিন ট্রেনে উঠে বসলেন। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়লো। একের পর এক স্টেশন যায় কিন্তু সালানপুর আর আসে না এবং বাবাও নামবার উদ্যোগ করেন না। মা ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছেন—আর কতদূর? এ তো অনেক পথ আসা হোলো। বাবাও ক্রমাগত সান্ত্বনা দিয়ে চলেছেন—এই তো এসে পড়লুম বলে। ব্যস্ত হলে কি চলে?

মা প্রশ্ন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়লেন। কয়েক ঘণ্টা বাদে জেগে উঠে দেখেন বিরাট স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। গলা বাড়িয়ে মা স্টেশনের নাম পড়লেন—সেটা মোগলসরাই। তখন মায়ের ভীষণ সন্দেহ হয়েছে। বাবা তবুও বুঝিয়ে চলেছেন—সালানপুর আর বেশি রাস্তা নয়। শেষে যখন ট্রেন বিরাট এক নদী পেরুচ্ছে আর ওপারে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন এক শহর, তখন মা বাবাকে একেবারে চেপে ধরেচেন—সত্যি করে বলো কোথায় যাচ্ছি?

ততক্ষণে ট্রেন ওপারে পৌঁছে গেছে। বাবা নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন—তোমার সামনে বারাণসী! তারপরেই জোরে হেসে—কেমন বোকা বানিয়েছি?

এই হচ্ছে মায়ের কাশী ভ্রমণের ইতিহাস।*

---

* ১৯৪৫ সালের পূজার ঠিক পরের ঘটনা। গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তখন কাশীতে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ওখানে যোগ দিয়ে বিভূতিভূষণ সস্ত্রীক আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার ও মুসৌরী পর্যন্ত যান।

এসব গল্প বলতে বলতে মা কেঁদে ফেলেন। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বলি—কাঁদে না মা, লক্ষ্মী খুকি আমার, আমি তোমাকে আবার কাশী নিয়ে যাবো—হরিদ্বার, দেরাদুন—বাবা তোমাকে যে সব জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন, সব জায়গায় আমার সঙ্গে তুমি আবার যাবে। কাঁদে না।

সত্যি কথা বলতে কি, মায়ের মত এত ভালোমানুষ আমি কমই দেখেছি। এখন মাকে আমি খুকি বলে ডাকি, মা আমাকে বাবা বলে ডাকেন। আমি বাবা হয়ে গেছি, আর মা হয়ে গেছেন ছোট মেয়ে। আমরা দু'জনে বাবাকে আমাদের বুকের মধ্যে ধরে রেখে দিয়েছি। নিষ্ঠাবান ভক্তের মনে যেমন তার অজান্তেই অবিরত নামগান চলে—তেমনি বাবার কথা আমরা কখনোই ভুলে নেই।

এ পৃথিবীর ধুলো আমার কাছে পবিত্র। কারণ এর ওপরে একদিন বাবা হেঁটেছেন। যখনই কোনো সুন্দর ঝর্ণার ধারে কিংবা পাহাড়ের চূড়ায় শালবনের মধ্যে বসবো, যখনই অস্তসূর্য অথবা পূর্ণিমার বিভিন্ন আলোয় বনভূমি স্বপ্নিল হয়ে উঠবে, তখনই আমি বুকের ভেতরে শুনতে পাবো সেই মানুষটির চরণধ্বনি যে আমাকে তিনবছর বয়সে মায়ের কাছে ফেলে চলে গিয়েছিল। হয়তো আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসে দেখবো সূর্যাস্ত—একই সঙ্গে, আমি জানতেও পারবো না।

আমার রক্তে আছে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। আমি নিজে লিখতে ভালোবাসি। কিন্তু তা বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কারণ বাবা দিবাকর। তাঁর তীব্র আলোকচ্ছটায় চার দিক উদ্ভাসিত। সে আলোর হাটে আমার ক্ষুদ্র প্রদীপের সামান্য আলো কারো নজরে পড়বে না। স্বনামে খ্যাত হওয়া হয়তো আমার হবে না। ছোটবেলা থেকে যা হয়ে আসছে তাই হবে—অর্থাৎ চিরকাল আমি পরিচিত হবো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে বলে। তা হোক, আমি যশ চাই না—অমরত্ব চাই না, আমি শুধু কল্পান্তর ধরে বার বার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করতে চাই। এর চেয়ে বেশি কিছুতে আমার দরকারও নেই, বিশ্বাসও নেই। জন্মজন্মান্তর ধরে শুধু বাবাকে চাই। নইলে আমার শৈশবের সেই পঞ্চাশ বছরের শিশু সঙ্গীটিকে আবার ফিরে পাবো কি করে?

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়


চাঁদের
পাহাড়

চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত।

তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি স্যার এইচ. এইচ. জনস্টন, রোসিটা ফরব্‌স্‌ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে, এই গল্পে উল্লিখিত রিখটারস্‌-ভেল্ড পর্বতমালা মধ্য-আফ্রিকার অতি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী, এবং ডিঙ্গোনেক (রোডেসিয়ন মনস্টার) ও বুনিপের প্রবাদ জুলুল্যাণ্ডের বহু আরণ্যঅঞ্চলে আজও প্রচলিত।

সেণ্টফ্র্যাঙ্কো সৌর স্তোত্রের অনুবাদটি স্বর্গীয় মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায় কৃত।

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাকপুর, যশোহর

১লা আশ্বিন ১৩৪৪

এক

শঙ্কর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এইবার সে সবে এফ. এ পাশ দিয়ে এসে গ্রামে বসেছে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া। সারা বৈশাখ এভাবে কাটবার পরে একদিন তার মা ডেকে বললেন—শোন্ একটা কথা বলি শঙ্কর। তোর বাবার শরীর ভাল নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনো হবে কি করে? কে খরচ দেবে? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা দেখ্।

মায়ের কথাটা শঙ্করকে ভাবিয়ে তুললে। সত্যিই তার বাবার শরীর আজ ক'মাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। অথচ করবেই বা কি শঙ্কর? এখন কি তাকে কেউ চাকরি দেবে? চেনেই বা সে কাকে?

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরি। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকরির বাজার এতটা খারাপ ছিল না। শঙ্করদের গ্রামের এক ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটীতে পাটের কলে চাকরি করতেন। শঙ্করের মা তাঁর স্ত্রীকে ছেলের চাকরির কথা বলে এলেন। যাতে তিনি স্বামীকে বলে শঙ্করের জন্যে পাটের কলে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরদিন বাড়ী বয়ে বলতে এলেন যে শঙ্করের চাকরির জন্যে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন।

শঙ্কর সাধারণ ধরনের ছেলে নয়। স্কুলে পড়বার সময় সে বরাবর খেলাধুলোতে প্রথম হয়ে এসেছে। সেবার মহকুমার একজিবিশনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পায়। ফুটবলে অমন সেণ্টার ফরওয়ার্ড ও অঞ্চলে তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জুড়ি খুঁজে মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিংএ সে অত্যন্ত নিপুণ। কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই. এম. সি. এ.-তে সে রীতিমত বক্সিং অভ্যাস করেছে। এই সব কারণে পরীক্ষায় সে তত ভাল করতে পারে নি, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু তার একটি বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তার বাতিক ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ও বড় বড় ভূগোলের বই পড়া। ভূগোলের অঙ্ক কষতে সে খুব মজবুত। আমাদের দেশের আকাশে যে-সব নক্ষত্রমণ্ডল ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে—ওটা কালপুরুষ, ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া, ওটা বৃশ্চিক, কোন্ মাসে কোন্‌টা ওঠে, কোন্ দিকে ওঠে—সব ওর নখদর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখনি বলে দেবে। আমাদের দেশের বেশী ছেলে যে এসব জানে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময়ে সে একরাশ ওই সব বই কিনে এনেছে, নির্জ্জনে বসে প্রায়ই পড়ে আর কি ভাবে ওই জানে। তার পর এল তার বাবার

অসুখ, সংসারের দারিদ্র্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে চাকরি নেওয়ার জন্যে অনুরোধ। কি করবে সে? সে নিতান্ত নিরুপায়। মা-বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না। অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকরি নিতে হবে। কিন্তু জীবনের স্বপ্ন তা'হলে ভেঙে যাবে, তাও সে যে না বোঝে এমন নয়! ফুটবলের নাম-করা সেণ্টার ফরওয়ার্ড, জেলার হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ন, নামজাদা সাঁতারু শঙ্কর হবে কিনা শেষে পাটের কলের বাবু? নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে সকালের ভোঁ বাজতেই ছুটতে হবে কলে—আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা—ওদিকে সেই ছ'টার ভোঁ বাজলে ছুটি। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে! ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাকড়া গাড়ী টানতে যাবে?···সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই। নদীর ধারে নির্জ্জনে বসে বসে শঙ্কর এই সব কথাই ভাবছিল। তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর, দূর দেশে—শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্ট্যান্‌লির মত, হ্যারি জন্‌স্টন্, মার্কো পোলো, রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মত। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরী করেছে—যদিও এ কথা ভেবে দেখে নি অন্যদেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালীর ছেলের পক্ষে তা ঘটা এক রকম অসম্ভব। তারা তৈরী হয়েছে কেরানী, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার জন্যে। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাত পথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান ভূপর্য্যটক আণ্টন্ হাউপ্টমান্ লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্ব্বত—মাউন্‌টেন্ অফ্ দি মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ! কত বার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের্ হাউপ্টমানের মত সেও একদিন যাবে মাউন্‌টেন্ অফ্ দি মুন্ জয় করতে। স্বপ্ন! সত্যিকার চাঁদের পাহাড়ের মতই দূরের জিনিস হয়ে থাকবে চিরকাল।··· চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে?

সে রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলে সে।··

চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতীর দল মড়্ মড়্ করে বাঁশ ভাঙছে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দুজনে একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বতে উঠছে; চারিধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্টমানের লেখা মাউন্‌টেন্ অফ্ দি মুনের দৃশ্যের মত। সেই ঘন বাঁশবন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড় বড় গাছ, নীচে পচাপাতার রাশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি গা—আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া সাদা ধব্‌ধবে চিরতুষারে ঢাকা পর্ব্বত-শিখরটি - এক একবার দেখা যাচ্ছে, এক একবার বনের আড়ালে চাপা পড়ছে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতীর গর্জ্জন শুনতে পেলে। সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল···এত বাস্তব বলে মনে হল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল!

বিছানার উপর উঠে বসল, ভোর হয়ে গিয়েছে, জানালার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেছে।

উঃ, কি স্বপ্নটাই দেখেছে সে! ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়! বলে তো অনেকে।

অনেকদিন আগেকার একটা ভাঙা পুরোনো মন্দির আছে তাদের গাঁয়ে। বারভূঁইয়ার এক ভূঁইয়ার জামাই মদন রায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈরী করেন। এখন মদন রায়ের বংশে কেউ নেই। মন্দির ভেঙেচুরে গিয়েছে, অশথ গাছ, বট গাছ গজিয়েছে কার্নিসে—কিন্তু যেখানে ঠাকুরের বেদী, তার ওপরের খিলেনটা এখনও ঠিক আছে। কোন মূর্ত্তি নেই, তবুও শনি-মঙ্গলবারে পুজো হয়, মেয়েরা বেদীতে সিঁদুর চন্দন মাখিয়ে রেখে যায়, সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত—যে যা মানত করে তাই হয়। শঙ্কর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরের একটা বটের ঝুরির গায়ে একটা ঢিল ঝুলিয়ে কি প্রার্থনা জানিয়ে এল।

বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দূর্ব্বাঘাসের বনে বসে রইল। জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হলেও বনে ঘেরা, কাছেই একটা পোড়ো বাড়ী; এদের বাড়ীতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের শিশুকালে—সেই থেকে বাড়ীর মালিক এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করছেন। সবাই বলে জায়গাটায় ভূতের ভয়। একা বড় কেউ এদিকে আসে না। শঙ্করের কিন্তু এই নির্জ্জন মন্দির-প্রাঙ্গণের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড় ভাল লাগে!

ওর মনে আজ ভোরের স্বপ্নটা দাগ কেটে বসে গিয়েছে। এই বনের মধ্যে বসে শঙ্করের আবার সেই ছবিটা মনে পড়ল—সেই মড়্‌মড়্‌ করে বাঁশঝাড় ভাঙছে বুনোহাতীর দল, পাহাড়ের অধিত্যকার নিবিড় বনে পাতালতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক উঁচুতে পর্ব্বতের জ্যোৎস্নাপাণ্ডুর তুষারাবৃত শিখরদেশটা যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করছে। কত স্বপ্ন তো সে দেখেছে জীবনে—এত সুস্পষ্ট ছবি স্বপ্নে সে দেখে নি কখনো—এমন গভীর রেখাপাত করে নি কোনো স্বপ্ন তার মনে।···

সব মিথ্যে। তাকে যেতে হবে পাটের কলে চাকরি করতে। তাই তার ললাট-লিপি নয় কি?···

কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা উপন্যাসে ঘটাতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে।

শঙ্করের জীবনেও এমন একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল।

সকালবেলা সে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে সবে বাড়ীতে পা দিয়েছে, এমন সময়ে ওপাড়ার রামেশ্বর মুখুজ্জের স্ত্রী একটুক্‌রো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বল্লেন—বাবা শঙ্কর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেক দিন পরে। ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়ীতে চিঠি দিয়েছে, কাল পিণ্টু সেখান থেকে এসেছে, এই ঠিকানা তারা লিখে দিয়েছে। পড় তো বাবা?

শঙ্কর বললে—উঃ, প্রায় দু-বছরের পর খোঁজ মিল্‌ল! বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে কি ভয়টাই দেখালেন! এর আগেও তো একবার পালিয়ে গেছলেন—না? তার পর সে কাগজটা খুললে। লেখা আছে—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগাণ্ডা রেলওয়ে হেড্‌ অফিস, কন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌ ডিপার্টমেণ্ট, মোম্বাসা, পূর্ব্ব আফ্রিকা।

শঙ্করের হাত থেকে কাগজের টুক্‌রোটা পড়ে গেল। পূর্ব্ব আফ্রিকা! পালিয়ে মানুষে এতদূর যায়? তবে সে জানে ননীবালা দিদির এই স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরনের। একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শঙ্করের আলাপও হয়েছিল—শঙ্কর তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে সবে উঠেছে। লোকটা খুব উদার প্রকৃতির, লেখাপড়া ভালই জানে, তবে কোন একটা চাকরিতে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না, উড়ে বেড়ানো স্বভাব। আর একবার পালিয়ে বর্ম্মা না কোচিন কোথায় যেন গিয়েছিল। এবারও বড়দাদার সঙ্গে কি নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার দরুন বাড়ী থেকে পালিয়েছিল—এ খবর শঙ্কর আগেই শুনেছিল। সেই প্রসাদবাবু পালিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠেছে একেবারে পূর্ব্ব আফ্রিকায়!

রামেশ্বর মুখুজ্জের স্ত্রী ভালো বুঝতে পারলেন না তাঁর জামাই কতদূরে গিয়েছে। অতটা দূরত্বের তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি চলে গেলে শঙ্কর ঠিকানাটা নিজের নোট বইয়ে লিখে রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসাদবাবুকে একখানা চিঠি দিলে। শঙ্করকে তাঁর মনে আছে কি? তাঁর শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের ছেলে সে। এবার এফ. এ. পাশ দিয়ে বাড়ীতে বসে আছে। তিনি কি একটা চাকরি করে দিতে পারেন তাঁদের রেলের মধ্যে? যতদূরে হয় সে যাবে।

দেড়মাস পরে, যখন শঙ্কর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে চিঠির উত্তর-প্রাপ্তি সম্বন্ধে—তখন একখানা খামের চিঠি এল শঙ্করের নামে। তাতে লেখা আছে—

মোম্বাসা
২নং পোর্ট স্ট্রীট

প্রিয় শঙ্কর,

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। কব্জির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে গিয়েছিলুম, সে কথা ভুলি নি। তুমি আসবে এখানে? চলে এসো। তোমার মত ছেলে যদি বাইরে না বেরুবে, তবে কে আর বেরুবে? এখানে নতুন রেল তৈরী হচ্ছে, আরও লোক নেবে। যত তাড়াতাড়ি পারো, এসো। তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার আমি নিচ্ছি।

তোমাদের—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি। যৌবনে তিনিও নিজে ছিলেন ডানপিটে ধরনের লোক। ছেলে পাটের কলে চাকরি করতে যাবে তাঁর এতে মত ছিল না, শুধু সংসারের অভাব অনটনের দরুনই শঙ্করের মায়ের মতে সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর মাসখানেক পরে শঙ্করের নামে এক টেলিগ্রাম এল ভদ্রেশ্বর থেকে। সেই জামাইটি দেশে এসেছেন সম্প্রতি। শঙ্কর যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রাম পেয়েই। তিনি আবার মোম্বাসায় ফিরবেন দিন কুড়ির মধ্যে। শঙ্করকে তা হলে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে যেতে পারেন।

দুই

চার মাস পরের ঘটনা। মার্চ মাসের শেষ।

মোম্বাসা থেকে রেলপথ গিয়েছে কিসুমু-ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের ধারে—তারই একটা শাখা লাইন তখন তৈরী হচ্ছিল। জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে তিনশো মাইল পশ্চিমে। ইউগাণ্ডা রেলওয়ের হুড্‌সবার্গ স্টেশন থেকে বাহাত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখানে শঙ্কর কনস্ট্রাক্‌শন্ ক্যাম্পের কেরানী ও সরকারী স্টোর্‌কিপার হয়ে এসেছে। থাকে ছোট একটা তাঁবুতে। তার আশে-পাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়িঘর তৈরী হয় নি বলে তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো—তাদের চারিধারে ঘিরে বহু দূরব্যাপী মুক্ত প্রান্তর, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে গাছ। তাঁবুগুলোর ঠিক গায়েই খোলা জায়গার শেষ সীমায় একটা বড় বাওবাব্ গাছ। আফ্রিকার বিখ্যাত গাছ, শঙ্কর কতবার ছবিতে দেখেছে, এবার সত্যিকার বাওবাব্ দেখে শঙ্করের যেন আশ মেটে না।

নতুন দেশ, শঙ্করের তরুণ তাজা মন—সে ইউগাণ্ডার এই নির্জ্জন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খুঁজে পেলে। কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে পড়তো—যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকে বেড়াতে বার হত—পুবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। সব দিকেই লম্বা লম্বা ঘাস, কোথাও মানুষের মাথা সমান উঁচু, কোথাও তার চেয়েও উঁচু।

কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিন শঙ্করকে ডেকে বললেন—শোনো রায়, ওরকম এখানে বেড়িও না। বিনা বন্দুকে এখানে এক পাও যেও না। প্রথম, এই ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পারো। পথ হারিয়ে লোক এসব জায়গায় মারাও গিয়েছে জলের অভাবে। দ্বিতীয়, ইউগাণ্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে সিংহ হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েছে—কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই। খুব সাবধান। এসব অঞ্চল মোটেই নিরাপদ নয়।

একদিন দুপুরের পরে কাজকর্ম্ম বেশ পুরোদমে চলছে, হঠাৎ তাঁবু থেকে কিছু দূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। সবাই সেদিকে ছুটে গেল ব্যাপার কি দেখতে। শঙ্করও ছুটল—ঘাসের জমি পাতি-পাতি করে খোঁজা হল—কিছুই নেই সেখানে।

কিসের চীৎকার তবে?

এঞ্জিনিয়ার সাহেব এলেন। কুলীদের নাম-ডাকা হল, দেখা গেল একজন কুলী অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল সে একটু আগে ঘাসের বনের দিকে কি কাজে গিয়েছিল, তাকে ফিরে আসতে কেউ দেখে নি।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে ঘাসের বনের বাইরে বালির ওপরে কʼটা সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজন সঙ্গে পায়ের দাগ দেখে দেখে অনেক দূর গিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলীর রক্তাক্ত দেহ বার করলেন।

তাকে তাঁবুতে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল। কিন্তু সিংহের কোনো চিহ্ন মিলল না। লোকজনের চীৎকারে সে শিকার ফেলে পালিয়েছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কুলীটা মারা গেল।

তাঁবুর চারিপাশের লম্বা ঘাস অনেকদূর পর্য্যন্ত কেটে সাফ্ করে দেওয়া গেল পরদিনই। দিনকতক সিংহের কথা ছাড়া তাঁবুতে আর কোনো গল্পই নেই। তার পর মাসখানেক পরে ঘটনাটা পুরানো হয়ে গেল, সে কথা সকলের মনে চাপা পড়ে গেল। কাজকর্ম্ম আবার বেশ চলল।

সেদিন দিনে খুব গরম। সন্ধ্যার একটু পরেই কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ল। কুলীদের তাঁবুর সামনে অনেক কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েছে। সেখানে তাঁবুর সবাই গোল হয়ে গল্পগুজব করছে। শঙ্করও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প শুনছে এবং অগ্নিকুণ্ডের আলোতে 'কেনিয়া মর্নিং নিউজ' পড়ছে। খবরের কাগজখানা পাঁচদিনের পুরোনো। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরে তবু এখানেতে বাইরের দুনিয়ার যা কিছু একটু খবর পাওয়া যায়।

তিরুমল আপ্পা বলে একজন মাদ্রাজী কেরানীর সঙ্গে শঙ্করের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিরুমল তরুণ যুবক, বেশ ইংরেজী জানে, মনেও খুব উৎসাহ। সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে য়্যাড্ভেঞ্চারের নেশায়। শঙ্করের পাশে বসে সে আজ সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দেশের কথা, তার বাপ-মায়ের কথা, তার ছোট বোনের কথা বলছে। ছোট বোনকে সে বড় ভালবাসে। বাড়ী ছেড়ে এসে তার কথাই তিরুমলের বড় মনে হয়। একবার সে দেশের দিকে যাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। মাস-দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব ?

ক্রমে রাত বেশি হল। মাঝে-মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, আবার কুলীরা তাতে কাঠ-কুটো ফেলে দিচ্ছে। আরও অনেকে উঠে শুতে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ধীরে-ধীরে দূর দিগন্তে দেখা দিল—সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো-আঁধারে লুকোচুরি আর বুনো গাছের দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া।

শঙ্করের ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই স্তব্ধ রাত্রির সৌন্দর্য্য। কুলীদের ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে সে সমুদ্রের বিশাল জনহীন তৃণভূমির আলো-আঁধার-মাখা রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবছিল। ওই বাওবাব্ গাছটার ওদিকে অজানা দেশের সীমা কেপটাউন পর্য্যন্ত বিস্তৃত—মধ্যে পড়বে কত পর্ব্বত অরণ্য, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগর জিম্বারি—বিশাল ও বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খনির দেশ !

একজন বড় স্বর্ণান্বেষী পর্য্যটক যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন—সেটা হাতে তুলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গে সোনা মেশানো রয়েছে। সে জায়গায় বড একটা সোনার খনি বেরিয়ে পডল। এ ধরনের কত গল্প সে পড়েছে দেশে থাকতে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশ, হীরের দেশ—কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলী, অজানা জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসেব রেখেছে ?

কত কি ভাবতে-ভাবতে শঙ্কর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেছে। ধবধবে সাদা জ্যোৎস্না দিনের মত পরিষ্কার। অগ্নিকুণ্ডের আগুন গিয়েছে নিবে। কুলীরা সব কুণ্ডলী পাকিয়ে আগুনের ওপরে শুয়ে আছে। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ শঙ্করের দৃষ্টি পড়ল তার পাশে—এখানে তো তিরুমল আপ্পা বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল! সে কোথায়? তা হলে হয়তো সে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে থাকবে।

শঙ্করও নিজে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে অল্প দূরেই পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জ্জন শুনতে পাওয়া গেল। রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে যেন তাঁবু কেঁপে উঠল সে রবে। কুলীরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। শঙ্কর জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গর্জ্জন—সেই দিক-দিশাহীন তৃণভূমির মধ্যে শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় সে গর্জ্জন যে কি এক অনির্দ্দেশ্য অনুভূতি তার মনে জাগালে!—তা ভয় নয়, সে এক রহস্যময় ও জটিল মনোভাব। একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলী ছিল তাঁবুতে। সে বললে, সিংহ লোক মেরেছে। লোক না মারলে এমন গর্জ্জন করবে না।

তাঁবুর ভেতর থেকে তিরুমলের সঙ্গী এসে হঠাৎ জানালে তিরুমলের বিছানা শূন্য। সে তাঁবুর মধ্যে কোথাও নেই।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। শঙ্কর নিজে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখে এল সত্যিই সেখানে কেউ নেই। তখনি কুলীরা আলো জেলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সব তাঁবুগুলোতে খোঁজ করা হল, নাম ধরে চীৎকার করে ডাকাডাকি করলে সবাই মিলে—তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না।

তিরুমল যেখানটাতে শুয়ে ছিল, সেখানটাতে ভাল করে দেখা গেল তখন। একটা কোনো ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মাটির ওপর সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে কারো দেরি হল না। বাওবাব্ গাছের কাছে তিরুমলের জামার হাতার খানিকটা টুক্‌রো পাওয়া গেল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে আগে আগে চললেন, শঙ্কর তাঁর সঙ্গে চলল। কুলীরা তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। সেই গভীর রাত্রে তাঁবু থেকে দূরে মাঠে চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হল, তিরুমলের দেহের কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার সিংহগর্জ্জন

শোনা গেল—কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জ্জন প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী কোনো রহস্যময়ী রাক্ষসীর বিকট চীৎকার।

মাসাই কুলীটা বললে—সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেকগুলো মানুষ ও ঘাল্ না করে ছাড়বে না। সবাই সাবধান। যে সিংহ একবার মানুষ খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

রাত যখন তিনটে, তখন সবাই ফিরল তাঁবুতে। বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার এই অংশে পাখী বড় একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের রাত্রিচর পাখীর ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে—সে স্বর অপার্থিব ধরনের মিষ্ট। এইমাত্র সেই পাখী কোন্ গাছের মাথায় বহুদূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্ত্তে উদাস করে দেয়। শঙ্কর ঘুমুতে গেল না। আর সবাই তাঁবুর মধ্যে শুতে গেল—কারণ পরিশ্রম কারো কম হয় নি। তাঁবুর সামনে কাঠকুটো জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা গেল। শঙ্কর সাহস করে বাইরে বসতে অবিশ্যি পারলে না—এরকম দুঃসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে নিজের খড়ের ঘরে শুয়ে জানালা দিয়ে বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোকিত অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল।

মনে কি এক অদ্ভুত ভাব! তিরুমলের অদৃষ্টলিপি এই জন্যেই বোধ হয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল। তাকেই বা কি জন্যে এখানে এনেছে তার অদৃষ্ট, কে জানে তার খবর?

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর! দেখতে বাব্‌লা বনে ভর্ত্তি বাংলাদেশের মাঠের মত দেখালে কি হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল! যেখানে সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা…পরমুহূর্ত্তে কি ঘটবে, এ মুহূর্ত্তে তা কেউ বলতে পারে না।

আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেছে—তরুণ হিন্দুযুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।

তিরুমল তো গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে পরদিন থেকে এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে আর সেখানে সিংহের উপদ্রবে থাকা যায় না। মানুষ-খেকো সিংহ অতি ভয়ানক জানোয়ার! যেমন সে ধূর্ত্ত তেমনি সাহসী। সন্ধ্যা তো দূরের কথা, দিনমানেই একা বেশিদূর যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার আগে তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড় বড় আগুনের কুণ্ড করা হয়, কুলীরা আগুনের কাছ ঘেঁষে বসে গল্প করে, রান্না করে, সেখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া করে। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক হাতে রাত্রে তিন-চার বার তাঁবুর চারিদিকে ঘুরে পাহারা দেন, ফাঁকা আওয়াজ করেন—এত সতর্কতার মধ্যেও একটা কুলীকে সিংহ নিয়ে পালালো তিরুমলকে মারবার ঠিক দুদিন পরে সন্ধ্যারাত্রে। তার পরদিন একটা সোমালী কুলী দুপুরে তাঁবু থেকে তিনশো গজের মধ্যে পাথরের ঢিবিতে পাথর ভাঙতে গেল—সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না।

সেই রাত্রেই, রাত দশটার পরে, শঙ্কর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরছে, লোকজন কেউ বড় একটা বাইরে নেই, সকাল সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে, কেবল এখানে ওখানে

দু-একটা নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকছে—শেয়ালের ডাক শুনলেই শঙ্করের মনে হয় সে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আছে—চোখ বুজে সে নিজের গ্রামটা ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই বিলিতি-আমড়া গাছটা ভাববার চেষ্টা করে—আজও সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুজলে।

কি চমৎকার লাগে! কোথায় সে? সেই তাদের গাঁয়ের বাড়ীতে জানালার কাছে তক্তপোশে শুয়ে? বিলিতি-আমড়া গাছটার ডালপালা চোখ খুললেই চোখে পড়বে? ঠিক? দেখবে সে চোখ খুলে?

শঙ্কর ধীরে ধীরে চোখ খুললে।

অন্ধকার প্রান্তর। দূরে সেই বড় বাওবাব্ গাছটা অস্পষ্ট অন্ধকারে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনের একটা ছাতার মত গোল খড়ের নীচু চালের ওপর একটা কি যেন নড়ছে। পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা সিংহ খড়ের চাল থাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত্ত করবার চেষ্টা করছে ও মাঝে মাঝে নাকটা চালের গর্ত্তের কাছে নিয়ে গিয়ে কিসের যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে!

তার কাছ থেকে চালাটার দূরত্ব বড় জোর বিশ হাত।

শঙ্কর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সিংহ চালার খড় খুঁচিয়ে গর্ত্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে—শঙ্করকে সে এখনও দেখতে পায়নি। তাঁবুর বাইরে কোথাও লোক নেই, সিংহের ভয়ে বেশী রাত্রে কেউ বাইরে থাকে না। নিজে সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, একগাছা লাঠি পর্য্যন্ত নেই হাতে।

শঙ্কর নিঃশব্দে পিছু হঠতে লাগল এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে সিংহের দিকে চোখ রেখে। এক মিনিট···দু মিনিট···নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর যে তার এত কর্ত্তৃত্ব ছিল, তা এর আগে শঙ্কর জানতো না। একটা ভীতিসূচক শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুল না বা সে হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টাও করলে না।

এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর পর্দ্দা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখল সাহেব টেবিলে বসে তখনও কাজ করছে। সাহেব ওর রকম-সকম দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ও বললে—সাহেব, সিংহ!···

সাহেব লাফিয়ে উঠল—কৈ? কোথায়?

বন্দুকের র‍্যাকে একটা ·৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফ‌্ল্ ছিল—সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে। শঙ্করকে আর একটা রাইফ‌্ল্ দিলে। দুজনে তাঁবুর পর্দ্দা তুলে আস্তে আস্তে বাইরে এল। একটু দূরেই কুলী লাইনের সেই গোল চালা। কিন্তু চালার ওপর কোথায় সিংহ? শঙ্কর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই মাত্র দেখে গেলাম্ স্যার। ঐ চালার ওপর সিংহ থাবা দিয়ে খড় খোঁচাচ্ছে।

সাহেব বললে—পালিয়েছে। জাগাও সবাইকে।

একটু পরে তাঁবুতে মহা শোরগোল পড়ে গেল। লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুগুর নিয়ে কুলীর

দল হল্লা করে বেরিয়ে পড়ল—খোঁজ খোঁজ চারিদিকে, খড়ের চালে সত্যিই ফুটো দেখা গেল। সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সিংহ উধাও হয়েছে। আগুনের কুণ্ডে বেশী করে কাঠ ও শুকনো খড় ফেলে আগুন আবার জ্বালানো হল। সে রাত্রে অনেকেরই ভাল ঘুম হল না, কিন্তু তাঁবুর বাইরেও বড় একটা কেউ রইল না। শেষ রাত্রের দিকে শঙ্কর নিজের তাঁবুতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—একটা মহা শোরগোলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মাসাই কুলীরা 'সিম্বা' 'সিম্বা' বলে চীৎকার করছে। দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল। শঙ্কর তাঁবুর বাইরে এসে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে জানলে সিংহ এসে আস্তাবলের একটা ভারবাহী অশ্বতরকে জখম করে গিয়েছে—এই মাত্র। সবাই শেষ রাত্রে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোক্‌রা কুলীকে তাঁবুর একশো হাতের মধ্যে থেকে সিংহে নিয়ে গেল। দিন চারেক পরে আর একটা কুলীকে নিলে বাওবাব্ গাছটার তলা থেকে।

কুলীরা আর কেউ কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে গাঁতিওয়ালা কুলীদের অনেক সময়ে খুব ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে হয়—তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বেশি দূর যেতে চায় না। তাঁবুর মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। সকলেরই মনে ভয়—প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। কাকে কখন নেবে কিছু স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় কাজ হয় না। কেবল মাসাই কুলীরা অবিচলিত রইল—তারা যমকে ভয় করে না। তাঁবু থেকে দু-মাইল দূরে গাঁতির কাজ তারাই করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার তাদের দেখাশুনা করে আসে।

কত নতুন ব্যবস্থা করা হল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব কমল না। কত চেষ্টা করেও সিংহ শিকার করা গেল না। অনেকে বললে—সিংহ একটা নয়, অনেকগুলো—ক'টা মেরে ফেলা যাবে? সাহেব বললে—মানুষ-খেকো সিংহ বেশী থাকে না। এ একটা সিংহেরই কাজ।

একদিন সাহেব শঙ্করকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে গাঁতিদার কুলীদের একবার দেখে আসতে। শঙ্কর বললে—সাহেব, তোমার ম্যান্‌লিকারটা দাও।

সাহেব রাজী হল। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে একটা অশ্বতরে চড়ে রওনা হল। তাঁবু থেকে মাইল খানেক দূরে এক জায়গায় একটা ছোট জলা। শঙ্কর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে পেয়েছে, তখন বেলা প্রায় তিনটে। কেউ কোনো দিকে নেই, রোদের ঝাঁঝ মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ অশ্বতর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সেটা এগিয়ে যেতে চায় না। শঙ্করের মনে হল জায়গাটার দিকে যেতে অশ্বতরটা ভয় পাচ্ছে। একটু পরে পাশের ঝোপে কি যেন একটা নড়ল। কিন্তু সেদিকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেলে না। সে অশ্বতর থেকে নামল। তবুও অশ্বতর নড়তে চায় না।

হঠাৎ শঙ্করের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝোপের মধ্যে সিংহ তার জন্য ওৎ পেতে বসে নেই তো? অনেক সময়ে এরকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপঝাপের মধ্যে

লুকিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অনুসরণ করে। নির্জ্জন স্থানে সুবিধা বুঝে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। যদি তাই হয়? শঙ্কর অশ্বতর নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনা করলে না। ভাবলে তাঁবুতে ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অশ্বতরের মুখটা ফিরিয়েছে, এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কি একটা নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সিংহগর্জ্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিরাট দেহ সশব্দে অশ্বতরের ওপর এসে পড়ল। শঙ্কর তখন হাত চারেক এগিয়ে আছে। সে তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে উপরি উপরি দুবার গুলি করলে। গুলি লেগেছে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু তখন অশ্বতর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—ধূসর বর্ণের জানোয়ারটা পলাতক। শঙ্কর পরীক্ষা করে দেখলে অশ্বতরের কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস ছিন্নভিন্ন, রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সেটা ছট্‌ফট করছে। শঙ্কর এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলে।

তার পর সে তাঁবুতে ফিরে এল। সাহেব বললে, সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। বন্দুকের গুলি যদি গায়ে লাগে তবে দস্তুরমত জখম তাকে হতেই হবে কিন্তু গুলি লেগেছিল তো? শঙ্কর বললে—গুলি লাগালাগির কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছুঁড়েছিল, এই মাত্র কথা। লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে দু-তিন দিনেও কোন আহত বা মৃত সিংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। কতকটা সিংহের উপদ্রবের জন্যে, কতকটা বা জলাভূমির সান্নিধ্যের জন্যে অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

শঙ্করকে আর কন্‌স্ট্রাকশন তাঁবুতে থাকতে হল না। কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট স্টেশনে সে স্টেশন মাস্টারের কাজ পেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই চলে গেল।

তিন

নতুন পদ পেয়ে উৎফুল্ল মনে শঙ্কর যখন স্টেশনটাতে এসে নামল, তখন বেলা তিনটে হবে। স্টেশন ঘরটা খুব ছোট। মাটির প্ল্যাটফর্ম্ম, প্ল্যাটফর্ম্ম আর স্টেশন ঘরের আশপাশ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্টেশন ঘরের পিছনে তার থাকবার কোয়ার্টার। পায়রার খোপের মত ছোট। যে ট্রেনখানা তাকে বহন করে এনেছিল, সেখানা কিসুমুর দিকে চলে গেল। শঙ্কর যেন অকূল সমুদ্রে পড়ল। এত নির্জ্জন স্থান সে জীবনে কখনো কল্পনা করে নি।

এই স্টেশনে সে একমাত্র কর্ম্মচারী। একটা কুলী পর্য্যন্ত নেই। সে-ই কুলী, সে-ই পয়েন্টস্‌ম্যান, সে-ই সব।

এরকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে যে এসব স্টেশন এখনও মোটেই আয়কর নয়। এর অস্তিত্ব এখনও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। এদের পেছনে রেল-কোম্পানী বেশী খরচ করতে রাজী নয়। একখানি ট্রেন সকালে, একখানি এই গেল—আর সারা দিন-রাত ট্রেন নেই।

সুতরাং তার হাতে প্রচুর অবসর আছে। চার্জ্জ বুঝে নিতে হবে এই যা একটু কাজ। আগের স্টেশন মাস্টারটী গুজরাটী, বেশ ইংরেজী জানে। সে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এল। চার্জ্জ বোঝাবার বেশী কিছু নেই। গুজরাটী স্টেশন মাস্টার তাকে পেয়ে খুব খুশি। ভাবে বোধ হল সে কথা বলবার সঙ্গী পায় নি অনেকদিন। দুজনে প্ল্যাটফর্ম্মের এদিক ওদিক পায়চারি করলে।

শঙ্কর বললে—কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন?

গুজরাটী ভদ্রলোকটি বললে—ও কিছু নয়। নির্জ্জন জায়গা—তাই।

শঙ্করের মনে হল কি একটা কথা লোকটা গোপন করে গেল। শঙ্করও আর পীড়াপীড়ি করলে না। রাত্রে ভদ্রলোক রুটি গড়ে শঙ্করকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে। খেতে বসে হঠাৎ লোকটি চেঁচিয়ে উঠল—ঐ যাঃ, ভুলে গিয়েছি।

—কি হল?

—খাবার জল নেই মোটে, ট্রেন থেকে নিতে একদম ভুলে গিয়েছি।

—সে কি? এখানে খাবার জল কোথাও পাওয়া যায় না?

—কোথাও না। একটা কুয়ো আছে, তার জল বেজায় তেতো আর কষা। সে জলে বাসন মাজা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। খাবার জল ট্রেন থেকে দিয়ে যায়।

বেশ জায়গা বটে। খাবার জল নেই, মানুষ-জন নেই। এখানে স্টেশন করেছে কেন তা শঙ্কর বুঝতে পারলে না।

পরদিন সকালে ভূতপূর্ব্ব স্টেশন মাস্টার চলে গেল। শঙ্কর পড়ল একা। নিজের কাজ করে, রাঁধে খায়, ট্রেনের সময় প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়ে দাঁড়ায়। দুপুরে বই পড়ে কি বড় টেবিলটাতে শুয়ে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করে।

স্টেশনের চারিধার ঘিরে ধূ ধূ সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ ঘাসের বন, মাঝে ইউক্', বাব্‌লা গাছ—দূরে পাহাড়ের সারি সারা চক্রবাল জুড়ে! ভারী সুন্দর দৃশ্য।

গুজরাটী লোকটি ওকে বারণ করে গিয়েছিল—একা যেন এই সব মাঠে সে না বেড়াতে বার হয়।

শঙ্কর বলেছিল -কেন?

সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গুজরাটী ভদ্রলোকটির কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। কিন্তু তার উত্তর অন্য দিক থেকে সে রাত্রেই মিলল।

সকাল-রাতেই আহারাদি সেরে শঙ্কর স্টেশন ঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে ডায়েরী লিখছে—স্টেশন ঘরেই সে শোবে—সামনের কাচ-বসানো দরজাটি বন্ধ আছে—কিন্তু আগল দেওয়া নেই—কিসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে দেখে—দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগিয়ে প্রকাণ্ড সিংহ! শঙ্কর কাঠের মত বসে রইল। দরজা একটু জোর করে ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। টেবিলের ওপর কেবল কাঠের রুলটা মাত্র আছে।

সিংহটা কিন্তু কৌতূহলের সঙ্গে শঙ্কর ও টেবিলের কেরোসিন বাতিটার দিকে চেয়ে চুপ

করে দাঁড়িয়ে রইল। খুব বেশীক্ষণ ছিল না, হয়তো মিনিট তুই—কিন্তু শঙ্করের মনে হল সে আর সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পরে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পর সিংহ ধীরে ধীরে অনাসক্ত ভাবে দরজা থেকে সরে গেল। শঙ্কর হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিলে।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে স্টেশনের চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া কেন আছে! কিন্তু শঙ্কর একটু ভুল করেছিল—সে আংশিক ভাবে বুঝেছিল মাত্র, বাকী উত্তরটা পেতে তু-একদিন বিলম্ব ছিল।

সেটা এল অন্য দিক থেকে।

পরদিন সকালের ট্রেনের গার্ডকে সে রাত্রের ঘটনাটা বললে। গার্ড লোকটি ভাল, সব শুনে বললে—এসব অঞ্চলে সর্ব্বত্রই এমন অবস্থা। এখান থেকে বারো মাইল দূরে আর একটা তোমার মত ছোট স্টেশন আছে—সেখানেও এই দশা। এখানে তো যে কাণ্ড—

সে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কথা বন্ধ করে ট্রেনে উঠে পড়ল। যাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে বলে গেল, বেশ সাবধানে থেকো সর্ব্বদা—

শঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়ল—এরা কি কথাটা চাপা দিতে চায়? সিংহ ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি? যাহোক্, সেদিন থেকে শঙ্কর প্ল্যাটফর্ম্মে স্টেশনে ঘরের সামনে রোজ আগুন জ্বালিয়ে রাখে। সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে স্টেশন ঘরে ঢোকে—অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে পড়াশুনো করে বা ডায়েরী লেখে। রাত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, প্ল্যাটফর্ম্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্যে দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক একদিন গভীর রাতে দূরে কোথায় সিংহের গর্জ্জন শুনতে পাওয়া যায়—অদ্ভুত জীবন।

ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল। এ তার রক্তে আছে। এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা—এই তো জীবন! শান্ত নিরাপদ জীবন নিরীহ কেরানীর জীবন হতে পারে—তার নয়—

সেদিন বিকেলের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সে নিজের কোয়ার্টারের রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময়ে খুঁটির গায়ে কি একটা দেখে সে তিন হাত লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল—প্রকাণ্ড একটা হল্‌দে খড়িশ গোখরো তাকে দেখে ফণা উদ্যত করে খুঁটি থেকে প্রায় এক হাত বাইরে মুখ বাড়িয়েছে। আর তু সেকেণ্ড পরে যদি শঙ্করের চোখ সেদিকে পড়ত—তা হলে—না, এখন সাপটাকে মারবার কি করা যায়? কিন্তু সাপটা পরমুহূর্ত্তে খুঁটি বেয়ে উপরে খড়ের চালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বেশ কাণ্ড বটে। ঐ ঘরে গিয়ে শঙ্করকে এখন ভাত রাঁধতে বসতে হবে। এ সিংহ নয় যে দরজা বন্ধ করে আগুন জেলে রাখবে। খানিকটা ইতস্ততঃ করে শঙ্কর অগত্যা রান্নাঘরে ঢুকল এবং কোনরকমে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে সন্ধ্যা হবার আগেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে স্টেশন ঘরে এল। কিন্তু স্টেশন ঘরেই বা বিশ্বাস কি? সাপ কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকবে, তাকে কি আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

পরদিনের সকালের ট্রেনে গার্ডের গাড়ী থেকে একটা নতুন কুলী তার রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল। সপ্তাহে দুদিন মোম্বাসা থেকে চাল আর আলু রেলকোম্পানী এই সব নির্জ্জন স্টেশনের কর্ম্মচারীদের পাঠিয়ে দেয়—মাসিক বেতন থেকে এর দাম কেটে নেওয়া হয়।

যে কুলীটা রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল সে ইণ্ডিয়ান, গুজরাট অঞ্চলে বাড়ী। সে বস্তাটা নামিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে চাইলে শঙ্করের দিকে, এবং পাছে শঙ্কর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, এই ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠে পড়ল।

কুলীর সে দৃষ্টি শঙ্করের চোখ এড়ায় নি। কি রহস্য জড়িত আছে যেন এই জায়গাটার সঙ্গে, কেউ তা ওর কাছে প্রকাশ করতে চায় না—প্রকাশ করা যেন বারণ আছে। ব্যাপার কি?

দিন দুই পরে ট্রেন পাশ করে সে নিজের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে—আর একটু হলে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিল আর কি! সেই খড়িশ গোখরো সাপ। পূর্ব্বদৃষ্ট সাপটাও হতে পারে, নতুন একটা যে নয় তারও কোনো প্রমাণ নেই।

শঙ্কর সেই দিন স্টেশনঘর, নিজের কোয়ার্টার ও চারধারের জমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে। সারা জায়গা মাটিতে বড় বড় গর্ত্ত, কোয়ার্টারের উঠানে, রান্নাঘরের দেওয়ালে, কাঁচা প্ল্যাটফর্ম্মের মাঝে মাঝে সর্ব্বত্র গর্ত্ত ও ফাটল আর ইঁদুরের মাটি। তবুও সে কিছু বুঝতে পারলে না।

একদিন সে স্টেশন ঘরে ঘুমিয়ে আছে, রাত অনেক। ঘর অন্ধকার—হঠাৎ শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর একটা কোন্ ইন্দ্রিয় যেন মুহূর্ত্তের জন্যে জাগরিত হয়ে উঠে তাকে জানিয়ে দিলে যে সে ভয়ানক বিপদে পড়বে। ঘোর অন্ধকার, শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। টর্চটা হাতড়ে পাওয়া যায় না কেন? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ টর্চটা তার হাতে ঠেকল এবং কলের পুতুলের মত সে সামনের দিকে ঘুরিয়ে টর্চটা জ্বাললে।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে টর্চটা ধরে বিছানার ওপরই বসে রইল।

দেওয়াল ও তার বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় মাথা উঁচু করে তুলে ও টর্চের আলো পড়ার দরুন সাময়িক ভাবে আলো-আঁধার লেগে থ' খেয়ে আছে আফ্রিকার ক্রূর ও হিংস্রতম সর্প—কালো মাম্বা! ঘরের মেজে থেকে সাপটা প্রায় আড়াই হাত উঁচু হয়ে উঠেছে—সেটা এমন কিছু আশ্চর্য্য নয় যখন ব্ল্যাক মাম্বা সাধারণতঃ মানুষকে তাড়া করে তার ঘাড়ে ছোবল মারে। ব্ল্যাক মাম্বার হাত থেকে রেহাই পাওয়া একপ্রকার পুনর্জ্জন্ম তাও শঙ্কর শুনেছে।

শঙ্করের একটা গুণ বাল্যকাল থেকেই আছে, বিপদে তার সহজে বুদ্ধিভ্রংশ হয় না—আর তার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর সে ঘোর বিপদেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

শঙ্কর বুঝলে হাত যদি তার একটু কেঁপে যায়—তবে যে মুহূর্ত্তে সাপটার চোখ থেকে

আলো সরে যাবে—সেই মুহূর্ত্তে ওর আলো-আঁধারি কেটে যাবে এবং তখুনি সে করবে আক্রমণ।

সে বুঝলে তার আয়ু নির্ভর করছে এখন দৃঢ় ও অবিকম্পিত হাতে টর্চটা সাপের চোখের দিকে ধরে থাকার ওপর। যতক্ষণ সে এরকম ধরে থাকতে পারবে ততক্ষণ সে নিরাপদ। কিন্তু যদি টর্চটা একটুও এদিক ওদিক সরে যায়—?

শঙ্কর টর্চ ধরেই রইল। সাপের চোখ দুটো জলছে যেন দুটো আলোর দানার মত। কি ভীষণ শক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্ছে চাবুকের মত খাড়া উদ্যত তার কালো মিশমিশে সরু দেহটাতে!···

শঙ্কর ভুলে গেল চারিপাশের সব আসবাব-পত্র, আফ্রিকা দেশটা, তার রেলের চাকরি, মোম্বাসা থেকে কিসুমু লাইনটা, তার দেশ, তার বাবা-মা—সমস্ত জগৎটা শূন্য হয়ে গিয়ে সামনের ওই দুটো জলজলে আলোর দানায় পরিণত হয়েছে···তার বাইরে সব শূন্য। অন্ধকার। মৃত্যুর মত শূন্য, প্রলয়ের পরের বিশ্বের মত অন্ধকার।

সত্য কেবল ওই মহাহিংস্র উদ্যত-ফণা সর্প, যেটা প্রত্যেক ছোবলে ১৫০০ মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং দেবার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে।···

শঙ্করের হাত ঝিম্‌ঝিম্ করছে, আঙ্গুল অবশ হয়ে আসছে, কনুই থেকে বগল পর্য্যন্ত হাতের যেন সাড়া নেই। কতক্ষণ সে আর টর্চ ধরে থাকবে? আলোর দানা দুটো হয়তো সাপের চোখ নয়···জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র···কিংবা ··

টর্চের ব্যাটারির তেজ কমে আসছে না? সাদা আলো যেন হলদে ও নিস্তেজ হয়ে আসছে না? কিন্তু জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র দুটো তেমনি জলছে। রাত না দিন? ভোর হবে, না সন্ধ্যা হবে?

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিলে। ওই চোখ দুটোর জ্বালাময়ী দৃষ্টি তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলেছে। সে সুজাগ থাকবে। এ তেপান্তরের মাঠে চেঁচালেও কেউ কোথাও নেই সে জানে—তার নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করছে তার জীবন। কিন্তু সে পারছে না যে, হাত যেন টন্‌টন্ করে অবশ হয়ে আসছে, আর কতক্ষণ সে টর্চ ধরে থাকবে? সাপে না হয় ছোবল দিক্ কিন্তু হাতখানা একটু নামিয়ে নিলে সে আরাম বোধ করবে এখন।

তার পরেই ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজলো। ঠিক রাত তিনটে পর্য্যন্তই বোধ হয় শঙ্করের আয়ু ছিল, কারণ তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠে নড়ে গেল—সামনের আলোর দানা গেল নিভে। কিন্তু সাপ কৈ? তাড়া করে এল না কেন?

পরক্ষণেই শঙ্কর বুঝতে পারলে সাপটাও সাময়িক মোহগ্রস্ত হয়েছে তার মত। এই অবসর · বিদ্যুতের চেয়েও বেগে সে টেবিল থেকে এক লাফ মেরে অন্ধকারের মধ্যে দরজার আগল খুলে ফেলে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে। ··

সকালের ট্রেন এল। শঙ্কর বাকী রাতটা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মেই কাটিয়েছে। ট্রেনের গার্ডকে বললে সব ব্যাপার। গার্ড বললে—চলো দেখি স্টেশন ঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে কোথাও

সাপের চিহ্নও পাওয়া গেল না। গার্ড লোকটা ভালো—বললে, বলি তবে শোনো। খুব বেঁচে গিয়েছ কাল রাত্রে। এতদিন কথাটা তোমায় বলি নি, পাছে ভয় পাও। তোমার আগে যিনি স্টেশন মাস্টার এখানে ছিলেন—তিনিও সাপের উপদ্রবেই এখান থেকে পালান। তাঁর আগে দুজন স্টেশন মাস্টার এই স্টেশনের কোয়ার্টারে সাপের কামড়ে মরেছে। আফ্রিকার ব্ল্যাক্ মাম্বা যেখানে থাকে, তার ত্রিসীমানায় লোক আসে না। বন্ধু ভাবে কথাটা বললাম, ওপরওয়ালাদের বলো না যেন, যে আমার কাছ থেকে এ কথা শুনেছ। ট্রান্সফারের দরখাস্ত কর।

শঙ্কর বললে—দরখাস্তের উত্তর আসতেও তো দেরি হবে, তুমি একটা উপকার করো। আমি-এখানে একেবারে নিরস্ত্র, আমাকে একটা বন্দুক কি রিভলভার যাবার পথে দিয়ে যাও। আর কিছু কার্ব্বলিক য়্যাসিড্। ফিরবার পথেই কার্ব্বলিক য়্যাসিড্‌টা আমায় দিয়ে যেও।

ট্রেন থেকে সে একটা কুলীকে নামিয়ে নিলে এবং দুজনে মিলে সারাদিন সর্ব্বত্র গর্ত্ত বুজিয়ে বেড়ালে। পরীক্ষা করে দেখে মনে হল কাল রাত্রে স্টেশন ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের কোণে একটা গর্ত্ত থেকে সাপটা বেরিয়েছিল। গর্ত্তগুলো ইঁদুরের, বাইরের সাপ দিনমানে ইঁদুর খাবার লোভে গর্ত্তে ঢুকেছিল হয়তো। গর্ত্তটা বেশ ভাল করে বুজিয়ে দিলে। ডাউন ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে এক বোতল কার্ব্বলিক য়্যাসিড্ পাওয়া গেল—ঘরের সর্ব্বত্র ও আশেপাশে সে য়্যাসিড্ ছড়িয়ে দিলে। কুলীটা তাকে একটা বড় লাঠি দিয়ে গেল। দু-তিন দিনের মধ্যে রেল কোম্পানী থেকে ওকে একটা বন্দুক দিলে।

চার

স্টেশনে জলের বড় কষ্ট। ট্রেন থেকে জল দেয়, তাতে রান্না-খাওয়া কোনো রকমে চলে—স্নান আর হয় না। এখানকার কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েছে। একদিন সে শুনলে স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জলাশয় আছে, সেখানে ভাল জল পাওয়া যায়, মাছও আছে।

স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে একদিন সে সকালের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সেখানে মাছ ধরতে চলল সঙ্গে একজন সোমালি কুলী, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মাছ ধরবার সাজ-সরঞ্জাম মোম্বাসা থেকে আনিয়ে নিয়েছিল। জলাশয়টা মাঝারি গোছের, চারিধারে উঁচু ঘাসের বন, ইউকা গাছ, নিকটেই একটা অনুচ্চ পাহাড়। জলে সে স্নান সেরে উঠে ঘণ্টা-দুই ছিপ ফেলে ট্যাংরা জাতীয় ছোট ছোট মাছ অনেকগুলি পেলে। মাছ অদৃষ্টে জোটে নি অনেক দিন কিন্তু আর বেশী দেরি করা চলবে না - কারণ আবার বিকেল চারটের মধ্যে স্টেশনে পৌছুনো চাই—বিকেলের ট্রেন পাস করাবার জন্যে।

প্রায়ই সে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায়, কোনো দিন সঙ্গে লোক থাকে—প্রায়ই একা যায়। স্নানের কষ্টও ঘুচেছে।

গ্রীষ্মকাল ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম—বেলা ন'টার পর থেকে আর রৌদ্রে যাওয়া যায় না। এগারোটার পর থেকে শঙ্করের মনে হয় যেন দিকবিদিক দাউ দাউ করে জ্বলছে। তবুও সে ট্রেনের লোকের মুখে শুনলে মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার গরমের কাছে এ নাকি কিছুই নয়।

শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে শঙ্করের জীবনের গতি মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে গেল। একদিন সকালের দিকে শঙ্কর মাছ ধরতে গিয়েছিল। যখন ফিরছে তখন বেলা তিনটে। স্টেশন যখন আর মাইলটাক্ আছে, তখন শঙ্করের কানে গেল সেই রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে কে যেন কোথায় অস্ফুট আর্ত্তস্বরে কি বলছে। কোন্ দিক থেকে স্বরটা আসছে, লক্ষ্য করে কিছুদূর যেতেই দেখলে একটা ইউকা গাছের নীচে স্বল্পমাত্র ছায়াটুকুতে কে একজন বসে আছে।

শঙ্কর দ্রুতপদে তার নিকটে গেল। লোকটা ইউরোপীয়ান – পরনে তালি দেওয়া ছিন্ন ও মলিন কোট্‌প্যাণ্ট। একমুখ লাল দাড়ি, বড় বড় চোখ, মুখের গড়ন বেশ সুশ্রী, দেহও বেশ বলিষ্ঠ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সম্ভবতঃ রোগে, কষ্টে ও অনাহারে বর্ত্তমানে শীর্ণ। লোকটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে অবসন্ন ভাবে পড়ে আছে। তার মাথার মলিন সোলার টুপিটা একদিকে গড়িয়ে পড়েছে মাথা থেকে—পাশে একটা খাকি কাপড়ের বড় ঝোলা।

শঙ্কর ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কোথা থেকে আসছো?

লোকটা কথার উত্তর না দিয়ে মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে জলপানের ভঙ্গি করে বললে—একটু জল। জল!

শঙ্কর বললে—এখানে তো জল নেই। আমার ওপর ভর দিয়ে স্টেশন পর্য্যন্ত আসতে পারবে?

অতি কষ্টে খানিকটা ভর দিয়ে এবং শেষের দিকে এক রকম শঙ্করের কাঁধে চেপে লোকটা প্ল্যাটফর্মে পৌছুলো। ওকে আনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল; বিকেলের ট্রেন ওর অনুপস্থিতিতেই চলে গিয়েছে। ও লোকটাকে স্টেশন ঘরে বিছানা পেতে শোয়ালে, জল খাইয়ে সুস্থ করলে, কিছু খাদ্যও এনে দিলে। সে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শঙ্কর দেখলে লোকটার ভারী জ্বর হয়েছে। অনেক দিনের অনিয়মে, পরিশ্রমে, অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিনে সে সুস্থ হবে না।

লোকটা একটু পরে পরিচয় দিলে। তার নাম ডিয়েগো আল্‌ভারেজ—জাতে পর্টুগীজ, তবে আফ্রিকার সূর্য্য তার বর্ণ তামাটে করে দিয়েছে।

রাত্রে ওকে স্টেশনে রাখলে শঙ্কর। কিন্তু ওর অসুখ দেখে সে পড়ে গেল বিপদে - এখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই—সকালের ট্রেন মোম্বাসার দিকে যায় না, বিকেলের ট্রেনে গার্ড রোগীকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাত কাটতে এখনো অনেক দেরি। বিকেলের গাড়ীখানা স্টেশনে এসে যদি পাওয়া যেত, তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

শঙ্কর রোগীর পাশে রাত জেগে বসে রইল। লোকটির শরীরে কিছু নেই। খুব সম্ভব কষ্ট ও অনাহার ওর অসুখের কারণ। এই দূর বিদেশে ওর কেউ নেই—শঙ্কর না দেখলে ওকে দেখবে কে?···বাল্যকাল থেকেই পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে—শঙ্কর যেভাবে সারা রাত তার সেবা করলে, তার কোনো আপনার লোক ওর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারতো না।

উত্তর-পূর্ব্ব কোণের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর পেছন থেকে চাঁদ উঠছে যখন সে রাত্রে—ঝম্ ঝম্ করছে নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি—তখন হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে ভীষণ সিংহ-গর্জ্জন শোনা গেল। রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল—সিংহের ডাকে সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। শঙ্কর বললে—ভয় নেই—শুয়ে থাকো। বাইরে সিংহ ডাকছে। দরজা বন্ধ আছে।

তার পর শঙ্কর আস্তে আস্তে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্ম্মে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে চারিধারে দেখবামাত্রই যেন সে রাত্রির অপূর্ব্ব দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে ফেললে। চাঁদ উঠছে দূরের আকাশ-প্রান্তে—ইউকা গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে পূব থেকে পশ্চিমে, ঘাসের বন যেন রহস্যময় নিস্পন্দ। সিংহ ডাকছে স্টেশনে কোয়ার্টারের পেছনে প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে। কিন্তু সিংহের ডাক আজকাল গা-সওয়া হয়ে উঠেছে—ওতে আর আগের মত ভয় পায় না। রাত্রির সৌন্দর্য্য এত আকৃষ্ট করেছে ওকে, যে ও সিংহের সান্নিধ্য যেন ভুলে গেল।

ফিরে ও স্টেশন ঘরে ঢুকল। টং টং করে ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। ঘরে ঢুকে দেখলে রোগী বিছানায় উঠে বসে আছে। বললে—একটু জল দাও, খাবো।

লোকটা বেশ ভাল ইংরিজি বলতে পারে। শঙ্কর টিন থেকে জল নিয়ে ওকে খাওয়ালে।

লোকটার জ্বর তখন যেন কমেছে। সে বললে—তুমি কি বলছিলে? আমার ভয় করছে ভাবছিলে? ডিয়েগো আল্‌ভারেজ ভয় করবে? ইয়াং ম্যান, তুমি ডিয়েগো আল্‌ভারেজকে জানো না। লোকটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ মিশানো অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিলে। সে অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ঢলে পড়ল। ওই হাসিতে শঙ্করের মনে হল এ লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে নজর পড়ল শঙ্করের। বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা আঙ্গুল—দাড়ির মত শিরাবহুল হাত, তাম্রাভ দড়ির নীচে চিবুকের ভাব শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এতক্ষণ পরে খানিকটা জ্বর কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসছে যেন ধীরে ধীরে।

লোকটা বললে—সরে এসো কাছে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশী করতে পারতো না। তবে একটা কথা বলি—আমি বাঁচবো না। আমার মন বলছে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমার উপকার করে যেতে চাই। তুমি ইণ্ডিয়ান? এখানে কত মাইনে পাও? এই সামান্য মাইনের জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূর এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো আজ তোমাকে যে-সব কথা বলবো—আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তা তুমি কারো কাছে প্রকাশ করবে না?

শঙ্কর সেই আশ্বাসই দিলে। তারপর সেই অদ্ভুত রাত্রি ক্রমশঃ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এমন এক আশ্চর্য্য, অবিশ্বাস্য ধরনের আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়ে গেল—যা সাধারণতঃ উপন্যাসেই পড়া যায়।

ডিয়েগো আল্‌ভারেজের কথা

ইয়্যাং ম্যান্, তোমার বয়েস কত হবে? বাইশ?···তুমি যখন মায়ের কোলে শিশু—আজ বিশ বছর আগের কথা, ১৮৮৮।৮৯ সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনি সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়েস ছিল কম, তুনিয়ার কোনো বিপদই বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না।

বুলাওয়েও শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে একাই রওনা হলাম, সঙ্গে কেবল তুটি গাধা, জিনিসপত্র বইবার জন্যে। জাম্বেজী নদী পার হয়ে চলেছি, পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, শুধু ছোটখাটো পাহাড়, ঘাস, মাঝে মাঝে কাফিরদের বস্তি। ক্রমে যেন মানুষের বাস কমে এল, এমন এক জায়গায় উপস্থিত এসে পৌছানো গেল, যেখানে এর আগে কখনো কোনো ইউরোপীয়ান আসে নি।

যেখানেই নদী বা খাল দেখি কিংবা পাহাড় দেখি—সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি। লোকে কত কি পেয়ে বড়মানুষ হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, এ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে কত কাহিনীই শুনে এসেছিলুম—সেই সব গল্পের মোহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলেছিল। কিন্তু বৃথাই তু বৎসর ধরে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ালুম। কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করলুম এই তু বছরে। একবার তো সন্ধান পেয়েও হারালুম।

সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিক। তাঁবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুয়ে পড়লুম তুপুর বেলা—কারণ তুপুরের রোদে পথ চলা সে-সব জায়গায় একরকম অসম্ভব—১১৫° ডিগ্রী থেকে ১৩০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে। বিশ্রামের পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি বন্দুকের নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। মাছি না থাকলে রাইফেলের তাগ্ ঠিক হয় না। কত এদিক ওদিক খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না। কাছেই একটা পাথরের ঢিবি, তার গায়ে সাদা সাদা কি একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল। ঢিবিটার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে। বেছে বেছে তারই একটা দানা সংগ্রহ করে ঘষে মেজে নিয়ে আপাততঃ সেটাকেই মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম। তার পর বৈকালে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখে রওনা হয়েছি, কোথায় তাঁবু ফেলেছিলাম সে কথা ক্রমে ভুলেই গিয়েছি।

দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেও আমার মত সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে তুজন মাটাবেল কুলী ছিল। পরস্পরকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম, তার

নাম জিম্ কার্টার, আমারই মত ভবঘুরে, তবে তার বয়স আমার চেয়ে বেশী। জিম্ একদিন আমার বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আমায় বললে —বন্দুকের মাছি তোমার এ রকম কেন? তারপর আমার গল্প শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে—তুমি বুঝতে পারো নি এ জিনিসটা খাঁটি রূপো, খনিজ রূপো! এ যেখানে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেখানে রূপোর খনি থাকে। আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর থেকে সেখানে অন্ততঃ ন'হাজার আউন্স রূপো পাওয়া যাবে। সে জায়গাতে এক্ষুনি চলো আমরা যাই। এবার আমরা লক্ষপতি হয়ে যাবো।

সংক্ষেপে বলি। তারপর কার্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে আবার গেলাম। কিন্তু চার মাস ধরে কত চেষ্টা, কত অসহ্য কষ্ট পেয়ে, কতবার বিরাট দিক-দিশাহীন মরুভূমিবৎ ভেল্ডের মধ্যে পথ হারিয়ে, মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছেও, কিছুতেই আমি সে স্থান নির্ণয় করতে পারলাম না। যখন সেখান থেকে সেবার তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছিলাম, অত লক্ষ্য করি নি জায়গাটা। আফ্রিকার ভেল্ডে কোনো চিহ্ন বড় একটা থাকে না, যার সাহায্যে পুরোনো জায়গা খুঁজে বার করা যায়—সবই যেন একরকম। অনেকবার হয়রান হয়ে শেষে আমরা রূপোর খনির আশা ত্যাগ করে গুয়াই নদীর দিকে চললাম। জিম্ কার্টার আমাকে আর ছাড়লে না, তার মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই ছিল। তার সে শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবলে এখনও আমার কষ্ট হয়।

তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সব কষ্টের চেয়ে বেশী বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। তাই এখন থেকে আমরা নদীপথ ধরে চলবো, এই স্থির করা গেল। বনের জন্তু শিকার করে খাই, আর মাঝে মাঝে কাফির বস্তি যদি পাই, সেখান থেকে মিষ্টি আলু, মুরগী প্রভৃতি সংগ্রহ করি।

একবার অরেঞ্জ নদী পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী একটা কাফির বস্তীতে আশ্রয় নিয়েছি, সেই দিন দুপুরের পরে কাফির বস্তীর মোড়লের মেয়ে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা দেখতে গেলাম—পাঁচ-ছ' বছরের একটা ছোট্ট উলঙ্গ মেয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে—তার পেটে নাকি ভয়ানক ব্যথা। সবাই কাঁদছে ও দাপাদাপি করছে। মেয়েটার ঘাড়ে নিশ্চয়ই দানো চেপেছে—ওকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না। তাকে ও তার বাপ-মাকে জিজ্ঞাসা করে এইটুকু জানা গেল, সে বনের ধারে গিয়েছিল—তারপর থেকে তাকে ভূতে পেয়েছে। আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বনের ফল বেশী পরিমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোনো বনের ফল সে খেয়েছিল কিনা? সে বললে—হ্যাঁ, খেয়েছিল। কাঁচা ফল? মেয়েটা বললে—ফল নয়, ফলের বীজ। সে ফলের বীজই খাদ্য।

এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল। গ্রামে আমাদের খাতির হয়ে গেল খুব। পনেরো দিন আমরা সে গ্রামের সর্দ্দারের অতিথি হয়ে রইলাম। ইলাণ্ড হরিণ শিকার করি আর রাত্রে কাফিরদের মাংস খেতে নিমন্ত্রণ

করি। বিদায় নেবার সময় কাফির সর্দ্দার বললে—তোমরা সাদা পাথর খুব ভালবাস—না? বেশ খেলবার জিনিস। নেবে সাদা পাথর? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। একটু পরে সে একটা ডুমুর ফলের মত বড় সাদা পাথর আমাদের হাতে এনে দিলে। জিম্ ও আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম—জিনিসটা হীরক!···খনি বা খনির ওপরকার উপলাকীর্ণ মৃত্তিকাস্তর থেকে প্রাপ্ত পালিশ-না-করা হীরক খণ্ড!

কাফির সর্দ্দার বললে এটা তোমরা নিয়ে যায়। ঐ যে দূরের বড় পাহাড় দেখছো, ধোঁয়া-ধোঁয়া—এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌছে যাবে। ঐ পাহাড়ের মধ্যে. এ রকম সাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনেছি। আমরা কখনো যাই নি, জায়গা ভাল নয়, ওখানে বুনিপ বলে উপদেবতা থাকে। অনেক চাঁদ আগেকার কথা, আমাদের গ্রামের তিনজন সাহসী লোক কারো বারণ না শুনে ঐ পাহাড়ে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। আর একবার একজন তোমাদের মত সাদা মানুষ এসেছিল, সেও অনেক, অনেক চাঁদ আগে। আমরা দেখি নি, আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা। সে গিয়ে আর ফেরে নি।

কাফির গ্রাম থেকে বার হয়েই পথে আমরা ম্যাপ মিলিয়ে দেখলাম—দূরের ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে রিখ্‌টারসভেল্ড পর্ব্বতশ্রেণী—দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা বন্য, অজ্ঞাত, বিশাল ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চল। কোন সভ্য মানুষ সে অঞ্চলে পদার্পণ করে নি—দু-একজন দুর্দ্ধর্ষ দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া। ঐ বিস্তীর্ণ বনপর্ব্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কি আছে কেউ বলতে পারে না।

জিম্ কার্টার ও আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল—আমরা দুজনেই তখনি স্থির করলাম ওই অরণ্য ও পর্ব্বতমালা আমাদেরই আগমন প্রতীক্ষায় তার বিপুল রত্নভাণ্ডার লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন করে রেখেছে। আমরা ওখানে যাবোই।

কাফির গ্রাম থেকে রওনা হবার প্রায় সতেরো দিন পরে আমরা পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশের নিবিড় বনে প্রবেশ করলাম।

পূর্ব্বেই বলেছি দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে এই পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। জঙ্গলের কাছাকাছি কোনো কাফির বস্তি পর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না। জঙ্গল দেখে মনে হল কাঠুরিয়ার কুঠার আজ পর্য্যন্ত এখানে প্রবেশ করে নি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পৌছেছিলাম। জিম্ কার্টারের পরামর্শ মত সেখানেই আমরা রাত্রের বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটালাম। জিম্ জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে—আমি লাগলুম রান্নার কাজে। সকালের দিকে একজোড়া পাখী মেরেছিলাম, সেই পাখী ছাড়িয়ে তার রোস্ট্ করবো এই ছিল মতলব। পাখী ছাড়ানোর কাজে একটু ব্যস্ত আছি—এমন সময় জিম্ বললে—পাখী রাখো। দু পেয়ালা কাফি করো তো আগে।

আগুন জ্বালাই ছিল। জল গরম করতে দিয়ে আবার পাখী ছাড়াতে বসেছি, এমন সময় সিংহের গর্জ্জন একেবারে অতি নিকটে শোনা গেল। জিম্ বন্দুক নিয়ে বেরুল, আমি

বললাম—অন্ধকার হয়ে আসছে, বেশী দূর যেও না। তার পরে আমি পাখী ছাড়াচ্ছি—কিছু দূরে জঙ্গলের বাইরেই দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। একটুখানি থেমে আবার আর একটা আওয়াজ। তার পরেই সব চুপ। মিনিট দশ কেটে গেল, জিম্ আসে না দেখে আমি নিজের রাইফেল্‌টা নিয়ে যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল সেদিকে একটু যেতেই দেখি জিম্ আসছে—পেছনে কি একটা ভারী মত টেনে আনছে। আমায় দেখে বললে—ভারী চমৎকার ছালখানা! জঙ্গলের ধারে ফেলে রাখলে হায়নাতে সাবাড় করে দেবে। তাঁবুর কাছে টেনে নিয়ে যাই চল।

দুজনে টেনে সিংহের প্রকাণ্ড দেহটা তাঁবুর আগুনের কাছে নিয়ে এসে ফেললাম। তার পর ক্রমে রাত হল। খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে সিংহের গর্জ্জনে ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবু থেকে অল্প দূরেই সিংহ ডাকছে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক কত দূরে! আমি রাইফেল্ নিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। জিম্ শুধু একবার বললে—সন্ধ্যাবেলার সেই সিংহটার জুড়ি।

বলেই সে নির্ব্বিকারভাবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দেখি আগুন নিবে গিয়েছে। পাশে কাঠকুটো ছিল, তাই দিয়ে আবার জোর আগুন জাললাম। তার পরে আবার এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে জনকয়েক কাফিরের সঙ্গে দেখা হোল। তারা হরিণ শিকার করতে এসেছে। আমরা তাদের তামাকের লোভ দেখিয়ে কুলী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিতে চাইলাম।

তারা বললে—তোমরা জানো না তাই ও কথা বলছ। এ জঙ্গলে মানুষ আসে না। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। ঐ পাহাড়ের শ্রেণী অপেক্ষাকৃত নীচু, ওটা পার হয়ে মধ্যে খানিকটা সমতল জায়গা আছে, ঘন বনে ঘেরা, তার ওদিকে আবার এর চেয়েও উঁচু পর্ব্বতশ্রেণী। ঐ বনের মধ্যের সমতল জায়গাটা বড় বিপজ্জনক, ওখানে বুনিপ্ থাকে। বুনিপের হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না। ওখানে কেউ যায় না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাবো মরতে! ভালো চাও তো তোমরাও যেও না।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বুনিপ্ কি?

তারা জানে না। তবে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, বুনিপ্ কি না জানলেও সে কি অনিষ্ট করতে পারে সেটা তারা খুব ভাল রকমই জানে।

ভয় আমাদের ধাতে ছিল না, জিম্ কার্টারের তো একেবারেই না। সে আরও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল। এই বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে—হীরা পাই বা না পাই। মৃত্যু যে তাকে অলক্ষিতে টানছে, তখনও যদি বুঝতে পারতাম।

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্করের মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে, এ ধরনের কথা সে কখনও আর শোনে নি। মুমূর্ষু ডিয়েগো আল্‌ভারেজের জীর্ণ পরিচ্ছদ ও শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে, তার পাকা ভুরু-জোড়ার নীচেকার ইস্পাতের মত নীল দীপ্তি-

শীল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে, শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় ভরে উঠল।

সত্যিকার মানুষ বটে একজন!

আল্‌ভারেজ বললে—আর এক গ্লাস জল—

জল পান করে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলে—

হ্যাঁ, তার পরে শোনো। ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। কত বড় বড গাছ, বড় বড় ফার্ন, কত বিচিত্র বর্ণের অর্কিড্ ও লায়ানা, স্থানে স্থানে সে বন নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য। বড বড় গাছের নীচেকার জঙ্গল এতই ঘন, বঁড়শির মত কাঁটা গাছের গায়ে, মাথার ওপরকার পাতায় পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্য্যের আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গলে প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। অত্যন্ত বেবুনের উৎপাত জঙ্গলের সর্বত্র, বড় গাছের ডালে দলে দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানা রকমের বেবুন বসে আছে—অনেক সময় দেখলাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্য করে না। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়—দু-একটা বুড়ো সর্দ্দার বেবুন সত্যিই হিংস্র প্রকৃতির, হাতে বন্দুক না থাকলে তারা অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ করত। জিম্ কার্টার বললে—অন্ততঃ আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না কখনো এ জঙ্গলে।

সাত-আটদিন সেই নিবিড় জঙ্গলে কাটল। জিম্ কার্টার ঠিকই বলেছিল, প্রতিদিন একটা করে বেবুন আমাদের খাদ্য যোগান দিতে দেহপাত করত। উঁচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলের নানা স্থানে ছোট-বড় ঝরণা নেমে এসেছে, সুতরাং জলের অভাবও ঘটল না। একবার কিন্তু এতে বিপদও ঘটেছিল। একটা ঝরনার ধারে দুপুরবেলা এসে আগুন জেলে বেবুনের দাপ্না ঝলসাবার ব্যবস্থা করছি, জিম্ গিয়ে তৃষ্ণার ঝোঁকে ঝরনার জল পান করলে। তার একটু পরেই তার ক্রমাগত বমি হতে শুরু করল। পেটে ভয়ানক ব্যথা। আমি একটু বিজ্ঞান জানতাম, আমার সন্দেহ হওয়াতে ঝরণার জল পরীক্ষা করে দেখি, জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে। ওপর পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে ঝরনা নেমে আসছে নিশ্চয়ই। হোমিওপ্যাথিক বাক্স থেকে প্রতিষেধক ওষুধ দিতে সন্ধ্যার দিকে জিম্ সুস্থ হয়ে উঠল।

বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে মাঝে দু-একটা বিষধর সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্যজন্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নি। পাখীর কথা আর প্রজাপতির কথা অবশ্য বাদ দিলাম। কারণ এই সব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া এত বিচিত্র বর্ণের ও শ্রেণীর পাখী ও প্রজাপতি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বন্যজন্তু বলতে যা বোঝায়, তারা সে পর্য্যায়ে পড়ে না।

প্রথমেই রিখ্‌টারসভেল্ড পর্ব্বতশ্রেণীর একটা শাখা পর্ব্বত আমাদের সামনে পড়ল, সেটা মূল ও প্রধান পর্ব্বতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নীচু। সেটা পার হয়ে আমরা একটা বিস্তীর্ণ বনময় উপত্যকায় নেমে তাঁবু ফেললাম। একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। নদী দেখে আমার ও জিমের আনন্দ হল, এই সব

নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খনিজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

নদীর নানা দিকে আমরা বালি পরীক্ষা করে বেড়াই, কিছুই কোথাও পাওয়া যায় না। সোনার একটা রেণু পর্য্যন্ত নেই নদীর বালিতে। আমরা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লুম। তখন প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন কেটে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময় কফি খেতে খেতে জিম্ বললে, দেখ, আমার মন বলছে এখানে আমরা সোনার সন্ধান পাবো। থাকো এখানে আর কিছুদিন।

আরও কুড়িদিন কাটল। বেবুনের মাংস অসহ্য ও অত্যন্ত অরুচিকর হয়ে উঠেছে। জিমের মত লোকও হতাশ হয়ে পড়ল। আমি বললাম—আর কেন জিম্, চল ফিরি এবার। কাফির গ্রামে আমাদের ঠকিয়েছে। এখানে কিছু নেই।

জিম্ বললে—এই পর্ব্বতশ্রেণীর নানা শাখা আছে, সবগুলো না দেখে যাবো না।

একদিন পাহাড়ী নদীটার খাতের ধারে বসে বালি চালতে চালতে পাথরের নুড়ির রাশির মধ্যে অর্দ্ধপ্রোথিত একখানা হল্‌দে রঙের ছোট পাথর আমি ও জিম্ একসঙ্গেই দেখতে পেলাম। দুজনেই তাড়াতাড়ি সেটা খুঁড়ে তুললাম। আমাদের মুখ আনন্দে ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিম্ বললে—ডিয়েগো, পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হল—চিনেছ তো?

আমিও বুঝেছিলাম। বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু নদীস্রোতে ভেসে আসা জিনিসটা। খনির অস্তিত্ব নেই এখানে।

পাথরখানা দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হল্‌দে রঙের হীরকের জাত। অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কারণ ছিল না, কারণ এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে, এই বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর কোনো অজ্ঞাত, দুর্গম অঞ্চলে হল্‌দে হীরকের খনি আছে। নদীস্রোতে ভেসে এসেছে তা থেকে একটা স্তরের একটা টুকরো। সে মূল খনি খুঁজে বার করা অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সাহস-সাপেক্ষ।

সে পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্য্যের অভাব আমাদের ঘটত না, কিন্তু যে দৈত্য ঐ রহস্যময় বনপর্ব্বতের অমূল্য হীরকখনির প্রহরী, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বাধা দিলে।

একদিন আমরা বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম করছি, আমাদের সামনে পরিষ্কার জায়গাতে একটা তালগাছ, তালগাছের তলায় গুঁড়িটা ঘিরে খুব ঘন বন-ঝোপ। হঠাৎ আমরা দেখলাম কিসে যেন অত বড় তালগাছটা এমন নাড়া দিচ্ছে যে, তার ওপরকারের শুক্‌নো ডালপালাগুলো খর্ খর্ করে নড়ে উঠছে, যেমন নড়ে ঝড় লাগলে। গাছটাও সেই সঙ্গে নড়ছে।

আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বাতাস নেই কোনোদিকে, অথচ তালগাছটা নড়ছে কেন? আমাদের মনে হল কে যেন তালগাছের গুঁড়িটা ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। জিম্ তখুনি ব্যাপারটা কি দেখতে গুঁড়ির তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলো।

সে ওর মধ্যে ঢুকবার অল্পক্ষণ পরেই আমি একটা আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল্ নিয়ে ছুটে গেলুম—ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি জিম্ রক্তাক্ত দেহে বনের মধ্যে পড়ে আছে—কোন

ভীষণ বলবান জন্তুতে তার মুখের সামনে থেকে বুক পর্য্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফেঁড়ে ফেলেছে—যেমন পুরানো বালিশ ফেঁড়ে তুলো বার করে তেমনি। জিম্ শুধু বললে—সাক্ষাৎ শয়তান—মূর্ত্তিমান শয়তান—

হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললে—পালাও—পালাও—

তার পরেই জিম্ মারা গেল। তালগাছের গায়ে দেখি যেন কিসের মোটা ও শক্ত চোঁচ্ লেগে আছে। আমার মনে হল কোন ভীষণ বলবান জানোয়ার তালগাছের গায়ে গা ঘষছিল, গাছটা ওরকম নড়ছিল সেই জন্যেই। জন্তুটার কোনো পাত্তা পেলাম না। জিমের দেহ ফাঁকা জায়গায় বার করে আমি রাইফেল হাতে ঝোপের ওপারে গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি মাটির ওপরে কোনো অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন, তার মোটে তিনটে আঙ্গুল পায়ে—কিছুদূর গেলুম পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে, জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা গিয়ে একটা গুহার মুখে পদচিহ্নটা ঢুকে গেল। গুহার প্রবেশ-পথের কাছে শুকনো বালির ওপরে ওই অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার বড বড় তিন-আঙ্গুলে থাবার দাগ রয়েছে।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেই জনহীন অরণ্যভূমি ও পর্ব্বত-বেষ্টিত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আমি এক অজ্ঞাততর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করছি। ডাইনে চেয়ে দেখি প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সুউচ্চ ব্যাসাল্টের দেওয়াল খাড়া উঠেছে প্রায় চার হাজার ফুট, বনে বনে নিবিড়, খুব উঁচুতে পর্ব্বতের বাঁশবনের মাথায় সামান্য যেন একটু রাঙা রোদ—কিম্বা হয়তো আমার চোখের ভুল, অনন্ত আকাশের আভা পড়ে থাকবে।

ভাবলাম, এ সময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না। জিমের দেহ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। সারারাত তার মৃতদেহ নিয়ে আগুন জেলে রাইফেল্ তৈরী রেখে বসে রইলুম।

পরদিন জিমকে সমাধিস্থ করে আবার ওই জানোয়ারটার খোঁজে বার হলাম। কিন্তু মুশকিল এই যে, সে গুহা এবং সেই তালগাছটা পর্য্যন্ত অনেক খুঁজেও কিছুতেই বার করতে পারলুম না। ও রকম অনেক গুহা আছে পর্ব্বতের নানা জায়গায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন্ গুহা দেখেছিলাম কে জানে?

সঙ্গীহীন অবস্থায় সেই মহাদুর্গম রিখ্‌টারসভেল্ড পর্ব্বতশ্রেণীর বনের মধ্যে থাকা চলে না। পনেরো দিন হেঁটে সেই কাফির বস্তিতে পৌছলাম। তারা চিনতে পারলে, খুব খাতির করলে। তাদের কাছে জিমের মৃত্যু-কাহিনী বললুম।

শুনে তাদের মুখ ভয়ে কেমন হয়ে গেল—ছোট ছোট চোখ ভয়ে বড় হয়ে উঠল। বললে—সর্ব্বনাশ! বুনিপ্! ওই ভয়েই ওখানে কেউ যায় না।

কাফির বস্তি থেকে আর পাঁচ দিন হেঁটে অরেঞ্জ নদীর ধারে একখানা ডাচ্ লঞ্চ পেলাম। তাতে করে এসে সভ্য জগতে পৌছুলাম।

আমি আর কখনো রিখ্‌টারসভেল্ড পর্ব্বতের দিকে যেতে পারি নি। চেষ্টা করেছিলাম অনেক। কিন্তু বুয়র যুদ্ধ এসে পড়ল। যুদ্ধে গেলাম। আহত হয়ে প্রিটোরিয়ার হাসপাতালে

অনেকদিন রইলাম। তার পর সেরে উঠে একটা কমলালেবুর বাগানে কাজ পেয়ে সেখানেই এতদিন ছিলাম।

বছর চার-পাঁচ শান্ত জীবন যাপন করবার পরে ভালো লাগলো না, তাই আবার বার হয়েছিলাম। কিন্তু বয়েস হয়ে গিয়েছে অনেক, ইয়ংম্যান্, এবার আমার চলা বোধ হয় ফুরুবে।

এই ম্যাপখানা তুমি রাখো। এতে রিখ্‌টারসভেল্ড পর্ব্বত ও যে নদীতে আমরা হীরা পেয়েছিলাম, মোটামুটি ভাবে আঁকা আছে। সাহস থাকে সেখানে যেও, বড়মানুষ হবে। বুয়র যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু-একটা বড় হীরার খনি বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা যেখানে হীরা পেয়েছিলুম তার সন্ধান কেউ জানে না। যেও তুমি।

ডিয়েগো আল্‌ভারেজ গল্প শেষ করে আবার অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার গুণে ডিয়েগো আল্‌ভারেজ সেযাত্রা সেরে উঠল এবং দিন পনেরো শঙ্কর তাকে নিজের কাছেই রাখলে। চিরকাল যে পথে পথে বেড়িয়ে এসেছে, ঘরে তার মন বসে না। একদিন সে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শঙ্কর নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল। বললে, চল—তোমার অসুখের সময় যে-সব কথা বলেছিলে, মনে আছে? সেই হলদে হীরের খনি?

অসুখের ঝোঁকে আল্‌ভারেজ যে-সব কথা বলেছিল, এখন সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ আর কোনো কথাটি বলে না। বেশীর ভাগ সময় চুপ করে কি যেন ভাবে। শঙ্করের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বললে—আমিও কথাটা যে না ভেবে দেখেছি তা মনে কোরো না। কিন্তু আলেয়ার পেছনে ছুটবার সাহস আছে তোমার?

শঙ্কর বললে—আছে কি না দেখতে দোষ কি? আজই বলো তো মাভো স্টেশনে তার করে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলি।

আল্‌ভারেজ কিছু না ভেবেই বললে—কর তার। কিন্তু আগে বুঝে দেখো, যারা সোনা বা হীরা খুঁজে বেড়ায় তারা সব সময় তা পায় না। আমি আশী বছরের এক বুড়ো লোককে জানতাম, সে কখনো কিছু পায় নি—তবে প্রতিবারই বলতো, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি, এইবার পাবো! আজীবন অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্ডে প্রস্‌পেক্‌টিং করে বেড়িয়েছে।…

আরও দিন দশেক পরে দুজনে কিসুমু গিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়াগ্রা হ্রদে ষ্টীমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ানজার দিকে যাবে ঠিক করলে।

পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাজার হাজার জেব্রা, জিরাফ্‌ হরিণ চরতে দেখে শঙ্কর

তো অবাক। এমন দৃশ্য সে আর কখনো দেখে নি। জিরাফগুলো মানুষকে আদৌ ভয় করে না, পঞ্চাশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

আল্‌ভারেজ বলল—আফ্রিকার জিরাফ মারবার জন্যে গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। যে সে মারতে পারে না। সেজন্য মানুষকে ওদের তত ভয় নেই।

হরিণের দল কিন্তু বড় ভীরু, এক এক দলে দু-তিনশো হরিণ চরছে, ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে একবার চাইলে, তার পরক্ষণেই মাঠের দূর প্রান্তের দিকে সবাই চার পা তুলে দৌড়।

কিস্থমু থেকে ষ্টীমার ছাড়ল—এটা ব্রিটিশ ষ্টীমার, ওদের পয়সা নেই বলে ডেক্‌-এ যাচ্ছে। নিগ্রো মেয়েরা পিঠে ছেলেমেয়ে বেঁধে মুরগী নিয়ে ষ্টীমারে উঠেছে। মাসাই কুলীরা ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে—সঙ্গে নাইবেরি শহর থেকে কাঁচের পুঁতি, কম দামের খেলো আয়না, ছুরি প্রভৃতি নানা জিনিস।

ষ্টীমার থেকে নেমে আবার ওরা পথ চলে। ভিক্টোরিয়া হ্রদের যে বন্দরে ওরা নামলে—তার নাম মোওয়ান্‌জা—এখান থেকে তিনশো মাইল দূরে ট্যাবোরা, সেখানে পৌছে কয়েক দিন বিশ্রাম করে ওরা যাবে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের তীরবর্ত্তী উজিজি বন্দরে।

এই পথে যাবার সময় আল্‌ভারেজ বললে—টাঙ্গানিয়াকার মধ্যে দিয়ে যাওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। এখানে এক রকম মাছি আছে, তা কামড়ালে স্লিপিং সিক্‌নেস্ হয়। স্লিপিং সিক্‌নেসের মড়কে টাঙ্গানিয়াকা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। মোওয়ান্‌জা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের ভয়ও খুব বেশী। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার এই অঞ্চলও 'সিংহের রাজ্য' বলা চলে।

শহর থেকে দশ মাইল দূরে পথের ধারে একটা ছোট খড়ের বাংলো। সেখানে এক ইউরোপীয় শিকারী আশ্রয় নিয়েছে। আল্‌ভারেজকে সে খুব খাতির করলে। শঙ্করকে দেখে বললে—একে পেলে কোথায়? এ তো হিন্দু! তোমার কুলী?

আল্‌ভারেজ বললে—আমার ছেলে।

সাহেব আশ্চর্য্য হয়ে বললে—কি রকম?

আল্‌ভারেজ আনুপূর্ব্বিক সব বর্ণনা করলে, তার রোগের কথা, শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার কথা। কেবল বললে না কোথায় যাচ্ছে ও কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

সাহেব হেসে বললে—বেশ ভালো। ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর মনে সাহস ও দয়া দুইই আছে। ঈস্ট ইণ্ডিজের হিন্দুরা লোক হিসেবে ভালোই বটে। একবার ইউগাণ্ডাতে একজন শিখ আমার প্রতি এমন সুন্দর আতিথ্য দেখিয়েছিল, তা কখনো ভুলতে পারবো না। আজ তোমরা এসো, রাত সামনে, আমার এখানেই রাত্রি যাপন করো। এটা গবর্নমেণ্টের ডাকবাংলো। আমিও তোমাদের মত সারাদিন পথ চলে বিকেলের দিকে এসে উঠেছি।

সাহেবের একটা ছোট গ্রামোফোন আছে, সন্ধ্যার পরে টিনবন্দী বিলাতী টোমাটোর

ঝোল ও সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করার পরে সবাই বাংলোর বাইরে ক্যাম্প-চেয়ারে শুয়ে রেকর্ড শুনে যাচ্ছে, এমন সময় অল্প দূরে সিংহের গর্জ্জন শোনা গেল। বোধ হল মাটির কাছে মুখ নামিয়ে সিংহ গর্জ্জন করছে- কারণ মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সাহেব বললে—টাঙ্গানিয়াকায় বেজায় সিংহের উপদ্রব আর বড় হিংস্র এরা। প্রায় অধিকাংশ সিংহই মানুষখেকো। মানুষের রক্তের আস্বাদ একবার পেয়েছে, এখন মানুষ ছাড়া আর কিছু চায় না।

শঙ্কর ভাবলে খুব সুসংবাদ বটে। ইউগাণ্ডা রেলওয়ে তৈরী হবার সময়ে সে সিংহের উপদ্রব কাকে বলে খুব ভালই দেখেছে।

পরদিন সকালে ওরা আবার রওনা হল, সাহেব বলে দিলে সূর্য্য উঠে গেলে খুব সাবধান থাকবে। স্লিপিং সিক্‌নেসের মাছি রোদ উঠলেই জাগে। গায়ে যেন না বসে।

দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ। আল্‌ভারেজ বললে—খুব সাবধান, এই সব ঘাসের বনেই সিংহের আড্ডা। বেশী পেছনে থেকো না।

আল্‌ভারেজের বন্দুক আছে, এই একটা ভরসা। আর একটা ভরসা এই যে, আল্‌ভারেজ যাকে বলে 'ক্র্যাক্ শট্' তাই। অর্থাৎ তার গুলি বড় একটা ফস্কায় না। কিন্তু অত বড় অব্যর্থ-লক্ষ্য শিকারীর সঙ্গে থেকেও শঙ্কর বিশেষ ভরসা পেলে না, কারণ ইউগাণ্ডার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, সিংহ যখন যাকে নেবে, এমন সম্পূর্ণ অতর্কিতেই নেবে যে পিঠের রাইফেলের চামড়ার স্ট্র্যাপ্ খোলবার অবকাশ পর্য্যন্ত দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যা হবার ঘণ্টাখানেক আগে দূরবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রাত্রের বিশ্রামের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করে নিতে হল। আল্‌ভারেজ বললে—সামনে কোন গ্রাম নেই—অন্ধকারের পর এখানে পথ চলা ঠিক নয়।

একটা সুবৃহৎ বাওবাব্ গাছের তলায় দু টুকরো কেম্বিস্ ঝুলিয়ে ছোট্ট একটু তাঁবু খাটানো হল। কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রের খাবার তৈরী করতে বসল শঙ্কর। তারপর সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর দুজনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে আল্‌ভারেজ ডাকলে—শঙ্কর, ওঠো।

শঙ্কর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

আল্‌ভারেজ বললে—কি একটা জানোয়ার তাঁবুর চারিপাশে ঘুরছে—বন্দুক বাগিয়ে রাখো।

সত্যিই একটা কোনো অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ তাঁবুর পাতলা কেম্বিসের পর্দ্দার বাইরেই শোনা যাচ্ছে বটে। তাঁবুর সামনে সন্ধ্যায় যে আগুন করা হয়েছিল—তার স্বল্পাবশিষ্ট আলোকে সুবৃহৎ বাওবাব্ গাছটা একটা ভীষণদর্শন দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে বৃদ্ধ বারণ করলে।

পরক্ষণেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে তাঁবুটা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর পর্দ্দার ভেতর থেকেই আল্‌ভারেজ পর পর দুবার রাইফেল ছুঁড়লে। শব্দটা লক্ষ্য

করে শঙ্করও সেই মুহূর্তে বন্দুক ওঠালে। কিন্তু শঙ্কর ঘোড়া টেপবার আগে আল্‌ভারেজের রাইফেল আর একবার আওয়াজ করে উঠল।

তার পরেই সব চুপ।

ওরা টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দেখলে, তাঁবুর পূবদিকের পর্দ্দার বাইরে পর্দ্দাটা খানিকটা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ।

সেটা তখনও মরে নি, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছে। আরও দুবার গুলি খেয়ে সেটা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

আল্‌ভারেজ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বললে—রাত এখনো অনেক। ওটা এখানে পড়ে থাক্। চলো আমরা আমাদের ঘুম শেষ করি।

দুজনেই এসে শুয়ে পড়ল—একটু পরে শঙ্কর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আল্‌ভারেজের নাসিকা-গর্জ্জন শুরু হয়েছে। শঙ্করের চোখে ঘুম এল না।

আধঘণ্টা পরে শঙ্করের মনে হল, আল্‌ভারেজের নাসিকা-গর্জ্জনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে টাঙ্গানিয়াকা অঞ্চলের সমস্ত সিংহ যেন একযোগে ডেকে উঠল। সে কি ভয়ানক সিংহের ডাক!···আগেও শঙ্কর অনেকবার সিংহগর্জ্জন শুনেছে, কিন্তু এ রাত্রের সে ভীষণ বিরাট গর্জ্জন তার চিরকাল মনে ছিল। তা ছাড়া ডাক তাঁবু থেকে বিশ হাতের মধ্যে।

আল্‌ভারেজ আবার জেগে উঠল। বললে—নাঃ, রাত্রে দেখছি একটু ঘুমুতে দিলে না। আগের সিংহটার জোড়া। সাবধান থাকো। বড় পাজী জানোয়ার।

কি দুর্যোগের রাত্রি! তাঁবুর আগুনও তখন নিবু-নিবু। তার বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাতলা কেম্বিসের চটের মাত্র ব্যবধান—তার ওদিকে সাথীহারা পশু। বিরাট গর্জ্জন করতে করতে সেটা একবার তাঁবু থেকে দূরে যায়, আবার কাছে আসে, কখনও তাঁবু প্রদক্ষিণ করে।

ভোর হবার কিছু আগে সিংহটা সরে পড়ল। ওরাও তাঁবু তুলে আবার যাত্রা শুরু করলে।

ছয়

দিন পনেরো পরে শঙ্কর ও আল্‌ভারেজ উজিজি বন্দর থেকে স্টীমারে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের বক্ষে ভাসল। হ্রদ পার হয়ে আলবার্টভিল্ বলে একটা ছোট শহরে কিছু আবশ্যকীয় জিনিস কিনে নিল। এই শহর থেকে কাবালো পর্য্যন্ত বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্টের রেলপথ আছে। সেখান থেকে কঙ্গো নদীতে স্টীমারে চড়ে তিনদিনের পথ সান্‌কিনি যেতে হবে, সান্‌কিনি নেমে কঙ্গোনদীর পথ ছেড়ে দক্ষিণ মুখে অজ্ঞাত বনজঙ্গল ও মরুভূমির দেশে প্রবেশ করতে হবে।

কাবালো অতি অপরিষ্কার স্থান, কতকগুলো বর্ণসঙ্কর পর্টুগীজ ও বেলজিয়ামের আড্ডা।

স্টেশনের বাইরে পা দিয়েছে এমন সময় একজন পর্টুগীজ ওর কাছে এসে বললে—হ্যালো,

কোথায় যাবে ? দেখছি নতুন লোক, আমায় চেন না নিশ্চয়ই। আমার নাম আলবুকার্ক !

শঙ্কর চেয়ে দেখলে আল্‌ভারেজ তখনও স্টেশনের মধ্যে।

লোকটার চেহারা যেমন কর্কশ, তেমনি কদাকার। কিন্তু সে ভীষণ জোয়ান, প্রায় সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের প্রত্যেকটি মাংসপেশী গুনে নেওয়া যায় এমনি সুদৃঢ় ও সুগঠিত।

শঙ্কর বললে—তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।

লোকটা বললে—তুমি দেখছি কালা আদমি, বোধ হয় ঈস্ট ইণ্ডিজের। আমার সঙ্গে পোকার খেলবে চলো।

শঙ্কর ওর কথা শুনে চটেছিল, বললে—তোমার সঙ্গে পোকার খেলবার আমার আগ্রহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝলে, লোকটা পোকার খেলবার ছলে তাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করতে চায়। পোকার একরকম তাসের জুয়াখেলা—শঙ্কর নাম জানলেও সে খেলা কখনো জীবনে দেখেও নি, নাইরোবিতে সে জানতো বদমাইশ জুয়াড়ীরা পোকার খেলার ছল করে নতুন লোকের সর্ব্বনাশ করে। এটা এক ধরনের ডাকাতি।

শঙ্করের উত্তর শুনে পর্টুগীজ বদমাইশটা রেগে লাল হয়ে উঠল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে চাইল। সে আরও কাছে ঘেঁষে এসে দাঁতে দাঁত চেপে অতি বিকৃত স্বরে বললে—কি ? নিগার, কি বললি ? ঈস্ট ইণ্ডিজের তুলনায় তুই অত্যন্ত ফাজিল দেখছি। তোর ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যে তোকে জানিয়ে দিই যে, তোর মত কালা আদমিকে আলবুকার্ক এই রিভলভারের গুলিতে কাদাখোঁচা পাখীর মত ডজনে ডজনে মেরেছে। আমার নিয়ম হচ্ছে এই শোন্‌। কাবালোতে যারা নতুন লোক নামবে, তারা হয় আমার সঙ্গে পোকার খেলবে, নয়তো আমার সঙ্গে রিভলভারে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে।

শঙ্কর দেখলে এই বদমাইশ লোকটার সঙ্গে রিভলভারের লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অনিবার্য্য। বদমাইশটা হচ্ছে একজন ক্র্যাক্‌-শট গুণ্ডা। আর সে কি! কাল পর্য্যন্ত রেলের নিরীহ কেরানী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করে যদি পোকারই খেলে তবে সর্ব্বস্ব যাবে।

হয়তো আধমিনিট কাল শঙ্করের দেরি হয়েছে উত্তর দিতে, লোকটা কোমরের চামড়ার হোলস্টার্‌ থেকে নিমেষের মধ্যে রিভলভার বার করে শঙ্করের পেটের কাছে উঁচিয়ে বললে—যুদ্ধ না পোকার ?

শঙ্করের মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভীরুর মত সে পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নীচু করবে না, হোক্‌ মৃত্যু।

সে বলতে যাচ্ছে যুদ্ধ, এমন সময় পেছন থেকে ভয়ানক বাঁজখাই স্বরে কে বললে—এই সামলাও, গুলিতে মাথার চাঁদি উড়ল! দুজনেই চমকে উঠে পেছনে চাইলে। আল্‌ভারেজ তার উইন্‌চেস্টার রিপিটারটা বাগিয়ে উঁচিয়ে পর্টুগীজ বদমাইশটার মাথা লক্ষ্য করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। শঙ্কর সুযোগ বুঝে চট্‌ করে পিস্তলের নলের উল্টোদিকে ঘুরে গেল। আল্‌ভারেজ বললে—বালকের সঙ্গে রিভলভার ডুয়েল ? ছোঃ! তিন বলতে

পিস্তল ফেলে দিবি—এক—দুই—তিন—

আলবুকার্কের শিথিল হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল।

আল্‌ভারেজ বললে—বালককে একা পেয়ে খুব বীরত্ব জাহির করছিলি, না?

শঙ্কর ততক্ষণ পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। আলবুকার্ক একটু বিস্মিত হল, আল্‌ভারেজ যে শঙ্করের দলের লোক তা সে ভাবেও নি। সে হেসে বললে—আচ্ছা মেট্, কিছু মনে কোরো না, আমারই হার। দাও আমার পিস্তলটা দাও ছোক্‌রা। কোনো ভয় নেই, দাও। এসো হাতে হাত দাও। তুমিও মেট্। আলবুকার্ক রাগ পুষে রাখে না। এসো কাছেই আমার কেবিন, এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে যাও।

আল্‌ভারেজ নিজের জাতের লোকের রক্ত চেনে। ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে আলবুকার্কের কেবিনে গেল। শঙ্কর বিয়ার খায় না শুনে তাকে কফি করে দিলে। প্রাণ-খোলা হাসি হেসে কত গল্প করলে, যেন কিছুই হয় নি।

শঙ্কর বাস্তবিকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণ আগের অপমান ও শত্রুতা যে এমন বেমালুম ভুলে গিয়ে, যাদের হাতে অপমান হয়েছে তাদেরই সঙ্গে এমনিধারা দিল-খোলা হেসে খোশগল্প করতে পারে, পৃথিবীতে সে ধরনের লোক বেশী নেই।

পরদিন ওরা কাবালো থেকে স্টীমারে উঠল কঙ্গোনদী বেয়ে দক্ষিণমুখে যাবার জন্যে। নদীর দুই তীরের দৃশ্যে শঙ্করের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এরকম অদ্ভুত বনজঙ্গলের দৃশ্য জীবনে কখনো সে দেখে নি। এতদিন সে যেখানে ছিল, আফ্রিকার সে অঞ্চলে এমন বন নেই—সে শুধু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রধানতঃ ঘাসের বন, মাঝে মাঝে বাবলা ও ইউকা গাছ। কিন্তু কঙ্গোনদী বেয়ে স্টীমার যত অগ্রসর হয়, দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা মোটা লতা, বনের ফুল; বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, আপনার সৌন্দর্য্যে ও নিবিড় প্রাচুর্য্যে আপনি মুগ্ধ।

শঙ্করের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যপ্রিয় ভাবুক মনটি ছিল, (হাজার হোক্ সে বাংলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আল্‌ভারেজের মত শুধু কঠিনপ্রাণ স্বর্ণান্বেষী প্রস্‌পেক্টর নয়) এই রূপের মেলায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে রাঙা অপরাহ্ণে ও দুপুর রোদে আপন মনে কত কি স্বপ্নজাল রচনা করে।

অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, অচেনা তারাভরা বিদেশের আকাশের তলায় রহস্যময়ী বন্য প্রকৃতি তখন যেন জেগে উঠেছে—জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্যজন্তুর ডাক কানে আসে, শঙ্করের চোখে ঘুম নেই, এই সৌন্দর্য্য-স্বপ্নে ভোর হয়ে, মধ্য আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও জেগে বসে থাকে।

ঐ জলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল—আকাশে অনেক দূরে তার ছোট্ট গ্রামের মাথায়ও আজ এমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেছে, ওই রকম এক ফালি কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রির চাঁদও। সে-সব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে সে এসে পড়েছে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কি এর পরিণতি কে জানে?

দুদিন পরে বোট এসে সান্‌কিনি পৌছুলো। সেখান থেকে ওরা আবার পদব্রজে রওনা হল—জঙ্গল এদিকে বেশী নেই, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী জনমানবহীন প্রান্তর ও অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, অধিকাংশ পাহাড় রুক্ষ ও বৃক্ষশূন্য, কোনো কোনো পাহাড়ে ইউফোবিয়া জাতীয় গাছের ঝোপ। কিন্তু শঙ্করের মনে হল, আফ্রিকার এই অঞ্চলের দৃশ্য বড় অপরূপ। একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, সূর্য্যাস্তের রঙ, জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া এই দেশকে রাত্রে, অপরাহ্নে রূপকথার পরীরাজ্য করে তোলে।

আল্‌ভারেজ বললে—এই ভেল্ড্‌ অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে একরকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশী।

কথাটা যেদিন বলা হল, সেদিনই এক কাণ্ড ঘটল। জনহীন ভেল্ডে সূর্য্য অস্ত গেলে ওরা একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বাললে—শঙ্কর জল খুঁজতে বেরুল। সঙ্গে আল্‌ভারেজের বন্দুকটা নিয়ে গেল, কিন্তু মাত্র দুটি টোটা। আধঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরে বেলাটুকু গেল, পাতলা অন্ধকারে সমস্ত প্রান্তরকে ধীরে ধীরে আবৃত করে দিলে। শঙ্কর শপথ করে বলতে পারে, সে আধঘণ্টার বেশী হাঁটে নি। হঠাৎ চারিধারে চেয়ে শঙ্করের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল, যেন কি একটা বিপদ আসছে, তাঁবুতে ফেরা ভালো। দূরে দূরে ছোট-বড় পাহাড়, একই রকম দেখতে সব দিক, কোনো চিহ্ন নেই, সব একাকার।

মিনিট পাঁচ-ছয় হাঁটবার পরই শঙ্করের মনে হল সে পথ হারিয়েছে। তখন আল্‌ভারেজের কথাটা তার মনে পড়ল। কিন্তু তখনও সে অনভিজ্ঞতার দরুন বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলে না। হেঁটেই যাচ্ছে—একবার মনে হয় সামনে, একবার মনে হয় বাঁয়ে, একবার মনে হয় ডাইনে। তাঁবুর আগুনের কুণ্ডটা দেখা যায় না কেন? কোথায় সেই ছোট পাহাড়টা?

দু-ঘণ্টা হাঁটবার পরে শঙ্করের খুব ভয় হল। ততক্ষণে সে বুঝেছে যে, সে সম্পূর্ণরূপে পথ হারিয়েছে এবং ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। একা তাকে রোডেসিয়ার এই জনমানবশূন্য, সিংহসঙ্কুল অজানা প্রান্তরে রাত কাটাতে হবে,—অনাহারে এবং এই কন্‌কনে শীতে বিনা কম্বলে ও বিনা আগুনে। সঙ্গে একটা দেশলাই পর্য্যন্ত নেই।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাঁড়ালো যে, পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে অর্থাৎ পথ হারানোর চব্বিশ ঘণ্টা পরে, উদ্‌ভ্রান্ত, তৃষ্ণায় মুমূর্ষু শঙ্করকে ওদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে একটা ইউফোবিয়া গাছের তলা থেকে আল্‌ভারেজ উদ্ধার করে তাঁবুতে নিয়ে এল।

আল্‌ভারেজ বললে—তুমি যে পথ ধরেছিলে শঙ্কর, তোমাকে আজ খুঁজে বার করতে না পারলে তুমি গভীর থেকে গভীরতর মরুপ্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়ে কাল দুপুর নাগাদ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে। এর আগে তোমার মত অনেকেই রোডেসিয়ার ভেল্ডে এভাবে মারা গিয়েছে! এ-সব ভয়ানক জায়গা। তুমি আর কখনও তাঁবু থেকে ওরকম বেরিও না, কারণ তুমি আনাড়ী। মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার জানা নেই। ডাহা মারা পড়বে।

শঙ্কর বললে—আল্‌ভারেজ, তুমি দুবার আমার প্রাণরক্ষা করলে, এ আমি ভুলবো না।

আল্‌ভারেজ বললে—ইয়াং ম্যান ভুলে যাচ্ছ যে, তার আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।

তুমি না থাকলে ইউগাণ্ডার তৃণভূমিতে আমার হাড়গুলো সাদা হয়ে আসতো এতদিন।

মাস দুই ধরে রোডেসিয়া ও এঙ্গোলার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভেল্ড্ অতিক্রম করে, অবশেষে দূরে মেঘের মত পর্ব্বতশ্রেণী দেখা গেল। আল্ভারেজ ম্যাপ মিলিয়ে বলল—ওই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থান, রিখ্টারসভেল্ড্ পর্ব্বত, এখনও এখান থেকে চল্লিশ মাইল হবে। আফ্রিকার এই সব খোলা জায়গায় অনেক দূর থেকে জিনিস দেখা যায়।

এ অঞ্চলে অনেক বাওবাব্ গাছ। শঙ্করের এ গাছটা বড় ভাল লাগে—দূর থেকে যেন মনে হয় বট কি অশ্বত্থ গাছের মত, কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায়, বাওবাব্ গাছ ছায়াবিরল অথচ বিশাল, আঁকা-বাঁকা সারা গায়ে যেন বড় বড় আঁচিল কি আব্ বেরিয়েছে, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা বেঁটে, কুদর্শন, কুব্জ দৈত্য। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখানে ওখানে প্রায় সর্ব্বত্রই দূরে নিকটে বড় বড় বাওবাব্ গাছ দাঁড়িয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলার দুর্জ্জয় শীতে তাঁবুর সামনে আগুন করে বসে আল্ভারেজ বললে—এই যে দেখছ রোডেসিয়ার ভেল্ড্ অঞ্চল, এখানে হীরে ছড়ানো আছে সর্ব্বত্র, এটা হীরের খনির দেশ। কিম্বার্লি খনির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আরও অনেক ছোটখাটো খনি আছে, এখানে ওখানে ছোট বড় হীরের টুকরো কত লোকে পেয়েছে, এখনও পায়।

কথা শেষ করেই বলে উঠল—ও কারা?

শঙ্কর সামনে বসে ওর কথা শুনছিল। বললে, কোথায় কে?

কিন্তু আল্ভারেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার হাতের বন্দুকের গুলির মতই অব্যর্থ, একটু পরে তাঁবু থেকে দূরে অন্ধকারে কয়েকটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি এদিকে এগিয়ে আসছে, শঙ্করের চোখে পড়ল। আল্ভারেজ বললে—শঙ্কর, বন্দুক নিয়ে এসো, চট্ করে যাও, টোটা ভরে—

বন্দুক হাতে শঙ্কর বাইরে এসে দেখলে, আল্ভারেজ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করছে, কিছু-দূরে অজানা মূর্ত্তি কয়টি এখনও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আসছে। একটু পরে তারা এসে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের বাইরে দাঁড়ালো। শঙ্কর চেয়ে দেখলে আগন্তুক কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, —তাদের হাতে কিছু নেই, পরনে লেংটি, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক—সুগঠিত চেহারা, তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল যেন কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি।

আল্ভারেজ জুলু ভাষায় বললে—কি চাও তোমরা?

ওদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা চলল, তার পরে ওরা সব মাটির ওপর বসে পড়ল। আল্ভারেজ বললে—শঙ্কর, ওদের খেতে দাও—

তার পরে অনুচ্চস্বরে বললে—বড় বিপদ। খুব হুঁশিয়ার, শঙ্কর!

টিনের খাবার খোলা হল। সকলের সামনেই খাবার রাখলে শঙ্কর। আল্ভারেজও ওই সঙ্গে আবার খেতে বসলো, যদিও সে ও শঙ্কর সন্ধ্যার সময়েই তাদের নৈশ আহার শেষ করেছে। শঙ্কর বুঝলে আল্ভারেজের কোনো মতলব আছে, কিংবা এদেশের রীতি অতিথির সঙ্গে খেতে হয়।

আল্ভারেজ খেতে খেতে জুলু ভাষায় আগন্তুকদের সঙ্গে গল্প করছে, অনেকক্ষণ পরে

খাওয়া শেষ করে ওরা চলে গেল। চলে যাবার আগে সবাইকে একটা করে সিগারেট দেওয়া হল।

ওরা চলে গেলে আল্‌ভারেজ বললে—ওরা মাটাবেল্ জাতির লোক। ভয়ানক দুর্দ্দান্ত, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। শয়তানকে ভয় করে না। ওরা সন্দেহ করেছে আমরা ওদের দেশে এসেছি হীরের খনির সন্ধানে। আমরা যে জায়গাটায় আছি, এটা ওদের একজন সর্দ্দারের রাজ্য। কোনো সভ্য গবর্নমেণ্টের আইন এখানে খাট্‌বে না। ধরবে আর নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারবে। চলো আমরা তাঁবু তুলে রওনা হই।

শঙ্কর বললে—তবে তুমি বন্দুক আনতে বললে কেন?

আল্‌ভারেজ হেসে বললে—ভ্যাখো, ভেবেছিলুম যদি ওরা খেয়েও না ভোলে, কিংবা কথাবার্ত্তায় বুঝতে পারি যে, ওদের মতলব খারাপ, ভোজনরত অবস্থাতেই ওদের গুলি করবো। এই ভ্যাখো রিভলভার পেছনে রেখে তবে খেতে বসেছিলাম। এ কটাকে সাবাড় করে দিতাম। আমার নাম আল্‌ভারেজ, আমিও একসময়ে শয়তানকেও ভয় করতুম না, এখনও করি নে। ওদের হাতের মাছ মুখে পৌছোবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

আরও পাঁচ-ছ' দিন পথ চলবার পরে একটা খুব বড় পর্ব্বতের পাদমূলে নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানীর মধ্যে ওরা প্রবেশ করলে। স্থানটি যেমন নির্জ্জন, তেমনি বিশাল। সে বন দেখে শঙ্করের মনে হল, একবার যদি সে এর মধ্যে পথ হারায়, সারাজীবন ঘুরলেও বার হয়ে আসবার সাধ্য তার হবে না। আল্‌ভারেজও তাকে সাবধান করে দিয়ে বললে—খুব হুঁশিয়ার শঙ্কর, বনে চলাফেরা যার অভ্যাস নেই, সে পদে পদে এই সব বনে পথ হারাবে। অনেক লোক বেঘোরে পড়ে বনের মধ্যে মারা পড়ে। মরুভূমির মধ্যে যেমন পথ হারিয়ে ঘুরেছিলে, এর মধ্যেও ঠিক তেমনিই পথ হারাতে পারো। কারণ এখানে সবই একরকম, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেবার কোনো চিহ্ন নেই। ভাল বুশ্‌ম্যান না হলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। বন্দুক না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না, এটিও যেন মনে থাকে। মধ্য আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়।

শঙ্করকে তা না বললেও চলতো, কারণ এসব অঞ্চল যে শখের পার্ক নয়, তা এর চেহারা দেখেই সে বুঝতে পেরেছে। সে জিজ্ঞেস করলে—তোমার সেই হলদে হীরের খনি কতদূরে? এই তো রিখ্‌টারসভেল্ড্ পর্ব্বতমালা, ম্যাপে যতদূর বোঝা যাচ্ছে।

আল্‌ভারেজ হেসে বললে—তোমার ধারণা নেই বললাম যে। আসল রিখ্‌টারসভেল্ডের এটা বাইরের থাক্। এ রকম আরও অনেক থাক্ আছে। সমস্ত অঞ্চলটা এত বিশাল যে পুবে সত্তর মাইল ও পশ্চিমদিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্য্যন্ত গেলেও এ বন ও পাহাড় শেষ হবে না। সর্ব্বনিম্ন প্রস্থ চল্লিশ মাইল। সমস্ত জড়িয়ে আট ন' হাজার বর্গমাইল সমস্ত রিখ্‌টারস্‌-ভেল্ড্ পার্ব্বত্য অঞ্চল ও অরণ্য। এই বিশাল অজানা অঞ্চলের কোন্‌খানটাতে এসেছিলুম আজ সাত আট বছর আগে, ঠিক সে জায়গাটা খুঁজে বার করা কি ছেলেখেলা, ইয়্যাং ম্যান্?

শঙ্কর বললে—এদিকে খাবার ফুরিয়েছে, শিকারের ব্যবস্থা দেখতে হয়, নইলে কাল থেকে বায়ুভক্ষণ ছাড়া উপায় নেই।

আল্‌ভারেজ বললে—কিছু ভেবো না। দেখছো না গাছে গাছে বেবুনের মেলা? কিছু না মেলে বেবুনের দাপ্‌না ভাজা আর কফি দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাবো কাল থেকে। আজ আর নয়, তাঁবু ফেল, বিশ্রাম করা যাক্‌।

একটা বড় গাছের নীচে তাঁবু খাটিয়ে ওরা আগুন জ্বাললে। শঙ্কর রান্না করলে, আহারাদি শেষ করে যখন দুজনে আগুনের সামনে বসেছে, তখনও বেলা আছে।

আল্‌ভারেজ কড়া তামাকের পাইপ টানতে টানতে বললে—জানো শঙ্কর, আফ্রিকার এই সব অজানা অরণ্যে এখনও কত জানোয়ার আছে, যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত্র রাখে না? খুব কম সভ্য মানুষ এখানে এসেছে। ওকাপি বলে যে জানোয়ার সে তো প্রথম দেখা গেল ১৯০০ সালে। এক ধরনের বুনো শূওর আছে, যা সাধারণ বুনো শূওরের প্রায় তিনগুণ বড় আকারের। ১৮৮৮ সালে মোজেস্‌ কাউলে, পৃথিবী পর্য্যটক ও বড় শিকারী, সর্ব্বপ্রথম এই বুনো শূওরের সন্ধান পান বেলজিয়াম কঙ্গোর লুয়ালাবু অরণ্যের মধ্যে। তিনি বহু কষ্টে একটা শিকারও করেন এবং নিউইয়র্ক প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত মিউজিয়মে উপহার দেন। বিখ্যাত রোডেসিয়ান্‌ মনস্টারের নাম শুনেছ?

শঙ্কর বললে—না, কি সেটা?

—শোন তবে। রোডেসিয়ার উত্তর সীমায় প্রকাণ্ড জলাভূমি আছে। ওদেশের অসভ্য জুলুদের মধ্যে অনেকেই এক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারকে এই জলাভূমিতে মাঝে মাঝে দেখেছে। ওরা বলে তার মাথা কুমীরের মত, গণ্ডারের মত তার শিং আছে, গলাটা অজগর সাপের মত লম্বা ও আঁশওয়ালা, দেহটা জলহস্তীর মত, লেজটা কুমীরের মত। বিরাটদেহ এই জানোয়ারের প্রকৃতিও খুব হিংস্র। জল ছাড়া কখনো ডাঙায় এ জানোয়ারকে দেখা যায় নি। তবে এই সব অসভ্য দেশী লোকের অতিরঞ্জিত বিবরণ বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু ১৮৮০ সালে জেম্‌স্‌ মার্টিন বলে একজন প্রস্পেক্টর রোডেসিয়ার এই অঞ্চলে বহুদিন ঘুরেছিলেন সোনার সন্ধানে। মিঃ মার্টিন আগে জেনারেল ম্যাথিউসের এডিকং ছিলেন, নিজে একজন ভাল ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ববিদও ছিলেন। ইনি তাঁর ডায়েরীর মধ্যে রোডে-সিয়ার এই অজ্ঞাত জানোয়ার দূর থেকে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। তিনিও বলেন, জানোয়ারটা আকৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপের মত ও বেজায় বড়। কিন্তু তিনি জোর করে কিছু বলতে পারেন নি, কারণ খুব ভোরের কুয়াশার মধ্যে কোভিরাণ্ডো হ্রদের সীমানায় জলাভূমিতে আবছায়া ভাবে তিনি জানোয়ারটাকে দেখেছিলেন। জানোয়ারটার ঘোড়ার চিঁহিঁ ডাকের মত ডাক শুনেই তাঁর সঙ্গের জুলু চাকর-গুলো উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে পালাতে বললে—সাহেব পালাও, পালাও, ডিঙ্গোনেক্‌! ডিঙ্গোনেক্‌! ডিঙ্গোনেক্‌ ঐ জানোয়ারটার জুলু নাম। দু-তিন বছরে এক আধবার দেখা দেয় কি না দেয়, কিন্তু সেটা এতই হিংস্র যে তার আবির্ভাব সে দেশের লোকের পক্ষে ভীষণ ভয়ের

ব্যাপার। মিঃ মার্টিন বলেন, তিনি তাঁর ৩০৩ টোটা গোটা দুই উপরি উপরি ছুঁড়েছিলেন জানোয়ারটার দিকে। অতদূর থেকে তাক্ হল না, রাইফেলের আওয়াজে সেটা সম্ভবতঃ জলে ডুব দিলে।

শঙ্কর বললে—তুমি কি করে জানলে এসব? মিঃ মার্টিনের ডায়েরী ছাপানো হয়েছিল নাকি?

—না, অনেকদিন আগে বুলাওয়েও ক্রনিক্ল্ কাগজে মিঃ মার্টিনের এই ঘটনাটা বেরিয়েছিল। আমি তখন সবে এদেশে এসেছি। রোডেসিয়া অঞ্চলে আমিও প্রস্‌পেক্‌টিং করে বেড়াতুম বলে জানোয়ারটার বিবরণ আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। কাগজখানা অনেকদিন আমার কাছে রেখেও দিয়েছিলুম। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। ওরাই নাম দিয়েছিল জানোয়ারটার—রোডেসিয়ান্ মনস্টার।

শঙ্কর বললে—তুমি কোনো কিছু অদ্ভুত জানোয়ার ছাখো নি?

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেছে। সেই আবছায়া আলো-অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মনে হল—হয়তো শঙ্করের ভুল হতে পারে—কিন্তু শঙ্করের মনে হয় সে দেখলে আল্‌ভারেজ, দুর্দ্ধর্ষ ও নির্ভীক আল্‌ভারেজ, দুঁদে ও অব্যর্থলক্ষ্য আল্‌ভারেজ ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো—এবং—এবং সেইটাই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য—যেন পরক্ষণেই শিউরে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আল্‌ভারেজ যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই চারিপাশের জনমানবহীন ঘন জঙ্গল ও রহস্যভরা দুরারোহ পর্ব্বতমালার দিকে একবার চেয়ে দেখলে, কোন কথা বললে না। যেন এই পর্ব্বতজঙ্গলে বহুকাল পরে এসে অতীতের কোনো বিভীষিকাময়ী পুরাতন ঘটনা ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে, যে স্মৃতিটা ওর পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়।

আল্‌ভারেজ ভয় পেয়েছে!

অবাক্! আল্‌ভারেজের ভয়! শঙ্কর ভাবতেও পারে না। কিন্তু সেই ভয়টা অলক্ষিতে এসে শঙ্করের মনেও চেপে বসলো। এই সম্পূর্ণ অজানা বিচিত্র রহস্যময়ী বনানী, এই বিরাট পর্ব্বতপ্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে যুগ যুগ ধরে গোপন করে আসছে—যে বীর হও, যে নির্ভীক হও, এগিয়ে এসো সে—কিন্তু মৃত্যুপণে ক্রয় করতে হবে সে গহন রহস্যের সন্ধান। রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পর্বতমালা ভারতবর্ষের দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয়—এদেশের মাসাই, জুলু, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্ব্বর, নরমাংসলোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না।

সাত

তার পর দিন দুই কেটে গেল। ওরা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে। পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উৎরাই, মাঝে মাঝে কর্কশ ও দীর্ঘ টুসক্ ঘাসের বন, জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, ঝরনা এক-আধটা যদিও বা দেখা যায়, আল্ভারেজ তাদের জল ছুঁতেও দেয় না। দিব্যি স্ফটিকের মত নির্ম্মল জল পড়ছে ঝর্না বেয়ে, সুশীতল ও লোভনীয়, তৃষ্ণার্ত্ত লোকের পক্ষে সে লোভ সম্বরণ করা বড়ই কঠিন - কিন্তু আল্ভারেজ জলের বদলে ঠাণ্ডা চা খাওয়াবে তবুও জল খেতে দেবে না। জলের তৃষ্ণা ঠাণ্ডা চায়ে দূর হয় না, তৃষ্ণার কষ্টই সব চেয়ে বেশী কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল শঙ্করের। একস্থানে টুসক্ ঘাসের বন বেজায় ঘন। তার ওপরে ওদের চারিধারে ঘিরে সেদিন কুয়াশাও খুব গভীর। হঠাৎ বেলা উঠলে নীচের কুয়াশা সরে গেল—সামনে চেয়ে শঙ্করের মনে হল, খুব বড় একটা চড়াই তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে, কত উঁচু সেটা তা জানা সম্ভব নয়, কারণ নিবিড় কুয়াশা কিংবা মেঘে তার ওপরের দিকটা সম্পূর্ণরূপে আবৃত। আল্ভারেজ বললে—রিখ্টারস্ভেল্ডের আসল রেঞ্জ্।

শঙ্কর বললে—এটা পার হওয়া কি দরকার?

আল্ভারেজ বললে—এইজন্যে দরকার যে সেবার আমি আর জিম্ দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিলুম এই পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে, কিন্তু আসল রেঞ্জ্ পার হই নি। যে নদীর ধারে হলদে হীরে পাওয়া গিয়েছিল, তার গতি পুব থেকে পশ্চিমে। এবার আমরা যাচ্ছি উত্তর থেকে দক্ষিণে। সুতরাং পর্ব্বত পার হয়ে ওপারে না গেলে কি করে সেই নদীটার ঠিকানা করতে পারি?

শঙ্কর বললে—আজ যে রকম কুয়াশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটু অপেক্ষা করা যাক্ না কেন? আর একটু বেলা বাড়ুক।

তাঁবু ফেলে আহারাদি সম্পন্ন করা হল। বেলা বাড়লেও কুয়াশা তেমন কাটল না। শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন নেই। চোখ মুছতে মুছতে তাঁবুর বাইরে এসে সে দেখলে, আল্ভারেজ চিন্তিত-মুখে ম্যাপ খুলে বসে আছে। শঙ্করকে দেখে বললে—শঙ্কর, আমাদের এখনও অনেক ভুগতে হবে। সামনে চেয়ে দেখ।

আল্ভারেজের কথার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোখে পড়ল। কুয়াশা কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখ্টারস্ভেল্ড্ পর্ব্বতের প্রধান থাক্ ধাপে ধাপে উঠে মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত কিন্তু উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্য্যের রাঙা আলোয় দেবলোকের কনকদেউলের মত বহুদূর নীলশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সামনের পর্ব্বতাংশ সম্পূর্ণ দুরারোহ—শুধুই খাড়া খাড়া উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ—কোথাও একটু ঢালু নেই। আল্ভারেজ বললে—এখান থেকে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, শঙ্কর। দেখেই

বুঝেছ নিশ্চয়। পাহাড়ের কোলে কোলে পশ্চিম দিকে চল। যেখানে ঢালু এবং নীচু পাবো, সেখান দিয়েই পাহাড় পার হতে হবে। কিন্তু এই দেড়শো মাইল লম্বা পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কোথায় সে-রকম জায়গা আছে, এ খুঁজতেই তো এক মাসের'ওপর যাবে দেখছি।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পশ্চিম দিকে যাওয়ার পরে এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল, যেখানে পর্ব্বতের গা বেশ ঢালু, সেখান দিয়ে পর্ব্বতে ওঠা চলতে পারে।

পরদিন খুব সকাল থেকে পর্ব্বতারোহণ শুরু হল। শঙ্করের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ছ'টা। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। যে জায়গাটা দিয়ে তারা উঠছে—সেখানে পর্ব্বতের চার মাইলের মধ্যে উঠেছে ছ'হাজার ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হলেও কী ভীষণ দুরারোহ তা সহজেই বোঝা যাবে। তা ছাড়া যতই ওপরে উঠছে অরণ্য ততই নিবিড়তর, ঘন অন্ধকার চারিদিক, বেলা হয়েছে, রোদ উঠেছে, অথচ সূর্য্যের আলো ঢোকে নি জঙ্গলের মধ্যে—আকাশই চোখে পড়ে না তায় সূর্য্যের আলো!

পথ বলে কোনো জিনিস নেই। চোখের সামনে শুধুই গাছের গুঁড়ি যেন ধাপে ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেছে। কোথা থেকে জল পড়েছে কে জানে, পায়ের নীচের প্রস্তর আর্দ্র ও পিচ্ছিল, প্রায় সর্ব্বত্রই পাথরের ওপর শেওলা-ধরা। পা পিছলে গেলে গড়িয়ে নীচের দিকে বহুদূর চলে গিয়ে তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে আহত হতে হবে।

শঙ্কর বা আল্‌ভারেজ কারো মুখে কথা নেই। এই উত্তুঙ্গ পথে ওঠবার কষ্টে দুজনেই অবসন্ন, দুজনেরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। শঙ্করের কষ্ট আরও বেশী, বাংলার সমতলভূমিতে আজন্ম মানুষ হয়েছে, পাহাড়ে ওঠার অভ্যাসই নেই কখনো।

শঙ্কর ভাবছে, আল্‌ভারেজ কখন বিশ্রাম করতে বলবে। সে আর উঠতে পারছে না, কিন্তু যদি সে মরেও যায়, একথা আল্‌ভারেজকে সে কখনই বলবে না যে, সে আর পারছে না। হয়তো তাতে আল্‌ভারেজ ভাববে, ঈস্ট্ ইণ্ডিজের মানুষগুলো দেখছি নিতান্ত অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্ব্বত ও অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি—এমন কোন কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোট হয়ে যায়।

বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য, মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঝরনা বনের মধ্যে দিয়ে খুব ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে ডালে নানা রঙের টিয়াপাখী চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় বড় ঘাসের মাথায় সাদা সাদা ফুল, অর্কিডের ফুল ঝুলছে গাছের ডালের গায়ে, গুঁড়ির গায়ে।

হঠাৎ শঙ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে মাঝে লম্বা দাড়ি-গোঁপওয়ালা বালখিল্য মুনিদের মত ও কারা বসে রয়েছে। তারা সবাই চুপচাপ বসে, মুনিজনোচিত গাম্ভীর্য্যে ভরা। ব্যাপার কি?

আল্‌ভারেজ বললে—ও কলোবাস্ জাতীয় মাদী বানর। পুরুষ জাতীয় কলোবাস্ বানরের দাড়ি-গোঁপ নেই, স্ত্রী জাতীয় কলোবাস্ বানরের হাতখানেক লম্বা দাড়ি-গোঁপ গজায় এবং তারা বড় গম্ভীর, দেখেই বুঝতে পাচ্ছ।

ওদের কাণ্ড দেখে শঙ্কর হেসেই খুন।

পায়ের তলায় মাটিও নেই, পাথরও নেই—তাদের বদলে আছে শুধু পচা পাতা ও শুকনো গাছের গুঁড়ির স্তূপ। এই সব বনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাতার রাশি ঝরছে, পচে যাচ্ছে, তার ওপরে শেওলা পুরু হয়ে উঠছে, ছাতা গজাচ্ছে, তার ওপরে আবার নতুন-ঝরা পাতার রাশি, আবার পড়ছে গাছের ডাল-পালা, গুঁড়ি। জায়গায় জায়গায় ষাট-সত্তর ফুট গভীর হয়ে জমে রয়েছে এই পত্রস্তূপ।

আল্‌ভারেজ ওকে শিখিয়ে দিলে, এসব জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে। এমন জায়গা আছে, যেখানে মানুষে চলতে চলতে ওই ঝরা পাতার রাশির মধ্যে ভুস্ করে ঢুকে ডুবে যেতে পারে, যেমন অতর্কিতে পথ চলতে চলতে প্রাচীন কূপের মধ্যে পড়ে যায়। উদ্ধার করা সম্ভব না হলে সে-সব ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য্য।

শঙ্কর বললে—পথের গাছপালা না কাটলে আর তো ওঠা যাচ্ছে না, বড় ঘন হয়ে উঠছে।

ক্ষুরের মত ধারালো চওড়া এলিফ্যাণ্ট্ ঘাসের বন—যেন রোমান্ যুগের দ্বি-ধার তলোয়ার। তার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় দুজনের কেউই নিরাপদ বলে ভাবছে না নিজেকে, দু-হাত তফাতে কি আছে দেখা যায় না যখন, তখন সব রকম বিপদের সম্ভাবনাই তো রয়েছে। থাকতে পারে বাঘ, থাকতে পারে সিংহ, থাকতে পারে বিষাক্ত সাপ।

শঙ্কর লক্ষ্য করছে মাঝে মাঝে ডুগ্‌ডুগি বা ঢোল বাজনার মত একটা শব্দ হচ্ছে কোথায় যেন বনের মধ্যে। কোনো অসভ্য জাতির লোক ঢোল বাজাচ্ছে নাকি? আল্‌ভারেজকে সে জিজ্ঞেস করলে।

আল্‌ভারেজ বললে—ঢোল নয়, বড় বেবুন কিংবা বনমানুষে বুক চাপড়ে ওই রকম শব্দ করে। মানুষ এখানে কোথা থেকে আসবে?

শঙ্কর বললে—তুমি যে বলেছিলে এ বনে গরিলা নেই?

—গরিলা সম্ভবতঃ নেই। আফ্রিকার মধ্যে বেলজিয়ান্ কঙ্গোর কিছু অঞ্চল, রাওয়েন্‌জরী আল্পস্ বা ভিরুঙ্গা আগ্নেয় পর্ব্বতের অরণ্য ছাড়া কোথাও গরিলা আছে বলে তো জানা নেই। গরিলা ছাড়াও অন্য ধরনের বনমানুষে বুক চাপড়ে ওই রকম আওয়াজ করতে পারে।

ওরা সাড়ে চার হাজার ফুটের ওপর উঠেছে। সেদিনের মত সেখানেই রাত্রির বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হল। একটা বিশাল সত্যিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের রাত্রিকালীন শব্দ এত বিচিত্র ধরনের ও এত ভীতিজনক যে সারারাত শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। শুধু ভয় নয়, ভয় মিশ্রিত একটা বিস্ময়।

কত রকমের শব্দ—হায়েনার হাসি, কলোবাস্ বানরের কর্কশ চীৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক—প্রকৃতির এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রে কেউ ঘুমোয় না। সমস্ত অরণ্যটা এই গভীর রাত্রে যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে। বছর কয়েক আগে খুব বড় একটা সার্কাসের দল এসে ওদের স্কুল-বোর্ডিংয়ের পাশের মাঠে তাঁবু ফেলেছিল,

তাদের জানোয়ারদের চীৎকারে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা রাত্রে ঘুমুতে পারতো না—শঙ্করের সেই কথা এখন মনে পড়ল। কিন্তু এসবের চেয়েও মধ্যরাত্রে একদল বন্য হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি তাঁবুর অত্যন্ত নিকটে শুনে শঙ্কর এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আল্‌ভারেজকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠালে। আল্‌ভারেজ বললে—আগুন জ্বলছে তাঁবুর বাইরে, কোনো ভয় নেই, ওরা ঘেঁষবে না এদিকে।

সকালে উঠে আবার ওপরে ওঠা শুরু। উঠছে, উঠছে—মাইলের পর মাইল বন্য বাঁশের অরণ্য, তার তলায় বুনো আদা। ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁদিকের বাঁশবনের তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হস্তীযূথ কচি বাঁশের কোঁড় মড় মড় করে ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল।

পাঁচ হাজার ফুট ওপরে কত কি বন্য পুষ্পের মেলা—টক্‌টকে লাল ইরিথ্রিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেছে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাংলাদেশের বনকলমী ফুলের মত কিন্তু রঙটা অত গাঢ় বেগুনি নয়। সাদা ভেরোনিকা ঘন সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেছে। বন্য কফির ফুল, রঙীন বেগোনিয়া। মেঘের রাজ্যে ফুলের বন, মাঝে মাঝে সাদা বেলুনের মত মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে এসে আটকাচ্ছে—কখনও বা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্চে।

সাড়ে সাত হাজার ফুটের ওপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। এই পর্য্যন্ত উঠতে ওদের আরও দু'দিন লেগেছে। আর অসহ্য কষ্ট, কোমর পিঠ ভেঙে পড়ছে। এখানে বনানীর মূর্ত্তি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলছে—সে শেওলা কোথাও কোথাও এত লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মত হয়েছে—বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে, তার ওপর কোথাও সূর্য্যের আলো নেই, সব সময়ই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরনের নিস্তব্ধতা—বাতাস বইছে তারও শব্দ নেই পাখীর কূজন নেই সে বনে—মানুষের গলার সুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোন্ অন্ধকার নরকে দীর্ঘশ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা।

সেদিন অপরাহ্নে যখন আল্‌ভারেজ তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করবার হুকুম দিলে—তখন তাঁবুর বাইরে বসে এক পাত্র কফি খেতে খেতে শঙ্করের মনে হল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী, পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ যখন কোনো একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে নি, যে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরাটকায় সরীসৃপের দল জগৎজোড়া বনজঙ্গলের নিবিড় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতো—সৃষ্টির সেই অতীত প্রভাবে সে যেন কোন্ জাদুমন্ত্রের বলে ফিরে গিয়েছে—

সন্ধ্যার পরেই সমগ্র বনানী নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হল। তাঁবুর বাইরে ওরা আগুন করেছে—সেই .আলোর মণ্ডলীর বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। এ বনের আশ্চর্য্য নিস্তব্ধতা শঙ্করকে বিস্মিত করছে। বনানীর সেই বিচিত্র নৈশ শব্দ এখানে শুব্ধ কেন? আল্‌ভারেজ চিন্তিত মুখে ম্যাপ দেখছিল। বললে—শোনো শঙ্কর, একটা কথা ভাবছি। আট হাজার ফুট উঠলাম, কিন্তু এখনও পর্ব্বতের সেই খাঁজটা পেলাম না যেটা দিয়ে আমরা রেঞ্জ্ পার

হয়ে ওপারে যাবো। আর কত ওপরে উঠবো? যদি ধরো এই অংশে স্যাড্‌লটা নাই থাকে?

শঙ্করের মনেও এ খট্‌কা যে না জেগেছে তা নয়। সে আজই ওঠবার সময় মাঝে মাঝে ফিল্ড্‌ গ্লাস্‌ দিয়ে ওপরের দিকে দেখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঘন মেঘে বা কুয়াশায় ওপরের দিকটা সর্ব্বদাই আবৃত থাকায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিই তো, তারা কত উঠবে আর, সমতল খাঁজ যদি না পাওয়া যায়? আবার নীচে নামতে হবে, আবার অন্য জায়গা বেয়ে উঠতে হবে। দফা সারা।

সে বললে—ম্যাপে কি বলে?

আল্‌ভারেজের মুখ দেখে মনে হল ম্যাপের ওপর সে আস্থা হারিয়েছে। বললে—এ ম্যাপ অত খুঁটিনাটি ভাবে তৈরী নয়। এ পর্ব্বতে উঠেছে কে যে ম্যাপ তৈরী হবে? এই যে দেখছো—এখানা সার ফিলিপো ডি ফিলিপির তৈরী ম্যাপ, যিনি পর্টুগিজ পশ্চিম আফ্রিকার ফার্ডিনাণ্ডো পো শৃঙ্গ আরোহণ করে খুব নাম করেন, এবং বছর কয়েক আগে বিখ্যাত পর্ব্বত আরোহণকারী পর্য্যটক ডিউক অফ আব্রুৎসির অভিযানেও যিনি ছিলেন। কিন্তু রিখ্‌টারস্‌-ভেল্ডে তিনি ওঠেন নি, এ ম্যাপে পাহাড়ের যে কন্‌টুর আঁকা আছে, তা খুব নিখুঁত বলে মনে তো হয় না। ঠিক বুঝছি নে।

হঠাৎ শঙ্কর বলে উঠল—ও কি?

তাঁবুর বাইরে প্রথমে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ, এবং পরক্ষণেই একটা কষ্টকর কাশির শব্দ পাওয়া গেল—যেন থাইসিসের রোগী খুব কষ্টে কাতর ভাবে কাশ্‌ছে। একবার···দুবার··· তার পরেই শব্দটা থেমে গেল। কিন্তু সেটা মানুষের গলার শব্দ নয়, শোনবামাত্রই শঙ্করের সে কথা মনে হল।

রাইফেল নিয়ে সে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বার হতে যাচ্ছে, আল্‌ভারেজ তাড়াতাড়ি উঠে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলে।

শঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে বললে—কেন, কিসের শব্দ ওটা?

কথা বলে আল্‌ভারেজের দিকে চাইতেই ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আল্‌ভারেজের মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। শব্দটা শুনেই কি!

সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের মণ্ডলীর বাইরে নিবিড় অন্ধকারে একটা ভারী অথচ লঘুপদ জীব যেন বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে বেশ মনে হল।

দুজনেই খানিকটা চুপচাপ, তার পরে আল্‌ভারেজ বললে—আগুনে কাঠ ফেলে দাও। বন্দুক দুটো ভরা আছে কি না দেখ। ওর মুখের ভাব দেখে শঙ্কর ওকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলে না।

রাত্রি কেটে গেল।

পরদিন সকালে শঙ্করেরই আগে ঘুম ভাঙল। তাঁবুর বাইরে এসে কফি করবার আগুন জাল্‌তে সে তাঁবু থেকে কিছুদূরে কাঠ ভাঙতে গেল। হঠাৎ তার নজর পড়ল ভিজে মাটির

ওপর একটা পায়ের দাগ—লম্বায় দাগটা এগারো ইঞ্চির কম নয়, কিন্তু তিনটে মাত্র পায়ের আঙুল। তিন আঙুলেরই দাগ বেশ স্পষ্ট। পায়ের দাগ ধরে সে এগিয়ে গেল—আরও অনেকগুলো সেই পায়ের দাগ আছে, সবগুলোতেই সেই তিন আঙুল।

শঙ্করের মনে পড়ল ইউগাণ্ডার স্টেশন ঘরে আলভারেজের মুখে শোনা জিম্ কার্টারের মৃত্যুকাহিনী। গুহার মুখে বালির ওপর সেই অজ্ঞাত হিংস্র জানোয়ারের তিন আঙুলওয়ালা পায়ের দাগ। কাফির গ্রামের সর্দ্দারের মুখে শোনা গল্প।

আল্ভারেজের কাল রাত্রের বিবর্ণ মুখও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। আর একদিনও আল্ভারেজ ঠিক এই রকমই ভয় পেয়েছিল, যেদিন পর্ব্বতের পাদমূলে ওরা প্রথম এসে তাঁবু পাতে।

বুনিপ্! কাফির সর্দ্দারের গল্পের সেই বুনিপ্। রিখ্টারসভেল্ড্ পর্ব্বত ও অরণ্যের বিভীষিকা, যার ভয়ে শুধু অসভ্য মানুষ কেন, অন্য কোনো বন্য জন্তু পর্য্যন্ত এই আট হাজার ফুট ওপরকার বনে আসে না। কাল রাত্রে কোনো জানোয়ারের শব্দ পাওয়া যায় নি কেন, এখন তা শঙ্করের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আল্ভারেজ্ পর্য্যন্ত ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর গলার শব্দ শুনে। বোধ হয় ও শব্দের সঙ্গে আল্ভারেজের পূর্ব্ব পরিচয় ঘটেছে।

আল্ভারেজের ঘুম ভাঙতে সেদিন দেরি হল। গরম কফি এবং গরম কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সেই নির্ভীক ও দুর্দ্ধর্ষ আল্ভারেজ, যে মানুষকেও ভয় করে না, শয়তানকেও না। শঙ্কর ইচ্ছে করেই আল্ভারেজকে ঐ অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালে না—কি জানি যদি আল্ভারেজ বলে বসে—এখনও পাহাড়ের স্যাড্ল্ পাওয়া গেল না, তবে নেমে যাওয়া যাক্!

সকালে সেদিন খুব মেঘ করে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। পর্ব্বতের ঢালু বেয়ে যেন হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে নীচে নামছে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, এতটা উঠেছে ওরা কিন্তু প্রতি হাজার ফুট ওপর থেকে নীচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে সেগুলিকে সমতলভূমির অরণ্য বলে ভ্রম হচ্ছে—কাজেই প্রথমটা মনে হয় যেন কতটুকুই বা উঠেছি, এটুকু তো।

বৃষ্টি সেদিন থামলো না—বেলা দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে আল্ভারেজ্ ওঠবার হুকুম দিলে। শঙ্কর এটা আশা করে নি। এখানে শঙ্কর কর্ম্মী শ্বেতাঙ্গচরিত্রের একটা দিক লক্ষ্য করলে। তার মনে হচ্ছিল, কেন এই বৃষ্টিতে মিছে মিছে বার হওয়া? একটা দিনে কি এমন হবে? বৃষ্টি-মাথায় পথ চলে লাভ?

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে ঘন অরণ্যানী ভেদ করে সেদিন ওরা সারাদিন উঠল। উঠছে, উঠছে, উঠছেই—শঙ্কর আর পারে না। কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র, তাঁবু সব ভিজে একশা, একখানা রুমাল পর্য্যন্ত শুকনো নেই কোথাও—শঙ্করের কেমন একটা অবসাদ এসেছে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্ব্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে

একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল, ওর তখন মনে হল—এই অজানা দেশে অজানা পর্ব্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন অনির্দ্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে সে চলেছে কোথায়? আল্ভারেজ কে তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হীরার খনিতে তার দরকার নেই। বাংলা দেশের খড়ে ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখীদের কাকলী—সে-সব যেন কতদূরের কোন্ অবাস্তব স্বপ্ন-রাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি তাদের চেয়ে মূল্যবান নয়।

কিন্তু তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্ম্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই. বাংলা বলে কোনো দেশ নেই। সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে—সে আর কোথাও ফিরতে চায় না, হীরা চায় না - পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু উর্দ্ধে এক কৌমুদী-শুভ্র দেবলোকের এখন সে অধিবাসী, তার চারিধারে যে সৌন্দর্য্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে তা কখনো দেখে নি। সে গহন নিস্তব্ধতা, এর আগে কোনো মানুষ অনুভব করে নি। জনমানবহীন বিশাল রিখ্টারসভেল্ড্ পর্ব্বত ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যান-স্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য কচিৎ ঘটে।

সেই রাত্রে ঘুম থেকে ও ধড়মড়িয়ে উঠল আল্ভারেজের ডাকে। আল্ভারেজ ডাকছে—শঙ্কর, শঙ্কর, ওঠো বন্দুক বাগাও।

—কি-কি—

তার পর ও কান পেতে শুনলে—তাঁবুর চারিপাশে কে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোর নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েছে, তাঁবুর বাইরে অন্ধকারই বেশী, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর দরজার মুখে আগুন তখনও একটু একটু জ্বলছে—কিন্তু তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোট, আলোর জ্যোতিও ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না।

হুড়্মুড় করে একটা শব্দ হল—গাছপালা ভেঙে একটা ভারী জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালালো যেন। যেন তাঁবুর সকলে সজাগ হয়ে উঠেছে, এখন আর অতর্কিত শিকারের সুবিধে হবে না, বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝতে পেরেছে।

জানোয়ারটা যাই হোক না কেন, তার যেন বুদ্ধি আছে, বিচারের ক্ষমতা আছে, মস্তিষ্ক আছে।

আল্ভারেজ রাইফেল হাতে টর্চ জ্বেলে বাইরে গেল। শঙ্করও গেল ওর পেছনে পেছনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, তাঁবুর উত্তর-পূর্ব্ব কোণের জঙ্গলের চারা গাছপালার ওপর দিয়ে যেন একটা ভারী স্টীম রোলার চলে গিয়েছে। আল্ভারেজ সেই দিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বার দুই ফ্যাওড় করলো।

কোনো দিকে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

তাঁবুতে ফেরবার সময় তাঁবুর ঠিক দরজার মুখে আগুনের কুণ্ডের অতি নিকটেই একটা পায়ের দাগ দুজনেরই চোখে পড়ল। তিনটে মাত্র আঙ্গুলের দাগ ভিজে মাটির ওপর সুস্পষ্ট।

এতে প্রমাণ হয়, জানোয়ারটা আগুনকে ডরায় না। শঙ্করের মনে হল, যদি ওদের ঘুম না ভাঙতো, তবে সেই অজ্ঞাত বিভীষিকাটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে একটুও দ্বিধা করতো না—এবং তার পর কি ঘট্‌ত তা কল্পনা করে কোনো লাভ নেই। আল্‌ভারেজ বললে—শঙ্কর, তুমি তোমার ঘুম শেষ করো, আমি জেগে আছি।

শঙ্কর বললে—না, তুমি ঘুমোও আল্‌ভারেজ।

আল্‌ভারেজ ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—পাগল, তুমি জেগে কিছু করতে পারবে না, শঙ্কর। ঘুমিয়ে পড়ো, ঐ দেখ দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আবার ঝড়বৃষ্টি আসবে, রাত শেষ হয়ে আসছে, ঘুমোও। আমি বরং একটু কফি খাই।

রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিদ্যুৎ, তেমনি মেঘ-গর্জ্জন। সে বৃষ্টি চলল সমানে সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শঙ্করের মনে হল, পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ হয়েছে শুরু, প্রলয়ের দেবতা সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেছেন বুঝি। বৃষ্টির বহর দেখে আল্‌ভারেজ পর্য্যন্ত দমে গিয়ে তাঁবু ওঠাবার নাম মুখে আনতে ভুলে গেল।

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকেল পাঁচটা। বোধ হয়, বৃষ্টি না থামলেই ভাল ছিল, কারণ অমনি আল্‌ভারেজ চলা শুরু করবার হুকুম দিলে। বাঙালী ছেলের স্বভাবতঃই মনে হয়—এখন অবেলায় যাওয়া কেন? এত কি সময় বয়ে যাচ্চে? কিন্তু আল্‌ভারেজের কাছে দিন, রাত, বর্ষা, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, অন্ধকার সব সমান। সে রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূমির মধ্যে দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে উঠছে, উঠছে—এমন সময় আল্‌ভারেজ পেছন থেকে বলে উঠল—শঙ্কর দাড়াও ঐ দেখ—

আল্‌ভারেজ ফিল্ড গ্লাস্ দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে বাঁ পাশের পর্ব্বতশিখরের দিকে চেয়ে দেখছে। শঙ্কর ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। হ্যাঁ, সমতল খাঁজটা পাওয়া গিয়েছে। বেশী দূরেও নয়, মাইল দুইয়ের মধ্যে, বাঁদিক ঘেঁষে।

আল্‌ভারেজ হাসিমুখে বললে—দেখেছ স্যাড্‌লটা? থামবার দরকার নেই, চল আজ রাত্রেই স্যাড্‌লের ওপর পৌছে তাঁবু ফেলবো। শঙ্কর আর সত্যিই পারছে না। এ দুর্দ্ধর্ষ পর্টুগিজ্‌টার সঙ্গে হীরার সন্ধানে এসে সে কি ঝকমারি না করেছে! শঙ্কর জানে অভিযানের নিয়মানুযায়ী দলপতির হুকুমের ওপর কোনো কথা বলতে নেই। এখানে আল্‌ভারেজই দলপতি, তার আদেশ অমান্য করা চলবে না। কোথাও আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও, পৃথিবীর ইতিহাসের বড় বড় অভিযানে সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। সেও মানবে।

অবিশ্রান্ত হাঁটবার পরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে স্যাড্‌লে যখন উঠল—শঙ্করের তখন আর এক পাও চলবার শক্তি নেই।

স্যাড্‌লটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নয়, কখনো বা দুশো ফুট খাড়া উঠছে, কখনো বা

চার-পাঁচশো ফুট নেমে গেল এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ দুরারোহ—যতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড় বড় বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথ্রিনা, পেনসিয়ানা, রিঠাগাছ, বাঁশ, বন্য আদা। বিচিত্র বর্ণের অর্কিডের ফুল ডালে ডালে। বেবুন ও কলোবাস্ বানর সর্বত্র।

আরও দুদিন ধরে ক্রমাগত নামতে নামতে ওরা রিখ্‌টারসভেল্ড পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে পদার্পণ করলো। শঙ্করের মনে হল, এদিকে জঙ্গল যেন আরও বেশী দুর্ভেদ্য ও বিচিত্র। আটলান্টিক মহাসাগরের দিক থেকে সমুদ্রবাষ্প উঠে কতক ধাক্কা খায় পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন পর্ব্বতে, বাকিটা আটকায় বিশাল রিখ্‌টারসভেল্ডের দক্ষিণ সানুতে—সুতরাং বৃষ্টি এখানে হয় অজস্র, গাছপালার তেজও তেমনি।

দিন পনেরো ধরে সে বিরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকাব সর্ব্বত্র দুজনে মিলে খুঁজেও আল্‌ভারেজ বর্ণিত পাহাড়ী নদীর কোনো ঠিকানা বার করতে পারলে না। ছোটখাটো ঝরনা দু একটা উপত্যকার ওপর দিয়ে বইছে বটে—কিন্তু আল্‌ভারেজ কেবলই ঘাড় নাড়ে আর বলে—এসব নয়।

শঙ্কর বলে—তোমার ম্যাপ দ্যাখো না ভালো করে? কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, আল্‌ভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্‌ভারেজ বলে—ম্যাপ কি হবে? আমার মনে গভীর ভাবে আঁকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার ছবি—সে একবার দেখতে পেলেই তখুনি চিনে নেবো। এ সে জায়গাই নয়, এ উপত্যকাই নয়।

নিরুপায়। খোঁজো তবে।

এক মাস কেটে গেল। পশ্চিম আফ্রিকায় বর্ষা নামল মার্চ্চ মাসের প্রথমে। সে কী ভয়ানক বর্ষা! শঙ্কর তার কিছু নমুনা পেয়ে এসেছে রিখ্‌টারসভেল্ড্ পার হবার সময়ে। উপত্যকা ভেসে গেল পাহাড় থেকে নানা বড় বড় পার্ব্বত্য ঝরনার জলধারায়। তাঁবু ফেলবার স্থান নেই। একরাত্রে হঠাৎ অতিবর্ষণের ফলে ওদের তাঁবুর সামনে একটা নিরীহ ক্ষীণকায়া ঝরনাধারা ভীমমূর্ত্তি ধারণ করে ওদের তাঁবুসুদ্ধ ওদের সুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় করেছিল—আল্‌ভারেজের সজাগ ঘুমের জন্যে সে-যাত্রা বিপদ কেটে গেল।

কিন্তু দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। শঙ্কর একদিন ঘোর বিপদে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সে বিপদটাও বড় অদ্ভুত ধরনের।

সেদিন আল্‌ভারেজ রাইফেল্ পরিষ্কার করছিল, সেটা শেষ করে রান্না করবে কথা ছিল। শঙ্কর রাইফেল্ হাতে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে।...

আল্‌ভারেজ বলে দিয়েছে তাকে এ বনে খুব সতর্ক হয়ে সাবধানে চলাফেরা করতে—আর বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে। আর একটা খুব মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে, সেটা এই—বনের মধ্যে বেড়াবার সময় হাতের কব্জিতে কম্পাস্ সর্ব্বদা বেঁধে নিয়ে বেড়াবে এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথের ধারে গাছপালায় কোনো চিহ্ন রেখে যাবে, যাতে ফেরবার সময় সেই সব চিহ্ন ধরে আবার ঠিক ফিরতে পারো। নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

একদিন শঙ্কর স্প্রিংবক্ হরিণের সন্ধানে গভীর বনে চলে গিয়েছে। সকালে বেরিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এক জায়গায় একটা বড় গাছের তলায় সে একটু বিশ্রামের জন্য বসল।

সেখানটাতে চারিধারেই বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির মেলা, আর সব গাছেই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে একপ্রকারের বড় বড় লতা উঠে তাদের ছোট ছোট পাতা দিয়ে এমনি নিবিড় ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে গাছগুলোকে জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রং দেখা যায় না। কাছেই একটা ছোট্ট জলার ধারে ঝাড়ে ঝাড়ে মারিপোসা লিলি ফুটে রয়েছে।

খানিকটা সেখানে বসবার পরে শঙ্করের মনে হল তার কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কি ধরনের অস্বস্তি তা সে কিছু বুঝতে পারলে না—অথচ জায়গাটা ছেড়ে উঠে যাবারও ইচ্ছে হল না—সে ক্লান্তও বটে, আর জায়গাটাও বেশ আরামেরও বটে।

কিন্তু এ তার কি হল! তার সমস্ত শরীরে এত অবসাদ কোথা থেকে এল? ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল নাকি?

অবসাদটা কাটাবার জন্যে সে পকেট হাতড়ে একটা চুরুট বার করে ধরালে। কিসের একটা মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ বাতাসে—শঙ্করের বেশ ভাল লাগছে গন্ধটা। একটু পরে দেশলাইটা মাটি থেকে কুড়িয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে মনে হল, হাতটা যেন তার নিজের নেই—যেন আর কারো হাত, তার মনের ইচ্ছায় সে হাত নড়ে না।

ক্রমে তার সর্ব্বশরীর যেন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদে অবশ হয়ে পড়তে চাইল। কি হবে আর বৃথা ভ্রমণে, আলেয়ার পিছু পিছু বৃথা ছুটে, এই রকম বনের ঘন ছায়ায় নিভৃত লতাবিতানে অলস স্বপ্নে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে সুখ আর কি আছে?

একবার তার মনে হল, এই বেলা উঠে তাঁবুতে যাওয়া যাক্, নতুবা তার কোনো একটা বিপদ ঘটবে যেন। একবার সে ওঠবার চেষ্টাও করতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তার দেহমনব্যাপী অবসাদের জয় হল। অবসাদ নয়, যেন একটা মৃদুমধুর নেশার আনন্দ। সমস্ত জগৎ তার কাছে তুচ্ছ। সে নেশাটাই তার সারাদেহ অবশ করে আনছে ক্রমশঃ।

শঙ্কর গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে ভাল করেই শুয়ে পড়ল। বড় বড় কটন্ উড্ গাছের ডালে শাখায় আলোছায়ার রেখা অস্পষ্ট, কাছেই কোথাও বন্য পেচকের ধ্বনি অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে যেন তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তারপরে কি হল শঙ্কর আর কিছু জানে না।…

আল্ভারেজ যখন বহু অনুসন্ধানের পর ওর অচৈতন্য দেহটা কটন্ উড্ জঙ্গলের ছায়ায় আবিষ্কার করলে, তখন বেলা বেশী নেই। প্রথমটা আল্ভারেজ মনে ভাবলে, এ নিশ্চয়ই সর্পাঘাত—কিন্তু দেহটা পরীক্ষা করে সর্পাঘাতের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ মাথার ওপরকার ডালপালা ও চারিধারের গাছপালার দিকে নজর পড়তেই অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী আল্ভারেজ ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে। সেখানটাতে সর্ব্বত্র অতি মারাত্মক বিষ-লতার বন (Poison Ivy), যার রসে আফ্রিকার অসভ্য মানুষেরা তীরের ফলা ডুবিয়ে নেয়।

যার বাতাস এমনি বেশ সুগন্ধ বহন করে, কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশী মাত্রায় গ্রহণ করলে, অনেক সময় পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত হ্তে পারে, মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য্য নয়।

তাঁবুতে এসে শঙ্কর দু-তিন দিন শয্যাগত হয়ে রইল। সর্ব্বশরীর ফুলে ঢোল। মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে আর সর্ব্বদাই তৃষ্ণায় গলা কাঠ। আল্‌ভারেজ বলে—যদি তোমাকে সারা রাত ওখানে থাকতে হতো—তা হলে সকালবেলা তোমাকে বাঁচানো কঠিন হতো।

একদিন একটা ঝরনার জলধারার বালুময় তীরে শঙ্কর হলদে রঙের কি দেখতে পেলে। আল্‌ভারেজ পাকা প্রস্‌পেক্টর, সে এসে বালি ধুয়ে সোনার রেণু বার করলে—কিন্তু তাতে সে বিশেষ উৎসাহিত হল না। সোনার পরিমাণ এত কম যে মজুরি পোষাবে না—এক টন বালি ধুয়ে আউন্স তিনেক সোনা পাওয়া হয়তো যেতে পারে।

শঙ্কর বললে—বসে থেকে লাভ কি, তবু যা সোনা পাওয়া যায়, তিন আউন্স সোনার দামও তো কম নয়!

সে যেটাকে অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিস বলে মনে করেছে, অভিজ্ঞ প্রস্‌পেক্টর্ আল্‌ভারেজের কাছে সেটা কিছুই নয়। তা ছাড়া শঙ্করের মজুরির ধারণার সঙ্গে আল্‌ভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না। শেষ পর্য্যন্ত ও কাজ শঙ্করকে ছেড়ে দিতে হোল।

ইতিমধ্যে ওরা মাসখানেক ধরে জঙ্গলের নানা অঞ্চলে বেড়ালে। আজ এখানে দু'দিন তাঁবু পাতে, সেখান থেকে আর এক জায়গায় উঠে যায়, সেখানে কিছুদিন তন্ন তন্ন করে চারিধার দেখবার পরে আর এক জায়গায় উঠে যায়। সেদিন অরণ্যের একটা স্থানে ওরা নতুন পৌছে তাঁবু পেতেছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে দু-একটা পাখী শিকার করে সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে এসে দেখলে, আল্‌ভারেজ বসে চুরুট টানছে, তার মুখ দেখে মনে হল সে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।

শঙ্কর বললে—আমি বলি আল্‌ভারেজ, তুমিই যখন বার করতে পারলে না, তখন চলো ফিরি।

আল্‌ভারেজ বললে—নদীটা তো উড়ে যায় নি, এই বন পর্ব্বতের কোনো না কোনো অঞ্চলে সেটা নিশ্চয়ই আছে।

—তবে আমরা বার করতে পারছি নে কেন?

—আমাদের খোঁজা ঠিকমত হচ্ছে না।

—বল কি আল্‌ভারেজ, ছ'মাস ধরে জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছি, আবার কাকে খোঁজা বলে?

আল্‌ভারেজ গম্ভীর মুখে বললে—কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েছে কোথায় জানো, শঙ্কর? তোমাকে এখনও কথাটা বলি নি, শুনলে হয়তো খুব দমে যাবে বা ভয় পাবে। আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, এসো আমার সঙ্গে।

শঙ্কর অধীর আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর পেছনে পেছনে চললো। ব্যাপারটা কি?

আল্‌ভারেজ একটু দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বললে—শঙ্কর, আমরা আজই এখানে এসে তাঁবু পেতেছি, ঠিক তো?

শঙ্কর অবাক হয়ে বললে—এ কথার মানে কি? আজই তো এখানে এসেছি না আবার কবে এসেছি?

—আচ্ছা, এই গাছের গুঁড়ির কাছে সরে এসে ছাখো তো?

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, গুঁড়ির নরম ছাল ছুরি দিয়ে খুদে কে 'D A' লিখে রেখেছে—কিন্তু লেখাটা টাট্‌কা নয়, অন্ততঃ মাসখানেকর পুরোনো।

শঙ্কর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে না। আল্‌ভারেজের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আল্‌ভারেজ বললে—বুঝতে পারলে না? এই গাছে আমিই মাসখানেক আগে আমার নামের অক্ষর দুটি খুদে রাখি। আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। তুমি তো বুঝতে পারো না, তোমার কাছে সব বনই সমান। এর মানে এখন বুঝেছ? আমরা চক্রাকারে বনের মধ্যে ঘুরছি। এসব জায়গায় যখন এরকম হয়, তখন তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বেজায় শক্ত।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝলে ব্যাপারটা। বললে—তুমি বলতে চাও মাসখানেক আগে আমরা এখানে এসেছিলাম?

—ঠিক তাই। বড় অরণ্যে বা মরুভূমিতে এই বিপদ ঘটে। একে বলে death circle, আমার মনে মাসখানেক আগে প্রথমে সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমরা death circle-এ পড়েছি। সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই গাছের ছালে ঐ অক্ষর খুদে রাখি। আজ বনের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ল।

শঙ্কর বললে—আমাদের কম্পাসের কি হল? কম্পাস থাকতে দিক্ ভুল হচ্ছে কি ভাবে রোজ রোজ?

আল্‌ভারেজ বললে—আমার মনে হয় কম্পাস খারাপ হয়ে গিয়েছে। রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্‌ পার হবার সময় সেই যে ভয়ানক ঝড় ও বিদ্যুৎ হয়, তাতেই কি ভাবে ওর চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—তা হলে আমাদের কম্পাস এখন অকেজো?

—আমার তাই ধারণা।

শঙ্কর দেখলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। ম্যাপ ভুল, কম্পাস অকেজো, তার ওপর ওরা পড়েছে এক ভীষণ দুর্গম গহনারণ্যের মাঝে বিষম মরণ ঘূর্ণিতে। জনমানুষ নেই, খাবার নেই, জলও নেই বললেই হয়, কারণ যেখানকার সেখানকার জল যখন পানের উপযুক্ত নয়। থাকার মধ্যে আছে এক ভীষণ অজ্ঞাত মৃত্যুর ভয়। জিম্ কার্টার এই অভিশপ্ত অরণ্যানীর মধ্যে রত্নের লোভে এসে প্রাণ দিয়েছিল, এখানে কারো মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না।

আল্‌ভারেজ কিন্তু দমে যাবার পাত্রই নয়। সে দিনের পর দিন চলল বনের মধ্যে দিয়ে। বনের কোনো কূলকিনারা পায় না শঙ্কর, আগে যাও বা ছিল, ঘূর্ণিপাকে তারা ঘুরছে শোনা অবধি, শঙ্করের দিক্ সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে।

দিন তিনেক পরে ওরা একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হল, সেখানে রিখ্‌টারস্‌ভেল্ডের

একটি শাখা আসল পর্ব্বতমালার সঙ্গে সমকোণ করে উত্তরদিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে। খুব কম হলেও সেটা ৪০০০ হাজার ফুট উঁচু। আরও পশ্চিমদিকে একটা খুব উঁচু পর্ব্বতচূড়া ঘন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার উপত্যকা তিন মাইল বিস্তীর্ণ হবে এবং এই উপত্যকা খুব ঘন জঙ্গলে ভরা।

বনে গাছপালার যেন তিন চারটে থাক। সকলের ওপরের থাকে শুধুই পরগাছা ও শেওলা, মাঝের থাকে ছোট বড় বনস্পতির ভিড, নীচের থাকে ঝোপঝাপ, ছোট ছোট গাছ। সূর্য্যের আলোর বালাই নেই বনের মধ্যে।

আল্‌ভারেজ বনের মধ্যে না ঢুকে বনের ধারেই তাঁবু ফেলতে বললে। সন্ধ্যার সময় ওরা কফি খেতে খেতে পরামর্শ করতে বসল যে, এখন কি করা যাবে। খাবার একদম ফুরিয়েছে, চিনি অনেকদিন থেকেই নেই, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আর দু-এক দিন পরে কফিও শেষ হবে। সামান্য কিছু ময়দা এখনও আছে—কিন্তু আর কিছুই নেই। ময়দা এই জন্যে আছে, যে ওরা ও জিনিসটা কালেভদ্রে ব্যবহার করে। ওদের প্রধান ভরসা বন্য জন্তুর মাংস কিন্তু সঙ্গে যখন ওদের গুলি-বারুদের কারখানা নেই, তখন শিকারের ভরসাই বা চিরকাল করা যায় কি করে?

কথা বলতে বলতে শঙ্কর দূরের যে পাহাড়ের চূড়াটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে, সেদিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিল। এই সময়ে অল্পক্ষণের জন্যে মেঘ সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। চূড়াটার অদ্ভুত চেহারা, যেন একটা কুলপী বরফের আগার দিকটা কে এক কামড়ে খেয়ে ফেলেছে।

আল্‌ভারেজ বললে—এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বুলাওয়েও কি সল্‌সবেরী চারশো থেকে পাচশো মাইলের মধ্যে। মধ্যে শ-দুই মাইল মরুভূমি। পশ্চিম দিকে উপকূল তিনশো মাইলের মধ্যে বটে, কিন্তু পর্টুগিজ্ পশ্চিম আফ্রিকা অতি ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে ভরা, সুতরাং সেদিকের কথা বাদ দাও। এখন আমাদের উপায় হচ্ছে, হয় তুমি নয় আমি সল্‌সবেরী কি বুলাওয়েও চলে গিয়ে টোটা ও খাবার কিনে আনি। কম্পাসও চাই।

আল্‌ভারেজের মুখের এই কথাটা বড় শুভক্ষণে শঙ্কর শুনেছিল। দৈব মানুষের জীবনে যে কত কাজ করে, তা মানুষে কি সব সময়ে বোঝে? দৈবক্রমে 'বুলাওয়েও' ও 'সল্‌সবেরী' দুটো শহরের নাম, তাদের অবস্থানের দিক ও এই জায়গাটা থেকে তাদের আনুমানিক দূরত্ব শঙ্করের কানে গেল। এর পর যে কতবার মনে মনে আল্‌ভারেজকে ধন্যবাদ দিয়েছিল, এই নাম দুটো বলবার জন্যে।

কথাবার্ত্তা সেদিন বেশী অগ্রসর হল না। দুজনেই পরিশ্রান্ত ছিল, সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করলে।

আট

মাঝ রাত্রে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। কি একটা শব্দ হচ্ছে ঘন বনের মধ্যে, কি একটা কাণ্ড কোথায় ঘটছে বনে। আল্‌ভারেজও বিছানায় উঠে বসেছে। দুজনেই কান-খাড়া করে শুনলে—বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কি হচ্ছে বাইরে?

শঙ্কর তাড়াতাড়ি টর্চ জেলে বাইরে আসছিল, আল্‌ভারেজ বারণ করলে। বললে—এসব অজানা জঙ্গলে রাত্রিবেলা ওরকম তাড়াতাড়ি তাবুর বাইরে যেও না, তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্ছ কোথায়?

তাঁবুর বাইরে রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুজনেই টর্চ ফেলে দেখলে—

বন্য জন্তুর দল গাছপালা ভেঙে ঊর্দ্ধশ্বাসে উন্মত্তের মত দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পশ্চিমের সেই ভীষণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, পূবদিকে পাহাড়টার দিকে চলেছে। হায়েনা, বেবুন, বুনো মহিষ। দুটো চিতাবাঘ তো ওদের গা ঘেঁষে ছুটে পালালো। আরও আসছে …দলে দলে আসছে…ধাড়ী ও মাদী কলোবাস্ বাঁদর দলে দলে ছানাপোনা নিয়ে ছুটেছে। সবাই যেন কোনো আকস্মিক বিপদের মুখ থেকে প্রাণের ভয়ে ছুটছে!…আর সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথায় একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে—চাপা, গম্ভীর, মেঘগর্জ্জনের মত শব্দটা—কিংবা দূরে কোথাও হাজারটা জয়ঢাক যেন একসঙ্গে বাজ্‌ছে!

ব্যাপার কি! দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলে। দুজনেই অবাক্। আল্‌ভারেজ বললে—শঙ্কর, আগুনটা ভাল করে জ্বালো—নয়তো বন্যজন্তুর দল আমাদের তাঁবুসুদ্ধ ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে।

জন্তুদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে! মাথার ওপরেও পাখীর দল বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা স্প্রিংবক্ হরিণের দল ওদের দশগজের মধ্যে এসে পড়ল।

কিন্তু ওরা দুজনে তখন এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ব্যাপার দেখে যে, এত কাছে পেয়েও গুলি করতে ভুলে গেল। এমন ধরনের দৃশ্য ওরা জীবনে কখনো দেখে নি!

শঙ্কর আল্‌ভারেজকে কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাবে, তার পরেই—প্রলয় ঘট্‌ল। অন্ততঃ শঙ্করের তো তাই বলেই মনে হলো। সমস্ত পৃথিবীটা দুলে এমন কেঁপে উঠল যে, ওরা দুজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন নিকটেই কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল—আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাট্‌লো।

আল্‌ভারেজ মাটি থেকে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে বললে—ভূমিকম্প!

কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখে বিস্মিত হল, রাত্রির অমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে, পঞ্চাশ হাজার বাতির এমন বিজ্‌লি আলো জলে উঠল কোথা থেকে!

তারপর তাদের নজর পড়ল, দূরের সেই পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু হয়েছে। রাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুন-রাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠছে পাহাড়ের চূড়ো থেকে দু-হাজার আড়াই

হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঁচুতে—সঙ্গে সঙ্গে কি বিশ্রী গন্ধকের উৎকট নিঃশ্বাস-রোধকারী গন্ধ বাতাসে!

আল্‌ভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে বলে উঠল—আগ্নেয়গিরি। সাণ্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা!

কিন্তু অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না ওরা খানিকক্ষণ। লক্ষটা তুবড়ি একসঙ্গে জলছে, লক্ষটা রঙমশালে একসঙ্গে আগুন দিয়েছে, শঙ্করের মনে হল। রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে মাঝে নীচু হয়ে যায়, হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, অমনি দপ্‌ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে। আর সেই সঙ্গে হাজারটা বোমা ফাটার আওয়াজ।

এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপছে, যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না – কেবল টলে টলে পড়তে হয়। শঙ্কর তো টলতে টলতে তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকলো—ঢুকে দেখে একটা ছোট কুকুর-ছানার মত জীব তার বিছানায় একসঙ্গে গুটিসুটি হয়ে ভয়ে কাঁপছে। শঙ্করের টর্চ্চের আলোয় সেটা থতমত খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দুটো মণির মত জলতে লাগল। আল্‌ভারেজ তাঁবুতে ঢুকে দেখে বললে—নেকড়ে বাঘের ছানা! রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েছে যখন প্রাণের ভয়ে।

ওরা কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখে নি, তা থেকে বিপদ আসতে পারে ওদের জানা নেই—কিন্তু আল্‌ভারেজের কথা ভাল করে শেষ হতে না হতে, হঠাৎ কি প্রচণ্ড ভারী জিনিসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সের ওজনের জলন্ত কয়লার মত রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের ওপর এসে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটাও জলে উঠেছে—তখন আল্‌ভারেজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে – পালাও, পালাও, শঙ্কর—তাঁবু ওঠাও—শীগ্‌গির—

ওরা তাঁবু ওঠাতে ওঠাতে আরও দু-পাঁচখানা আগুন-রাঙা জলন্ত ভারী পাথর এদিকে ওদিকে সশব্দে পড়ল। নিঃশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমনি ঘন গন্ধকের ধূম বাতাসে ছড়িয়েছে।

দৌড়···দৌড়···দৌড়। দু-ঘণ্টা ধরে ওরা জিনিসপত্র কতক টেনে হিঁচড়ে, কতক বয়ে নিয়ে পূর্বদিকের সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌছুলো। সেখানে পর্য্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে। আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করলে। ওরা পাহাড়ের ওপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর রাত্রির অন্ধকার ঠেলে। ভোর যখন হল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে পাহাড়ের ঢালুতে বড় গাছের তলায়, দুজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল।

সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের সে ভীষণ সৌন্দর্য্য অনেকখানি কমে গেল, কিন্তু শব্দ ও পাথর-পড়া যেন বাড়লো। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব মিহি ধূসরবর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়ছে···গাছপালা লতাপাতার ওপর দেখতে দেখতে পাত্‌লা একপুরু ছাই জমে গেল।

সারাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চললো—আবার রাত্রি এল। নিম্নের উপত্যকা ভূমির অত বড় হেমলক্ গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তরবর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভীষণ সৌন্দর্য্য, কতদূর পর্য্যন্ত বন ও আকাশ, কতদূরের দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে পর্ব্বতের অগ্নিকটাহের আগুনে—তখন পাথর পড়াটা একটু কেবল কমেছে। কিন্তু সেই রাঙা আগুনভরা বাষ্পের মেঘ তখনও সেই রকমই দীপ্ত হয়ে আছে।

রাত দুপুরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ওদের তন্দ্রা ছুটে গেল—ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জ্বলন্ত পাহাড়ের চূড়ার মুণ্ডটা উড়ে গিয়েছে—নীচের উপত্যকাতে ছাই, আগুন ও জ্বলন্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা দিলে। আল্‌ভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল। ওদের তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। পেছনের একটা উঁচু গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে।

শঙ্কর ভাবছিল—এই জনহীন অরণ্য অঞ্চলে এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও পেতো না, যদি তারা না থাক্‌তো। সভ্য জগৎ জানেও না আফ্রিকার গহন অরণ্যের এ আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব। কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে জ্বলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েছে। কুল্‌পী বরফটাতে ঠিক যেন কে আর একটা কামড় বসিয়েছে।

আল্‌ভারেজ ম্যাপ দেখে বললে—এটা আগ্নেয়গিরি বলে ম্যাপে দেওয়া নেই। সম্ভবত বহু বৎসর পরে এই এর প্রথম অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা খুব অর্থপূর্ণ।

শঙ্কর বললে—কি নাম?

আল্‌ভারেজ বললে—এর নাম লেখা আছে 'ওল্‌ডোনিও লেঙ্গাই'—প্রাচীন জুলু ভাষায় এর মানে 'অগ্নিদেবের শয্যা'। নামটা দেখে মনে হয়, এ অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের কাছে এ পাহাড়ের আগ্নেয়-প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। বোধ হয় তার পর দু-একশো বছর কিংবা তারও বেশীকাল এটা চুপচাপ ছিল।

ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনা-আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্রদেব, প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন, এজন্যে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা। আপনার এ রূপের কাছে শত হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।

নয়

আগ্নেয় পর্ব্বতের অত কাছে বাস করা আল্‌ভারেজ উচিত বিবেচনা করলে না। ওল্‌ডোনিও লেঙ্গাই পাহাড়ের ধূমায়িত শিখরদেশের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, তারা আরও পশ্চিম ঘেঁষে চলতে লাগল। সেদিকের গহন অরণ্যে আগুনের আঁচটিও লাগে নি, বর্ষার জলে সে অরণ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট গাছপালার ও লতাঝোপের সমাবেশে। ছোট বড় কত ঝরনাধারা ও পার্ব্বত্য নদী বয়ে চলেছে—তাদের মধ্যে একটাও আল্‌ভারেজের পূর্ব্ব-পরিচিত নয়।

এইবার এক জায়গায় ওরা এসে উপস্থিত হল, যেখানে চারিদিকেই চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট বড় পাহাড় ও প্রত্যেক পাহাড়ের গায়েই নানা আকারের গুহা। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্য রিখ্‌টারসভেল্ডের সাধারণ দৃশ্য থেকে একটু অন্যরকম। এখানে বন তত ঘন নয়, কিন্তু খুব বড় বড় গাছ চারিদিকে, আর যেখানে সেখানে পাহাড ও গুহা।

একটা উঁচু ঢিবির মত গ্রানাইটের পাহাড়ের ওপর ওরা তাঁবু ফেলে রইল। এখানে এসে পর্য্যন্ত শঙ্করের মনে হয়েছে জায়গাটা ভাল নয়। কি একটা অস্বস্তি, মনের মধ্যে কি একট আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, তা সে না পারে ভাল করে নিজে বুঝতে, না পারে আল্‌ভারেজকে বোঝাতে।

একদিন আল্‌ভারেজ বলল—সব মিথ্যে শঙ্কর, আমরা এখনও বনের মধ্যে ঘুরছি। আজ সেই গাছটা আবার দেখছি, সেই D. A. লেখা। অথচ তোমার মনে আছে, আমরা যতদূর সম্ভব পশ্চিমদিক ঘেঁষেই চলেছি আজ পনেরো দিন। কি করে আমরা আবার সেই গাছের কাছে আসতে পারি?

শঙ্কর বললে—তবে এখন কি উপায়?

—উপায় আছে। আজ রাত্রে একটা বড় গাছের মাথায় উঠে নক্ষত্র দেখে দিক্‌নির্ণয় করতে হবে। তুমি তাঁবুতে থেকো।

শঙ্কর একটা কথা বুঝতে পারছিল না। তারা যদি চক্রাকারে ঘুরছে, তবে এই অনুচ্চ শৈলমালা ও গুহার দেশে কি করে এল? এ অঞ্চলে তো কখনো আসে নি বলেই মনে হয়। আল্‌ভারেজ এর উত্তরে বললে, গাছটাতে নাম খোদাই দেখে সে আর কখনো তার পূর্ব্বে আসবার চেষ্টা করে নি। পূর্বদিকে মাইল দুই এলেই এই স্থানটাতে ওরা পৌঁছুতো।

সে রাত্রে শঙ্কর একা তাঁবুতে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ছিল। এই একখানাই বাংলা বই সে দেশ থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে, এবং বহুবার পডলেও সময় পেলেই আবার পড়ে।

কতদূরে ভারতবর্ষ, তার মধ্যে চিতোর, মেওয়ার, মোগল-রাজপুতের বিবাদ। এই অজানা মহাদেশের অজানা মহা অরণ্যানীর মধ্যে বসে সে-সব যেন অবাস্তব বলে মনে হয়।

তাঁবুর বাইরে হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শঙ্কর প্রথমটা ভাবলে, আল্‌ভারেজ গাছ থেকে নেমে ফিরে আসছে বোধ হয়—কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এ মানুষের স্বাভাবিক পায়ের শব্দ নয়, কেউ দু-পায়ে থলে জড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘষে ঘষে টেনে টেনে চললে যেন এমন ধরনের শব্দ হওয়া সম্ভব। আল্‌ভারেজের উইন্‌চেস্টার রিপিটারটা হাতের কাছেই ছিল, ও সেটা তাঁবুর দরজার দিকে বাগিয়ে বসলো। বাইরে পদশব্দটা একবার থেমে গেল—পরেই আবার তাঁবুর দক্ষিণ পাশ থেকে বাঁদিকে এল। একটা কোনো বড় প্রাণীর যেন ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল—ঠিক যেমন পর্ব্বত পার হবার সময় এক রাত্রে ঘটেছিল, ঠিক এই রকমই। শঙ্কর একটু ভয় খেয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে রাইফেল ছুঁড়ে বসলো। একবার·· দুবার—

সঙ্গে সঙ্গে মিনিট দুই পরে দূরের গাছের মাথা থেকে প্রত্যুত্তরে দুবার রিভল্‌ভারের আওয়াজ পাওয়া গেল। আল্‌ভারেজ মনে ভেবেছে, শঙ্করের কোনো বিপদ উপস্থিত, নতুবা রাত্রে খামোকা বন্দুক ছুঁড়বে কেন? বোধ হয় সে তাড়াতাড়ি নেমেই আসছে।

এদিকে চারিদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজে জানোয়ারটা বোধ হয় পালিয়েছে, আর তার সাড়াশব্দ নেই। শঙ্কর টর্চ্চ জেলে তাঁবুর বাইরে এসে ভাবলে, আল্‌ভারেজকে সঙ্কেতে গাছ থেকে নামতে বারণ করবে, এমন সময় কিছুদূরে বনের মধ্যে হঠাৎ আবার দুবার পিস্তলের আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

শঙ্কর পিস্তলের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। কিছুদূরে গিয়েই দেখলে বনের মধ্যে একটা বড় গাছের তলায় আল্‌ভারেজ শুয়ে। টর্চ্চের আলোয় তাকে দেখে শঙ্কর শিউরে উঠল ভয়ে বিস্ময়ে—তার সর্ব্বশরীর রক্তমাখা, মাথাটা বাকী শরীরের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে, গায়ের কোটটা ছিন্নভিন্ন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। ডাকলে —আল্‌ভারেজ! আল্‌ভারেজ!

আল্‌ভারেজের সাড়া নেই। তার ঠোঁট দুটো একবার যেন নড়ে উঠল, কি যেন বলতে গেল; সে শঙ্করের দিকে চেয়েই আছে, অথচ সে চোখে যেন দৃষ্টি নেই; অথবা কেমন যেন নিস্পৃহ, উদাস দৃষ্টি।

শঙ্কর ওকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে এল। মুখে জল দিল, তার পর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখে, গলার নীচে কাঁধের দিকে খানিকটা জায়গার মাংস কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। সারা পিঠটার সেই অবস্থা। কোন এক অসাধারণ বলশালী জন্তু তীক্ষ্ণধার নখে বা দন্তে পিঠখানা চিরে ফালা ফালা করেছে।

পাশেই নরম মাটিতে কোনো জন্তুর পায়ের দাগ।

তিনটে মাত্র আঙ্গুল সে পায়ে।

সারারাত্রি সেই ভাবেই কাটল, আল্‌ভারেজের সাড়া নেই, সংজ্ঞা নেই। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে এল। শঙ্করের দিকে বিস্ময়ের ও অচেনার দৃষ্টিতে

চেয়ে দেখলে, যেন এর আগে সে কখনো শঙ্করকে দেখে নি। তার পরে আবার চোখ বুজল। দুপুরের পর খুব সম্ভবতঃ নিজের মাতৃভাষায় কি সব বকতে শুরু করল, শঙ্কর এক বর্ণও বুঝতে পারলে না। বিকেলের দিকে সে হঠাৎ শঙ্করের দিকে চাইলে। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের মনে হল, সে ওকে চিনতে পেরেছে। এইবার ইংরেজীতে বললে—শঙ্কর! এখনও বসে আছ? তাঁবু ওঠাও—চল যাই—। তার পর অপ্রকৃতিস্থের মত নির্দ্দেশহীন ভঙ্গিতে হাত তুলে বললে—রাজার ঐশ্বর্য্য লুকোনো রয়েছে ঐ পাহাড়ের গুহার মধ্যে—তুমি দেখতে পাচ্ছ না—আমি দেখতে পাচ্ছি। চল আমরা যাই—তাঁবু ওঠাও—দেরি কোরো না।

এই আল্‌ভারেজের শেষ কথা।

* * * *

তার পর কতক্ষণ শঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যা হল, একটু একটু করে সমগ্র বনানী ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল।

শঙ্করের তখন চমক ভাঙ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আগে আগুন জ্বাললে, তার পর দুটো রাইফেলে টোটা ভরে, তাঁবুর দোরের দিকে বন্দুকের নল বাগিয়ে, আল্‌ভারেজের মৃতদেহের পাশে একখানা শতরঞ্চির ওপর বসে রইল।

তার পর সে রাত্রে আবার নামলো তেমনি ভীষণ বর্ষা। তাঁবুর কাপড় ফুঁড়ে জল পড়ে জিনিসপত্র ভিজে গেল। শঙ্কর তখন কিন্তু এমন হয়ে গিয়েছে যে, তার কোন দিকে দৃষ্টি নেই। এই ক'মাসে সে আল্‌ভারেজকে সত্যিই ভালবেসেছিল, তার নির্ভীকতা, তার সঙ্কল্পে অটলতা, তার পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তি, তার বীরত্ব – শঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। সে আল্‌ভারেজকে নিজের পিতার মত ভালবাসতো। আল্‌ভারেজও তাকে তেমনি স্নেহের চোখেই দেখতো।

কিন্তু এসবের চেয়েও শঙ্করের মনে হচ্ছে বেশী যে, আল্‌ভারেজ মারা গেল শেষকালে সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটারই হাতে। ঠিক জিম্ কার্টারের মতই।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তার মন ভয়ে আকুল হয়ে উঠল। সম্মুখে ভীষণ অজানা মৃত্যুদূত—ঘোর রহস্যময় তার অস্তিত্ব। কখন সে আসবে, কখন বা যাবে, কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না। ঘুমে ঢুলে না পড়ে, শঙ্কর মনের বলে জেগে বসে রইল সারা রাত।

ওঃ সে কি ভীষণ রাত্রি! যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এ রাত্রির কথা সে ভুলবে না। গাছে গাছে, ডালে ডালে, হাজারধারায় বৃষ্টি-পতনের শব্দে ও একটানা ঝড়ের শব্দে অরণ্যানীর অন্য সকল নৈশ শব্দকে আজ ডুবিয়ে দিয়েছে, পাহাড়ের ওপর বড় গাছ মড়্ মড়্ করে ভেঙে পড়ছে। এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে সে একা এই ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে! কালো গাছের গুঁড়িগুলো যেন প্রেতের মত দেখাচ্ছে, অত বড় বৃষ্টিতেও জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে। সম্মুখে বন্ধুর মৃতদেহ। ভয় পেলে চলবে না। সাহস আনতেই হবে মনে, নতুবা ভয়েই সে মারা যাবে। সাহস আনবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে রাইফেল্ দুটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে।

একটা উইন্‌চেস্টার, অপরটি ম্যান্‌লিকার—দুটোরই ম্যাগাজিনে টোটা ভর্ত্তি। এমন কোনো শরীবধারী জীব নেই, যে এই দুই শক্তিশালী অতি ভয়ানক মারণাস্ত্রকে উপেক্ষা করে আজ রাত্রে অক্ষতদেহে তাঁবুতে ঢুকতে পারে।

ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে। শঙ্কর সারারাত সজাগ পাহারা দিল। পরদিন সকালে আল্‌ভারেজের মৃতদেহ সে একটা বড় গাছের তলায় সমাধিস্থ করলে এবং দুখানা গাছের ডাল ক্রুশের আকারে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির ওপর তা পুঁতে দিলে।

আল্‌ভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপর্টো খনি-বিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা ছিল ওর নামে। তাদের শেষ পরীক্ষায় আল্‌ভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। ওর কথাবার্ত্তায় অনেক সময়ই শঙ্করের সন্দেহ হতো যে, সে নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী, ভবঘুরে নয়।

লোকালয় থেকে বহুদূরে এই জনহীন, গহন অরণ্যে ক্লান্ত আল্‌ভারেজের রত্নানুসন্ধান শেষ হল। তার মত লোকেরা রত্নের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গায় চিরকাল আট্‌কে রাখতে পারতো না।

দুঃসাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির ওপর। সিংহ, গরিলা, হায়েনা সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবারই ওপরে, সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিখ্‌টারসভেল্ড্ পর্ব্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ।

দশ

সেদিন-সে-রাত্রিও কেটে গেল। শঙ্কর এখন দুঃসাহসে মরীয়া হয়ে উঠেছে। যদি তাকে প্রাণ নিয়ে এ ভীষণ অরণ্য থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে তাকে ভয় পেলে চলবে না। দু-দিন সে কোথাও না গিয়ে তাঁবুতে বসে মন স্থির করে ভাববার চেষ্টা করলে, সে এখন কি করবে! হঠাৎ তার মনে হল, আল্‌ভারেজের সেই কথাটা—সল্‌সবেরি···এখান থেকে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে আন্দাজ পাঁচ-ছশো মাইল······

সল্‌সবেরি!···দক্ষিণ রোডেসিয়ার রাজধানী সল্‌সবেরি। যে করে হোক, পৌছুতেই হবে তাকে সল্‌সবেরিতে। সে এখনও অনেকদিন বাঁচবে, তার জন্মকোষ্ঠীতে লেখা আছে। এ জায়গায় বেঘোরে সে মরবে না।

* * * *

শঙ্কর ম্যাপগুলো খুব ভাল করে দেখলে। পর্টুগিজ গবর্নমেণ্টের ফরেস্ট্ সার্ভের ম্যাপ, ১৮৭৩ সালের রয়েল মেরিন্ সার্ভের তৈরী উপকূলের ম্যাপ, ভ্রমণকারী স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ, এ বাদে আল্‌ভারেজের হাতে আঁকা ও জিম্ কার্টারের সইযুক্ত একখানা জীর্ণ বিবর্ণ খসড়া নক্সা। আল্‌ভারেজ বেঁচে থাকতে সে এই সব ম্যাপ বুঝতে একবারও ভাল

করে চেষ্টা করে নি, এখন এগুলো বোঝার ওপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। সল্‌স্‌বেরির সোজা রাস্তা বার করতে হবে। এ স্থান থেকে তার অবস্থিতি-বিন্দুর দিক্‌ নির্ণয় করতে হবে, রিখ্‌টারস্‌ভেল্‌ড্‌ অরণ্যের এ গোলকধাঁধাঁ থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে—সবই এই ম্যাপগুলির সাহায্যে।

অনেক দেখবার শোনবার পরে ও বুঝতে পারলে এই অরণ্য পর্ব্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া নেই—এক আল্‌ভারেজের ও জিম কার্টারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া। তাও এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এত সাঙ্কেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যে, শঙ্করের পক্ষে তা প্রায় দুর্ব্বোধ্য। কারণ এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে ভাগ বসায়।

চতুর্থ দিন শঙ্কর সে-স্থান ত্যাগ করে আন্দাজ মত পূর্ব্বদিকে রওনা হল। যাবার আগে কিছু বনের ফুলের মালা গেঁথে আল্‌ভারেজের সমাধির ওপর অর্পণ করলে।

'বুশ্‌ ক্র্যাফ্‌ট্‌' বলে একটা জিনিস আছে। সুবিস্তীর্ণ, বিজন, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময়ে এ বিদ্যা জানা না থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আল্‌ভারেজের সঙ্গে এতদিন ঘোরাঘুরি করার ফলে, শঙ্কর কিছু কিছু 'বুশ্‌ ক্র্যাফ্‌ট্‌' শিখে নিয়েছিল, তবুও তার মনে সন্দেহ হল যে, এই বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে কি অর্জ্জন করেছে? শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভাল হয় বন পার হতে পারে, ভাগ্য প্রসন্ন না হয়—মৃত্যু।

দুটো তিনটে ছোট পাহাড সে পার হয়ে চলল। বন কখনো গভীর, কখনো পাতলা। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির আর শেষ নেই। শঙ্করের জানা ছিল যে, দীর্ঘ এলিফ্যাণ্ট্‌ ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে বনের প্রান্তসীমায় পৌছানো গিয়েছে। কারণ গভীর জঙ্গলে কখনো এলিফ্যাণ্ট্‌ বা টুসক্‌ ঘাস জন্মায় না। কিন্তু এলিফ্যাণ্ট্‌ ঘাসের চিহ্ন নেই কোনোদিকে—শুধুই বনস্পতি আর নীচু বনঝোপ।

প্রথম দিন শেষ হল এক নিবিড়তর অরণ্যের মধ্যে। শঙ্কর জিনিসপত্র প্রায় সবই ফেলে দিয়ে এসেছিল, কেবল আল্‌ভারেজের ম্যান্‌লিকার রাইফেলটা, অনেকগুলো টোটা, জলের বোতল, টর্চ্চ, ম্যাপগুলো, কম্পাস, ঘড়ি, একখানা কম্বল ও সামান্য কিছু ঔষধ সঙ্গে নিয়েছিল —আর নিয়েছিল একটা দড়ির দোল্‌না। তাঁবুটা যদিও খুব হাল্‌কা, কিন্তু তা সে বয়ে আনা অসম্ভব বিবেচনায় ফেলেই এসেছে।

দুটো গাছের ডালে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে সে দড়ির দোল্‌না টাঙালে এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে গাছতলায় আগুন জ্বালালে। দোল্‌নায় শুয়ে বন্দুক হাতে জেগে রইল কারণ ঘুম অসম্ভব। একে ভয়ানক মশা, তার ওপর সন্ধ্যার পর থেকেই গাছতলার কিছুদূর দিয়ে একটা চিতাবাঘ যাতায়াত শুরু করলে। গভীর অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে যেন দুটো আগুনের ভাঁটা; শঙ্কর টর্চ্চের আলো ফেলে, পালিয়ে যায়, আবার আধঘণ্টা পরে ঠিক সেই-খানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। শঙ্করের ভয় হল, ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো বা লাফ

দিয়ে দোল্নায় উঠে আক্রমণ করবে। চিতাবাঘ অতি ধূর্ত্ত জানোয়ার। কাজেই সারারাত্রি শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। তার ওপর চারিধারে নানা বন্য জন্তুর রব। একবার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল বালকবালিকার খিল্‌খিল হাসির রবে তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ও চমকে জেগে উঠল। ছেলেমেয়েরা হাসে কোথায়? এই জনমানবহীন অরণ্যে বালকবালিকাদের যাতায়াত করা বা এত রাত্রে হাসা উচিত নয় তো? পরক্ষণেই তার মনে পড়ল একজাতীয় বেবুনের ডাক ঠিক ছেলেপুলের হাসির মত শোনায়, আল্‌ভারেজ একবার গল্প করেছিল। প্রভাতে সে গাছ থেকে নেমে রওনা হল। বৈমানিকেরা যাকে বলেন 'ফ্লাইং ব্লাইণ্ড্'—সে এইভাবে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে, দু চোখ বুজে। এই দুদিন চলেই সে সম্পূর্ণভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে—আর তার উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম জ্ঞান নেই। সে বুঝলে কোনো মহারণ্যে দিক্ ঠিক রেখে চলা কি ভীষণ কঠিন ব্যাপার! তোমার চারিপাশে সব সময়েই গাছের গুঁড়ি, অগণিত, অজস্র, তার লেখাজোখা নেই। তোমার মাথার ওপর সব সময় ডালপালা লতাপাতার চন্দ্রাতপ। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্যের আলোও কম, সব সময়েই যেন গোধূলি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, ঐ একই ব্যাপার। এদিকে কম্পাস অকেজো, কি করে দিক ঠিক রাখা যায়?

* * * *

পঞ্চম দিনে একটা পাহাড়ের তলায় এসে সে বিশ্রামের জন্যে থামল। কাছেই একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখ, একটা ক্ষীণ জলস্রোত গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে এঁকে বেঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

অত বড় গুহা কখনো না দেখার দরুন, একটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই সে জিনিসপত্র বাইরে রেখে গুহার মধ্যে ঢুকলো। গুহার মুখে খানিকটা আলো—ভেতরে বড় অন্ধকার, টর্চ্চ জেলে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে, সে ক্রমশঃ এমন এক জায়গায় এসে পৌছুলো, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আর দুটো মুখ। ওপরের দিকে টর্চ্চ উঠিয়ে দেখলে, ছাদটা অনেকটা উঁচু। সাদা শক্ত নুনের মত ক্যালসিয়াম কার্ব্বোনেটের সরু মোটা ঝুরি ছাদ থেকে ঝাড়লণ্ঠনের মত ঝুলছে।

গুহার দেওয়ালগুলো ভিজে, গা বেয়ে অনেক জায়গায় জল খুব ক্ষীণধারায় ঝরে পড়ছে। শঙ্কর ডাইনের গুহায় ঢুকলো, সেটা ঢুকবার সময় সরু, কিন্তু ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে পাথর নয়, ভিজে মাটি। টর্চ্চের আলোয় ওর মনে হল, গুহাটা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের ভূমির এক কোণে আর একটা গুহামুখ। সেটা দিয়ে ঢুকে শঙ্কর দেখলে সে যেন দুধারে পাথরের উঁচু দেওয়াল-ওয়ালা একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে এসেছে। গলিটা আঁকাবাঁকা, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলেছে—শঙ্কর অনেক দূর চলে গেল গলিটা ধরে।

ঘণ্টা দুই এতে কাটলো। তার পর সে ভাবলে, এবার ফেরা যাক্। কিন্তু ফিরতে গিয়ে

সে আর কিছুতেই সেই ত্রিভূজাকৃতি গুহাটা খুঁজে পেল না। কেন, এই তো সেই গুহা থেকেই এই সরু গুহাটা বেরিয়েছে, সরু গুহা তো শেষ হয়েই গেল—তবে সে ত্রিভুজ গুহা কৈ?

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর শঙ্করের হঠাৎ কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে গুহার পথ হারিয়ে ফেলে নি তো? সর্ব্বনাশ!

সে বসে আতঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলে, ভাবলে—না, ভয় পেলে তার চলবে না। স্থির বুদ্ধি ভিন্ন এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। মনে পড়ল, আল্‌ভারেজ তাকে বলে দিয়েছিল, অপরিচিত স্থানে বেশীদূর অগ্রসর হবার সময়ে পথের পাশে সে যেন কোন চিহ্ন রেখে যায়, যাতে আবার সেই চিহ্ন ধরে ফিরতে পারে। এ উপদেশ সে ভুলে গিয়েছিল। এখন উপায়?

টর্চ্চের আলো জ্বালতে তার আর ভরসা হচ্ছে না। যদি ব্যাটারি ফুরিয়ে যায়, তবে নিরুপায়। গুহার মধ্যে অন্ধকার স্থচীভেদ্য। সেই দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পথ খুঁজে বার করা তো দূরের কথা।

সারাদিন কেটে গেল—ঘড়িতে সন্ধ্যা সাতটা। এদিকে টর্চ্চের আলো রাঙা হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ভীষণ গুমট গরম গুহার মধ্যে, তা ছাড়া পানীয় জল নেই। পাথরের দেওয়াল বেয়ে যে জল চুঁয়ে পড়ছে, তার আস্বাদ—কষা, ক্ষার, ঈষৎ লোনা। তার পরিমাণও বেশী নয়। জিব দিয়ে চেটে খেতে হয় দেওয়ালের গা থেকে।

বাইরে অন্ধকার হয়েছে নিশ্চয়ই, সাড়ে সাতটা বাজলো। আটটা, নটা, দশটা। তখনও শঙ্কর পথ হাতড়াচ্ছে—টর্চ্চের পুরোনো ব্যাটারি জ্বলছে সমানে বেলা তিনটে থেকে, এইবার সে এত ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে, শঙ্কর ভয়ে আরও উন্মাদের মত হয়ে উঠল। এই আলো যতক্ষণ, তার প্রাণের ভরসাও ততক্ষণ—নতুবা এ রৌরব নরকের মত মহা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবার কোনো আশা নেই—স্বয়ং আল্‌ভারেজও পারতো না।

টর্চ্চ নিবিয়ে ও চুপ করে একখানা পাথরের ওপর বসে রইল। এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতেও পারতো, যদি আলো থাকতো—কিন্তু অন্ধকারে সে কি করে এখন? একবার ভাবলে, রাত্রিটা কাটুক না, দেখা যাবে এখন। পরক্ষণেই মনে হল—তাতে আর কি স্থবিধে হবে? এখানে দিন রাত্রি সমান।

অন্ধকারেই সে দেওয়াল ধরে ধরে চলতে লাগলো—হায়, হায়, কেন গুহায় ঢুকবার সময় দুটো নতুন ব্যাটারি সঙ্গে নেয় নি! অন্ততঃ একটা দেশলাই!

ঘড়ি হিসেবে সকাল হল। গুহার চির অন্ধকারে আলো জ্বললো না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে ওর। বোধ হয়, এই গুহার অন্ধকারে ওর সমাধি অদৃষ্টে লেখা আছে, দিনের আলো আর দেখতে হবে না। আল্‌ভারেজের বলি গ্রহণ করে আফ্রিকার রক্ততৃষ্ণা মেটে নি, তাকেও চাই।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। শঙ্কর জুতোর স্থকতোলা চিবিয়ে খেয়েছে, একটা

আরসুলা, কি ইঁদুর, কি কাঁকড়াবিছে—কোনো জীব নেই গুহার মধ্যে যে সে ধরে খায়। মাথা ক্রমশঃ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আসছে, তার জ্ঞান নেই সে কি করছে বা তার কি ঘটছে—কেবল এইটুকু মাত্র জ্ঞান রয়েছে যে তাকে এ গুহা থেকে যে করে হোক বেরুতেই হবে, দিনের আলোর মুখ দেখতেই হবে। তাই সে অবসন্ন নির্জীব দেহেও অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়েই বেড়াচ্ছে, মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ওইরকমই হাতড়াবে।

একবার সে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে সে জেগে উঠল, তা সে জানে না; দিন, রাত্রি, ঘণ্টা, দণ্ড, পল মুছে গিয়েছে এই ঘোর অন্ধকারে। হয়তো বা তার চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে, কে জানে?

ঘুমোবার পরে সে যেন একটু বল পেল। আবার উঠল, আবার চলল, আল্‌ভারেজের শিষ্য সে, নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত-পা কোলে করে বসে কখনই মরবে না।···সে পথ খুঁজবে, খুঁজবে, যতক্ষণ বেঁচে আছে।

আশ্চর্য্য, সে নদীটাই বা কোথায় গেল?···গুহার মধ্যে গোলকধাঁধাঁয় ঘোরবার সময়ে জলধারাকে সে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। নদী দেখতে পেলে হয়তো উদ্ধার পাওয়াও যেতে পারে, কারণ তার এক মুখ যেদিকেই থাক্, একটা মুখ আছে গুহার বাইরে। কিন্তু নদী তো দূরের কথা, একটা অতি ক্ষীণ জলধারার সঙ্গেও আজ তিন দিন পরিচয় নেই। জল অভাবে শঙ্কর মরতে বসেছে, কষা, লোনা, বিস্বাদ জল চেটে চেটে তার জিব ফুলে উঠেছে, তৃষ্ণা তাতে বেড়েছে ছাড়া কমে নি।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে শঙ্কর খুঁজতে লাগল, ভিজে দেওয়ালের গায়ে কোথাও শেওলা জন্মেছে কি না—খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। না, তাও নেই! পাথরের দেওয়াল সর্ব্বত্র অনাবৃত—মাঝে মাঝে ক্যাল্‌সিয়াম্ কার্ব্বোনেটের পাতলা সর পড়েছে। একটা ব্যাঙের ছাতা, কি শেওলাজাতীয় উদ্ভিদও নেই। সূর্য্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে বাঁচতে পারে না।

আরও একদিন কেটে রাত এল। এত ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে বলে তো বোধ হয় না। ওর মনে হতাশা ঘনিয়ে এসেছে। আরও সে কি চলবে, কতক্ষণ চলবে? এতে কোনো ফল নেই, এ চলার শেষ নেই। কোথায় সে চলেছে এই গাঢ় নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে, এই ভয়ানক নিস্তব্ধতার মধ্যে! উঃ, কি ভয়ানক অন্ধকার, আর কি ভয়ানক নিস্তব্ধতা! পৃথিবী যেন মরে গিয়েছে, সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য্য নিভে গিয়েছে, সেই মৃত পৃথিবীর জনহীন, শব্দহীন, সময়হীন শ্মশানে সে-ই একমাত্র প্রাণী বেঁচে আছে।

আর বেশীক্ষণ এ-রকম থাকলে সে ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

এগারো

শঙ্কর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ হয়, কিম্বা হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে থাকবে। মোটের ওপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ঘড়িতে বারোটা—সম্ভবতঃ রাত বারোটাই হবে। ও উঠে আবার চলতে শুরু করলে। এক জায়গায় তার সামনে একটা পাথরের দেওয়াল পড়ল—তার রাস্তা যেন আট্‌কে রেখেছে। টর্চ্চের রাঙা আলো একটিবার মাত্র জ্বালিয়ে সে দেখলে, যে দেওয়াল ধরে সে এতক্ষণ যাচ্ছিল, তারই সঙ্গে সমকোণ করে এ দেওয়ালটা আড়াআড়ি ভাবে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সে কান খাড়া করলে · অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষীণ জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?

হ্যাঁ···ঠিক, জলের শব্দই বটে···কুলু, কুলু, কুলু, কুলু—ঝরনা-ধারার শব্দ—যেন পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে বেধে জল বইছে কোথাও। ভাল করে শুনে ওর মনে হল, জলের শব্দটা হচ্ছে এই পাথরের দেওয়ালের ওপারে। দেওয়ালে কান পেতে শুনে ওর সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। দেওয়াল ফুঁড়ে যাবার উপযুক্ত ফাঁক আছে কিনা, টর্চ্চের রাঙা আলোয় সন্ধান করতে করতে এক জায়গায় খুব নীচু ও সংকীর্ণ প্রাকৃতিক রন্ধ্র দেখতে পেলে। সেখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা গিয়ে হাতে জল ঠেক্‌লো। সন্তর্পণে ওপরের দিকে হাত দিয়ে বুঝলো, সেখানটাতে দাঁড়ানো যেতে পারে। দাঁড়িয়ে উঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা যেতেই, স্রোতযুক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবে গেল।···

ঘন অন্ধকারের মধ্যেই নীচু হয়ে, ও প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা জল পান করে নিলে। তার পর টর্চ্চের ক্ষীণ আলোয় জলের স্রোতের গতি লক্ষ্য করলে। এ ধরনের নির্ঝরের স্রোতের উজান দিকে গুহার মুখ সাধারণতঃ হয় না। টর্চ্চ নিবিয়ে সেই মহা নিবিড় অন্ধকারে পায়ে পায়ে জলের ধারা অনুভব করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে চললো। নির্ঝর চলেছে এঁকে বেঁকে, কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। এক জায়গায় যেন সেটা তিন-চারটে ছোট বড় ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক চলে গিয়েছে, ওর মনে হল।

সেখানে এসে সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। টর্চ্চ জেলে দেখলে স্রোত নানামুখী। আল্‌ভারেজের কথা মনে পড়ল, পথে চিহ্ন রেখে না গেলে, এখানে আবার গোল পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

নীচু হয়ে চিহ্ন রেখে যাওয়ার উপযোগী কিছু খুঁজতে গিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ, নির্মল জলধারায় এপারে ওপারে দুপারেই এক ধরনের পাথরের নুড়ি বিস্তর পড়ে আছে। সেই ধরনের পাথরের নুড়ির ওপর দিয়েও প্রধান জলধারা বয়ে চলেছে।

অনেকগুলো নুড়ি পকেটে নিয়ে, সে প্রত্যেক শাখাটা শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করবে ভেবে, দুটো নুড়ি ধারার পাশে রাখতে রাখতে গেল। একটা স্রোত থেকে খানিকদূর গিয়ে আবার

অনেকগুলো ফেক্‌ড়ি বেরিয়েছে। প্রত্যেক সংযোগ-স্থলে ও নুড়ি সাজিয়ে একটা 'S' অক্ষর তৈরী করে রাখলে।

অনেকগুলো স্রোতশাখা আবার ঘুরে শঙ্কর যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকেই যেন ঘুরে গেল। পথে চিহ্ন না রেখে গিয়েই শঙ্করের মাথা গোলমাল হয়ে যাবার যোগাড় হল। একবার শঙ্করের পায়ে খুব ঠাণ্ডা কি ঠেকতেই, সে আলো জ্বেলে দেখলে, জলের ধারে এক প্রকাণ্ডকায় অজগর পাইথন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পাইথন ওর স্পর্শে আলস্য পরিত্যাগ করে মাথাটা উঠিয়ে কড়ির দানার মত চোখে চাইতেই টর্চ্চের আলোয় দিশাহারা হয়ে গেল—নতুবা শঙ্করের প্রাণ-সংশয় হয়ে উঠতো। শঙ্কর জানে অজগর সর্প অতি ভয়ানক জন্তু —বাঘ সিংহের মুখ থেকেও হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, অজগর সর্পের নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। একটিবার লেজ ছুঁড়ে পা জড়িয়ে ধরলে আর দেখতে হতো না।

এবার অন্ধকারে চলতে ওর ভয়ানক ভয় করছিল। কি জানি, আবার কোথায় কোন্ পাইথন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে! দুটো তিনটে স্রোতশাখা পরীক্ষা করে দেখবার পরে ও তার কৃত চিহ্নের সাহায্যে পুনরায় সংযোগস্থলে ফিরে এল। প্রধান সংযোগস্থলে ও নুড়ি দিয়ে একটা ক্রুশচিহ্ন করে রেখে গিয়েছিল। এবার ওরই মধ্যে যেটাকে প্রধান বলে মনে হল, সেটা ধরে চলতে গিয়ে দেখলে সেও সোজামুখে যায় নি। তারও নানা ফেক্‌ড়ি বেরিয়েছে কিছুদূরে গিয়েই। এক-এক জায়গায় গুহার ছাদ এত নীচু হয়ে নেমে এসেছে যে কুঁজো হয়ে, কোথাও বা মাজা দুমড়ে, অশীতিপর বৃদ্ধের ভঙ্গিতে চলতে হয়।

হঠাৎ এক জায়গায় টর্চ্চ জ্বেলে সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও শঙ্কর বুঝতে পারলে, গুহাটা সেখানে ত্রিভুজাকৃতি—সেই ত্রিভুজ গুহা, যাকে খুঁজে বার না করতে পেরে, মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল। একটু পরেই দেখলে বহুদূরে যেন অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি নক্ষত্র জ্বলছে। গুহার মুখ! এবার আর ভয় নেই। এ-যাত্রার মত সে বেঁচে গেল।

*　　*　　*　　*

শঙ্কর যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন রাত তিনটে। সেখানটায় গাছপালা কিছু কম, মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ দেখা যায়। রৌরবের মহা অন্ধকার থেকে বার হয়ে এসে রাত্রির নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ অন্ধকার তার কাছে দীপালোকখচিত নগরপথের মত মনে হল। প্রাণভরে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে, এ অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্যে।

ভোর হল। সূর্য্যের আলো গাছের ডালে ডালে ফুট্‌লো। শঙ্কর ভাবলে এ অমঙ্গলজনক স্থানে আর একদণ্ডও সে থাকবে না। পকেটে একখানা পাথরের নুড়ি তখনও ছিল, ফেলে না দিয়ে গুহার বিপদের স্মারক স্বরূপ সেখানা সে কাছে রেখে দিলে।

পরদিন এলিফ্যাণ্ট্ ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে, সেদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিল। রাত্রে শঙ্কর অনেকক্ষণ বসে ম্যাপ দেখলে। সামনে যে মুক্ত প্রান্তরবৎ দেশ পড়ল, এখান থেকে সেটা প্রায় তিনশো মাইল বিস্তৃত, একেবারে জাম্বেসী

নদীর তীর পর্য্যন্ত। এই তিনশো মাইলের খানিকটা পড়েছে বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে, প্রায় ১৭৫ মাইল, অতি ভীষণ, জনমানবহীন, জলহীন, পথহীন মরুভূমি। মিলিটারি ম্যাপ থেকে আল্‌ভারেজ নোট করেছে যে, এই অঞ্চলের উত্তরপূর্ব্ব কোণ লক্ষ্য করে একটি বিশেষ পথ ধরে না গেলে, মাঝামাঝি পার হতে যাওয়াব মানেই মৃত্যু। ম্যাপে এর নাম দিয়েছে 'তৃষ্ণার দেশ' (Thirstland Trek)। রোডেসিয়া পৌছুতে পারলে যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সে-সব স্থানে মানুষ আছে।

শঙ্কর এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলে। পথের এই ভয়ানক অবস্থা জেনে-শুনেও সে দমে গেল না, হাত-পা-হারা হয়ে পড়ল না। এই পথে আল্‌ভারেজ একা গিয়ে সল্‌স্‌বেরি থেকে টোটা ও খাবার কিনে আনবে বলেছিল। বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ যা পারবে বলে স্থির করেছিল, সে তা থেকে পিছিয়ে যাবে?

কিন্তু সাহস ও নির্ভীকতা এক জিনিস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ম্যাপ দেখে গন্তব্যস্থানের দিক্ নির্ণয় করার ক্ষমতা শঙ্করের ছিল না। সে দেখলে ম্যাপের সে কিছুই বোঝে না। মিলিটারি ম্যাপগুলোতে দুটো মরুমধ্যস্থ কূপের অবস্থান-স্থানের ল্যাটিচিউড্ লঙ্গিচিউড্ দেওয়া আছে, 'ম্যাগ্‌নেটিক্ নর্থ' আর 'ট্রু নর্থ' ঘটিত কি একটা গোলমেলে অঙ্ক কষে বার করতো আল্‌ভারেজ, শঙ্কর দেখেছে কিন্তু শিখে নেয় নি।

সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই শঙ্কর এই দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হল। ফলে, দুদিন যেতে না যেতেই শঙ্কর সম্পূর্ণ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ম্যাপ-দৃষ্টে যে কোনো অভিজ্ঞ লোক যে জলাশয় চোখ বুজে খুঁজে বার করতে পারতো—শঙ্কর তার তিন মাইল উত্তর দিয়ে চলে গেল, অথচ তখন তার জল ফুরিয়ে এসেছে, নতুন পানীয় জল সংগ্রহ করে না নিলে জীবন বিপদাপন্ন হবে।

প্রথমতঃ শুধু প্রান্তর আর পাহাড়, ক্যাক্‌টাস্ ও ইউফোবিয়ার বন, মাঝে মাঝে গ্রানাইটের স্তূপ। তার পর কি ভীষণ কষ্টের সে পথ-চলা! খাদ্য নেই, জল নেই, পথ ঠিক নেই, মানুষের মুখ দেখা নেই। দিনের পর দিন শুধু সুদূর, শূন্য-দিগ্বলয় লক্ষ্য করে সে হতাশ পথ-যাত্রা—মাথার ওপর আগুনের মত সূর্য্য, পায়ের নীচে বালি পাথর যেন জলন্ত অঙ্গার, সূর্য্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে—নক্ষত্র উঠছে, চাঁদ উঠছে—আবার অস্ত যাচ্ছে। মরুভূমির গিরগিটি একঘেয়ে সুরে ডাকছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে—সন্ধ্যায়, গভীর নিশীথে।

মাইল-লেখা পাথর নেই, কত মাইল অতিক্রম করা হল তার হিসেব নেই। খাদ্য দু-একটা পাখী, কখনো বা মরুভূমির বুজার্ড শকুনি, যার মাংস জঠর ও বিস্বাদ। এমন কি একদিন একটা পাহাড়ী বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে, যার দংশনে মৃত্যু—তাও যেন পরম সুখাদ্য, মিললে মহা সৌভাগ্য।

দুদিন ঘোর তৃষ্ণায় কষ্ট পাবার পরে পাহাড়ের ফাটলে একটা জলাশয় পাওয়া গেল। কিন্তু জলের চেহারা লাল, কতকগুলো কি পোকা ভাসছে জলে—ডাঙায় একটা কি জন্তু মরে পচে ঢোল হয়ে আছে। সেই জলই আকণ্ঠ পান করে শঙ্কর প্রাণ বাঁচালে।

দিনের পর দিন কাটছে—মাস গেল, কি সপ্তাহ গেল, কি বছর গেল, হিসেব নেই। শঙ্কর রোগা হয়ে গিয়েছে শুকিয়ে। কোথায় চলেছে তার কিছু ঠিক নেই—শুধু সামনের দিকে যেতে হবে এই জানে। সামনের দিকেই ভারতবর্ষ—বাংলা দেশ।

তার পর পড়ল আসল মরু, কালাহারি মরুভূমির এক অংশ। দূর থেকে তার চেহারা দেখে শঙ্কর ভয়ে শিউরে উঠলো। মানুষ কি করে পার হতে পারে এই অগ্নিদগ্ধ প্রান্তর! শুধুই বালির পাহাড়, তাম্রাভ কটা বালির সমুদ্র। ধূ-ধূ করে যেন জলছে দুপুরের রোদে। মরুর কিনারায় প্রথম দিনেই ছায়ায় ১২৭ ডিগ্রী উত্তাপ উঠল থার্মোমিটারে।

ম্যাপে বার বার লিখে দিয়েছে, উত্তর-পূর্ব্ব কোণ ঘেঁষে ছাড়া কেউ এই মরুভূমি মাঝামাঝি পার হতে যাবে না। গেলেই মৃত্যু, কারণ সেখানে জল একদম নেই। জল যে উত্তরপূর্ব্ব ধারে আছে তাও নয়, তবে ত্রিশ মাইল, সত্তর মাইল ও নব্বুই মাইল ব্যবধানে তিনটি স্বাভাবিক উণুই আছে—যাতে জল পাওয়া যায়, ঐ উণুইগুলি প্রায়ই পাহাড়ের ফাটলে, খুঁজে বার করা বড়ই কঠিন। এইজন্যে মিলিটারি ম্যাপে ওদের অবস্থান স্থানের অক্ষ ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে।

শঙ্কর ভাবলে, ওসব বার করতে পারবো না। সেক্সটাণ্ট্ আছে, নক্ষত্রের চার্ট আছে কিন্তু তাদের ব্যবহার সে জানে না। যা হয় হবে, ভগবান ভরসা। তবে যতদূর সম্ভব উত্তর-পূর্ব্ব কোণ ঘেঁষে যাবার চেষ্টা সে করলে।

তৃতীয় দিনে নিতান্ত দৈববলে সে একটা উণুই দেখতে পেল। জল কাদাগোলা, আগুনের মত গরম, কিন্তু তাই তখন অমৃতের মত দুর্লভ। মরুভূমি ক্রমে ঘোরতর হয়ে উঠল। কোন প্রকার জীবের বা উদ্ভিদের চিহ্ন ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে গেল। আগে রাত্রে আলো জাললে দু-একটা কীটপতঙ্গ আলোয় আকৃষ্ট হয়ে আসতো, ক্রমে তাও আর আসে না।

দিনে উত্তাপ যেমন ভীষণ, রাত্রে তেমনি শীত। শেষ রাত্রে শীতে হাত-পা জমে যায় এমন অবস্থা, অথচ ক্রমশঃ আগুন জালাবার উপায় গেল, কারণ জালানি কাঠ একেবারেই নেই। কয়েক দিনের মধ্যে সঞ্চিত জল গেল ফুরিয়ে। সে সুবিস্তীর্ণ বালুকা-সমুদ্রে একটি পরিচিত বালুকণা খুঁজে বার করা যতদূর অসম্ভব, তার চেয়ে অসম্ভব ক্ষুদ্র এক হাত-দুই ব্যাসবিশিষ্ট জলের উণুই বার করা।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণার কষ্টে শঙ্কর উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। এতক্ষণে শঙ্কর বুঝেছে যে, এ ভীষণ মরুভূমি একা পার হওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার শামিল। সে এমন জায়গায় এসে পড়েছে, যেখান থেকে ফেরবার উপায়ও নেই।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির ওপর উঠে সে দেখলে, চারিধারে শুধুই কটা বালির পাহাড়, পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমে সূর্য্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ সূর্য্যাস্তের আভায় লাল। কিছুদূরে একটা ছোট ঢিবির মত পাহাড় এবং দূর থেকে মনে হল একটা গুহাও আছে। এ ধরনের গ্রানাইটের ছোট ঢিবি এদেশে সর্ব্বত্র—ট্রান্সভাল ও রোডেসিয়ায়

এদের নাম 'Kopje' অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। রাত্রে শীতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে শঙ্কর সেই গুহায় আশ্রয় নিলে।

এইখানে এক ব্যাপার ঘটল।

বারো

গুহার মধ্যে ঢুকে শঙ্কর টর্চ জেলে (নতুন ব্যাটারি তার কাছে তখনও ডজন-দুই ছিল) দেখলে গুহাটা ছোট, মেঝেটাতে ছোট ছোট পাথর ছড়ানো, বেশ একটা ছোটখাটো ঘরের মত। গুহার এক কোণে ওর চোখ পড়তেই অবাক হয়ে রইল। একটা ছোট কাঠের পিপে! এখানে কি করে এল কাঠের পিপে!

এগিয়ে দু-পা গিয়েই চমকে উঠল। গুহার দেওয়ালের ধার ঘেঁসে শায়িত অবস্থায় একটা সাদা নরকঙ্কাল, তার মুণ্ডটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো। কঙ্কালের আশে-পাশে কালো কালো থলে-ছেঁড়ার মত জিনিস, বোধ হয় সেগুলো পশমের কোটের অংশ। দুখানা বুট জুতো কঙ্কালের পায়ে এখনও লাগানো। একপাশে একটা মরচে-পড়া বন্দুক।

পিপেটার পাশে একটা ছিপি-আঁটা বোতল। বোতলের মধ্যে একখানা কাগজ। ছিপিটা খুলে কাগজখানা বার করে দেখলে, তাতে ইংরিজিতে কি লেখা আছে।

পিপেটাতে কি আছে দেখবার জন্যে যেমন সে সেটা নাড়াতে গিয়েছে, অমনি পিপের নীচে থেকে একটা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনে ওর শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু হয়ে ঠেলে উঠল। বোধ হয়, ছোবল মারবার আগে সাপটা এক সেকেণ্ড দেরি করেছিল। সেই এক সেকেণ্ডের দেরি করার জন্যে শঙ্করের প্রাণ রক্ষা হল। পরমুহূর্তেই শঙ্করের '৪৫ অটোমেটিক কোল্ট্ গর্জ্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অতবড় ভীষণ বিষধর 'স্যাণ্ড্ ভাইপার'-এর মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে, রক্ত-মাংস খানিকটা পিপের গায়ে, খানিকটা পাথরের দেওয়ালে ছিটকে লাগল। আল্‌ভারেজ ওকে শিখিয়েছিল, পথে সর্ব্বদা হাতিয়ার তৈরী রাখবে। এ উপদেশ অনেকবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

অদ্ভুত পরিত্রাণ। সব দিক থেকে। পিপেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাতে অল্প একটু জল তখনও আছে। খুব কালো শিউ গোলার মত রং বটে, তবুও জল। ছোট পিপেটা উঁচু করে ধরে, পিপের ছিপি খুলে ঢক্ ঢক্ করে শঙ্কর সেই দুর্গন্ধ কালো কালির মত জল আকণ্ঠ পান করলে। তারপর সে টর্চ্চের আলোতে সাপটা পরীক্ষা করলে। পুরো পাঁচ হাত লম্বা সাপটা, মোটাও বেশ। এ ধরনের সাপ মরুভূমির বালির মধ্যে লুকিয়ে শুধু মুণ্ডটা ওপরে তুলে থাকে—অতি মারাত্মক রকমের বিষাক্ত সর্প!

এইবার বোতলের মধ্যের কাগজখানা খুলে মন দিয়ে পড়লে। যে ছোট পেন্সিল দিয়ে

এটা লেখা হয়েছে—বোতলের মধ্যে সেটাও পাওয়া গেল। কাগজখানাতে লেখা আছে ··

"আমার মৃত্যু নিকট। আজই আমার শেষ রাত্রি। যদি আমার মরণের পরে, কেউ এই ভয়ঙ্কর মরুভূমির পথে যেতে যেতে এই গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে সম্ভবতঃ এই কাগজ তাঁর হাতে পড়বে।

আমার গাধাটা দিন দুই আগে মরুভূমির মধ্যে মারা গিয়েছে। এক পিপে জল তার পিঠে ছিল, সেটা আমি এই গুহার মধ্যে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি, যদিও জ্বরে আমার শরীর অবসন্ন। মাথা তুলবার শক্তি নেই। তার ওপর অনাহারে শরীর আগের থেকেই দুর্ব্বল!

আমার বয়স ২৬ বৎসর। আমার নাম আত্তিলিও গাত্তি। ফ্লোরেন্সের গাত্তি বংশে আমার জন্ম। বিখ্যাত নাবিক রিওলিনো কাভালকান্তি গাত্তি—যিনি লেপাণ্টোর যুদ্ধে তুর্কীদের সঙ্গে লড়েছিলেন, তিনি আমার একজন পূর্ব্বপুরুষ।

রোম ও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভবঘুরে হয়ে গেলাম সমুদ্রের নেশায়,—যা আমাদের বংশগত নেশা।

ডাচ্ ইণ্ডিজ যাবার পথে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ-ডুবি হল।

আমরা সাতজন লোক অতিকষ্টে ডাঙা পেলাম। ঘোর জঙ্গলময় অঞ্চল আফ্রিকার এই পশ্চিম উপকূল! জঙ্গলের মধ্যে শেফুজাতির এক গ্রামে আমরা আশ্রয় নিই এবং প্রায় দু-মাস সেখানে থাকি। এখানেই দৈবাৎ এক অদ্ভুত হীরার খনির গল্প শুনলাম। পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত ও ভীষণ আরণ্য অঞ্চলে নাকি এই হীরার খনি অবস্থিত।

আমরা সাতজন ঠিক করলাম এই হীরার খনি যে করে হোক, বার করতে হবেই। আমাকে ওরা দলের অধিনায়ক করলে—তারপর আমরা দুর্গম জঙ্গল ঠেলে চললাম সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পার্ব্বত্য অঞ্চলে। সে গ্রামের কোন লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হল না। তারা বলে, তারা কখনও সে জায়গায় যায় নি, কোথায় তা জানে না, বিশেষতঃ এক উপদেবতা নাকি সে বনের রক্ষক। সেখান থেকে হীরা নিয়ে কেউ আসতে পারবে না।

আমরা দমবার পাত্র নই। পথে যেতে যেতে ঘোর কষ্টে বেঘোরে দুজন সঙ্গী মারা গেল। বাকী চারজন আর অগ্রসর হতে চায় না। আমি দলের অধ্যক্ষ, গাত্তি বংশে আমার জন্ম, পিছু হটতে জানি না। যতক্ষণ প্রাণ আছে, এগিয়ে যেতে হবে এই জানি। আমি ফিরতে চাইলাম না।

শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। আজ রাত্রেই আসবে সে নিরবয়ব মৃত্যুদূত। বড় সুন্দর আমাদের ছোট্ট হ্রদ সেরিনো লাগ্রানো, ওরই তীরে আমার পৈতৃক প্রাসাদ, কাস্টোলি রিওলিনি। এতদূর থেকেও আমি সেরিনো লাগ্রানোর তীরবর্তী কমলালেবুর বাগানের লেবুফুলের সুগন্ধ পাচ্ছি। ছোট যে গির্জ্জাটি পাহাড়ের নীচেই, তার রূপোর ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ পাচ্ছি।

না, এসব কি আবোল-তাবোল লিখছি জ্বরের ঘোরে! আসল কথাটা বলি। কতক্ষণই বা আর লিখবো?

আমরা সে পর্ব্বতমালা, সে মহাদুর্গম অরণ্যে গিয়েছিলাম। সে খনি বার করেছিলাম। যে নদীর তীরে হীরা পাওয়া যায়, এক বিশাল ও অতি ভয়ানক গুহার মধ্যে সে নদীর উৎপত্তি স্থান। আমি সেই গুহার মধ্যে ঢুকে এবং নদীর জলের তীরে ও জলের মধ্যে পাথরের নুড়ির মত অজস্র হীরা ছড়ানো দেখতে পাই। প্রত্যেক নুড়িটি টেট্রাহেড্রন ক্রিস্ট্যাল, স্বচ্ছ ও হরিদ্রাভ ; লণ্ডন ও আমস্টার্ডামের বাজারে এমন হীরা নেই।

এই অরণ্য ও পর্ব্বতের সে উপদেবতাকে আমি এই গুহার মধ্যে দেখেছি—ধুনোর কাঠের মশালের আলোয়, দূর থেকে আবছায়া ভাবে। সত্যিই ভীষণ তার চেহারা। জ্বলন্ত মশাল হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে ঘেঁষে নি। এই গুহাতেই সে সম্ভবতঃ বাস করে। হীরার খনির সে রক্ষক, এই প্রবাদের সৃষ্টি সেই জন্যেই বোধ হয় হয়েছে।

কিন্তু কি কুক্ষণেই হীরার সন্ধান পেয়েছিলাম এবং কি কুক্ষণেই সঙ্গীদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম। ওদের নিয়ে আবার যখন সে গুহায় ঢুকি, হীরার খনি খুঁজে পেলাম না। একে ঘোর অন্ধকার, মশালের আলোয় সে অন্ধকার দূর হয় না, তার ওপরে বহুমুখী নদী, কোন্ স্রোতটার ধারা হীরার রাশির ওপর দিয়ে বইছে, কিছুতেই বার করতে পারলাম না আর।

আমার সঙ্গীরা বর্ব্বর, জাহাজের খালাসী। ভাবলে, ওদের ফাঁকি দিলাম বুঝি। আমি একা নেবো এই বুঝি আমার মতলব। ওরা কি ষড়যন্ত্র আঁটলে জানি নে, পরদিন সন্ধ্যাবেলা চারজনে মিলে অতর্কিতে ছুরি খুলে আমায় আক্রমণ করলে। কিন্তু তারা জানতো না আমাকে, আত্তিলিও গাত্তিকে। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বইছে, আমার পূর্ব্বপুরুষ রিওলিনি কাভালকান্তি গাত্তির—যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে ওরকম বহু বর্ব্বরকে নরকে পাঠিয়েছিলেন। সাণ্টা কাটালিনার সামরিক বিদ্যালয়ে যখন আমি ছাত্র, আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ Fencer এণ্টোনিও ড্রেফুসকে ছোরার ডুয়েলে জখম করি। আমার ছোরার আঘাতে ওরা দুজন মরে গেল, দুজন সাংঘাতিক ঘায়েল হল, নিজেও আমি চোট পেলাম ওদের হাতে। আহত বদমাইশ দুটোও সেই রাত্রেই ভবলীলা শেষ করল। ভেবে দেখলাম এখন এই গুহার গোলকধাঁধার ভেতর থেকে খনি খুঁজে হয়তো বার করতে পারবো না। তা ছাড়া আমি সাংঘাতিক আহত, আমায় সভ্যজগতে পৌছুতেই হবে। পূর্ব্বদিকের পথে ডাচ্ উপনিবেশে পৌছবো বলে রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এসে আর অগ্রসর হতে পারলুম না। ওরা তলপেটে ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে। সেই সঙ্গে জ্বর। মানুষের কি লোভ তাই ভাবি। কেন ওরা আমাকে মারলে? ওরা আমার সঙ্গী, একবারও তো ওদের ফাঁকি দেওয়ার কথা আমার মনে আসে নি!

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হীরকখনির মালিক আমি, কারণ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেছি। যিনি আমার এ লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই সভ্য মানুষ ও খ্রীস্টান। তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, আমাকে তিনি যেন খ্রীস্টানের উপযুক্ত কবর দেন। এই অনুগ্রহের বদলে ঐ খনির স্বত্ব আমি তাঁকে দিলাম। রাণী শেবার ধনভাণ্ডারও এ খনির কাছে কিছু নয়।

প্রাণ গেল, যাক্, কি করবো? কিন্তু কি ভয়ানক মরুভূমি এ! একটা ঝিঁঝিঁ পোকার

ডাক পর্য্যন্ত নেই কোনদিকে ! এমন সব জায়গাও থাকে পৃথিবীতে ! আমার আজ কেবলই মনে হচ্ছে, পপ্‌লার ঘেরা সেরিনো লাগ্রানো হ্রদ আর দেখবো না, তার ধারে যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গির্জ্জাটা, তার সেই বড় রূপোর ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনি, পাহাড়ের ওপরে আমাদের যে প্রাচীন প্রাসাদ কাস্টোলি রিওলিনি, মুরদের দুর্গের মত দেখায়···দূরে আম্‌ব্রিয়ার সবুজ মাঠ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট ডোরা নদী বয়ে যাচ্ছে···যাক্, আবার কি প্রলাপ বকছি !

গুহার দুয়ারে বসে আকাশের অগণিত তারা প্রাণভরে দেখছি শেষ বারের জন্যে।···সাধু ফ্রান্সিসের সেই সৌর স্তোত্র মনে পড়ছে—স্তুত হোন প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থির বায়ু তরে, ভগিনী মেদিনী তরে, নীল মেঘ তরে, আকাশের তরে, তারকা-সমূহ তঁরে, সুদিন-কুদিন তরে, দেহের মরণ তরে।

আর একটা কথা। আমার দুই পায়ের জুতোর মধ্যে পাঁচখানা বড় হীরা লুকানো আছে, তোমায় তা দিলাম হে অজানা পথিক বন্ধু। আমার শেষ অনুরোধটি ভুলো না। জননী মেরী তোমার মঙ্গল করুন।

কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গাত্তি

১৮৮০ সাল। সম্ভবতঃ মার্চ্চ মাস।"

* * * *

হতভাগ্য যুবক !

তার মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর চলে গিয়েছে, এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ পথে হয়তো কেউ যায় নি, গেলেও গুহাটার মধ্যে ঢোকে নি। এতকাল পরে তার চিঠিখানা মানুষের হাতে পড়ল।

আশ্চর্য্য এই যে কাঠের পিপেটাতে ত্রিশ বছর পরেও জল ছিল কি করে ?

কিন্তু কাগজখানা পড়েই শঙ্করের মনে হল, এই লেখায় বর্ণিত ঐটেই সেই গুহা—সে নিজে যেখানে পথ হারিয়ে মারা যেতে বসেছিল ! তার পরে সে কৌতূহলের সঙ্গে কঙ্কালের পায়ের জুতো টান দিয়ে খসাতেই পাঁচখানা বড় বড় পাথর বেরিয়ে পড়ল। এ অবিকল সেই পাথরের নুড়ির মত, যা এক-পকেট কুড়িয়ে অন্ধকারে, গুহার মধ্যে সে পথে চিহ্ন করেছিল এবং যার একখানা তার কাছে রয়েছে। এ পাথরের নুড়ি তো রাশি রাশি সে দেখেছে গুহার মধ্যের সেই অন্ধকারময়ী নদীর জলস্রোতের নীচে, তার দুই তীরে ! কে জানতো যে হীরার খনি খুঁজতে সে ও আল্‌ভারেজ সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার হয়ে এসে, ছ'মাস ধরে রিখটারস্‌ভেল্ড পার্ব্বত্য অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গিয়েছে—এমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সেখানে গিয়ে পড়বে ! হীরা যে এমন রাশি রাশি পড়ে থাকে পাথরের নুড়ির মত—তাই বা কে ভেবেছিল ! আগে এসব জানা থাক্‌লে, পাথরের নুড়ি সে দু-পকেট ভরে কুড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসতো !

কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ হয়ে গিয়েছে যে, সে রত্নখনির গুহা যে কোথায়, কোন

দিকে তার কোনো নক্সা করে আনে নি বা সেখানে কোনো চিহ্ন রেখে আসেনি, যাতে আবার তাকে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। সেই সুবিস্তীর্ণ পর্ব্বত ও আরণ্য অঞ্চলের কোন্ জায়গায় সেই গুহাটা দৈবাৎ সে দেখেছিল, তা কি তার ঠিক আছে, না ভবিষ্যতে সে আবার সে জায়গা বার করতে পারবে? এ যুবকও তো কোনো নক্সা করে নি, কিন্তু এ সাংঘাতিক আহত হয়েছিল রত্নখনি আবিষ্কার করার পরেই, এর ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। হয়তো এ যা বার করতে পারতো নক্সা না দেখে—সে তা পারবে না।

হঠাৎ আল্ভারজের মৃত্যুর পূর্ব্বের কথা শঙ্করের মনে পড়ল। সে বলেছিল—চলো যাই, শঙ্কর, গুহার মধ্যে রাজার ভাণ্ডার লুকানো আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি।...

শঙ্কর তার পরে গুহার মধ্যেই নরকঙ্কালটা সমাধিস্থ করলে। পিপেটা ভেঙে ফেলে তারই দুখানা কাঠে মরচে-পড়া পেরেক ঠুকে ক্রুশ তৈরী করলে ও সমাধির ওপর সেই ক্রুশটা পুঁতলে। এ ছাড়া খ্রীস্টধর্ম্মাচারীকে সমাধিস্থ করবার অন্য কোন রীতি তার জানা নেই। তার পরে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, এই মৃত যুবকের আত্মার শান্তির জন্য।

এসব শেষ করতে সারাদিনটা কেটে গেল। রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন আবার সে রওন হল। কঙ্কালের চিঠিখানা ও হীরাগুলি যত্ন করে সঙ্গে নিল।

তবে তার মনে হয়, ও অভিশপ্ত হীরার খনির সন্ধানে যে গিয়েছে, সে আর ফেরেনি। আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা মরেছে, জিম কার্টার মরেছে, আল্ভারেজ মরেছে। এর আগেই বা কত লোক মরেছে, তার ঠিক কি? এইবার তার পালা। এই মরুভূমিতেই তার শেষ, এই বীর ইটালিয়ান যুবকের মত।

তেরো

দুপুরের রোদে যখন দিকে দিগন্তে আগুন জলে উঠল, একটা ছোট্ট পাথরের ঢিবির আড়ালে সে আশ্রয় নিলে। ১৩৫° ডিগ্রি উত্তাপ উঠেছে তাপমান যন্ত্রে, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ উত্তাপে পথ হাঁটা চলে না। যদি সে কোন রকমে এই ভয়ানক মরুভূমির হাত এড়াতে পারতো, তবে হয়তো জীবন্ত মানুষের আবাসে পৌছুতেও পারতো। সে ভয় করে শুধু এই মরুভূমি, সে জানে কালাহারি মরু বড বড় সিংহের বিচরণভূমি, কিন্তু তার হাতে রাইফেল আছে—রাতদুপুরেও একা যত সিংহই হোক, সম্মুখীন হতে সে ভয় করে না—কিন্তু ভয় হয় তৃষ্ণা-রাক্ষসীকে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। দুপুরে সে দুবার মরীচিকা দেখলে। এতদিন মরুপথে আসতেও এ আশ্চর্য্য নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে নি, বইয়েই পড়েছিল মরীচিকার কথা। একবার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, একবার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, দুই মরীচিকাই কিন্তু প্রায় এক রকম—অর্থাৎ একটা বড় গম্বুজওয়ালা মসজিদ বা গির্জ্জা, চারিপাশে খর্জ্জুরকুঞ্জ, সামনে বিস্তৃত জলাশয়। উত্তর-পূর্ব্ব কোণের মরীচিকাটা বেশী স্পষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে দূরদিগন্তে মেঘমালার মত পর্ব্বতমালা দেখা গেল। শঙ্কর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না। পূর্ব্বদিকে একটাই মাত্র বড় পর্ব্বত, এখান থেকে দেখা পাওয়া সম্ভব, দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রান্তবর্ত্তী চিমানিমানি পর্ব্বতমালা। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, সে বিশাল কালাহারি পদব্রজে পার হয়ে প্রায় শেষ করতে চলেছে। না ও-ও মরীচিকা?

কিন্তু রাত দশটা পর্য্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নারাত্রে সে দূর-পর্ব্বতের সীমারেখা তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেল। অসংখ্য ধন্যবাদ হে ভগবান, মরীচিকা নয় তবে। জ্যোৎস্নারাত্রে কেউ কখনো মরীচিকা দেখে নি।

তবে কি প্রাণের আশা আছে? আজ পৃথিবীর বৃহত্তম রত্নখনির মালিক সে। নিজের পরিশ্রমে ও দুঃসাহসের বলে সে তার স্বত্ব অর্জ্জন করেছে। দরিদ্র বাংলা মায়ের বুকে সে যদি আজ বেঁচে ফেরে!

দুদিনের দিন বিকালে সে এসে পর্ব্বতের নীচে পৌঁছুলো। তখন সে দেখলে, পর্ব্বত পার হওয়া ছাড়া ওপারে যাওয়ার কোনো সহজ উপায় নেই। নইলে পঁচিশ মাইল মরুভূমিতে পাড়ি দিয়ে পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে আসতে হবে। মরুভূমির মধ্যে সে আর কিছুতেই যেতে রাজি নয়। সে পাহাড় পার হয়েই যাবে।

এইখানে সে প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে। সে ভুলে গেল যে সাড়ে বারো হাজার ফুট একটা পর্ব্বতমালা ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিখ্‌টারসভেল্ড পার হওয়ার মতই শক্ত। তার চেয়েও শক্ত, কারণ সেখানে আল্‌ভারেজ ছিল, এখানে সে একা।

শঙ্কর ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারলে না, ফলে চিমানিমানি পর্ব্বত উত্তীর্ণ হতে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসলো, ভীষণ প্রজ্বলন্ত কালাহারি পার হতে গিয়েও সে অমন ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয় নি।

চিমানিমানি পর্ব্বতের জঙ্গল খুব বেশী ঘন নয়। শঙ্কর প্রথম দিন অনেকটা উঠল—তার পর একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে কোনদিকে যাবার উপায় নেই। কোন্ পথটা দিয়ে উঠেছিল সেটাও আর খুঁজে পেলে না—তার মনে হল, সে সমতলভূমির যে জায়গা দিয়ে উঠেছিল, তার ত্রিশ ডিগ্রী দক্ষিণে চলে এসেছে। কেন যে এমন হল, এর কারণ কিছুতেই সে বার করতে পারলে না। কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেল, কখনও উঠছে, কখনও নামছে, সূর্য্য দেখে দিক ঠিক করে নিচ্ছে, কিন্তু সাত-আট মাইল পাহাড় উত্তীর্ণ হতে এতদিন লাগছে কেন?

তৃতীয় দিনে আর একটা নতুন বিপদ ঘটল। তার আগের দিন একখানা আল্‌গা পাথর গড়িয়ে তার পায়ে চোট লেগেছিল। তখন তত কিছু হয় নি, পরদিন সকালে আর সে শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাঁটু ফুলেছে, বেদনাও খুব। দুর্গম পথে নামা-ওঠা করা এ অবস্থায় অসম্ভব। পাহাড়ের একটা ঝরনা থেকে ওঠবার সময় জল সংগ্রহ করে এনেছিল, তাই একটু একটু করে খেয়ে চালাচ্ছে। পায়ের বেদনা কমে না যাওয়া পর্য্যন্ত তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। বেশীদূর যাওয়া চলবে না। সামান্য একটু-আধটু চলাফেরা

করতেই হবে খাদ্য ও জলের চেষ্টায়, ভাগ্যে পাহাড়ের এই স্থানটা যেন খানিকটা সমতলভূমির মত, তাই রক্ষা।

এই সব অবস্থায়, এই মনুষ্যবাসহীন পাহাড়ে বিপদ তো পদে পদেই। একা এ পাহাড় টপকাতে গেলে যে কোনো ইউরোপীয় পর্যটকেরও ঠিক এই রকম বিপদ ঘটতে পারতো।

শঙ্কর আর পারে না। ওর হৃৎপিণ্ডে কি একটা রোগ হয়েছে, একটু হাঁটলেই ধড়াস্ ধড়াস্ করে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরায় ধাক্কা মারে। অমানুষিক পথশ্রমে, দুর্ভাবনায়, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, কখনও বা অনাহারের কষ্টে, ওর শরীরে কিছু নেই।

চারদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। খাদ্য নেই কাল থেকে। রাইফেল্ সঙ্গে আছে, কিন্তু একটা বন্য জন্তুর দেখা নেই। দুপুরে একটা হরিণকে চরতে দেখে ভরসা হয়েছিল, কিন্তু রাইফেলটা তখন ছিল পঞ্চাশ গজ তফাতে একটা গাছে ঠেস দেওয়া, আনতে গিয়ে হরিণটা পালিয়ে গেল। জল খুব সামান্যই আছে, চামড়ার বোতলে। এ অবস্থায় নেমে সে ঝরণা থেকে জল আনবেই বা কি করে? হাঁটুটা আরও ফুলেছে। বেদনা এত বেশী যে, একটু চলাফেরা করলেই মাথার শির পর্য্যন্ত ছিঁড়ে পড়ে যন্ত্রণায়।

পরিষ্কার আকাশতলে আর্দ্রতাশূন্য বায়ুমণ্ডলের গুণে অনেকদূর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিক্‌চক্রবালে মেঘলা করে ঘিরেছে নীল পর্ব্বতমালা দূরে দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ কালাহারি। দক্ষিণে ওয়াহকুহকু পর্ব্বত, তারও অনেক পেছনে মেঘের মত দৃশ্যমান পল ক্রুগার পর্ব্বতমালা—সল্‌সবেরির দিকে কিছু দেখা যায় না, চিমানিমানি পর্ব্বতের এক উচ্চতর শৃঙ্গ সেদিকে দৃষ্টি আট্‌কেছে।

আজ দুপুর থেকে ওর মাথার ওপর শকুনির দল উড়েছে। এতদিন এত বিপদেও শঙ্করের যা হয় নি, আজ শকুনির দল মাথার ওপর উড়তে দেখে শঙ্করের সত্যই ভয় হয়েছে। ওরা তাহলে কি বুঝেছে যে শিকার জোটবার বেশী দেরি নেই?

সন্ধ্যার কিছু পরে কি একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে, পাশের শিলাখণ্ডের আড়ালে একটা ধূসর রঙের নেকড়ে বাঘ—নেকড়ের লম্বা ছুঁচালো কান দুটো খাড়া হয়ে আছে, সাদা সাদা দাঁতের ওপর দিয়ে রাঙা জিবটা অনেকখানি বার হয়ে লক্ লক্ করছে। চোখে চোখ পড়তেই সেটা চট্ করে পাথরের আড়াল থেকে সরে দূরে পালালো।

নেকড়ে বাঘটাও তাহলে কি বুঝেছে? পশুরা নাকি আগে থেকে অনেক কথা জানতে পারে।

হাড়ভাঙা শীত পড়লো রাত্রে। ও কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে। অগ্নিকুণ্ডের আলো যতটুকু পড়েছে তার বাইরে ঘন অন্ধকার।

কি একটা জন্তু এসে অগ্নিকুণ্ড থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে দেহ মিশিয়ে চুপ করে বসলো। কোয়োট্, বন্যকুকুর জাতীয় জন্তু। ক্রমে আর একটা, আর দুটো, আর তিনটে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দশ-পনেরোটা এসে জমা হল। অন্ধকারে তার চারিধার ঘিরে

নিঃশব্দে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে।

কি সব অমঙ্গলজনক দৃশ্য !

ভয়ে ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। সত্যিই কি এতদিনে তারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে !

এতদিন পরে এল তা হলে! সে-ও পারলে না রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্‌ থেকে হীরে নিয়ে পালিয়ে যেতে !

উঃ, আজ কত টাকার মালিক সে। হীরের খনি বাদ যাক্, তার সঙ্গে যে ছখানা হীরে রয়েছে, তার দাম অন্ততঃ দু-তিন লক্ষ টাকা নিশ্চয় হবে। তার গরীব গ্রামে, গরীব বাপ-মায়ের বাড়ী যদি এই টাকা নিয়ে গিয়ে উঠতে পারতো·· কত গরীবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারতো, গ্রামে কত দরিদ্র কুমারীকে বিবাহের যৌতুক দিয়ে ভাল পাত্রে বিবাহ দিত, কত সহায়হীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শেষ দিন ক'টা নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারতো···

কিন্তু সে-সব ভেবে কি হবে, যা হবার নয় ? তার চেয়ে এই অপূর্ব্ব রাত্রির নক্ষত্রালোকিত আকাশের শোভা, এই বিশাল পর্ব্বত ও মরুভূমির নিস্তব্ধ গম্ভীর রূপ, মৃত্যুর আগে শঙ্করও চায় চোখ ভরে দেখতে, সেই ইটালিয়ান্ যুবক গাত্তির মত। ওরা যে অদৃষ্টের এক অদৃশ্য তারে গাঁথা সবাই, আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা, জিম্ কার্টার, আল্‌ভারেজ, সে

রাত গভীর হয়েছে। কি ভীষণ শীত !···একবার সে চেয়ে দেখলে, কোয়োটগুলো এরই মধ্যে কখন আরও নিকটে সরে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়ে তাদের চোখগুলো জ্বলছে। শঙ্কর একখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই ওরা সব দূরে সরে গেল—কিন্তু কি নিঃশব্দ ওদের গতিবিধি আর কি অসীম তাদের ধৈর্য্যও ! শঙ্করের মনে হল, ওরা জানে শিকার ওদের হাতের মুঠোয়, হাতছাড়া হবার কোনো উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলায় সেই ধূসর নেকড়ে বাঘটাও দু-দুবার এসে কোয়োটদের পেছনে অন্ধকারে বসে দেখে গিয়েছে।

একটুও ঘুমুতে ভরসা হল না ওর। কি জানি কোয়োট্ আর নেকড়ের দল হয়তো তা হলে জীবন্তই তাকে ছিঁড়ে খাবে মৃত মনে করে। অবসন্ন, ক্লান্ত দেহে জেগেই বসে থাকতে হবে তাকে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসলেও উপায় নেই। মাঝে মাঝে কোয়োট্‌গুলো এগিয়ে এসে বসে, ও জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই সরে যায়···দু-একটা হায়েনাও এসে ওদের দলে যোগ দিলে···হায়েনাদের চোখগুলো অন্ধকারে কি ভীষণ জ্বলছে !

কি ভয়ানক অবস্থাতে পড়েছে। জনবিরল বর্ব্বর দেশের জনশূন্য পর্ব্বতের সাড়ে তিন হাজার ফুট উপরে সে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় বসে···গভীর রাত, ঘোর অন্ধকার···সামান্য আগুন জ্বলছে···মাথার ওপর জলকণাশূন্য শুষ্ক বায়ুমণ্ডলের গুণে আকাশের অগণ্য তারা জ্বল্ জ্বল্ করছে যেন ইলেকৃট্রিক আলোর মত···নীচে তার চারিধার ঘিরে অন্ধকারে মাংসলোলুপ নীরব কোয়োট্, হায়েনার দল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এটাও মনে হল, বাংলার পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ায় ধুঁকে সে মরছে না। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু। পদব্রজে কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছে সে—একা। মরে

গিয়ে চিমানিমানি পর্ব্বতের শিলায় নাম খুদে রেখে যাবে। সে একজন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী ও আবিষ্কারক। অত বড় হীরের খনি সে-ই তো খুঁজে বার করেছে! আল্‌ভারেজ মারা যাওয়ার পরে, সেই বিশাল অরণ্য ও পর্ব্বত অঞ্চলের গোলকধাঁধা থেকে সে একাই পার হতে পেরে এতদূর এসেছে! এখন সে নিরুপায়, অসুস্থ, চলৎশক্তি-রহিত। তবুও সে যুঝছে, ভয় তো পায় নি, সাহস তো হারায় নি! কাপুরুষ, ভীরু নয় সে। জীবন-মৃত্যু তো অদৃষ্টের খেলা। না বাঁচলে তার দোষ কি?

* * * *

দীর্ঘ রাত্রি কেটে গিয়ে পুবদিকে ফরসা হল। সঙ্গে সঙ্গে বন্য জন্তুর দল কোথায় পালালো। বেলা বাড়ছে, আবার নির্ম্মম সূর্য্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে শুরু করেছে দিক্‌বিদিক্। সঙ্গে সঙ্গে শকুনির দল কোথা থেকে এসে হাজির। কেউ মাথার ওপর ঘুরছে, কেউ বা দূরে দূরে গাছের ডালে কি পাথরের ওপরে বসেছে। খুব ধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে। ওরা যেন বলছে—কোথায় যাবে বাছাধন? যে ক'দিন লাফালাফি করবে, করে নাও। আমরা বসি, এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই আমাদের!

শঙ্করের খিদে নেই। খাবার ইচ্ছেও নেই। তবুও সে গুলি করে একটা শকুনি মারলে! রৌদ্র ভীষণ চড়েছে। আগুন-তাতা পাথরের গায়ে পা রাখা যায় না। এ পর্ব্বতও মরুভূমির শামিল, খাদ্য এখানে মেলে না, জলও না। সে মরা শকুনিটা নিয়ে আগুন জেলে ঝলসাতে বসলো। এর আগে মরুভূমির মধ্যেও সে শকুনির মাংস খেয়েছে। এরাই এখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, আজ ও খাচ্ছে ওদের, কাল ওরা খাবে ওকে। শকুনিগুলো এসে আবার মাথার ওপর জুটেছে।

তার নিজের ছায়া পড়েছে পাথরের গায়ে, সে নির্জ্জন স্থানে শঙ্করের উদ্‌ভ্রান্ত মনে ছায়াটা যেন আর একজন সঙ্গী মনে হল। বোধ হয়, ওর মাথা খারাপ হয়ে আসছে···কারণ বেঘোর অবস্থায় ও কতবার নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগল···কতবার পরক্ষণের সচেতন মুহূর্ত্তে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে সামলে নিলে।

সে পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? জ্বর হয়নি তো? তার মাথার মধ্যে ক্রমশঃ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। আল্‌ভারেজ্···হীরের খনি···পাহাড়, পাহাড়, বালির সমুদ্র···আত্তিলিও গাত্তি · কাল রাত্রে ঘুম হয় নি···আবার রাত আসছে, সে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

কিসের শব্দে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ আসছে কোন্ দিক থেকে। কোন পরিচিত শব্দের মত নয়। কিসের শব্দ? কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ কাছে আসছে সেটা।

হঠাৎ আকাশের দিকে শঙ্করের চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল···তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের পথে বিকট শব্দ করে একটা জিনিস যাচ্ছে। ওই কি এরোপ্লেন? সে বইয়ে ছবি দেখেছে বটে।

এরোপ্লেন যখন ঠিক মাথার ওপর এল, শঙ্কর চীৎকার করলে, কাপড় ওড়ালে, গাছের

ডাল ভেঙে নাড়লে, কিন্তু কিছুতেই পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না। দেখতে দেখতে এরোপ্লেনখানা সুদূরে ভায়োলেট্ রঙের পল্ ক্রুগার পর্ব্বতমালার মাথার ওপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হয়তো আরও এরোপ্লেন যাবে এ পথ দিয়ে। কি আশ্চর্য্য দেখতে এরোপ্লেন জিনিসটা! ভারতবর্ষে থাকতে সে একখানাও দেখে নি।

শঙ্কর ভাবলে, আগুন জ্বালিয়ে কাঁচা ডাল পাতা দিয়ে সে যথেষ্ট ধোঁয়া করবে। যদি আবার এ পথে যায়, পাইলটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ধোঁয়া দেখে। একটা সুবিধে হয়েছে, এরোপ্লেনের বিকট আওয়াজে শকুনির দল কোন্ দিকে ভেগেছে।

সেদিন কাট্‌ল। দিন কেটে রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের দুর্ভোগ হল শুরু। আবার গত রাত্রির পুনরাবৃত্তি। সেই কোয়োটের দল আবার এল। আগুনের চারিধারে তারা আবার তাকে ঘিরে বসলো। নেক্‌ড়ে বাঘটা সন্ধ্যা না হতেই দূর থেকে একবার দেখে গেল। গভীর রাত্রে আর একবার এল।

কিসে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? আওয়াজ করতে ভরসা হয় না—টোটা মাত্র দুটি বাকী। টোটা ফুরিয়ে গেলে তাকে অনাহারে মরতে হবে। মরতে তো হবেই, তবে দুদিন আগে আর পিছে; যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

কিন্তু আওয়াজ তাকে করতেই হল। গভীর রাত্রে হায়েনাগুলো এসে কোয়োট্‌দের সাহস বাড়িয়ে দিলে। তারা আরও এগিয়ে সরে এসে তাকে চারিধার থেকে ঘিরলে। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারলে আর ভয় পায় না।

একবার একটু তন্দ্রামত এসেছিল—বসে বসেই ঢুলে পড়েছিল। পরমুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে উঠে দেখলে, নেকড়ে বাঘটা অন্ধকার থেকে পা টিপে টিপে তার অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে। ওর ভয় হল; হয়তো ওটা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভয়ের চোটে একবার গুলি ছুঁড়লে, আর একবার শেষ রাত্রের দিকে ঠিক এরকমই হল। কোয়োটগুলোর ধৈর্য্য অসীম, সেগুলো চুপ করে বসে থাকে মাত্র, কিছু বলে না। কিন্তু নেকড়ে বাঘটা ফাঁক খুঁজছে।

রাত ফরসা হবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হয়ে গেল কোয়োট্, হায়েনা ও নেকড়ের দল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আগুনের ধারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা কিসের শব্দে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল।

খানিকটা আগে খুব বড় একটা আওয়াজ হয়েছে কোনো কিছুর। শঙ্করের কানে তার রেশ এখনও লেগে আছে।

কেউ কি বন্দুকের আওয়াজ করেছে? কিন্তু তা অসম্ভব। এই দুর্গম পর্ব্বতের পথে কোন্ মানুষ আসবে?

একটিমাত্র টোটা অবশিষ্ট আছে। শঙ্কর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে সেটা খরচ করে একটা আওয়াজ করলে। যা থাকে কপালে, মরেছেই তো। উত্তরে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল।

আনন্দে ও উত্তেজনায় শঙ্কর ভুলে গেল যে তার পা খোঁড়া, ভুলে গেল যে সে একটানা বেশীদূরে যেতে পারে না। তার আর টোটা নেই—সে আর বন্দুকের আওয়াজ করতে পারলে না—কিন্তু প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল, গাছের ডাল ভেঙে নাড়তে লাগল, আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোর সন্ধানে চারিদিকে আকুল-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল।

* * *

ক্রুগার ন্যাশন্যাল পার্ক জরীপ করবার দল, কিম্বার্লি থেকে কেপ টাউন যাবার পথে, চিমানিমানি পর্ব্বতের নীচে কালাহারি মরুভূমির উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তাঁবু ফেলেছিল। সঙ্গে সাতখানা ডবল টায়ার ক্যাটারপিলার চাকা বসানো মোটর গাড়ি। এদের দলে নিগ্রো কুলী ও চাকর-বাকর বাদে ন'জন ইউরোপীয়। জনচারেক হরিণ শিকার করতে উঠেছিল চিমানিমানি পর্ব্বতের প্রথম ও নিম্নতম থাক্‌টাতে।

হঠাৎ এ জনহীন অরণ্যপ্রদেশে সভ্য রাইফেলের আওয়াজে ওরা বিস্মিত হয়ে উঠল। কিন্তু ওদের পুনরায় আওয়াজের প্রত্যুত্তর না পেয়ে ইতস্তত: খুঁজতে বেরিয়ে দেখতে পেলে, সামনের একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর চূড়া থেকে, এক জীর্ণ ও কঙ্কালসার কোটরগতচক্ষু প্রেতমূর্ত্তি উন্মাদের মত হাত পা নেড়ে তাদের কি বোঝাবার চেষ্টা করছে। তার পরনে ছিন্নভিন্ন অতি মলিন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ।

ওরা ছুটে গেল। শঙ্কর আবোল-তাবোল কি বকলে, ওরা ভাল বুঝতে পারলে না। যত্ন করে ওকে নামিয়ে পাহাড়ের নীচে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ওর জিনিসপত্রও নামিয়ে আনা হয়েছিল। তখন ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু এই ধাক্কায় শঙ্করকে বেশ ভুগতে হল। ক্রমাগত অনাহারে, কষ্টে, উদ্বেগে, অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণের ফলে, তার শরীর খুব জখম হয়েছিল—সেই রাত্রেই তার বেজায় জর এল।

* * *

জরে সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ল—কখন যে মোটর গাড়ী ওখান থেকে ছাড়লো, কখন যে তারা সল্‌স্‌বেরিতে পৌছলো শঙ্করের কিছুই খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় পনেরো দিন সে সল্‌সবেরির হাসপাতাতে কাটিয়ে দিলে। তারপর ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরের রাজপথে এসে দাঁড়ালো।

চোদ্দ

সল্‌স্‌বেরি! কত দিনের স্বপ্ন।···

আজ সে সত্যিই একটা বড় ইউরোপীয় ধরনের শহরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বড় বড় বাড়ী, ব্যাঙ্ক, হোটেল, দোকান, পিচ্‌ঢালা চওড়া রাস্তা, একপাশ দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম চলেছে, জুলু রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা টানছে, কাগজওয়ালা কাগজ বিক্রী করছে। সবই যেন নতুন, যেন এসব দৃশ্য জীবনে কখনো দেখে নি।

লোকালয়ে তো এসেছে, কিন্তু সে একেবারে কপর্দ্দকশূন্য। এক পেয়ালা চা খাবার পয়সাও তার নেই। কাছে একটা ভারতীয় দোকান দেখে তার বড় আনন্দ হল। কতদিন যে দেখে নি স্বদেশবাসীর মুখ! দোকানদার মেমন্ মুসলমান, সাবান ও গন্ধদ্রব্যের পাইকারী বিক্রেতা। খুব বড় দোকান। শঙ্করকে দেখেই সে বুঝলে এ দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত। নিজে দু টাকা সাহায্য করলে ও একজন বড় ভারতীয় সওদাগরের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলে।

টাকা দুটি পকেটে নিয়ে শঙ্কর আবার পথে এসে দাঁড়ালো। আসবার সময় বলে এল—অসীম ধন্যবাদ টাকা দুটির জন্যে, এ আমি আপনার কাছে ধার নিলাম, আমার হাতে পয়সা এলে আপনাকে কিন্তু এ টাকা নিতে হবে। সামনেই একটা ভারতীয় রেস্টুরেণ্ট। সে ভাল কিছু খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। কতদিন সভ্য খাদ্য মুখে দেয় নি! সেখানে ঢুকে এক টাকার পুরী, কচুরী, হালুয়া, মাংসের চপ, পেট ভরে খেলে। সেই সঙ্গে দু-তিন পেয়ালা কফি।

চায়ের টেবিলে একখানা পুরানো খবরের কাগজের দিকে তার নজর পড়ল। তাতে একটা জায়গায় বড় বড় অক্ষরে হেড্ লাইনে লেখা আছে—

National Park Survey Party's Singular Experience

A lonely Indian found in the desert

Dying of thirst and Exhaustion

His strange story

শঙ্কর দেখলে, তার একটা ফটোও কাগজে ছাপা হয়েছে। তার মুখে একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্পও দেওয়া হয়েছে। এ রকম গল্প সে কারো কাছে করে নি।

খবরের কাগজখানার নাম 'সল্স্বেরি ডেলি ক্রনিক্ল্'। সে খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে। তার চারিপাশে ভিড় জমে গেল। ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে রিপোর্টারের দল অনেক চেষ্টা করেছিল জানা গেল। সেখানে চিমানিমানি পর্ব্বতে পা-ভেঙে পড়ে থাকার গল্প বলে ও ফটো তুলতে দিয়ে শঙ্কর পঞ্চাশ টাকা পেলে। ও থেকে সে আগে সেই সহৃদয় মুসলমান দোকানদারের টাকা দুটি দিয়ে এল।

ওদের দৃষ্ট আগ্নেয়গিরিটার সম্বন্ধে সে কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখলে। তাতে আগ্নেয়-গিরিটারও নামকরণ করলে মাউণ্ট্ আল্ভারেজ। তবে মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যে লুকানো একটা এত বড় আস্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির এই গল্প কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে না। অবিশ্যি রত্নের গুহার বাষ্পও সে কাউকে জানতে দেয় নি। দলে দলে লোক ছুটবে ওর সন্ধানে।

তার পরে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে সে একরাশ ইংরেজি বই ও মাসিক পত্রিকা কিনলে। বই পড়ে নি কতকাল! সন্ধ্যায় একটা সিনেমায় ছবি দেখলে। কতকাল পরে রাত্রে হোটেলের ভাল বিছানায় ইলেকট্রিক আলোর তলায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে সে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে নীচের প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর স্ট্রীটের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ট্রাম যাচ্ছে নীচে দিয়ে, জুলু রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ভারতীয় কফিখানায়

ঠুন্ ঠুন্ করে ঘণ্টা বাজছে, মাঝে মাঝে দু-চারখানা মোটরও যাচ্ছে। এর সঙ্গে মনে হল আর একটা ছবি—সামনে আগুনের কুণ্ড, কিছুদূরে বৃত্তাকারে ঘিরে বসে আছে কোয়োট্ ও হায়েনার দল। ওদের পিছনে নেকড়েটার দুটো গোল গোল চোখ আগুনের ভাঁটার মত জল্‌ছে অন্ধকারের মধ্যে।

কোন্‌টা স্বপ্ন?···চিমানিমানি পর্ব্বতে যাপিত সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি, না আজকের এই রাত্রি?

ইতিমধ্যে সল্‌সবেরিতে সে একজন বিখ্যাত লোক হয়ে গেল। রিপোর্টারের ভিড়ে তার হোটেলের হল্ সব সময় ভর্ত্তি। খবরের কাগজের লোক আসে তার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাবার কণ্ট্রাক্ট করতে, কেউ আসে ফটো নিতে।

আত্তিলিও গাত্তির কথা সে ইটালিয়ান্ কনসাল্ জেনারেলকে জানালে। তাঁর আপিসের পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেল, আত্তিলিও গাত্তি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান যুবক ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসে পর্টুগীজ পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজডুবি হবার পরে নামে। তার পর যুবকটির আর কোনা পাত্তা পাওয়া যায় নি। তার আত্মীয়-স্বজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক। ১৮৯০-৯৫ সাল পর্য্যন্ত তারা তাদের নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়ের সন্ধানের জন্যে পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার কনস্যুলেট্ আপিসকে জালিয়ে খেয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করাও হয়েছিল তার সন্ধানের জন্যে। ১৮৯৫ সাল থেকে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

পূর্ব্বোক্ত মুসলমান দোকানদারটির সাহায্যে সে ব্ল্যাকমুন স্ট্রীটের বড় জহুরী রাইডাল ও মর্সবির দোকানে চারখানা পাথর সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রী করলে। বাকী দুখানার দর আরও বেশী উঠেছিল, কিন্তু শঙ্কর সে দুখানা পাথর তার মাকে দেখাবার জন্যে দেশে নিয়ে যেতে চায়। এখন বিক্রী করতে তার ইচ্ছে নেই।

* * * *

নীল সমুদ্রে!···

বম্বেগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পর্টুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকার বেইরা বন্দরের নারিকেল-বনশ্যাম তীরভূমিকে মিলিয়ে যেতে দেখতে দেখতে, শঙ্কর ভাবছিল তার জীবনের এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা। এই তো জীবন, এই ভাবেই তো জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে। মানুষের আয়ু মানুষের জীবনের ভুল মাপকাঠি। দশ বৎসরের জীবন উপভোগ করেছে সে এই দেড় বছরে। আজ সে শুধু একজন ভবঘুরে পথিক নয়, একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ-আবিষ্কারক। মাউণ্ট আল্‌ভারেজকে সে জগতে প্রসিদ্ধ করবে। দূরে ভারত মহাসমুদ্রের পারে জননী জন্মভূমি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জন্য এখন মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মনটি উৎসুক হয়ে আছে, কবে দূর থেকে দৃশ্যমান বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চুড়োটা মাতৃভূমির উপকূলের সান্নিধ্য ঘোষণা করবে· তার পর বাউলকীর্ত্তনগান-মুখরিত বাংলাদেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল ছোট পল্লী·· সামনে আসছে বসন্ত কাল···পল্লীপথে যখন একদিন সজ্‌নে ফুলের দল পথ-বিছিয়ে পড়ে থাকবে, বৌ-

কথা-ক ডাকবে ওদের বড় বকুল গাছটায় · নদীর ঘাটে গিয়ে লাগবে ওর ডিঙি।

বিদায়! আল্ভারেজ বন্ধু!·· স্বদেশে ফিরে যাওয়ার এই আনন্দের মুহূর্ত্তে তোমার কথাই আজ মনে হচ্চে। তুমি সেই দলের মানুষ, সারা আকাশ যাদের ঘরের ছাদ, সারা পৃথিবী যাদের পায়ে চলার পথ—আশীর্ব্বাদ কোরো তোমার মহারণ্যের নির্জ্জন সমাধি থেকে, যেন তোমার মত হতে পারি জীবনে, অমনি সুখ-দুঃখ নিস্পৃহ, অমনি নির্ভীক।

বিদায় বন্ধু আত্তিলিও গাত্তি। অনেক জন্মের বন্ধু ছিলে তুমি।

তোমরা সবাই মিলে শিখিয়েছ চীন দেশে প্রচলিত সেই প্রাচীন ছড়াটির সত্যতা—

ছাদের আল্সের দিব্যি চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক প্রস্তর হয়ে ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো।

* * * *

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে। এখন জন্মভূমির টান বড় টান। জন্মভূমির কোলে এখন সে কিছুদিন কাটাবে। তার পর দেশেই সে কোম্পানী গঠন করবার চেষ্টা করবে—আবার সুদূর রিখ্টার্স্ভেল্ড পর্ব্বতে ফিরবে রত্নখনির পুনর্ব্বার অনুসন্ধানে—খুঁজে সে বার করবেই।

ততদিন—বিদায়!

পরিশিষ্ট

সল্স্বেরি থাকতে সে সাউথ রোডেসিয়ান্ মিউজিয়ামের কিউরেটার প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ডঃ ফিট্জেরাল্ডের সঙ্গে দেখা করেছিল, বিশেষ করে বুনিপের কথাটা তাঁকে বলবার জন্যে। দেশে আসবার কিছুদিন পরে ডঃ ফিটজেরাল্ডএর কাছ থেকে শঙ্কর নিম্নলিখিত পত্রখানা পায়।

The South Rhodesian Museum
Salisbury. Rhodesia
South Africa
January 12. 1911

Dear Mr. Choudhuri,

I am writing this letter to fulfil my promise to you to let you know what I thought about your report of a strange three-toed monster in the wilds of the Richtersveldt Mountains. On looking up my files I find other similar accounts by explorers who had been to the region

before you, specially by Sir Robert McCulloch, the famous naturalist, whose report has not yet been published, owing to his sudden and untimely death last year. On thinking the mater over, I am inclined to believe that the monster you saw was nothing more than a species of anthropoid ape, closely related to the gorilla, but much bigger in size and more savage than the specimens found in the Ruwenzori and Virunga Mountains. This species is becoming rarer and rarer every day, and such numbers as do exist are not easily to be got at on account of their shyness and the habit ot hiding themselves in the depths of the high-altitude rain forests of the Richtersveldt. It is only the very fortunate traveller who gets glimpses of them, and I should think that in meeting them he runs risks proportionate to his good luck.

Congratulating you on both your luck and pluck,

I remain
Yours Sincerely
J. G. Fitzgerald



চাঁদপাল ঘাট থেকে রেঙ্গুনগামী মেল স্টীমার ছাড়চে। বহু লোকজনের ভিড়। পুজোর ছুটির ঠিক পরেই। বর্মা প্রবাসী দু'চারজন বাঙালী পরিবার রেঙ্গুনে ফিরচে। কুলীরা মাল-পত্র তুলচে। দড়াদড়ি ছোঁড়াছুঁড়ি, হৈ হৈ। ডেকযাত্রীদের গোলমালের মধ্যে জাহাজ ছেড়ে গেল। যারা আত্মীয়-স্বজনকে তুলে দিতে এসেছিল, তারা তীরে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগলো।

সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসেনি। কারণ কলকাতায় তার জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই। সবে চাকরিটা পেয়েচে, একটা বড় ঔষধ-ব্যবসায়ী ফার্মের ক্যান্‌ভাসার হয়ে সে যাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর।

সুরেশ্বরের বাড়ী হুগলী জেলার একটা গ্রামে। বেজায় ম্যালেরিয়ায় দেশটা উচ্ছন্ন গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত বনজঙ্গল, পোড়ো বাড়ীর ইট স্তূপাকার হয়ে পথে যাতায়াত বন্ধ করেচে, সন্ধ্যার পর সুরেশ্বরদের পাড়ায় আলো জ্বলে না।

ওদের পাড়ার চারিদিকে বনজঙ্গল ও ভাঙা পোড়ো বাড়ীর মধ্যে একমাত্র অধিবাসী সুরেশ্বররা। কোনো উপায় নেই বলেই এখানে পড়ে থাকা—নইলে কোন্ কালে উঠে গিয়ে শহর-বাজারের দিকে বাস করতো ওরা।

সুরেশ্বর বি এসসি. পাশ করে এতদিন বাড়িতে বসে ছিল। চাকরি মেলা দুর্ঘট আর কে-ই বা করে দেবে—এই সব জন্যেই সে চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। তার বাবা সম্প্রতি পেন্‌সন্ নিয়ে বাড়ি এসে বসেছেন, খুব সামান্যই পেন্‌সন্—সে আয়ে সংসার চালানো কায়ক্লেশে হয়; কিন্তু তাও পাড়াগাঁয়ে। শহরে সে আয়ে চলে না। বছর খানেক বাড়ী বসে থাকবার পরে সুরেশ্বর গ্রামে আর থাকতে পারলে না। গ্রামে নেই লোকজন। তার সমবয়সী এমন কোনো ভদ্রলোকের ছেলে নেই যার সঙ্গে দু'দণ্ড কথাবার্ত্তা বলা যায়। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়াই গ্রামের নিয়ম। তারপর কোনোদিকে সাড়া শব্দ নেই।

ক্রমশঃ এ জীবন সুরেশ্বরের অসহ্য হয়ে উঠল। সে ঠিক করলে কলকাতায় এসে টুইশানি করেও যদি চালায়, তবুও তো শহরে সে থাকতে পারবে এখন।

আজ মাস পাঁচ-ছয় আগে সুরেশ্বর কলকাতায় আসে এবং দেশের একজন পরিচিত লোকের মেসে ওঠে। এতদিন এক আধটা টুইশানি করেই চালাচ্ছিল, সম্প্রতি এই চাকরিটা পেয়েচে, তারই এক ছাত্রের পিতার সাহায্যে ও সুপারিশে। সঙ্গে তিন বাক্স ঔষধ-পত্রের নমুনা আছে বলে তাদের ফার্মের মোটর গাড়ী ওকে চাঁদপাল ঘাটে পৌছে দিয়ে গিয়েছিল।

এই প্রথম চাকরি এবং এই প্রথম দূর বিদেশে যাওয়া—সুরেশ্বরের মনে খানিকটা আনন্দ ও খানিকটা বিষাদ মেশানো এক অদ্ভুত ভাব। একদল মানুষ আছে, যারা অজানা দূর বিদেশে নতুন নতুন বিপদের সামনে পড়বার সুযোগ পেলে নেচে ওঠে—সুরেশ্বর ঠিক সে দলের নয়। সে নিতান্তই ঘরকুণো ও নিরীহ ধরনের মানুষ—তার মত লোক নিরাপদে

চাকরি করে আর দশজন বাঙালী ভদ্রলোকের মতো নির্বিঘ্নে সংসার-ধর্ম্ম পালন করতে পারলে সুখী হয়।

তাকে যে বিদেশে যেতে হচ্ছে—তাও যে সে বিদেশ নয়, সমুদ্র পারের দেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে—সে নিতান্তই দায়ে পড়ে। নইলে চাকরি থাকে না! সে চায় নি এবং ভেবেও রেখেছে এইবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারলে অন্য চাকরির চেষ্টা করবে।

কিন্তু জাহাজ ছাড়বার পরে সুরেশ্বরের মন্দ লাগছিল না। ধীরে ধীরে বোটানিক্যাল গার্ডেন, দুইতীর-ব্যাপী কলকারখানা পেছনে ফেলে রেখে প্রকাণ্ড জাহাজখানা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভোর ছ'টায় জাহাজ ছেড়েছিল, এখন বেশ রৌদ্র উঠেছে, ডেকের একদিকে অনেকখানি জায়গায় যাত্রীরা ডেক-চেয়ার পেতে গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, স্টীমারের একজন কর্ম্মচারী সবাইকে বলে গেল পাইলট নেমে যাওয়ার আগে যদি ডাঙায় কোনো চিঠি পাঠানো দরকার হয় তা যেন লিখে রাখা হয়।

বয় এসে বল্লে—আপনাকে চায়ের বদলে আর কিছু দেবো?

সুরেশ্বর সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী, সে চা খায় না, এ খবর আগেই জানিয়েছিল এবং কিছু আগে সকলকে চা দেওয়ার সময়ে চায়ের পেয়ালা সে ফেরৎ দিয়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—না, কিছু দরকার নেই।

বয় চলে গেল।

এমন সময় কে একজন বেশ মার্জ্জিত ভদ্র সুরে ও পেছনের দিক থেকে জিজ্ঞেস করলে—মাপ করবেন, মশায় কি বাঙালী?

সুরেশ্বর পেছনে ফিরে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে এইমাত্র একজন নব আগন্তুক যাত্রী তার ডেকচেয়ার পাতবার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে ও তাকে প্রশ্ন করছে। তার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়, একহারা, দীর্ঘ সুঠাম চেহারা, সুন্দর মুখশ্রী, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—সবসুদ্ধ মিলিয়ে বেশ সুপুরুষ।

সুরেশ্বর উত্তর দেওয়ার আগেই সে লোকটি হাসিমুখে বল্লে—কিছু মনে করবেন না, একসঙ্গেই কদিন থাকতে হবে আপনার সঙ্গে, একটু আলাপ করে নিতে চাই। প্রথমটা বুঝতে পারি নি আপনি বাঙালী কি না।

সুরেশ্বর হেসে বল্লে—এ আর মনে করবার কি? ভালই তো হোল আমার পক্ষেও। সেকেণ্ড ক্লাসে আর কি বাঙালী নেই?

—না, আর যাঁরা যাচ্ছেন—সবাই ডেকে। একজন কেবল ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। আপনি কতদূর যাবেন—রেঙ্গুনে?

—আপাততঃ তাই বটে—সেখানে থেকে যাবো সিঙ্গাপুর।

—বেশ, বেশ, খুব ভাল হোল। আমিও তাই। সরে এসে বসুন এদিকে, আপনার সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমিয়ে নিই। বাঁচলুম আপনাকে পেয়ে।

সুরেশ্বর শীঘ্রই তার সঙ্গীটির বিষয়ে তার নিজের মুখেই অনেক কথা শুনলে। ওর নাম

বিমলচন্দ্র বসু, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে ডাক্তারী করবার চেষ্টায় সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। বিমলের বাড়ী কলকাতায়, ওদের অবস্থা বেশ ভালই। ওদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের বন্ধু সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করেন, তাঁর নামে বিমল চিঠি নিয়ে যাচ্ছে।

কথাবার্ত্তা শুনে সুরেশ্বরের মনে হোল বিমল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী। নতুন দেশে নতুন জীবনের মধ্যে যাবার আনন্দেই সে মশগুল। সে বেশ সবল যুবকও বটে। অবশ্যি সুরেশ্বর নিজেও গায়ে ভালই শক্তি ধরে, এক সময়ে রীতিমত ব্যায়াম ও কুস্তি করতো, তারপর গ্রামে অনেকদিন থাকার সময়ে সে মাটি-কোপানো, কাঠ-কাটা প্রভৃতি সংসারের কাজ নিজের হাতে করতো বলে হাত পা যথেষ্ট শক্ত ও কর্ম্মক্ষম।

ক্রমে বেলা বেশ পড়ে এল। সুরেশ্বর ও বিমল ডেকে বসে নানারকম গল্প করছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমল বল্লে—আমি একবার কেবিন থেকে আসি, আপনি বসুন। ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়েছে, এখুনি পাইলট নেমে যাবে। আমার চিঠিপত্র দিতে হবে ওর সঙ্গে। আপনি যদি চিঠিপত্র দেন তবে এই বেলা লিখে রাখুন।

সাগর-পয়েণ্টের বাতিঘর দূর থেকে দেখা যাওয়ার কিছু আগেই কলকাতা বন্দরের পাইলট জাহাজ থেকে নেমে একখানা ষ্টীমলঞ্চে কলকাতার দিকে চলে গেল।

সাগর-পয়েণ্ট ছাড়িয়ে কিছু পরেই সমুদ্র—কোনো দিকে ডাঙা দেখা যায় না—ঈষৎ ঘোলা ও পাটকিলে রঙের জলরাশি চারি ধারে। সন্ধ্যা হয়েছে, সাগর পয়েণ্টের বাতিঘরে আলো ঘুরে ঘুরে জলছে, কতকগুলো সাদা গাঙচিল জাহাজের বেতারের মাস্তুলের ওপর উড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করছে বলে বিমল কেবিন থেকে ওভার-কোটটা আনতে গেল, সুরেশ্বর ডেকে বসে রইল।

জ্যোৎস্না রাত। ডেকের রেলিং-এর ধারে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, সুরেশ্বরের মন এই সন্ধ্যায় খুবই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ বাড়ীর কথা ভেবে, বৃদ্ধ বাপমায়ের কথা ভেবে, আসবার সময়ে বোন প্রভার অশ্রুসজল করুণ মুখখানির কথা ভেবে।

পূর্ব্বেই বলেছি সুরেশ্বর নিরীহ প্রকৃতির ঘরোয়া ধরনের লোক। বিদেশে যাচ্ছে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চাকরির খাতিরে। বিমল যদিও সুরেশ্বরের মত ঘরকুণো নয়, তবুও তার সিঙ্গাপুরে যাবার মধ্যে কোন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল না। সে চিঠি নিয়ে যাচ্ছে পরিচিত বন্ধুর নিকট থেকে সেখানকার লোকের নামে, তারা ওকে সন্ধান বলে দেবে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে; তারপর বিমল সেখানে একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে গেটের গায়ে নাম-খোদাই পেতলের পাত বসিয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মত ডাক্তারী আরম্ভ করে দেবে—এই ছিল তার মতলব। যেমন পাঁচজনে দেশে বাস করছে, সে না হয় গিয়ে করবে সিঙ্গাপুরে।

কিন্তু দুজনেই জানতো না একটা কথা।

তারা জানতো না যে নিরুপদ্রব, শান্তভাবে ডাক্তারী ও ওষুধের ক্যানভাসারি করতে তারা যাচ্ছে না—তাদের অদৃষ্ট তাদের দুজনকে এক সঙ্গে গেঁথে নিয়ে চলেছে এক বিপদসঙ্কুল

পথযাত্রায় এবং তাদের দুজনের জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার দিকে।

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে। বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

একদিন দুপুরে বিমল সুরেশ্বরকে উত্তেজিত স্বরে ডাক দিয়ে বল্লে—চট্ করে চলে আসুন, দেখুন, কি একটা জন্তু!

জন্তুটা আর কিছু নয়, উড্ডীয়মান মৎস্য। জাহাজের শব্দে জল থেকে উঠে খানিকটা উড়ে আবার জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম সুরেশ্বর উড্ডীন মৎস্য দেখলে; ছেলেবেলায় চারুপাঠে ছবি দেখেছিল বটে।

মাঝে মাঝে অন্য অন্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রায়ই কলিকাতাগামী জাহাজ।

ওরা জাহাজের নাম পড়ছে—ওরা কেন, সবাই। এ অকূল জলরাশির দেশে অন্য একখানা জাহাজ ও অন্য লোকজন দেখতে পাওয়া যেন কত অভিনব দৃশ্য! শত শত যাত্রী ঝুঁকে পড়েছে সাগ্রহে রেলিংয়ের ওপর, নাম পড়ছে, কত কী মন্তব্য করছে। ওরাও নাম পড়লে—একখানার নাম ড্যালহাউসি, একখানার নাম ইরাবতী, একখানার নামের কোন মানে হয় না—কিলাওয়াজা—অন্ততঃ ওরা তো কোন মানে খুঁজে পেলে না। একখানা জাপানী এন. ওয়াই. কে লাইনের জাহাজ হিদ্‌জুমারু, উদীয়মান সূর্য্য আঁকা পতাকা ওড়ানো।

দুদিনের দিন রাত্রে বেসিন লাইট হাউসের আলো ঘুরে ঘুরে জলতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর সমুদ্র-পীড়ায় কাতর হয়ে পড়েছে, কিন্তু বিমল ঠিক খাড়া আছে, যদিও তার খাওয়ার ইচ্ছা প্রায় লোপ পেয়েছে। সুরেশ্বর তো কিছুই খেতে পারে না, যা খায় পেটে তলায় না, দিনরাত কেবিনে শুয়ে আছে, মাথা তুলবার ক্ষমতা নেই।

জাহাজের স্টুয়ার্ড এসে দেখে গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

কি বিশ্রী জিনিস এই পরের চাকরি! এত হাঙ্গামা পোয়ানো কি ওর পোষায়? দিব্যি ছিল, বাড়ীতে খাচ্ছিল দাচ্ছিল। চাকরির খাতিরে বিদেশে বেরিয়ে কি ঝকমারি দেখো তো!

বিমল আপন মনে ডেকে বসে বই পড়ে, স্ফূর্ত্তিতে শিস্ দেয়, গান করে। সুরেশ্বরকে ঠাট্টা করে বলে—হোয়াট্ এ গুড সেলার ইউ আর!

তিন দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত জাহাজে চলবার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এলিফ্যাণ্ট পয়েণ্টের লাইট হাউস দেখা গেল।

বেলাভূমি যদিও দেখা যায় না, তবুও সমুদ্রের জলের ঘোর নীল রং ক্রমশঃ সবুজ হয়ে ওঠাতে বোঝা গেল যে ডাঙা বেশী দূরে নেই। ডাঙার গাছপালা মাঝে মাঝে জলে ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার অল্প পরেই জাহাজ ইরাবতীর মোহনায় প্রবেশ করলে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সাইরেন্ বেজে উঠল, রয়েল মেলের নিশান উঠিয়ে দেওয়া হোল মাস্তুলে। সন্ধ্যাকাশ তখনও

যেন লাল। সন্ধ্যা তারার সঙ্গে চাঁদ উঠেছে পশ্চিমাকাশে—ইরাবতীবক্ষে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

জাহাজ কিছুদূর গিয়ে নোঙর ফেললে। রাত্রে ইরাবতী নদীতে বড় জাহাজ চালানোর নিয়ম নেই। রেঙ্গুনের পাইলট্ রাত্রে জাহাজে থাকবে, সকালে ইরাবতীবক্ষে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

ভোরবেলায় কেবিন থেকে ঘুম-চোখে বেরিয়ে এসে সুরেশ্বর দেখলে জাহাজ চলছে ইরাবতীর দুই তীরের সমতলভূমি ও ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। যতদূর চোখ যায় নিম্ন বঙ্গের মত শস্যশ্যামলা ঘন সবুজ ভূমি, কাঠের ঘর বাড়ী। তারপরেই রেঙ্গুনে পৌছে গেল জাহাজ।

সুরেশ্বর বা বিমল কেউই রেঙ্গুনে নামবে না। সুরেশ্বরের রেঙ্গুনে কাজ আছে বটে কিন্তু সে ফিরবার মুখে। ওরা দুজনেই এ জাহাজ থেকে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে ওদের জিনিসপত্র রেখে শহর বেড়াতে বেরুল।

বেশী কিছু দেখবার সময় নেই। দুপুরের পরেই সিঙ্গাপুরের জাহাজ ছাড়বে, জাহাজের 'পার্সার' বলে দিলে বেলা সাড়ে বারোটার আগেই ফিরে আসতে।

নতুন দেশ, নতুন মানুষের ভিড়। ওরা যা কিছু দেখছে, বেশ লাগছে ওদের চোখে। লেক্, পার্ক ও সোয়েডাগোং প্যাগোডা দেখে ওরা জাহাজে ফিরবার কিছু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিলে।

আবার অকূল সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি।

একদিন সুরেশ্বর বিমলকে বল্লে—দেখ বিমল, কাল রাত্রে বড় একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি।

এ কয়েকদিনের মেলামেশায় তাদের পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা 'তুমি'তে পৌচেছে।

—কি স্বপ্ন?

—তুমি আর আমি ছোট একটা অদ্ভুত গড়নের বজরা নৌকা করে সমুদ্রে কোথায় যাচ্ছি। সে ধরনের বজরা আমি ছবিতে দেখেছি, ঠিক বোঝাতে পারছি নে এখন। তারপর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, খালি ধোঁয়া—বিশ্রী কালো ধোঁয়া—

—আমরা বাঁচলাম তো! না খসলাম?

কথা শেষ করে বিমল হো হো করে হেসে উঠলো। সুরেশ্বর চুপ করে রইল।

বিমল বল্লে—আমি একটা প্রস্তাব করি শোনো। চলো দুজনে সিঙ্গাপুর গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ডাক্তারখানা খুলি। তুমি তোমার কোম্পানীকে বলে ওষুধ আনাবে। বেশ ভাল হবে। আমি ডাক্তারী করবো।

রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ছেড়ে দুই দিন দুই রাত অনবরত যাওয়ার পরে চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল। রেঙ্গুনের মত সমতলভূমি নয়, উঁচু নীচু, যেদিকে চাও সেদিকে পাহাড়। উপকূলের চতুর্দ্দিকেই মাছ ধরবার বিপুল আয়োজন, বড় বড় কালো রঙের খুঁটি দিয়ে ঘেরা, জাল ফেলা। জেলেদের থাকবার টিনের ঘর। পালতোলা জেলে-ডিঙিতে অহরহ তীর আচ্ছন্ন।

পিনাং বন্দরে জাহাজ ঢুকবামাত্রই অসংখ্য সাম্পান এসে জাহাজের চারিধারে ঘিরলে। মাঝিরা সকলেই চীনেম্যান।

ওরা সাম্পানে করে বন্দরে নেমে শহর দেখতে বার হোল। ঘণ্টা হিসাবে দুজনে একখানা রিকৃশা করলে—ঘণ্টা-পিছু কুড়ি সেণ্ট্ ভাড়া।

পিনাঙে ঠিক সমুদ্রতীরে একটু সমতলভূমি, চারিদিকেই পাহাড়, অনেকগুলো ছোট নদী এই সব পাহাড় থেকে বার হয়ে শহরের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

ওরা একটা পাহাড়ের ওপর চীনা মঠ দেখতে গেল। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, বাগান পুরোহিতের ঘর, দেবমন্দির স্তরে স্তরে উঠেছে। বাগানের চারিদিকে নালায় ঝরণায় স্রোতে কত পদ্ম গাছ। মন্দিরের মধ্যে টেওস্ট ধর্ম্মজ দেবমূর্তি।

এদের মধ্যে একটি মূর্ত্তি দেখে সুরেশ্বর চমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কোন চীনা দেবতার মূর্ত্তি, ভ্রূকুটি-কুটিল, কঠিন, রুক্ষ মুখ। হাতে অস্ত্র, দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত আক্রোশপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস করতে উদ্যত।

বিমল বল্লে—কি, দাঁড়ালে যে ?

—দেখছো মূর্ত্তিটা ? মুখচোখের কি ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাব দেখেছো ?

মন্দিরের পুরোহিতদের জিগ্যেস করে জানা গেল ওটি টেওস্ট রণ-দেবতার মূর্ত্তি।

হঠাৎ সুরেশ্বর বল্লে—চল, এখান থেকে চলে যাই।

বিস্মিত বিমল বল্লে—ওকি। পাহাড়ের উপরে যাবে না ?

সুরেশ্বর আর উঠতে অনিচ্ছুক দেখে বিমল ওকে নিয়ে জাহাজে ফিরলো।

পথে বল্লে—তোমার কি হল হে সুরেশ্বর ? ও রকম মুখ গম্ভীর করে মনমরা হয়ে পড়লে কেন ?

সুরেশ্বর বল্লে—কই না, ও কিছু নয়, চলো।

জাহাজে ফিরে এসেও কিন্তু সুরেশ্বরের সে ভাব দূর হল না। ভাল করে কথা কয় না, কি যেন ভাবছে। নৈশভোজের টেবিলে ও ভাল করে খেতেও পারলে না।

রাত ন'টার পরে পিনাং থেকে জাহাজ ছাড়লে সুরেশ্বর যেন কিছু স্বস্তি অনুভব করলে। পিনাং বন্দরের জেটির আলোকমালা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওরা ডেকে এসে বসেছে নৈশভোজের পরে।

হঠাৎ সুরেশ্বর বলে উঠলো—উঃ, কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম ওই চীনাদেবতার মূর্ত্তিটা দেখে !

বিমল হেসে বল্লে—আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু, সত্যি তুমি এত ভীতু তা তো জানি নে ! স্বীকার করি মূর্ত্তিটা অবিশ্যি কমনীয় নয়, তবুও—

সুরেশ্বর গম্ভীর মুখে বল্লে—আমার মনে হচ্ছে কি জানো বিমল ? আমরা যেন এই দেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছি। সব সময় সব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা ঐ চীনে মন্দিরে গিয়ে ভাল কাজ করিনি।

পিনাং থেকে ছাড়বার তিন দিন পরে জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌছুলো।

দূর থেকে সিঙ্গাপুরের দৃশ্য দেখে বিমল ও সুরেশ্বর খুব খুশী হয়ে উঠলো। শুধু মালয় উপদ্বীপ কেন, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটি প্রধান বন্দর, বন্দরে ঢুকবার সময়েই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় জলের মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তাদের ওপর সুদৃশ্য ঘর-বাড়ী—চারিদিকে পিনাংএর মত মাছ ধরবার প্রকাণ্ড আড্ডা। নীল রংএ চিত্রিত চক্ষু ড্রাগন ঝোলানো পাল-তোলা সেই চীনা জাঙ্ক ও সাম্পানে সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বন্দরে ঢুকবার মুখেই একখানা বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ প্রায় মাঝ-দরিয়ায় নোঙর করে আছে কয়লা নেবার জন্যে। তার প্রকাণ্ড ফোকরওয়ালা দুই কামান ওদের দিকে মুখ হাঁ করে আছে যেন ওদের গিলবার লোভে। আরও নানা ধরনের জাহাজ, ষ্টীমলঞ্চ, সাম্পান, মালয় নৌকার ভিড়ে বন্দরের জল দেখা যায় না। যে দিকে চোখ পড়ে শুধু নৌকো আর জাহাজ, বিমলের মনে হলো কলকাতা এর কাছে কোথায় লাগে? তার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বড় বন্দর।

চারিধারেই বারসমুদ্র, বন্দরের মুখে ছোট-বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে আর দু'খানা বড় যুদ্ধ-জাহাজ ওদের চোখে পড়লো। বন্দরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তিন মাইলের পরে বিখ্যাত নৌ-বহরের আড্ডা। দূর থেকে দেখা যায়, বড় বড় ইস্পাতের খুঁটি, বেতারের মাস্তুলে সেদিকটা অরণ্যের সৃষ্টি করেছে।

জাহাজের কয়লা নেবার একটা প্রধান আড্ডা সিঙ্গাপুর। পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে পূর্ব্বগামী সব রকম জাহাজকেই এখানে দাঁড়াতে হবে কয়লার জন্যে। এর বিপুল ব্যবস্থা আছে, বহুদূর ধরে পর্ব্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হয়েছে, যেন সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন কয়লার পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে।

বন্দরে জাহাজ এসে থামলে সুরেশ্বর ও বিমল চীনে কুলি দিয়ে মালপত্র এনে দুখানা রিক্‌শা ভাড়া করলে। ওরা দুজনেই একটা ভারতীয় হোটেল দেখে নিয়ে সেখানে উঠলো। বিকালের দিকে সুরেশ্বর তার ওষুধের ফার্মের কাজে কয়েক জায়গায় ঘুরে এল, বিমল যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরেশ্বর জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে? অমনভাবে বসে কেন?

বিমল বল্লে—ভাই এতদূরে পয়সা খরচ করে আসাই মিথ্যে হোল। আমি যা ভেবে এখানে এলুম তা হবার কোনো আশা নেই। যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিলাম, তাঁর নিজের ভাগ্‌নে ডাক্তার হয়ে এসে বসেছে। আমার কোনো আশাই নেই।

সুরেশ্বর বল্লে—তাতে কি হয়েছে? এতবড় সিঙ্গাপুর শহরে দু'জন বাঙালী ডাক্তারের স্থান হবে না? ক্ষেপেছ তুমি? আমি ওষুধের দোকান খুলছি, তুমি সেখানে ডাক্তার হয়ে বোসো। দেখো কি হয় না হয়।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে হলো তাদের ঘরের বাইরে জানলার কাছে কে যেন একজন ওদের কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

বিমল বল্লে—ও কে ?

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তার মনে হলো একজন যেন বারান্দার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে ফিরে এসে বল্লে—ও কিছু না, কে একজন গেল।

তারপর ওরা দু'জনে অনেক রাত পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একখানা ওষুধের দোকান খুলবার সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করলে। বিমল হাজারখানেক টাকা এখন ঢালতে প্রস্তুত আছে, সুরেশ্বর নিজেদের ফার্মকে বলে ওষুধের যোগাড় করবে।

বড় ডাকঘরের ক্লক্ টাওয়ারে ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজলো। হোটেলের চাকর এসে দু'জনের খাবার দিয়ে গেল। শিখের হোটেল, মোটা মোটা সুস্বাদু রুটি ও মাংস, আস্ত মাসকলায়ের ডাল ও আলুর তরকারী—এই আহার্য্য। সারাদিনের ক্লান্তির পরে তা অমৃতের মত লাগলো ওদের।

আহারাদি সেরে সুরেশ্বর শোবার যোগাড় করতে যাচ্ছে, এমন সময় বিমল হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

সুরেশ্বর বল্লে—কি ?

বিমল ফিরে এসে বিছানায় বসলো। বল্লে—আমার ঠিক মনে হোল কে একজন জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কাউকে দেখলুম না কিন্তু—

সুরেশ্বরের কি রকম সন্দেহ হোল। বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, নানা রকম বিপদের আশঙ্কা এখানে পদে পদে। সে বল্লে, সাবধান থাকাই ভালো। দরজা বেশ করে বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়। রাতও হয়েছে অনেক।

সুরেশ্বরের ঘুম ছিল সজাগ। তাই অনেক রাত্রে একটা কিসের শব্দে ও ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসলো সন্দিগ্ধ মন নিয়ে।

বিছানার শিয়রের দিকে জানালাটা খোলা ছিল। বিছানা ও জানলার মধ্যে একটা ছোট টেবিলের দিকে নজর পড়াতে সুরেশ্বর দেখলে টেবিলটার ওপর ঢিল জড়ানো একটুকরো কাগজ। এটাই বোধ হয় একটু আগে জানলা দিয়ে এসে পড়েছে, তার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘরে আলো জ্বালাই ছিল। কাগজের টুকরোটা ও পড়লে, তাতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে—

আপনারা ভারতীয়! যতদূর জানতে পেরেছি সিঙ্গাপুরে আপনারা নবাগত ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। কাল দুপুর বেলা বোটানিক্যাল গার্ডেনে অর্কিডের ঘরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যে বড় ডুরিয়ান্ ফলের গাছ আছে, তার নীচে অপেক্ষা করবেন দুজনেই। আপনাদের দুজনের পক্ষেই লাভজনক কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। আসতে ইতস্ততঃ করবেন না।

লেখার নীচে নাম-সই নেই।

বিমলও কাগজখানা পড়লে।

ব্যাপার কি ? এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

সুরেশ্বরই প্রথমে কথা বল্লে। বল্লে—কেউ তামাশা করেছে বলে মনে হচ্ছে, কি বলো? কিন্তু তাই বা করবে কে, আমাদের চেনেই বা কে?

বিমল চিন্তিত মুখে বল্লে—কিছু বুঝতে পারছি নে। কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি?

—কি খারাপ উদ্দেশ্য? আমরা যে খুব বড় লোক নই, তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়া হোটেল বা এম্পায়ার হোটেলে না উঠে এখানে উঠেছি। টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়েও যাচ্ছিনে। সুতরাং কি করতে পারে আমাদের?

সে রাত্রের মত তু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে বিমল বল্লে—চল যাওয়াই যাক। এত ভয় কিসের? বোটানিক্যাল গার্ডেন তো আর নির্জন মরুভূমি নয়, সেখানে কত লোক বেড়ায় নিশ্চয়ই। তু'জনকে খুন করে দিনের আলোয় টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এত ভরসা কারু হবে না।

তুপুরের পর হোটেল থেকে বেরিয়ে কুয়ালা জোহোর স্ট্রীটের মোড় থেকে একখানা রিক্‌শা ভাড়া করলে। ম্যাসিডন্ কোম্পানীর সোডাওয়াটারের দোকানের সামনে একজন চীনা ভদ্রলোক ওদের রিক্‌শা থামিয়ে চীনে রিক্‌শাওয়ালাকে কি জিগ্যেস করলে। তারপর উত্তর পেয়ে লোকটি চলে গেল। বিমল রিক্‌শাওয়ালাকে ইংরিজীতে জিগ্যেস করলে—কি বল্লে তোমাকে হে?

রিক্‌শাওয়ালা বল্লে—জিগ্যেস করলে সওদাগরী কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—তুমি কি বল্লে?

—আমি কিছু বলিনি। বলবার নিয়ম নেই আমাদের। সিঙ্গাপুর খারাপ জায়গা, মিস্টার।

বোটানিক্যাল গার্ডেন শহর ছাড়িয়ে প্রায় তু'মাইল দূরে। শহর ছাড়িয়েই প্রকাণ্ড একটা কিসের কারখানা। তারপর পথের তু'ধারে ধনী মালয়, ইউরোপীয় ও চীনাদের বাগান-বাড়ী। এমন ঘন সবুজ গাছপালার সমাবেশ ও শোভা, বিমল ও সুরেশ্বর বাংলাদেশের ছেলে হয়েও দেখেনি—কারণ বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী এই সব স্থানের মত উদ্ভিদ সংস্থান ও প্রাচুর্য্য পৃথিবীর অন্য কোথাও হওয়া সম্ভব নয়।

মাঝে মাঝে রবারের বাগান।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌছে ওরা রিক্‌শাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করলে। প্রকাণ্ড বড় বাগান। কত ধরনের গাছপালা, বেশির ভাগই মালয় উপদ্বীপজাত। বড় বড় রুটিফলের গাছ, ডুরিয়ান্ পাকবার সময় বলে ডুরিয়ান্ ফলের গাছের নীচে দিয়ে যেতে পাকা ডুরিয়ান্ ফলের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নারিকেলকুঞ্জ একটি অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় স্থান। এত উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের এমন ঘন সন্নিবেশ ওরা কোথাও দেখে নি। নিস্তব্ধ তুপুরে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় কি পাখী ডাকছে সুস্বরে, আকাশ সুনীল, জায়গাটা বড় ভাল লাগলো ওদের। অর্কিড হাউস্ খুঁজে বার করে তার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সত্যই খুব বড় একটা

ডুরিয়ান ফলের গাছ দেখা গেল। সে গাছেরও ফল পেকে যথারীতি দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

বিমল বললে—একটু সতর্ক থাকো। দেখা যাক না কি হয়!

সবুজ টিয়ার ঝাঁক গাছের ডালে ডালে উড়ে বসছে। একটা অপূর্ব শান্তি চারিদিকে — ওরা দুজনে ডুরিয়ান গাছের ছায়ায় শুকনো তালপাতা পেতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। মিনিট-তিনও হয় নি, এমন সময় কিছুদূরে এক মাদ্রাজী ও একজন চীনা ভদ্রলোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর ও বিমল দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো।

ওরা কাছে এসে অভিবাদন করলে। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুবেশ, তিনি বেশ পরিষ্কার ইংরেজীতে বললেন—আপনারা ঠিক এসেছেন তাহলে। ইনি মিঃ আ-চিন্ স্থানীয় কন্‌সুলেট অপিসের মিলিটারী অ্যাটাসে। আমার নাম সুব্বা রাও।

পরস্পরের অভিবাদন-বিনিময় শেষ হবার পর চারজনই সেই ডুরিয়ান গাছের তলায় বসলো। সমগ্র বোটানিকেল গার্ডেনে এর চেয়ে নির্জ্জন স্থান আছে কিনা সন্দেহ।

সুব্বা রাও বললেন—প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করি —আপনারা দুজনেই উপাধিধারী ডাক্তার তো? সুরেশ্বর বললে, সে ডাক্তার নয়, ঔষধ-ব্যবসায়ী। বিমল পাশকরা ডাক্তার।

এ কথার উত্তরে আ-চিন্ বললে—দুজনকেই আমাদের দরকার। একটা কথা প্রথমেই বলি, আমাদের দেশ ঘোর বিপন্ন। আমরা ভারতের সাহায্য চাই। জাপান অন্যায়ভাবে আমাদের আক্রমণ করছে, দেশে খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। আমরা গোপনে ডাক্তারি ইউনিট গঠন করে দেশে পাঠাচ্ছি। কারণ আইনতঃ বিদেশ থেকে আমরা তা সংগ্রহ করতে পারি না। আপনারা বুদ্ধের দেশের লোক, আমরা আপনাদের মন্ত্রশিষ্য। আমাদের সাহায্য করুন। এর বদলে আমাদের দরিদ্র দেশ দুশো ডলার মাসিক বেতন ও অন্যান্য খরচ দেবে। এখন আপনারা বিবেচনা করে বলুন আপনাদের কি মত?

সুরেশ্বর বললে—যদি রাজী হই, কবে যেতে হবে।

—এক সপ্তাহের মধ্যে। লুকিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন হংকং যাবার পাশপোর্ট আপনারা পাবেন না। আমার গভর্নমেণ্ট সে ব্যবস্থা করবেন ও আপনাদের এখানে এই এক সপ্তাহ থাকার খরচ বহন করবেন। আপনারা যদি রাজী হন, আমার গভর্নমেণ্ট আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সুব্বা রাও বললেন—জবাব এখুনি দিতে হবে না। ভেবে দেখুন আপনারা। আজ সন্ধ্যাবেলা জোহোর স্ট্রীটের বড় পার্কের ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের কাছে আমি ও আ-চিন্ থাকবো। কিন্তু দয়া করে কাউকে জানাবেন না।

ওরা চলে গেলে বিমল বল্লে—কি বল সুরেশ্বর, শুনলে তো সব ব্যাপার?

সুরেশ্বর বল্লে—চল যাই। এখন আমাদের বয়স কম, দেশবিদেশে যাবার তো এই সময়। একটা বড় যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল ইউনিটে থাকলে ডাক্তার হিসেবে তোমারও অনেক জ্ঞান হবে। চীনদেশটাও দেখা হয়ে যাবে পরের পয়সায়।

বিমল বল্লে—আমার তো খুবই ইচ্ছে, শুধু তুমি কি বল তাই ভাবছিলুম।

সন্ধ্যাবেলায় ওরা এসে জোহোর স্ট্রীটের পার্কের ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের কোণে আ-চিন্ ও সুব্বা রাওয়ের সাক্ষাৎ পেলে। ওদের সব কথাবার্ত্তা শুনে আ-চিন্ বল্লে—তা হলে আপনাদের রওনা হতে হবে কাল রাত্রে। ক'দিন আপনাদের হোটেলের বিল যা হয়েছে তা কাল বিকেলেই চুকিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করবেন। বাকী ব্যবস্থা আমি করবো। আর এই নিন্—

কথা শেষ করে বিমলের হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে আ-চিন ও সুব্বা রাও চলে গেলেন।

বিমল খুলে দেখলে কাগজখানা একশো ডলারের নোট্।

পরদিন সকাল থেকে ওরা বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা, কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রইল। বৈকালে নির্দ্দেশমত আবার ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের কোণে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরেই আ-চিন্ এলেন। বিমলকে জিগ্যেস কল্লেন—

—আপনাদের জিনিসপত্র ?

—হোটেলে আছে।

—হোটেলে রেখে ভাল করেন নি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে জিনিসপত্র তুলে এখানে নিয়ে আসুন। আমি এখানেই থাকি। পার্কের কোণে ছোট রাস্তাটার ওপর গাড়ী দাঁড় করিয়ে হর্ন দিতে বলবেন। আপনাদের আর কিছু লাগবে ?

—না, ধন্যবাদ। যা দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট।

আধঘণ্টার মধ্যেই বিমল ও সুরেশ্বর ট্যাক্সিতে ফিরে পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতে লাগলো।

আ-চিন্ এসে ওদের গাড়ীতে উঠে মালয় ভাষায় ড্রাইভারকে কি বল্লেন। সে ট্যাক্সি বড় পোস্ট আফিসের সামনে এসে দাঁড় করালো।

বিমল বল্লে—এখানে কি হবে ?

বিমলের কথা শেষ হতে না হতে ওদের ট্যাক্সির পাশে একখানা নীল রংয়ের হুইপেট গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ষ্টিয়ারিং ধরে আছে একজন চীনা ড্রাইভার।

আ-চিন্ বল্লেন—উঠুন পাশের গাড়ীতে।

পরে তাঁর ইঙ্গিত-মত দু'জন ড্রাইভারে মিলে জিনিসপত্র সব নতুন গাড়ীখানায় তুলে দিলে। গাড়ী যখন তীরবেগে সিঙ্গাপুরের অজানা বড় রাস্তা বেয়ে চলেছে, তখন বিমল বল্লে—অত সদরে দাঁড়িয়ে ও ব্যবস্থা করলেন কেন ? কেউ যদি টের পেয়ে থাকে ?

আ-চিন্ বল্লেন—কেউ করবে না জানি বলেই ঐ ব্যবস্থা। এ সময়ে চীনা ডাক নিতে রোজ কনস্থলেট্ আপিসের লোক ওখানে আসবে সকলেই জানে। আমার পরণে কনস্থলেট্ ইউনিফর্ম, আমি লুকিয়ে কোন কাজ করতে গেলেই লোকে সন্দেহের চোখে দেখবে। সদরে কেউ কিছু হঠাৎ মনে করবে না।

একটু পরেই সমুদ্র চোখে পড়লো—নারিকেল শ্রেণীর আড়ালে। শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা নিভৃত স্থানে এসে গাড়ী একটা বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো। পাশেই নীল সমুদ্র।

আ-চিন্ বল্লেন—এখানে নামতে হবে।

বাংলোর একটা ঘরে ওদের বসিয়ে আ-চিন্ বল্লেন—আমি যাই। এখানে নিশ্চিন্তমনে থাকুন। কোনো ভয় নেই। যথাসময়ে আপনাদের খাবার দেওয়া হবে। বাকী ব্যবস্থা সব রাত্রে।

তিনি চলে গেলেন। একটু পরে জনৈক চীনা ভৃত্য ছোট ছোট পেয়ালায় সবুজ চা ও কুমড়োর বিচির কেক্ নিয়ে ওদের সামনে রাখলে।

বিমল বল্লে—এ আবার কি চিজ বাবা? ইঁদুর ভাজা-টাজা নয় তো?

স্থরেশ্বর বল্লে—ইঁদুর নয়, কুমড়োর বিচি, তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইঁদুর খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, নইলে হরিমটর খেয়ে থাকতে হবে চীন দেশে।

কিন্তু কেক্গুলো ওদের মন্দ লাগলো না। চা পানের পরে ওরা বাংলোর চারিধারে একটু ঘুরে বেড়ালে। সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে নির্জ্জন স্থানে সমুদ্রতীরে বাংলোটি অবস্থিত। সমুদ্রের দিকে এক সারি ঝাউ অপরাহ্নের বাতাসে সোঁ সোঁ করছিল। দূরে সমুদ্রবক্ষে অস্তসূর্যের আভা পড়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

স্থরেশ্বর ভাবছিল হুগলী জেলার তাদের সেই গ্রাম, তাদের পুরনো বাড়ী—বাপ মায়ের কথা। জীর্ণ, সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটের পৈঠা বেয়ে মা পুকুরে গা ধুতে নামছেন এতক্ষণ।

জীবনে কি সব অদ্ভুত পরিবর্ত্তনও ঘটে! তিন মাস মাত্র আগে সেও এমনি সন্ধ্যায় ঐ গ্রামের খালের ধারটিতে একা পায়চারি করে বেড়াতো ও কি ভাবে কোথায় গেলে চাকরি পাওয়া যায় সেই ভাবনাতে ব্যস্ত থাকতো। আর আজ কোথায় কতদূরে এসে পড়েছে।

বিমল মুগ্ধ হয়েছিল এই সুদূর-প্রসারী শ্যামল সমুদ্র-বেলার সান্ধ্যশোভার দৃশ্যে। সে ভাবছিল কবি ও ঔপন্যাসিকদের পক্ষে এমন বাংলো তো স্বর্গ—মাথার ওপরকার নীল আকাশ—এই সবুজ ঝাউয়ের সারি—ঐ সমুদ্রবক্ষের ছোট ছোট পাহাড়—সত্যিই স্বর্গ—

গভীর রাত্রে আ-চিন্ এসে ওদের ওঠালেন। একখানা মোটরে আধ মাইল আন্দাজ গিয়ে সমুদ্রতীরের একটা নির্জ্জন স্থানে ওরা জিনিসপত্র সমেত ছোট একটা জালি বোটে উঠলো। দূরে বন্দরের আলোর সারি দেখা যাচ্ছে—অন্ধকার রাত্রি, নির্জ্জন সমুদ্রবক্ষ। কিছুদূরে একটা চীনা জাঙ্ক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল—জালিবোট গিয়ে জাঙ্কের গায়ে লাগলো।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওরা জাঙ্কে উঠলো।

পাটাতনের নীচে একটা ছোট কামরা ওদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কামরাতে একটা চীনা মাদুর বিছানো, বেতের বালিশ, চীনা লণ্ঠন, রঙীন গালার পুতুল, কাঁচকড়ার ফুলের টবে নার্সিসাস ফুলগাছ—এমন কি ছোট খাঁচাসমেত একটি ক্যানারি পাখী।

আ-চিন্ বল্লেন—কামরা আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো?

সুরেশ্বর বল্লে—সুন্দর সাজানো কামরা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আ-চিন্ গম্ভীর ভাবে বল্লেন—ধন্যবাদ আপনাদের। আমাদের বিপন্ন দেশকে দয়া করে আপনারা সাহায্য করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে অজানা ভবিষ্যতের দিকে চলেছেন। ভগবান বুদ্ধের দেশের লোক আপনারা—সব সময়েই আপনারা আমাদের নমস্য। ভগবান বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক।

সুরেশ্বর বল্লে—আপনি তো সঙ্গে যাবেন না—এ নৌকো ঠিক জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে তো?

—সে বিষয় ভাববেন না। এ চীন গবর্নমেণ্টের বেতনভোগী জাঙ্ক্। তিন দিন পরে একখানা চীনা জাহাজ আপনাদের তুলে নেবে। কারণ সামনে দুস্তর চীন সমুদ্র। জাঙ্কে সে সমুদ্র পার হওয়া তো যাবে না।

আ-চিন্ বিদায় নেবার পরে নৌকা নোঙর ওঠালে। জাঙ্কের সুসজ্জিত কামরায় মোমবাতির আলো জ্বলছে। অনুকূল বায়ুভরে চীন সমুদ্র বেয়ে নৌকা চলেছে—ঘন অন্ধকার, কেবল আলোকোৎক্ষেপক ঢেউগুলি যেন জোনাকির ঝাঁকের মত জ্বলছে।

বিমল বল্লে—এখান থেকে হংকং সতেরোশো আঠরোশো মাইল দূর। একে ভীষণ চীনসমুদ্র—আর এই জাঙ্ক তো এখানে মোচার খোলা। প্রাণ নিয়ে এখন ডাঙ্গায় পা দিতে পারলে হয়।

সুরেশ্বর বল্লে—এসে ভাল করনি, বিমল। ঝোঁকের মাথায় তখন দুজনেই আ-চিনের কথায় ভুলে গেলুম কেমন—দেখলে? এই জাঙ্কে যদি তোমায় আমায় খুন করে এরা জলে ভাসিয়ে দেয়, এদের কে কি করবে? কেউ জানে না আমরা কোথায় আছি। কেউ একটা খোঁজ পর্য্যন্ত করবে না।

বিমল বল্লে—ও সব কথা ভেবে কেন মন খারাপ কর? বাইরে গিয়ে সমুদ্রের দৃশ্যটা একবার দেখ। ফস্‌ফোরেসেণ্ট ঢেউগুলো কি চমৎকার দেখাচ্চে?

মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে। ওগুলো কি? ওরা কাউকে কিছু বলতে পারে না, ইংরাজি ভাষা কে জানে নৌকায়, তা ওদের জানা নেই। রাত্রে ওদের ঘুম হোল না। ক্রমে পুবদিক ফর্সা হয়ে এল, রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরে সূর্য্য উঠল।

সকাল থেকে নৌকা ভয়ানক নাচুনি ও দুলুনি শুরু করে দিল। চীন সমুদ্র অত্যন্ত বিপজ্জনক, সর্ব্বদা চঞ্চল, ঝড় তুফান লেগেই আছে। ওরা সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়ে কামরার মধ্যে ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। আহার বিহারে রুচি রইল না।

সেদিন বিকেলে এক মস্ত ঢেউয়ের মাথায় একটি কাটল্ ফিশ এসে পড়ল জাঙ্কের পাটাতনে। সেটা তখনও জ্যান্ত, পালাবার আগেই চীনা মাঝিরা ধরে ফেললে।

জাঙ্কে যা খাবার দেয়, সে ওদের মুখে ভাল লাগে না। ভাত ও সুঁটকি মাছের তরকারী। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত দুটি বাঙালী যাত্রীর পক্ষে চীনা ভাত তরকারী খাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সুরেশ্বর বল্লে—ঝকমারি করেছি এসে, ভাই। না খেয়ে তো দেখছি আপাততঃ মরতে হবে।

তৃতীয় দিন দুপুরে দূরে দিগ্বলয়ে একখানা বড় স্টীমারের ধোঁয়া দেখা গেল। ওরা দেখলে জাঙ্কের সারেঙ্ দূরবীন দিয়ে সেদিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে কি আদেশ দিলে, মাঝিমাল্লারা পাল নামিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আবার উল্টোদিকে যাবে নাকি? ব্যাপার কি?

সুরেশ্বর সারেঙ্‌কে জিগ্যেস্ করলে—নৌকা ঘোরাচ্ছ কেন?

সারেঙ্ দূরের অস্পষ্ট জাহাজটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বল্লে—ইংলিশ ক্রুজার, মিস্টার, ভেরি বিগ্ ক্রুজার—বিগ্ গান—

সুরেশ্বর বল্লে—তাতে তোমার ভয় কি? ওরা তোমাদের কিছু বলতে যাবে কেন?

কিন্তু সুরেশ্বর জানতো না সারেঙএর আসল ভয়ের কারণ কোনখানে। চীনা সমুদ্রে চীনা বোম্বেটের উপদ্রব নিবারণের জন্যে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ সর্ব্বপ্রকার চীনা নৌকা, জাহাজ ও জাঙ্কের ওপর—বিশেষ করে বন্দর থেকে দূরে বার-সমুদ্র দিয়ে যে সব যায়—তাদের ওপর খরদৃষ্টি রাখে। ওদের জাঙ্ককে দেখে সন্দেহ হোলেই থামিয়ে খানাতল্লাস করবে। তা হোলে এ জাঙ্কে যে বেআইনি আফিম রয়েছে পাটাতনের নীচে লুকোনো—তা ধরা পড়ে যাবে।

চীনা মাঝিগুলো অতিশয় ধূর্ত্ত। যুদ্ধজাহাজ দূর থেকে যেমনি দেখা, অমনি জাঙ্ক মাঝ সমুদ্রে ঝুপ করে নোঙর নামিয়ে দিলে ও পাটাতনের নীচে থেকে মাছ ধরার জাল বার করে সমুদ্রে ফেলতে লাগলো—দেখতে দেখতে জাঙ্কখানা একখানি চীনা জেলে-ডিঙিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।

বিমল বল্লে—উঃ, কি চালাক দেখেছ!

সুরেশ্বর বল্লে—চালাক তাই রক্ষে—নইলে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এসে যদি আমাদের ধরতো—! বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণ করার অপরাধে তোমায় আমায় জেল খাটতে হবে, সে হুঁশ আছে?

ধূসরবর্ণের বিরাটকায় ব্রিটিশ ক্রুজারখানা ক্রমেই নিকটে এসে পড়ছে। এখন তার বড় ফোকরওয়ালা কামানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে একটা ধূসরবর্ণের পর্ব্বত যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

যদি কোনো সন্দেহ করে একটি বড় কামান তাদের দিকে দাগে—আর ওদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে?

চীনা মাঝিমাল্লাগুলো মহা উৎসাহে ততক্ষণ জাল ফেলে মাছ ধরছে। সুরেশ্বর ও বিমলের বুক টিপ্ টিপ্ করছে উদ্বেগে ও উত্তেজনায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যুদ্ধজাহাজখানা ওদের দিকে লক্ষ্যই করলে না। ওদের প্রায় একমাইল দূরে দিয়ে সোজা পূর্ণবেগে সিঙ্গাপুরের দিকে চলে গেল।

জাঙ্ক সুদ্ধ লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

দুপুরের পরে দূরে একটি ছোট দ্বীপ দেখা গেল।

জাঙ্ক্ গিয়ে ক্রমে দ্বীপের পাশে নোঙর করলে। বিমল ও স্থরেশ্বর শুনলে নৌকার জল ফুরিয়ে গেছে—এবং এখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায়।

ওরা সেখানে থাকতে থাকতে আর একখানা বড় জাঙ্ক্ বিপরীত দিক থেকে এসে ওদের কাছেই নোঙর করলে।

বিমলদের জাঙ্কের মাঝিরা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়লো নবাগত নৌকাখানা দেখে। সকলেই ঘন ঘন চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে চায়—যদিও ভয়ের কারণ যে কি তা স্থরেশ্বর বা বিমল কেউ বুঝতে পারলে না।

কিন্তু একটু পরে সেটা খুব ভাল করেই বোঝা গেল।

ও নৌকা থেকে দশ-বারোজন গুণ্ডা ও বর্ব্বর আকৃতির চীনেম্যান এসে ওদের জাঙ্ক্ ঘিরে ফেললে। সকলের হাতেই বন্দুক, কারো হাতে ছোরা।

ওদের জাঙ্কের কেউ কোনো রকম বাধা দিলে না—দেওয়া সম্ভবও ছিল না। দস্যুরা দলে ভারী, তাছাড়া অত বন্দুক এ নৌকায় ছিল না। সকলের মুখ বেঁধে ওরা নৌকায় যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়ে নিজেদের জাঙ্কে ওঠালে। বিমল ও স্থরেশ্বরের কাছে যা ছিল, সব গেল। আ-চিন্ প্রদত্ত একশো ডলারের নোট্খানা পর্য্যন্ত—কারণ সেখানা ভাঙাবার দরকার না হওয়ায় ওদের বাক্সেই ছিল।

চীন সমুদ্রের বোম্বেটের উপদ্রব সম্বন্ধে বিমল ও স্থরেশ্বর অনেক কথা শুনেছিল। সিঙ্গাপুরে আরও শুনেছিল যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় সমস্ত নৌকো-জাহাজ হংকংএর নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে জড় হচ্ছে—এদিকে স্থতরাং বোম্বেটেদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

চীনা ও মালয় জলদস্যুরা শুধু লুঠপাট করেই ছেড়ে দেয় না—যাত্রীদের প্রাণ নষ্টও করে। কারণ এরা বেঁচে ফিরে গিয়ে অত্যাচারের সংবাদ সিঙ্গাপুর বা হংকংএ প্রচার করলেই চীন ও ও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কড়াকড়ি পাহারা বসাবে সমুদ্রে। 'মরা মানুষ কোনো কথা বলে না'—এ প্রাচীন নীতি অনেক ক্ষেত্রেই বড় কাজ দেয়।

দেখা গেল বর্ত্তমান দস্যুরা এ নীতি ভাল ভাবেই জানে। কারণ জিনিসপত্র ওদের জাঙ্কে রেখে এসে ওরা আবার ফিরে এল বিমলদের নৌকায়—যেখানে পাটাতনের ওপর মাঝিমাল্লার দল সারি সারি মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

বিমল ছিল নিজের কামরায়। স্থরেশ্বর কোথায় বিমল তা জানে না। একজন বদমাইসকে ছোরা হাতে ওর কামরায় ঢুকতে দেখে বিমল চমকে উঠলো।

লোকটা সম্ভবতঃ চীনাম্যান্। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, সার্কাসের পালোয়ানের মত জোয়ান—নীল ইজের আর একটা বুক কাটা কোর্ত্তা গায়ে। মুখখানা দেখতে খুব কুশ্রী নয়, কিন্তু কঠিন ও নিষ্ঠুর। ওর হাতে অস্ত্রখানা বিমল লক্ষ্য করে দেখলে ঠিক ছোরা নয়, মালয় উপদ্বীপে যাকে 'ক্রিস্' বলে তাই। যেমনি চক্‌চকে তেমনি সেখানা ক্ষুরধার বলে মনে হোল!

সে ক্রিস্খানা বিমলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে দেখিয়ে বল্লে—আমি তোমাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি, কিছু মনে করো না।

বিমলের মুখ বাঁধা, সে কি কথা বলবে ?

লোকটা পকেট থেকে একটা চামড়ার থলি বার করে সেটার মুখ খুলে বিমলের চোখের সামনে মেলে ধরলে। শুক্‌নো আমচুরের মত কতকগুলো কি জিনিস তার মধ্যে রয়েছে। বিমল অবাক হয়ে ভাবছে এ জিনিসগুলো কি, বা তাকে এগুলি দেখানোর সার্থকতাই বা কি —এমন সময় লোকটা একটা শুক্‌নো আমচুর বার করে ওর নাকের সামনে ধরে বল্লে— চিনতে পারলে না কি জিনিস ?

বিমল এতক্ষণে জিনিসটা চিনতে পারলে এবং চিনে ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠলো। সেটা একটা কাটা শুক্‌নো কান, মানুষের কান ! লোকটা হা হা করে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্লে—বুঝেছ এবার ? হ্যাঁ, ওটা আমার একটা বাতিক—মানুষের কান সংগ্রহ করা। তোমাকেও তোমার কান দুটির জন্যে একটুখানি কষ্ট দেবো। আশা করি মনে কিছু করবে না। এসো, একটু এগিয়ে এসো দেখি।

বিমল নিরুপায় মুখ দিয়ে একটা কথা বার করবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই তার। এক মুহূর্ত্তে তার মনে হোল হয়তো সুরেশ্বরের সমানই অবস্থা ঘটেছে, এতক্ষণে তারও অশেষ দুর্দ্দশা হচ্ছে এই পীতবর্ণ বর্ব্বরদের হাতে।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকে এরা বেশ আয়ত্ত করেছে বটে !

লোকটা সময়ের মূল্য বোঝে, কারণ কথা শেষ করেই বুদ্ধশিষ্যের এই বিচিত্র নমুনাটি চক্‌চকে ক্রিস্‌খানা হাতে করে এগিয়ে এল—বিমলের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল—মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ বার হতে চেয়েও হোল না, সে প্রাণপণে দুই চোখ বুজলে।...

তীক্ষ্ণ ক্রিসের স্পর্শ খুব ঠাণ্ডা—কতটা ঠাণ্ডা, খু-উব ঠাণ্ডা কি ? ক্রিসের স্পর্শ এল না, এল তার পরিবর্ত্তে দূর থেকে একট অস্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ—প্রস্তরময় কূলে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল বেগে আছড়ে পড়ার শব্দের মত গম্ভীর।

কতকগুলো ব্যস্ত মানুষের সম্মিলিত দ্রুত পদশব্দ বিমলের কানে গেল—বিস্মিত বিমল চোখ খুলে চেয়ে দেখলে লোকটা ছুটে কামরার বাইরে চলে গেল—চারিদিকে একটি সাড়া শোরগোল, কাঠের পাটাতনের ওপর অনেকগুলো পলায়নপর মানুষের দ্রুত পায়ের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।

কি ব্যাপার ? এ আবার কি নতুন কাণ্ড ?

পরক্ষণেই বিমলের মনে হোল তাদের জাঙ্কখানা একটা প্রকাণ্ড দুলুনি খেয়ে একেবারে কাৎ হয়ে পড়বার উপক্রম করেই পরমুহূর্ত্তে ঢেউয়ের তালে যেন আকাশে ঠেলে উঠলো— নোঙরের শিকলে কড়্ কড়্ শব্দে টান ধরলো—মজবুত শেকল না হোলে সেই হেঁচকা টানে ছিঁড়ে যেতো নিশ্চয়ই। একটু পরে বিমলদের নৌকার একজন জোয়ান মাঝি ওর কামরায় ঢুকে হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিলে।

তখনও পাশে কোথায় খুব হৈ চৈ হচ্ছে।

বিমল বল্লে—ব্যাপার কি বল তো ? আমার বন্ধুটি কোথায় ?

মাঝি বল্লে—সে ভালই আছে।

বলেই সে বাইরে চলে গেল। বেশী কথা বলে না এদেশের লোক।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে এসে দেখলে সামনে এক অদ্ভুত ব্যাপার। নবাগত বোম্বেটে জাঙ্কখানা কঠিন প্রস্তরময় ডাঙ্গায় ধাক্কা খেয়ে জখম হয়েচে। আর অল্প দূরেই সমুদ্র-বক্ষে এমন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে যা জীবনে কখনও দেখে নি।

আকাশ থেকে কালো মোটা থামের মত একটা জিনিস নেমে সমুদ্রের জলে মিশে গিয়েছে—সে জিনিসটা আবার চলনশীল—হালকা রবারের বেলুন বা ফানুসের মত অত বড় কালো মোটা থামটা বায়ুর গতির সঙ্গে ধীরে ধীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভেসে চলেছে।

এই সময় সুরেশ্বর ও জাঙ্কের সারেং এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো।

সারেং বল্লে—উঃ, কত বড় জোড়া জলস্তম্ভ, মিস্টার! চীন সমুদ্রে প্রায়ই জলস্তম্ভ হয় বটে কিন্তু এমন জোড়া জলস্তম্ভ আমি কখনো দেখি নি! ঐ জলস্তম্ভটা আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে!

ঐ কালো মোটা থামের মত ব্যাপারটা তাহলে জলস্তম্ভ। ছবিতে দেখেছে বটে। কিন্তু বিমল বা সুরেশ্বর জীবনে এই প্রথম জিনিসটা দেখলে।

কিন্তু ব্যাপারটা ওরা ঠিকমত বুঝতে পারে নি। জলস্তম্ভ ওদের জীবন বাঁচাল কী করে?

বেশী দেরি হোল না ব্যাপারটা বুঝতে। যখন ওরা দেখলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ সারেং নোঙর উঠিয়ে জাঙ্কখানা ডাঙা থেকে প্রায় একশো গজ এনে ফেলেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই তীর ও সমুদ্র উভয়ের ব্যবধান বাড়ছে। সারেং ও মাঝিদের মুখে শোনা গেল এই জলস্তম্ভের জোড়াটি দ্বীপের অদূরে ভেঙে গিয়ে বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে—তাতে বোম্বেটেদের জাঙ্কখানাকে উর্দ্ধে উঠিয়ে সবেগে আছাড় মেরেছে ডাঙার গায়ে। জাঙ্কখানা জখম তো হয়েছেই এবং বোধ হচ্ছে ওদের কতকগুলি লোককেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে।

সারেং বললে—জলস্তম্ভ ভয়ানক জিনিস, মিস্টার। অনেক সময় জাহাজ পর্য্যন্ত বিপদে পড়ে যায়—বড় বড় জাহাজ দূর থেকে কামান দেগে জলস্তম্ভ ভেঙে দেয়। আর বিশেষ করে এই চীন সমুদ্রে, সপ্তাহে দু-একটা বালাই লেগেই আছে।

দ্বীপ ছেড়ে জাঙ্কটা বহুদূরে চলে এসেছে।

আবার অকূল সমুদ্র!

বোম্বেটে জাহাজ ও জলস্তম্ভ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্ত-বিস্তৃত নীলিমার মধ্যে। সুরেশ্বর ও বিমল চুপ করে সমুদ্রের অপরূপ রঙের দিক্ চেয়ে বসে আছে।

সারেং এসে বললে,—মিস্টার, আমরা হংকং থেকে আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু হংকং যাবো না।

সুরেশ্বর বললে—কোথায় যাবো তবে?

—হংকং থেকে পঞ্চাশ মাইল আন্দাজ দূরে ইয়ান্-চাউ বলে একটা ছোট দ্বীপ আছে।

সেখানে আপনাদের নামিয়ে দেবার আদেশ আছে আমার ওপর। হংকং-এর কাছে গেলে বৃটিশ মানোয়ারী জাহাজ আমাদের নৌকো তল্লাস করবে। তোমরা ধরা পড়ে যাবে মিস্টার।

পরদিন দুপুরের পরে ইয়ান্-চাউ পৌছে গেল ওদের নৌকো। ক্ষুদ্র দ্বীপ। আগাগোড়া দ্বীপটি যেন একটা ছোট পাহাড়, সমুদ্রের জল থেকে মাথা তুলে জেগে রয়েছে। এখানে চীন গবর্নমেন্টের একটা বেতারের স্টেশন আছে।

সমস্ত দ্বীপে আর কোন অধিবাসী নেই। ঐ বেতারের স্টেশনের জনকয়েক চীনা কর্ম্মচারী ছাড়া।

দুদিন ওরা সেখানে বেতারের আড্ডায় কর্ম্মচারীদের অতিথি হয়ে রইল। তৃতীয় দিন খুব সকালে ক্ষুদ্র একখানা জাঙ্কে ওদের দশ মাইল দূরবর্ত্তী উপকূলে নিয়ে যাওয়া হোল।

বেতারে এই রকম আদেশই নাকি এসেছে।

এই চীন দেশ! যদি ঢেউ-খেলানো ছাদ-আঁটা চীনা বাড়ী না থাকতো, তবে চীন দেশের প্রথম দৃশ্যটা বাংলা দেশের সাধারণ দৃশ্য থেকে পৃথক করে নেওয়া হঠাৎ যেতো না।

উপকূল থেকে পাচ মাইল দূরে রেলওয়ে স্টেশন। অতি প্রচণ্ড কড়া রৌদ্রে পদব্রজেই ওদের স্টেশনে আসতে হোল। এদেশে ওদের জামাই-আদরে কেউ রাখবে না, কঠিন সামরিক জীবন যে এখন থেকেই শুরু হোল ওদের—এ কথাটা সুরেশ্বর ও বিমল হাড়ে হাড়ে বুঝলে সেই ভীষণ রোদে বিশ্রী ধুলোভরা রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

তার ওপর বেতারের কর্ম্মচারীটি ওদের সঙ্গে ছিল, তার মুখেই শোনা গেল এ সব অঞ্চল আদৌ নিরাপদ নয়।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে চোর ডাকাত ও গুণ্ডার দল যা-খুশি শুরু করেছে। তারা দিনদুপুরও মানে না। স্বদেশী বিদেশীও মানে না। কারো ধন-প্রাণ নিরাপদ নয় আজকাল। দেশ একপ্রকার অরাজক।

শীঘ্রই এর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল পথের মধ্যেই। ওরা একদলে আছে মাত্র চারজন। রৌদ্রে সুরেশ্বরের জল-তেষ্টা পেয়েছিল—চীনা কর্ম্মচারীটিকে ও ইংরাজীতে বল্লে—জল কোথাও পাওয়া যাবে?

রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম বা বস্তি। খানকতক খড়ের ঘর এক জায়গায় জড়ো করা মাত্র। সেই চীনা কর্ম্মচারীর পিছু পিছু ওরা বস্তির দিকে গেল। বিমলের মনে হোল একবার বৈদ্যবাটীর গঙ্গার চরে সে তরমুজ কিনতে গিয়েছিল—এ ঠিক যেন বৈদ্যবাটীর চড়ার চাষী-কৈবর্ত্তদের গাঁ-খানা। একখানা গরুর গাড়ী সামনেই ছিল—তফাতের মধ্যে চোখে পড়লো সেটার গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। গরুর গাড়ীর অত মোটা চাকা বাংলাদেশে হয় না।

ওদের আসতে দেখেই কিন্তু বস্তির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হোল। মেয়ে পুরুষ যে-যার ঘর ছেড়ে ছুটে বেরুলো—এদিক ওদিক দৌড় দিল। চীনা কর্ম্মচারীও তৎপর কম নয়—সেও ছুটে গিয়ে একটি ধাবমানা স্ত্রীলোকের পথ আগলে দাঁড়ালো।

স্ত্রীলোকটি দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে জড়সড় হয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। ব্যাপারটা কি ? সুরেশ্বর ও বিমল অবাক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীলোকের বিপন্ন কণ্ঠের আর্ত্তনাদ বিমল সহ্য করতে পারলে না। ও চেঁচিয়ে বল্লে—ওকে কিছু ব'লো না, মিঃ চংপে—

ততক্ষণ ওদের সঙ্গী চীনা ভাষায় কি একটা বল্লে স্ত্রীলোকটিকে। কথাটা এই রকম শোনাল ওদের অনভ্যস্ত কানে।

—হি চিন্-কিচিন্—চিন্-চিন্ —

স্ত্রীলোকটি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে বল্লে—ই চিন্, কি চিন্, সি চিন—

—কি চিন্, ফি চিন্ ?

—সি চিন্, লি চিন্।

সুরেশ্বর ও বিমল ওদের কথা শুনে হেসেই খুন। কথাবার্ত্তাগুলো যেন ঐ রকমই শোনাচ্ছিল।

তারপর ওরা স্ত্রীলোকটির কাছে পায়ে পায়ে গেল। আহা, যেন মূর্তিমতী দারিদ্র্যের ছবি ! ভারতবর্ষীয় লোকে তবুও স্নান করে, গায়ে মাথায় তেল দেয়, এরা তাও করে না—গায়ে খড়ি উড়ছে, মাথা রুক্ষ, শরীর অন্নাভাবে শীর্ণ ও জ্যোতিহীন। হতভাগ্য মহা চীন, হতভাগ্য ভারতবর্ষ ! দুজনেই দরিদ্র, কেউ খেতে পায় না,—গুরু শিষ্য দুজনের অবস্থাই সমান।

বিমলের মনে মনে এই দরিদ্রা নারী,—এই দরিদ্র, হতভাগ্য, উৎপীড়িত মহা চীনের এই ভয়ার্ত্ত, অসহায় কুঁড়েঘরবাসী চাষীমজুর—এদের প্রতি একটা গভীর অনুকম্পা ও সহানুভূতি জাগলো। মানুষ যখন দুঃখকষ্ট পায়, সব দেশে সর্ব্বকালে তারা এক। চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, এদের মধ্যে দেশের সীমা এখানে মুছে গিয়েছে।

এই অভাগিনী ভয়ব্যাকুলা দরিদ্রা নারী সমগ্র চীন দেশের প্রতীক।

বিমল এসেছে এক হতভাগ্য দেশ থেকে—এই হতভাগ্য দেশকে সাহায্য করতে। সে তা যথাসাধ্য করবে। দরকার হোলে বুকের রক্ত দিয়েও করবে।

স্ত্রীলোকটি যখন বুঝতে পারলে যে এরা ডাকাত নয় বা বিদ্রোহী রেড্ আর্মির লোকও নয়, তখন সে উঠে ঘরে গিয়ে জল নিয়ে এসে সবাইকে খাওয়ালে।

ধাতুপাত্র বা চীনা মাটির পাত্র নেই বাড়ীতে, এত গরীব সাধারণ লোক। লাউয়ের খোলায় জল রেখেছে।

চীনের বিশ্ববিখ্যাত মাটির বাসন, মিং রাজত্বের অপূর্ব্ব প্রাচীন শিল্প, পুতুল, খেলনা, বুদ্ধ, দানব, এসব এই গরীবদের জন্যে নয়।

রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খুব ভিড়। একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন সিন্‌কিউ থেকে সাংহাই যাচ্ছে—প্রত্যেক স্টেশনে আবার নতুন ভর্ত্তি-করা সৈন্যদের ওই ট্রেনেই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুরেশ্বর বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ট্রেনের ছাদের দিকে।

সব কামরার ছাদে কাঁচা ডালপালা চাপানো—কোনোটায় শুক্‌নো খড় বিচালি ছাওয়া।

বিমল বল্লে—এরোপ্লেন পাছে বোমা ফেলে ট্রেনে, তাই ওরকম করেছে বলে মনে হয়!

সাংহাই ৪৫০ মাইল দূরে।

হঠর হঠর করে করে সারাদিন ট্রেন কৃষিক্ষেত্র, অনুচ্চ পাহাড়, গ্রাম আর বস্তি পার হয়ে চলেছে, চলেছে। ট্রেনের গতি মন্দ নয়, পুরোনো আমলের এঞ্জিন বদলে নতুন এঞ্জিন কেনা হয়েছে, বেশ জোরেই ট্রেন যাচ্ছে।

ওদের কামরাতে সাধারণ সৈন্যদল নেই অবিশ্যি। মাত্র জন আষ্টেক লোক, সবাই অফিসার শ্রেণীর, কিন্তু কেউ ইংরিজী জানে না। মহা অসুবিধেয় পড়ে গেল ওরা—কিছু দরকার হলে চাওয়া যায় না, নতুন কিছু দেখলে জিগ্যেস করা যায় না যে সেটা কি।

দুপুরের দিকে একটা ছোট্ট শহরে গাড়ী দাঁড়াল এবং ওদের কামরাতে একজন সাদা সরু একগুচ্ছ লম্বা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক উঠলেন, সঙ্গে তাঁর এগারোটি তরুণ যুবা। এদের সবারই বেশ সুন্দর কমনীয় চেহারা।

বিমল বল্লে—গুড্ মর্নিং স্যার।

বৃদ্ধের মুখ দেখে মনে হয় জগতে তাঁর আপন-পর কেউ নেই। তিনি সবাইর ওপর সন্তুষ্ট, জীবনে সবাইকে ভালবেসেছেন।

তিনি হাসিমুখে ইংরিজিতে বল্লেন—গুড মর্নিং, আপনারা কোথায় যাবেন।

বিমল বল্লে –সাংহাই। আপনারা কি অনেকদূর যাবেন?

—আমরাও যাচ্ছি সাংহাই। আমি এখানকার কলেজের প্রোফেসর। আমার নাম লি। আমি সেখানে যাচ্ছি যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে। এদেরও নিয়ে যাচ্ছি, এরা সবাই আমার ছাত্র। সদানন্দ বৃদ্ধ কথা শেষ করে গর্ব্বিত দৃষ্টিতে তাঁর এগারোটি তরুণ ছাত্রের দিকে চাইলেন। বিমল ও সুরেশ্বরের বড় অদ্ভুত মনে হোল। এই ভয়ানক দিনে ইনি মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে চলেছেন সাংহাইতে, এতগুলি বালকের জীবন বিপন্ন করে।

একটু পরে বৃদ্ধের একটি ছাত্র একটি বেতের বাক্স থেকে কি সব খাবার বার করে সবাইকে খেতে দিলে। বৃদ্ধ সুরেশ্বর ও বিমলকেও তাঁদের সঙ্গে খেতে আহ্বান করলেন।

সুরেশ্বর নিম্নস্বরে বল্লে—খেও না বিমল। ইঁদুর ভাজা কিম্বা আরসুলা-চচ্চড়ি বোধ হয়।

কিন্তু সে সব কিছু নয়। শরবতী লেবুর রস দেওয়া কুমড়োর বীচি ভাজা আর শসার আচার।

বিমল বল্লে, 'প্রোফেসর লি, আপনি সাংহাইতে কোথায় উঠবেন? আমাদের সঙ্গে থাকুন না, আমরা যেখানে থাকবো?' হঠাৎ এরোপ্লেনের আওয়াজ কানে গেল—গাড়ীসুদ্ধ সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জানলার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করলে কোন দিক থেকে আওয়াজটা আসছে।

ছ'খানা এরোপ্লেন সারবন্দী হয়ে উড়ে পূব থেকে পশ্চিমের দিকে আসছে। ট্রেনখানার

বেগ হঠাৎ বড় বেড়ে গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু এরোপ্লেনের সারি ট্রেনের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে চলে গেল শান্তভাবেই।

প্রোফেসর লি দিব্যি নির্বিকার ভাবেই বসে ছিলেন। তিনি বল্লেন—আমাদের গভর্নমেণ্টের এরোপ্লেন।

একটা স্টেশনে প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে নারীকণ্ঠের কান্না শুনে বিমল ও সুরেশ্বর মুখ বাড়িয়ে দেখলে, কতকগুলি সৈন্য একটি দরিদ্রা স্ত্রীলোকের চারিধারে ঘিরে হাসছে—স্ত্রীলোকটির সামনে একটা শূন্য ফলের ঝুড়ি—এদিকে সৈন্যদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা খরমুজ।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, আমরা তো নতুন এদেশে এসেছি, কিছু বুঝি নে এ দেশের ভাষা। বোধ হয় খরমুজওয়ালীর সব ফল এরা কেড়ে নিয়ে দাম দিচ্ছে না। আপনি একবার দেখুন না।

বৃদ্ধ তাঁর এগারোটি ছাত্র নিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে গিয়ে বাধা দিলেন সৈন্যদের। চীনা ভাষায় তুবড়ি ছুটলো উভয় পক্ষেই।

বৃদ্ধের ছাত্রগণও তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দরকার হোলে মারামারি করবে। মারামারি একটা ঘটতো হয়তো, কিন্তু সেই সময় জনৈক চীনা সামরিক অফিসার গোলমাল দেখে সেখানে উপস্থিত হতেই সৈন্যরা খরমুজ রেখে যে যার কামরায় উঠে বসলো। খরমুজওয়ালী গোটাকতক ফল লি ও তাঁর ছাত্রদের খেতে দিলে—বৃদ্ধ তার দাম দিয়ে দিলেন, খরমুজ-ওয়ালীর প্রতিবাদ শুনলেন না।

সন্ধ্যার সময় ট্রেন ফু-চু পৌছুলো।

ফু-চু থেকে অনেকগুলি সৈন্য উঠলো। ট্রেন কিন্তু ছাড়তে চায় না—খবর পাওয়া গেল, সামনের রেলপথে কি একটা গোলমালের দরুন ট্রেন ছাড়বার আদেশ নেই।

এ দেশে সময়ের কোনো মূল্য নেই। চার পাঁচ ঘণ্টা ওদের ট্রেনখানা প্ল্যাট্‌ফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সৈন্যদল নেমে যে যার খুশি-মত স্টেশনে পায়চারি করছে, তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপাশের বাজারের মধ্যে ঢুকে হল্লা করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে।

একটা ছোট ছেলে তারের একরকম যন্ত্র বাজিয়ে গাড়ীতে গাড়ীতে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। প্রোফেসর লি তাকে ডেকে কি জিগ্যেস্ করলেন, তাকে কিছু খাবার দিলেন। তাঁরই মুখে বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে ছেলেটি অনাথ, স্থানীয় আমেরিকান মিশনে প্রতিপালিত হয়েছিল—এখন সেখানে আর থাকে না।

সন্ধ্যার আগে ট্রেন ছাড়লো। সারা রাতের মধ্যে যে কত স্টেশন পার হোল, কত স্টেশনে বিনা কারণে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল—তার লেখাজোখা নেই। এই রকম ধরনের রেলভ্রমণ বিমল ও সুরেশ্বর কখনো করেনি।

ভোরের দিকে ট্রেনখানা এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

বিমল ঘুমুচ্ছিল—ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রেনখানা দাঁড়াতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমল দেখলে দুধারের মাঠে ঘন কুয়াশা হয়েছে, দশহাত দূরের জিনিস দেখা যায়

না—সামনের দিকে লাইনের ওপর আর একখানা ট্রেন যেন দাঁড়িয়ে—কুয়াশায় তার পেছনের গাড়ীর লাল আলো ক্ষীণভাবে জ্বলছে।

প্রোফেসর লি-ও ইতিমধ্যে উঠেছেন।

তিনি বল্লেন—ব্যাপারটা কি?

বিমল বল্লে—সামনে দুখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে—এই তো দেখছি। ঘোর কুয়াশা, বিশেষ কিছু দেখা যায় না।

ট্রেন থেকে লোকজন নেমে দেখতে গেল সামনের দিকে এগিয়ে। খুব একটা গোলমাল যেন শোনা যাচ্ছে সামনে।

সুরেশ্বরও উঠেছিল, বল্লে—চলো বিমল, এগিয়ে দেখে আসি।

প্রোফেসর লি-ও নামলেন ওদের সঙ্গে। দুখানা ট্রেনকে ঘন কুয়াশার মধ্যে অতিক্রম করে রেললাইনের সামনে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়লো তা যেমন বীভৎস, তেমনি করুণ।

সেখানে আর একখানা ছোট সৈন্যবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে—কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানাকে ট্রেন বলে চিনে নেওয়ার উপায় নেই বল্লেই হয়। ছাদ উড়ে গিয়েছে, মোটা মোটা লোহার দণ্ড বেঁকে দুমড়ে লাইনের পাশের খাদে ছিটকে পড়েছে—জানলা-দরজার চিহ্ন বড় একটা নেই। কেবল ইঞ্জিনের কিছু হয় নি। শোনা গেল ট্রেনখানার ওপর বোমা পড়েছে এই কিছুক্ষণ আগে—কিন্তু সুখের বিষয় গাড়ীখানা একদম খালি যাচ্ছিল। এখানা কোনো টাইমটেব্‌লভুক্ত যাত্রী বা সৈন্যবাহী ট্রেন নয়। খালি ট্রেনখানা ফু-চু থেকে সাংহাই যাচ্ছিল, ডাউন লাইনে বড় গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে এর কামরাগুলো এই উদ্দেশ্যে। গার্ড ও ড্রাইভার বেঁচে গিয়েছে। কোনো প্রাণহানি হয় নি।

লাইন পরিষ্কার করতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। মাত্র পনেরো মাইল দূরে সাংহাই, সেখানে পৌছুতে বেজে গেল একটা।

সাংহাই নেমে বিমল ও সুরেশ্বর বুঝলে এ অতি বৃহৎ শহর; সাংহাইএর রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও আধুনিক ধরনে তৈরী, বড় বড় বাড়ী, দোকান, হোটেল, আপিস, স্কুল, কলেজ—চীনা ও ইংরাজী ভাষায় নানা সাইনবোর্ড চারিদিকে, মোটরের ও রিকশা-গাড়ীর ভিড়, রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য, চায়ের দোকান, চীনা ভাতের দোকানে ছোট বড় ইঁদুর ভাজা ঝোলানো রয়েছে, ফলওয়ালী রাস্তার ধারে বসে ফল বিক্রী করছে—এত বড় শহরের লোকজন ও ব্যবসাবাণিজ্য দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে এই সাংহাই শহরের ওপর বর্ত্তমানে জাপানী সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে আসছে পিকিং থেকে।

কিছু বদলায় নি যেন, মনে হয় প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সহজ ও উদ্বেগশূন্য ভাবেই চলেছে।

এখানে প্রোফেসর লি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। খুব বড় ধূসর রংয়ের সামরিক লরীতে চড়ে ওরা একটা বড় লম্বামতো বাড়ীর সামনে নীত হোল।

বাড়ীটা সামরিক বিভাগের একটা বড় দপ্তরখানা, এ ওদের বুঝতে দেরি হোল না—

ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদল ও অফিসারে ভর্ত্তি। প্রতি কামরায় চীনা ভাষায় সাইনবোর্ড আঁটা। অফিসার দল ঢুকছে বেরুচ্ছে, সকলের মুখেই ব্যস্ততার ভাব, উদ্বেগের চিহ্ন।

দু তিন জায়গায় ওদের নাম লেখা হোল—ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে যে চীনা অফিসার, সে প্রত্যেক জায়গায় একটা লম্বা হল্‌দে চীনা ভাষায় লিখিত কাগজ খুলে ধরলে টেবিলের ওপর।

তবুও আইনকানুন শেষ হোল না—অবশেষে একটা কামরার সামনে ওদের দাঁড় করালে। কামরার মধ্যে নিশ্চয় কোনো বড় কর্ম্মচারীর আড্ডা, কারণ কামরার সামনে দর্শনপ্রার্থী সামরিক অফিসার ও অন্যান্য লোকের ভিড় লেগেছে।

ভিড় ঠেলে একটু কাছে গিয়ে বিমল পড়লে দরজার গায়ে পিতলের ফলকে ইংরিজীতে লেখা আছে—জেনারেল চু-সিন্‌-টে, অফিসার কমাণ্ডিং, নাইন্‌টিন্‌থ্‌ রুট্‌ আর্মি। ওদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি—জেনারেল সাহেবের কামরায় শীঘ্রই ডাক পড়লো। বড় টেবিলের ওপাশে এক সুশ্রী, সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত যুবা বসে, ইনিই জেনারেল চু-টে, পূর্ব্বে বিদ্রোহী কমিউনিস্ট সৈন্যদলের নেতা ছিলেন, বর্ত্তমানে জেনারেল চিয়াং-কৈ-শাক-এর বিশিষ্ট সহকর্ম্মী।

হাসিমুখে জেনারেল চু-টে মার্জ্জিত ইংরিজীতে বল্লেন—গুড্‌ মর্নিং, আপনাদের কোনো কষ্ট হয় নি পথে?

এরাও হাসিমুখে কিছু সৌজন্যসূচক কথা বল্লে।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমি ভারতবর্ষের লোকদের বড় ভালবাসি। আপনারা আমাদের পর নন।

বিমল বল্লে—আমরাও তাই ভাবি।

—মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন? ঐ একজন মস্ত লোক আপনাদের দেশের!

জেনারেল চু-টে'র মুখে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে বিমল ও সুরেশ্বর দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তবে মহাত্মা গান্ধী তো আর ওদের বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী ছিলেন না, সুতরাং তাঁর দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওদের কোন জ্ঞান নেই—তার ওপর ওরা আজ দু'মাস দেশ ছাড়া।

—ভালই আছেন। ধন্যবাদ।—

—মিঃ জহরলাল নেহেরু ভাল আছেন? আমি তাঁকে শীগ্‌গির একটা চিঠি লিখছি আমাদের দেশের জন্য ভারতের সাহায্য, কংগ্রেসের সাহায্য চেয়ে।

বিমল ও সুরেশ্বরের বুক গর্ব্বে ফুলে উঠলো। একজন স্বাধীন দেশের বীর সেনানায়কের মুখে তাদের দরিদ্র ভারতের নেতাদের কথা শুনে, চীনদেশ ভারতের কাছে সাহায্যপ্রার্থী একথা শুনে ওরা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমার একসময় অত্যন্ত ইচ্ছে ছিল ভারতে বেড়াতে যাবো। নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। ভারতে ভাল বৈমানিক তৈরী হচ্ছে? এরোপ্লেন চালাবার ভাল স্কুল কোথাও স্থাপিত হয়েছে?

বিমলেরা এ খবর রাখে না। দমদমায় একটা যেন ঐ ধরণের কিছু আছে—তবে তার বিশেষ কোনো বিবরণ ওরা জানে না।

চু-টে বল্লেন—আপনাদের ধন্যবাদ, এদেশকে আপনারা সাহায্য করতে এসেছেন। আপনাদের ঋণ কখনো চীন শোধ দিতে পারবে না। আপনারা পথ দেখিয়েছেন। আপনাদের প্রদর্শিত পথে দুই দেশের মিলন আরও সহজ হোক্ এই কামনা করি।

বিমল বল্লে—এখন কি আমাদের সাংহাইতে থাকতে হবে?

—কিছুদিন। বৈদেশিক মেডিকেল ইউনিট আমেরিকান্ ডাক্তার ব্লুমফিল্ডের অধীনে। এখন আপনাদের থাকতে হবে মার্কিন কন্‌সেশনে—সাধারণ শহরে নয়। আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে চীন গবর্নমেণ্ট আপনাদের জীবনের জন্য দায়ী। সাধারণ শহরে বোমা পড়বে, হাতাহাতি যুদ্ধ হবে—এখানে কারো জীবন নিরাপদ নয়। আন্তর্জ্জাতিক কন্‌সেশনে আমরা হাসপাতাল খুলেছি। সেখানে আপনারা কাজ করবেন।

—ইওর এক্সেলেন্সি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, যদি বেয়াদবি না হয়!

—বলুন?

—সাংহাই কি জাপানীরা আক্রমণ করবে বলে আপনি ভাবেন?

জেনারেল চু-টে বল্লেন—এ তো আন্দাজের কথা নয়—সাংহাইএর দিকেই তো ওরা পিপিং থেকে আসছে। সেন্‌সি হচ্ছে লুংহাউ রেলের শেষপ্রান্ত। সেখানে আমরা সৈন্য জড় করছি ওদের বাধা দিতে। যাতে উত্তর-পশ্চিম চীনে আর না এগুতে পারে। তবে সাংহাইতে একটা বড় যুদ্ধ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। মেডিকেল ইউনিটের আরও সেইজন্যে সাংহাইতেই এখন দরকার।

সুরেশ্বর ও বিমল অভিবাদন করে বিদায় নিলে।

সৈন্যবিভাগের দপ্তরখানা থেকে বার হয়ে ওরা মোটরে চড়ে আন্তর্জ্জাতিক কন্‌সেশনে পৌছলো। বিমল ও সুরেশ্বর লক্ষ্য করলে ব্রিটিশ প্রজা হোলেও ওদের ব্রিটিশ কন্‌সেশনে না নিয়ে গিয়ে ফরাসী কন্‌সেশনে নিয়ে যাওয়া হোল। ওদের সঙ্গে দু'জন চীনা সামরিক কর্ম্মচারী ছিল, আবশ্যকীয় কাগজপত্র তারাই দেখালে বা সই করালে।

প্রকাণ্ড ব্যারাক। কড়া সামরিক আইন কানুন। হুকুম না নিয়ে কন্‌সেশনের সীমার বাইরে যাবার নিয়ম নেই, ঢোকবারও নিয়ম নেই। ফরাসী সান্ত্রী রাইফেল হাতে সর্ব্বদা পাহারা দিচ্ছে। ফরাসী জাতীয় পতাকা উড়ছে ব্যারাকের পতাকা-মন্দিরে। ওদের যাবার দুদিন পরে একদল আমেরিকান্ যুবক কন্‌সেশনে এসে পৌছুলো—এরা বেশীর ভাগ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। এসেছে চীন গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করতে, নিজেদের সুখ-সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়ে, প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করে। এদের মধ্যে তিনটি তরুণী ছাত্রীও ছিল, এরা এল সেদিন সন্ধ্যাবেলা। এদের কন্‌সেশনে ঢোকানো নিয়ে চীনা গবর্নমেণ্টকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

একটি মেয়ের নাম এ্যালিস্ ই. হুইট্‌বার্ন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিমলের সঙ্গে

সে যেচে আলাপ করলে। যেমনি সুশ্রী তেমনি অদ্ভুত ধরণের প্রাণবন্ত, সজীব মেয়ে। কুড়ি একুশ বয়েস—চোখেমুখে বুদ্ধির কি দীপ্তি!

বিমল তাকে বল্লে—মিস্ হুইটবার্ন, তুমি কি ডাক্তারীর ছাত্র ছিলে?

মেয়েটি বল্লে—না। আমি নার্স হবো আন্তর্জাতিক রেড্‌ক্রসে কিংবা চীনা সামরিক বিভাগের হাসপাতালে।

—তোমার বাপ-মা আছেন?

—আছেন। আমার বাবা ঘোড়ার শিক্ষক। খুব নাম-করা লোক আমাদের কাউন্টিতে।

—তাঁরা তোমাকে ছেড়ে দিলেন?

—তাঁদের বুঝিয়ে বল্লাম। জগতের এক হতভাগা জাতি যখন এত দুর্দ্দশা ভোগ করছে, তখন পড়াশুনো বা বিলাসিতা কি ভাল লাগে? আমি আমার সেণ্ট আর পাউডারের টাকা জমিয়ে, টকির পয়সা জমিয়ে, পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এদের সাহায্যের জন্যে মার্কিন রেড ক্রস্ ফণ্ডে। তারপর নিজেই না এসে পারলুম না—তুমিই বলো না মিঃ বোস্, পারা যায় থাকতে?

বিমল মুগ্ধ হয়ে গেল এই বিদেশিনী বালিকার হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পেয়ে। স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে! সংস্কারের পুঁটুলি নয়।

মেয়েটা বল্লে—আমাকে এ্যালিস্ বলে ডেকো। একসঙ্গে কাজ করবো, অত আড়ষ্ট ভদ্রতার দরকার নেই। আমার একখানা ফটো দেবো তোমায়, চলো তুলিয়ে আনি দোকান থেকে।

কন্‌সেশনের মধ্যে প্রায়ই সব আমেরিকান দোকান। মেয়েটি বল্লে—চলো সাংহাই শহরের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি—কোনো চীনা দোকানে ফটো তুলবো। ওরা দু পয়সা পাবে।

অনুমতি নিয়ে আসতে আধঘণ্টা কেটে গেল, তারপর বিমল আর এ্যালিস্ কন্‌সেশনের বড় ফটক দিয়ে সাংহাইয়ে যাবার রাস্তার ওপর উঠে একখানা রিক্‌শা ভাড়া করলে।

কন্‌সেশনে রাস্তাঘাটের নাম ইংরাজীতে ও ফরাসী ভাষায়। সাংহাই শহরে চীনা ভাষায়। কিছু বোঝা যায় না। ঢলঢলে নীল ইজের ও স্ট্র হ্যাট পরে চীনা রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা টানছে, কিন্তু এ অংশেও বহু বিদেশী লোক ও বিদেশী দোকান-পসারের সারি। সাংহাইএর আসল চীনাপল্লী আলাদা—রাস্তা সেখানে আরও সরু সরু—একথা বিমল ইতিমধ্যে চীনা অফিসারদের মুখে শুনেছিল।

এ্যালিস্ বল্লে—চল, চীনাপাড়া দেখে আসি, মিঃ বোস্।

রিক্‌শাওয়ালাকে চীনাপাড়ার কথা বলতেই সে বারণ করলে। বল্লে—সেখানে কেন যাবে? এ সময় সে সব জায়গা ভালো নয়। বিপদে পড়তে পারো। তোমাদের সেখানে নিয়ে গেলে আমায় পুলিসে ধরবে।

এ্যালিস্ ভয় পাবার মেয়েই নয়। বল্লে—চল, মিঃ বোস্, আমরা হেঁটেই যাবো। ওকে বিপদে ফেলতে চাই নে। ওর ভাড়া মিটিয়ে দিই।

বিমল রিক্‌শাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দিলে, এ্যালিস্‌কে দিতে দিলে না। কিন্তু রাস্তা দুজনে কেউই জানে না।

বিমল বল্লে—একখানা ট্যাক্সি নিই, এ্যালিস্! সে অনেকদূর, রাস্তা না জানলে ঘুরে হায়রান হবো।

হঠাৎ এ্যালিস্ ওপরের দিকে চেয়ে বল্লে—ও কি ও, মিঃ বোস্? এরোপ্লেনের শব্দ শুনছো? অনেকগুলো এরোপ্লেন একসঙ্গে আসছে যেন। কোন্‌দিকে বলো তো?

বিমলও শুনলে। বল্লে—গবর্নমেণ্টের এরোপ্লেন।

কিন্তু চক্ষের নিমেষে একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হোল, যা বিমলের অভিজ্ঞতার বাইরে!

সামনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ওপর বিকট এক আওয়াজ হোল—বাজ পড়ার আওয়াজের মত—সঙ্গে সঙ্গে এদিকে, ওদিকে, সামনে, পিছনে, পর পর সেই রকম ভীষণ আওয়াজ। ইট, চুণ, টালি চারিদিকে ছুটতে লাগলো। বিরাট শব্দ করে সামনের সেই বাড়ীটার তেতলার ছাদ ধ্বসে পড়লো ফুটপাথের ওপর। বাড়ীধ্বসা চুণ সুরকির ধুলোয় ও কিসের ঘন শ্বাসরোধকারী ধেঁায়ায় বিমল ও এ্যালিস্‌কে ঘিরে ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠলো মানুষের গলার আর্ত্ত চীৎকার, গোলমাল, গোঙানি, কাতর কাকুতি, অনুনয়ের শব্দ, দুড়দাড় শব্দে ছুটে চলার পায়ের শব্দ, কান্নার শব্দ, সে এক ভয়ানক কাণ্ড!

বিমল প্রথমটা বুঝতে না পেরে সেই ঘন ধূম আর ধূলির মধ্যে হতভম্বের মত খানিক দাঁড়িয়ে রইল—ব্যাপার কি? তারপরেই বিদ্যুৎ-চমকের মত তার মনে এল এ জাপানী এরোপ্লেনের বোমা বর্ষণ!

এ্যালিস্ কই? একহাতের দূরের মানুষ চোখে পড়ে না, সেই ধেঁায়া ধূলো আর গোলমালের মধ্যে। ওর কানে গেল এ্যালিসের উচ্চ ও সশঙ্ক কণ্ঠস্বর—মিঃ বোস, এসো—আমার হাত ধরো—বোমা পড়ছে—দৌড় দাও!

অন্ধকারের মধ্যে বিমল এ্যালিসের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে বল্লে—কোথাও নড়ো না এ্যালিস্, নড়লেই মারা যাবে। দাঁড়াও এখানে।

কিন্তু তখন আর ছুটবার বা পালাবার পথও নেই। পরবর্তী পাঁচ মিনিট কালের ঠিক হিসেব বিমল দিতে পারবে না। সে নিজেও জানে না। বাঁশঝাড়ে আগুন লাগলে যেমন গাঁটওয়ালা বাঁশ ফট্‌ফট্ করে একটার পর একটা ফাটে তেমনি চারিদিকে দুম্ দাম্ শুধু বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ।

পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে, টলছে—ভূমিকম্পের মত—ধেঁায়া, বাড়ী ধ্বসে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, আর্ত্তনাদ—তারপরে সব চুপচাপ, বোমার আওয়াজ থেমে গেল। বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনগুলো মাথার ওপরে চক্রাকারে দুবার ঘুরে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল—বেশ যেন নিরুপদ্রব, শান্ত ভাবেই।

ধেঁায়ায় মিনিট দুই তিন কিছু দেখা গেল না—যদিও গোলমাল, চীৎকার লোক জড় হওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিসের তীব্র হুইসল্ বেজে উঠলো একবার—দুবার, তিনবার।

ক্রমে ধীরে ধীরে ধুলো আর ধোঁয়ার আবরণ কেটে যেতেই এ্যালিস্ বল্লে—চলো এগিয়ে গিয়ে দেখি, মিঃ বোস্—

সামনে এক জায়গায় ফুটপাথের ওপর বেজায় লোক জড় হয়েছে। একটা বাড়ী পড়েছে ভেঙ্গে। অতি বীভৎস দৃশ্য ফুটপাথের ওপর। অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেখানটায়। বাড়ীটা বোধহয় একটা চীনা স্কুল ছিল—বেলা এগারোটা, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছিল, কতক ছিল স্কুল বাড়ীর মধ্যে। বাড়ীখানা একেবারে হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাথ ও রাস্তার খানিকদূর পর্য্যন্ত।

হর্ন বাজিয়ে দুখানা রেড্‌ক্রশ এ্যাম্বুলেন্স এল। একটা ছোট ছেলে এখনও নড়ছে—এ্যালিস্ ছুটে তার পাশে গিয়ে বসলো। বিমল এক চমক দেখেই বল্লে—কোনো আশা নেই মিস্ হুইটবার্ন—ও এখুনি যাবে।

বিমলের গা তখনও কাঁপছে। জীবনে এ রকম দৃশ্য কখনো দেখবার কল্পনাও সে করেনি। যুদ্ধ না শিশুপাল বধ!

এ্যালিস্ বিমলের কাজ অনেক সংক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আহত কেউ ছিল না—সবাই মৃত।

সব শেষ হয়ে যাবার পরে বিমল বল্লে—এ্যালিস্, এখন কি করবে? আর কি চীনে পল্লীতে যাবে এখন?

এ্যালিস্ বল্লে—যেতাম কিন্তু এই যে বোমা-ফেলা হয়ে গেল, এর শোরগোল অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে তো। কন্‌সেশনের সবাই আমাদের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়বে। সুতরাং চলো ফেরা যাক।

কিছুদূরে যেতেই দেখলে হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স ছুটোছুটি করছে। চীনা গবর্নমেণ্টের এ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ কামানগুলো চারদিক থেকে ছোঁড়া হতে লাগলো—কিন্তু তখন জাপানী বিমান কোথায়? আকাশের কোনো দিকেই তার পাত্তা নাই।

ওরা কন্‌সেশনে ফিরে এল। সুরেশ্বরের কাছে বিমল খুব বকুনি খেল, তাকে ফেলে যাওয়ার জন্যে।

এ্যালিস্ বল্লে—ওকে বকচো কেন—আমি ভেবেছি আজ বিকেলে আবার চীনাপাড়ায় যাবার চেষ্টা করবো। তুমি চলো না, সুরেশ্বর?

এবার ওদের সঙ্গে আর একটি মেয়ে যাবে বল্লে। এ্যালিসের সঙ্গে পড়তো, নাম তার মিনি—মিনি বেরিংটন।

বিকেলে ওরা ট্যাক্সি আনালে। ওদের ট্যাক্সি কন্‌সেশনের গেট্ পর্য্যন্ত এসেছে—এমন সময় একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্ম্মচারী ওদের ট্যাক্সিখানা থামালে।

বল্লে—আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বল্লে—শহর বেড়াতে।

—যাবেন না। আমরা গুপ্ত খবর পেয়েছি, জাপানী যুদ্ধজাহাজ বন্দরের বাইরের সমুদ্র

থেকে লম্বা পাল্লার কামানে গোলাবর্ষণ শুরু করবে আজ সন্ধ্যার সময়ে—সেই সঙ্গে জাপানী উড়ো জাহাজও যোগ দেবে বোমা ফেলতে।

—ধন্যবাদ। আমরা একটু ঘুরে এখুনি চলে আসবো।

একথা বল্লে এ্যালিস্—কাজেই বিমল বা সুরেশ্বর কিছু বলতে পারলে না। শহরের মধ্যে এসে দেখলে, পুলিস সকলের হাতে চীনা ভাষায় মুদ্রিত এক এক টুকরো কাগজ বিলি করছে। চীনা ছাত্রদের একটা লম্বা দল পতাকা উড়িয়ে মুখে কি বলতে বলতে শোভাযাত্রা করে চলেছে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড শহর। এত বড় শহর বিমল দেখে নি—সুরেশ্বরও না। কলকাতা এর কাছে লাগেই না।

চীনাপল্লীর নাম চা-পেই। সে জায়গাটায় রাস্তাঘাট কিন্তু অপরিষ্কার নয়—তবে বড় ঘিঞ্জি বসতি। প্রত্যেক মোড়ে খাবারের দোকান, ছোট বড় ইঁদুর ভাজা ঝুলছে। বাঁকে করে ফিরিওয়ালা ভাত তরকারী বিক্রী করছে।

বিমলের ভারী ভালো লাগলো এই চীনাপাড়ার জীবনস্রোত। এক জায়গায় একটা বুড়ী বসে ভিক্ষে করচে—টাকা-পয়সার বদলে সে পেয়েছে ভাত তরকারী, ওর মুখে এমন একটি উদার ভালবাসার ভাব, চোখে সন্তোষ ও তৃপ্তির দৃষ্টি। বোধ হয় আশাতীত ভাত তরকারী পেয়েছে বলে এত খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের দারিদ্র্য ও সহজ সরল সন্তোষের ছবি যেন এই বৃদ্ধা ভিখারিণীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে।

হঠাৎ আকাশে কি একটা অদ্ভুত ধরণের শব্দ শুনে ওরা মুখ তুলে চাইলে। একটা চাপা 'সোঁ-ও-ও' শব্দ। মিনি সর্ব্বপ্রথমে বলে উঠল—এ শেলের শব্দ! সর্ব্বনাশ, এ্যালিস্, চলো আমরা ফিরি—জাপানী যুদ্ধজাহাজের কামান থেকে শেল ছুঁড়ছে!

দুম্! দুম্!—দূরে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ শোনা গেল।

কাছেই কোথায় একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ হোল সঙ্গে সঙ্গে। লোকজন চারিধারে ছুট্‌তে লাগলো—ওরাও ছুটলো তাদের পিছু পিছু। বসতি যেখানে খুব ঘিঞ্জি, সেখানে একটা বাড়ীতে গোলা পড়েছে। বাড়ীটার সামনের অংশ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—ইট, চুণ, টালিতে সামনের রাস্তাটা প্রায় বন্ধ—কে মরেছে না মরেছে বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে লোকজনের বেজায় ভিড়।

আবার সেই রকম 'সোঁ—সোঁ—ও—ও' শব্দ!

কাছেই আর একটা জায়গায় গোলা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে সারবন্দী একদল এরোপ্লেন দেখা গেল। তারা অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছে, পাছে চীনা বিমানধ্বংসী কামানের গোলা খেতে হয় এই ভয়ে।

এ্যালিস্ বল্লে—ওরা পাল্লা ঠিক করে দিচ্ছে যুদ্ধজাহাজের গোলন্দাজদের। চলো এখানে আর থাকা নয়—এই চীনা পাড়াটা ওদের লক্ষ্য।

কিন্তু ওদের যাওয়া হোল না। এ্যালিসের কথা শেষ হোতে না হোতেই, যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্পে, পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল এবং একসঙ্গে দু'তিনটি শেলের বিস্ফোরণের

বিকট আওয়াজ ও সেই সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া ও বিশ্রী শ্বাসরোধকারী কর্ডাইট-এর উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল। তুমুল হৈ চৈ, আর্ত্তনাদ, কলরব ও পুলিসের হুইস্‌লের মাঝে এ্যালিসের হাত ধরলে বিমল, মিনির হাত ধরলে স্থরেশ্বর, কিন্তু পালাবার পথ নেই তখন কোনো দিকেই। ওদের ট্যাক্সিখানা দাঁড়িয়ে আছে বটে, ট্যাক্সিওয়ালার সন্ধান নেই—সে বোধ হয় পালিয়েছে।

চা-পেই পল্লীর ওপর কেন বিশেষ লক্ষ্য জাপানী তোপের, এ কথা বোঝা গেল না, কারণ এখানে চীনা গৃহস্থদের বাড়ীঘর মাত্র, কোনো সামরিক ঘাঁটি তো নেই এখানে। দেখতে দেখতে বাড়ীঘর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে পড়ে সামনের পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন আগে যা কিছু ম্যরা পড়েছিল—এখন সবাই পালিয়েছে, কেবল যারা ভাঙা বাড়ীর মধ্যে আটকে পড়েছে তাদেরই আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

একটা ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেন ছোট ছেলের কান্নার শব্দ। এ্যালিস্ বল্লে—দাঁড়াও বিমল—এখানে সবাই দাঁড়াও।

গোলাবর্ষণ তখনও চলছে, কিন্তু চীনাপল্লীর অন্য অঞ্চলে। এদিকে এখন শুধু গোঙানি, চীৎকার, হৈ-চৈ, কলরব ও কাতরোক্তি।

এ্যালিস্ আগে চড়লো গিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপরে। পেছনে মিনি ও স্থরেশ্বর। বিমল নীচে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কড়িকাঠ সরিয়ে ওরা তিনজনে একটা দরজা পেলে। তারপর একটা ছোট ঘর। এ্যালিস্ অতি কষ্টে ঘরে ঢুকলো—স্থরেশ্বর ওকে সাহায্য করলে। একটা ন-দশ মাসের শিশু সেই ঘরের মেঝেতে অক্ষত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

এ্যালিস্ তাকে সন্তর্পণে মেঝে থেকে তুলে স্থরেশ্বরের হাতে দিলে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঘরটার মধ্যে অন্ধকার। তিনজনে ঘরের মধ্যে থেকে ইটকাঠের স্তূপটার ওপরে উঠে শুনলে, বিমল উত্তেজিত ভাবে ডাকছে—আঃ, কোথায় গেলে তোমরা? চট্ করে নেমে এসো—বড় বিপদ!

চারিদিকের গোলা ফাট্‌বার আওয়াজ ও ছুটন্ত শেলের চাপা 'সোঁ—ও—ও' রব খুব বেড়েছে। একটা একটা শেল মাঝে মাঝে আকাশেই সশব্দে ফেটে তারাবাজির মত অনেকখানি আকাশ আলো করে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ্যালিস্ বল্লে—কি হয়েছে?

বিমল বল্লে—জাপানী সৈন্যদল যুদ্ধজাহাজ থেকে নেমেছে শহরে—তারা শহর আক্রমণ করছে শুনছি। এইদিকেই আসছে। তাদের হাতে পড়া আদৌ আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে না—তোমার হাতে ও কি?

মিনি বল্লে—একটা ছোট্ট ছেলে। একে কোথায় রাখি বলো তো এখন?

স্থরেশ্বর একজন ব্যস্ত ও উত্তেজিত পুলিসম্যানকে জিগ্যেস করে জানলে—সমুদ্রের ধারে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। জাপানীরা নগরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে।

এ্যালিস বল্লে—আমরা এখন ছোট ছেলেটিকে কোথায় রাখি বলো না? কনসেশনের

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। ওর বাপ-মা এই অঞ্চলের অধিবাসী। ছেলের সন্ধান পাবে না কন্‌সেশনে নিয়ে গেলে।

বিমল বল্লে—পুলিসম্যানদের জিম্মা করে দাও না।

এ্যালিস্ ও মিনি তাতে রাজি হোল না। এই সব চীনা পুলিসম্যান দায়িত্বজ্ঞানহীন, ওদের হাতে ছোট্ট ছেলেকে ওরা দেবে না।

সমস্ত গলিটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—লোকজন অন্ধকারে তার মধ্যে কি সব খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময় পাশের একটা স্তূপে দু'তিনটি হারিকেন লণ্ঠন ও টর্চ জ্বালিয়ে একদল ছোকরা একটি মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে বার করছে দেখা গেল।

বিমল উত্তেজিত সুরে বলে উঠলো প্রোফেসর লি! প্রোফেসর লি!

তারপরেই সে ছুটে গেল ছোকরার দলের দিকে। সুরেশ্বর দেখলে ছোকরার দলের নেতা হচ্ছেন, দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ—এবং তিনি তাদের পূর্ব্বপরিচিত প্রোফেসর লি।

সেই মুমূর্ষুদের আর্ত্তনাদ ও পথের লোকের চীৎকারের মধ্যে তিনজনের ব্যাকুল প্রশ্ন বিনিময় হোল। প্রোফেসর লি তাঁর ছাত্রদল নিয়ে নিকটেই এক সরাইখানায় ছিলেন—হঠাৎ এই বোমাবর্ষণের দুর্য্যোগ—এখন তিনি সেবাব্রতী, ছাত্রদের নিয়ে হতাহতদের টেনে বার করা ও তাদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

এ্যালিস্ ও মিনির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেওয়া হোল।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, এই ছোট ছেলেটির কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?

সদানন্দ সৌম্য বৃদ্ধ হাত পেতে বল্লেন—আমায় দাও। তোমরা ওর বাপ-মায়ের সন্ধান করতে পারবে না, আমি পারবো। আর কি জানো ছেলে অনেকগুলো জমেছে—চ্যাং, এদের নিয়ে চলো তো? দেখবে এসো তোমরা—

যাবার পথে একটু দূর গিয়েই বিমল বলে উঠলো—আঃ, কি ব্যাপার দেখ!

সকলেই দেখলে, সে দৃশ্য যেমন বীভৎস তেমনি করুণ। সেই বৃদ্ধা ভিখারিণী ঠ্যাং ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে—সেই জায়গাতেই। একখানা হাত প্রায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—পাশেই তার ভিক্ষালব্ধ ভাত-তরকারিগুলো রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে। আশার জিনিসগুলো—মুখেও দিতে পারে নি হয়তো!

এ্যালিসের চোখে জল এল। বিমল ও সুরেশ্বর মাথার টুপি খুলে বসল। মিনি চোখে রুমাল দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। কেবল অবিচলিত রইলেন প্রোফেসর লি। তিনি ছাত্রদের বল্লেন, এই মড়াটাকে একটা কিছু ঢাকা দাও তো হে! এ আর কি? আমাদের দেশের এ তো রোজকার ব্যাপার! এতে বিচলিত হোলে চলে না মাদাম।

নিকটেই একটা ঘরের মধ্যে প্রোফেসর লি ওদের নিয়ে গেলেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল সে ঘরের মেঝেতে পাঁচ-ছয়টি নয় দশ মাসের কি এক বছরের শিশু অনাবৃত মেঝের ওপর পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে!

এ্যালিস্ ছুটে গিয়ে তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্লে—ও' ইউ পুওর ডিয়ারিজ্!

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—সন্ধ্যা থেকে এতগুলো উদ্ধার করেছি স্তূপ থেকে। আপনাদেরটিও দিন। আমার দুটি ছাত্র এখানে পাহারা দিচ্ছে—আমরা খুঁজে এনে এখানে জড়ো করছি—রাখো এখানে।

গোলমাল ও ভিড় এখন একটু কমেছে।

প্রোফেসর লি সকলকে বল্লেন - আসুন, একটু চা খাওয়া যাক—রাত্রে আর ঘুম হবে না আজ, সারারাত এই রকম চলবে দেখছি—

যে ঘরে শিশুগুলিকে জড়ো করা হয়েছে, তার পাশেই একটা ছোট বাড়িতে লি থাকেন তাঁর ছাত্রবৃন্দ নিয়ে। দুজন ছাত্রকে শিশুদের কাছে রেখে বাকী সকলে ওদের নিয়ে গেল তাদের সেই বাসায়।

ছোট ছোট পেয়ালায় দুধ-চিনি-বিহীন সবুজ চা, শসার বিচি ভাজা, শরবতী লেবুর টুকরো এবং বাঙালী মেয়েদের পাইজোরের মত দেখতে, শূয়োরের চর্ব্বিতে ভাজা একপ্রকার কি খাবার।

সুরেশ্বর ও বিমল শেষোক্ত খাবার ঠেলে রেখে দিলে, সে কি এক ধরনের বিশ্রী গন্ধ খাবারে!

প্রোফেসর লি বল্লেন—আপনারা বিদেশী। আমাদের দেশকে সাহায্য করতে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এখনও কিছুই দেখেন নি, দেখলে আপনাদের দয়া হবে। এত গরীব দেশ আর এমন হতভাগ্য—

মিনি বল্লে—আমাদের সব দেখাবেন দয়া করে প্রোফেসর লি। দেখতেই তো এসেছি—

এ্যালিস্ বল্লে—আর একটা দেশ আছে প্রোফেসর লি। ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় পড়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দুঃস্থ ভারতবর্ষের কথা শুনলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।

বিমল এ্যালিসের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে চাইলে—বড় ভাল লাগলো এই বিদেশিনী বালিকার এই নিষ্কপট নিঃস্বার্থ সহানুভূতি তার দরিদ্র স্বদেশের জন্যে।

এ্যালিস্ বল্লে—শিশুগুলির কে আছে? পুওর লিট্‌ল মাইট্‌স্। আমায় একটা খোকা দেবেন প্রোফেসর লি?

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—কি করবে মিস্—

এ্যালিস্ বল্লে—আমাদের নাম ধরে ডাকবেন প্রোফেসর লি, ওর নাম মিনি, আমার নাম এ্যালিস্। আমরা আপনাকে দাদু বলে ডাকবো - কেমন?

এই সদানন্দ উদার, সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধকে এ্যালিসের বড় ভাল লেগে গেল। কিউরিও দোকানে বিক্রি হয় যে চিনে মাটির হাস্যমুখ বুদ্ধ—বৃদ্ধের মুখখানা ঠিক যেন তেমনি পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও প্রেমের ভাব মাখানো।

প্রোফেসর লি'র মুখ উদার হাসিতে ভরে গেল। বল্লেন—বেশ তাই হবে।

একটা বড় রকমের আওয়া'জের দিকে এই সময় প্রোফেসর লি'র জনৈক ছাত্র ওদের

সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলে।

বিমল বল্লে—বন্দরের দিকে এখনও গোলাবর্ষণ চলছে, হাতাহাতি যুদ্ধও চলছে—

ঠিক এই সময় পুলিসম্যান ঘরের দোরের কাছে এসে চীনা ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে—লোকটা যেন খুব ব্যস্ত ও উত্তেজিত—সে চলে গেলে প্রোফেসর বল্লেন—ও বলে গেল খাওয়া দাওয়া শেষ করে কেউ যেন আজ ঘরের বার না হয়—বিশেষতঃ মেয়েরা। জাপানীরা বেওনেট চার্জ করেছিল—আমাদের সৈন্যরা হটিয়ে দিয়েছে শেনস্থ প্রাচীরের পূর্ব্ব কোণে। কিন্তু আজ রাত্রে আবার ওরা গোলা মারবে, বোমাও ছুঁড়বে।

চা পান শেষ হোল। বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, মেয়েরা রয়েছেন সঙ্গে, আজ যাই। কন্‌সেশনে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

এ্যালিস বল্লে—দাদু, আমার একটা খোকা?

প্রোফেসর লি এ্যালিসের মাথায় হাত দিয়ে খেলার ছলে সস্নেহে বল্লেন—বেওয়ারিশ যদি কোনো খোকা থাকে, পাবে এ্যালিস্। কিন্তু কি করবে চীনা ছেলে নিয়ে?

এ্যালিসের এ হাস্যকর অনুরোধ শুনে মিনি তো হেসেই খুন।

—চল চল এ্যালিস্, কন্‌সেশনে একটা জ্যান্ত খোকা নিয়ে তোমায় ঢুকতেই দেবে কি?

ওরা যখন ফিরে আসছে, দূরে মাঝে মাঝে দুমদাম বিস্ফোরণের শব্দ এবং সাহায্যকারী এরোপ্লেনের হাউইয়ের শাদা অগ্নিময় ধূম দেখা যাচ্ছিল। তবে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

সেই রাত্রে কিসের বিষম আওয়াজে বিমলের ঘুম ভেঙে গেলে—সে ধড়মড় করে উঠে বিছানার ওপর বসলো—কর্ডাইটের শ্বাসরোধকারী ধূমে ও বিশ্রী গন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে।

ও ডাকলে—সুরেশ্বর—সুরেশ্বর—ওঠো—কন্‌সেশনে বোমা পড়ছে!

সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট হৈ চৈ উঠলো চারিদিকে।

বোমা! বোমা!

ওরা জানলা দিয়ে দেখলে, যে-ঘরের মধ্যে ওরা শুয়ে ছিল—তার পূর্বদিকে আর একটা ঘরের দেওয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে এ্যালিস্ ছুটতে ছুটতে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকলে—বিমল! বিমল!

বিমল বল্লে—এই যে এ্যালিস্, তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি? মিনি কোথায়?

বলতে বলতে মিনিও ঘরে ঢুকলো। বল্লে—বাইরে এসো, দ্যাখো শিগগির—চট্ করে এসো—

ওরা বাইরে গেল। কন্‌সেশনের পুলিসের ডেপুটি মার্শাল এসে পৌঁছেছেন দুর্ঘটনার স্থানে। সবাই আকাশের দিকে চাইলে, দুখানা এরোপ্লেন চলে যাচ্ছে—আলো নিবিয়ে। জনৈক ফরাসী কর্ম্মচারী দেখে বললে—কাওয়াসাকি বম্বার!

বিমল বল্লে—এ্যালিস্, কি করে চেনা গেল জিগ্যেস করো না?

মিনি বল্লে—আমি জানি। নীচের দিকে উইং-এ কালো আঁজি কাটা ছুঁচোমুখ প্লেন্ এই

হোল জাপানীদের বিখ্যাত বোমা ফেলবার প্লেন কাওয়াসাকি বম্বার। কিন্তু কন্‌শেসনে বোমা! এরকম তো কখনো—

সে রাত্রে আর কারো ঘুম হোল না। বিমল খুব খুশী না হয়ে পারলে না, তার মঙ্গলা-মঙ্গলের দিকে এ্যালিসের এত আগ্রহদৃষ্টি দেখে। সেই রাত্রে বোমা পড়েছে শুনে এ্যালিস্ সকলের আগে এসেছে তাকে দেখতে, সে কেমন আছে!

শেষ রাত্রের দিকে সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু শোরগোলে ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

ভীষণ গোলাবর্ষণের শব্দ আসছে—সাংহাই শহরে জাপানী যুদ্ধজাহাজ ও এরোপ্লেন থেকে একযোগে গোলা ও বোমা বৃষ্টি হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই শহর থেকে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে পালিয়ে আসছে কন্‌শেসনে—বাক্স তোরঙ্গ, পোঁটলা পুঁটুলি নিয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে। এদের সবারই মুখে ভীষণ ভয়ের চিহ্ন—এদের চক্ষু উদ্বেগে ও রাত্রি জাগরণে রক্তবর্ণ, চুল রুক্ষ, পাশব বলের কাছে মানুষের কি শোচনীয় পরাজয়!

বেলা দশটার মধ্যে ব্রিটিশ কন্‌শেসনের হাসপাতাল ও মার্কিন রেডক্রশের বড় হাসপাতাল আহতের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কি ভীষণ আওয়াজ ও গোলমাল পেন্‌হু প্রাচীরের দিকে, সমুদ্রের থেকে মাইল দুই দূরে পূর্ব্ব কোণে। সেখানে চীনা টেম্ব-রুট্ আর্মির সঙ্গে জাপানী নৌ-সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে। কন্‌শেসন থেকে যুদ্ধস্থলের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল, বিমল জিজ্ঞেস করে জানলে। এ ছাড়াও গোলাবর্ষণ চলছে শহরের বিভিন্ন স্থানে।

টেলিফোনে অর্ডার এল মেডিকেল ইউনিটের বড় ডাক্তারের কাছে থেকে—বিমল, সুরেশ্বর, এ্যালিস্ ও মিনিকে চ্যাং-লীন এ্যাভিনিউতে চীনা সামরিক হাসপাতালে যাবার জন্যে।

ওরা আমেরিকান রেডক্রস মোটরে সামরিক হাসপাতালের দিকে ছুটলো। ড্রাইভার খুব বড় একটা রেডক্রশ পতাকা গাড়ীর বনেটে উড়িয়ে দিলে—এ ছাড়া গাড়ীর ছাদের বাইরের পিঠে সারা ছাদ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড লাল ক্রস আঁকা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও ড্রাইভার বল্লে—যদি আপনারা হাসপাতালে পৌছতে পারেন, সে খুব জোর-বরাত বুঝতে হবে আপনাদের।

সুরেশ্বর ও বিমল একযোগে বল্লে কেন?

— কন্‌শেসন বা রেডক্রস কিছুই মানছে না। জাপানী বোমারু প্লেন কালও আমাদের রেড্‌ক্রস ভ্যানে বোমা ফেলেছে—শোনেন নি আপনারা সে কথা?

সেকথা না শোনাই ভাল। ওদের মোটর কন্‌শেসন থেকে বার হয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ দিয়ে তীর বেগে ছুটলো। বিমল দেখলে ড্রাইভার মাঝে মাঝে উপরের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে কি দেখছে।

বিমল বল্লে—কি দেখছো?

—বোমারু প্লেন আসছে কিনা দেখছি! এখন আপনাদের পৌছে দিতে পারবো কিনা জানি নে—তবে চেষ্টা করবো—

বলতে বলতে একখানা এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর। বিমলের মুখ শুকিয়ে গেল—সামনে উদ্যত মৃত্যুকে কে না ভয় করে? সবাই ওপরের দিকে চাইলে। ড্রাইভার এ্যাক্‌শিলারেটর পা দিয়ে চেপে স্পীড তুললে হঠাৎ বেজায়।

বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনখানা যেন আরও নীচে নামলো—কিন্তু ভাগ্যের জোরেই হোক্ বা অন্য কারণেই হোক্—শেষ পর্য্যন্ত সেখানা ওদের ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

ড্রাইভার বল্লে—জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার—ভীষণ জিনিস—নিচু হয়ে দেখলে এ গাড়ীতে চীনেম্যান আছে কিনা, থাকলে বোমা ফেলতো।

সুরেশ্বর বল্লে—উঃ, কানের কাছ দিয়ে তীর গিয়েছে।

এতক্ষণ যেন গাড়ীর সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল, এইবার একযোগে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

হাসপাতালে পৌছে দেখলে সেখানে এত আহত নরনারী এনে ফেলা হয়েছে যে কোথাও একটুকু জায়গা নেই। এদের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা। যুদ্ধের সৈন্যও আছে—তবে তাদের সংখ্যা তত বেশী নয়।

একটি দশ-এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর মুখ বালকের একখানা পা একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে—আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেটি তখনও বেঁচে আছে এবং কিছুক্ষণ আগে অজ্ঞান হয়ে থাকলেও এখন তার জ্ঞান হয়েছে এবং যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করছে। বিমলের ওয়ার্ডেই সে বালকটি আছে। এ্যালিস্ সেই ওয়ার্ডেই নার্স।

এ্যালিস্ পেশাদার নার্স নয়, বয়সেও নিতান্ত তরুণী, চোখের জল রাখতে পারলে না ছেলেটির যন্ত্রণা দেখে। বিমলকে বল্লে—একে মরফিয়া খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো না?

বিমল বল্লে—তা উচিত হবে না। ওকে এখুনি ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান করে পা কেটে ফেলতে হবে। অপারেশন টেবিল একটাও খালি নেই, সব ভর্ত্তি। একটা টেবিল খালি পেলেই ওকে চড়িয়ে দেবো।

এ্যালিস্ বালকটির শিয়রে বসে কতরকমে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে—কিন্তু ওদের সবারই মুশকিল চীনা ভাষা সামান্য এক আধটু বুঝতে পারলেও বলতে আদৌ পারে না।

সুরেশ্বর হাসপাতালের ঔষধালয়ে সহকারী কম্পাউণ্ডার হয়েছে। সে দুখানা চীনা বর্ণপরিচয় কোথা থেকে যোগাড় করে এনে ওদের দিয়েছে। এ্যালিস্ বল্লে—সুরেশ ঠিক বলছিল সেদিন, এসো তুমি, আমি, মিনি ভালো করে চীনে ভাষা শিখি, নইলে কাজ করতে পারবো না—

আর্ত্ত বালকটির শয়নশিয়রে এ্যালিস্‌কে যেন করুণাময়ী দেবীর মত দেখাচ্ছে, বিমল সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এ্যালিসের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠলো।

সন্ধ্যা সাতটার সময় টেবিল খালি হোল।

বালকটিকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েচে, কতকগুলি ডাক্তারী ছাত্র কিছুদূরে একটা গ্যালারিতে বসে আছে, হাসপাতালের সহকারী সার্জন চীনাম্যান, তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে কি বলছেন আর একজন ছাত্র ক্লোরোফর্ম পাম্প করছে। বিমল ও এ্যালিস্ সার্জনকে সাহায্য করবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। সার্জন হেসে বললেন, সকাল থেকে অপারেশন টেবিলে মরেছে একুশটা, টেবিল থেকে নামাবার তর সয় নি—গরম জলটা সরিয়ে দাও নার্স—

এমন সময় মাথার ওপরে কোথায় এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

বাইরে যারা ছিল, তারা দৌড়ে ভেতরে এল, একটা ছুটোছুটি শুরু হোল চারিদিকে।

কে একজন বল্লে—জাপানী বম্বার!

এ্যালিস্ বল্লে—রেডক্রসের লাল আলো জ্বলছে বাইরে—হাসপাতাল বলে বুঝতে পারবে—

সার্জন হেসে বল্লে—নার্স, ওরা কি কিছু মানছে?—শক্ত করে ধরে থাকো তুলোটা—

বালক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সার্জন ক্ষিপ্র ও কৌশলী হাতে ছুরি চালাচ্ছেন। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বুম্-ম্-ম্-ম ম!—বিকট বিস্ফোরণের শব্দ কোথাও কাছেই। তুমুল গোলমাল হৈ-চৈ, আর্ত্তনাদ, হাসপাতালের বাঁ দিকের অংশে বোমা পড়েছে। উগ্র ধোঁয়া ও নাইট্রোগ্লিসিরিনের গন্ধে ঘর ভরে গেল। সার্জন, বিমল বা এ্যালিসের দৃষ্টি কোনোদিকে নেই— ওরা একমনে কাজ করছে। সার্জন দৃঢ় অবিকম্পিত হস্তে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন তাঁর অপারেশন টেবিলের থেকে এক শো গজের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে নি, যেন তিনি মোটা ফি নিয়ে বড়-লোক, রোগীর বাড়ী গিয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে ব্যস্ত: গরম জলের পাত্রে ডোবানো ছুরি, ফরসেপ ছুঁচ ক্ষিপ্রহস্তে একমনে সার্জনকে যুগিয়ে চলেছে এ্যালিস্, একমনে ব্যাণ্ডেজের সারি গুছিয়ে রাখছে, পাতলা লিণ্ট-কাপড়ে মলম মাখাচ্ছে। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বাইরে বিকট শব্দ—হুড়মুড় করে হাসপাতালের বাঁ দিকের উইং-এর ছাদ ভেঙে পড়লো। মহাপ্রলয় চলেছে সেদিকে—

সার্জন বল্লেন—নাড়ীর বেগ কত?

বিমল—সত্তর।

কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—স্যার, বাঁদিকের উইং গুঁড়ো হয়ে গোটা সেপ্‌টিক ওয়ার্ডের রোগী চাপা পড়েছে—এদিকেও বোমা পড়তে পারে—তিনখানা বম্বার—

সার্জন বল্লেন—পড়লে উপায় কি? নার্স বড় ফরসেপটা—

উগ্র ধোঁয়ায় সবারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! আর একটা শব্দ অন্য কোন্‌দিকে হোল —আর একটা বোমা পড়েছে—বেজায় ধোঁয়া আসছে ঘরে।

বিমল বল্লে—স্যার, ধোঁয়ায় রোগী দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে? ক্লোরোফর্মের রোগী, এ ভাবে কতক্ষণ রাখা যাবে?

সার্জন ছুরি ফেলে বল্লেন—হয়ে গিয়েছে। লিণ্ট্ দাও, নার্স!

বিমল বল্লে—স্যার, রোগীর নাড়ী নেই। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল!

সার্জন এসে নাড়ী দেখলেন। এ্যালিস্ নীরবে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নাড়ী থেকে হাত নামিয়ে সার্জন গম্ভীর মুখে বল্লেন—বাইশটা পুরলো।

এ্যালিস্ নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে বল্লেন—চলো নার্স, স্ট্রেচারওয়ালারা এসে লাশ নিয়ে যাবে—এখন সবাই বাইরে চলো যাই—

ওপরওয়ালার আদেশ পেয়ে বিমল আগে এ্যালিসের কাছে এল এবং তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে ধূম্রলোক থেকে উদ্ধার করে ডানদিকের বড় দরজা দিয়ে কম্পাউণ্ডের খোলা হাওয়ায় নিয়ে এল।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেই এ্যালিস্‌কে বল্লে—ঐ দেখ এ্যালিস্, তিনখানা জাপানী বম্বার!—

এগারো ঘণ্টা সমানে ডিউটিতে থাকবার পরে বিমল, এ্যালিস্, সুরেশ্বর ও মিনি বাইরের ফুটপাথে পা দিলে।

চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউ প্রসিদ্ধ দেশনায়ক চ্যাং সো লীনের নামে হয়েছে—রেড শার্টদের প্রভাবে। সাংহাইয়ের মধ্যে এটা একটি প্রসিদ্ধ রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুটপাথে শামিয়ানার নিচে চা ও শূওরের মাংসের দোকান। লোকজনের বেজায় ভিড়।

এই এ্যাভিনিউয়ের ধারেই গভর্নমেণ্ট হাসপাতাল। ওরা যখন ফুটপাথে পা দিলে, তখন হাসপাতালের বাঁ অংশে মহা হৈ চৈ চলছে। সেপ্‌টিক্-ওয়ার্ড জাপানী বোমায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—সম্ভবতঃ একটা রোগীও বাঁচে নি সে ওয়ার্ডের।

মিনি দেখতে যাচ্ছিল—বিমল বারণ করলে।

—ওদিকে গিয়ে দেখে আর কি হবে মিনি? চলো আগে কোথাও একটু গরম চা খাওয়া যাক।

বোমা-ফেলা ও হত্যা ব্যাপারটা দেখে দেখে কদিনে ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু ওদের নয়, সাংহাইএর লোকজন, দোকানী, পথিকদেরও। নতুবা গত আধঘণ্টা ধরে হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণ চলছে, চোখের সামনে এই ভীষণ প্রলয় লীলা ও মাথার ওপরে চক্রাকারে উড়নশীল তিনখানা জাপানী বম্বারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউর চায়ের দোকান, মাংসের দোকান, ভাত-তরকারীর দোকান সব খোলা। লোকজনের দিব্যি ভিড়।

রাত পৌনে আটটা।

হঠাৎ এ্যালিস্ জিগ্যেস্ করলে—ছেলেটি মারা গেল, তখন ক'টা?

বিমল বল্লে—ঠিক সাড়ে সাতটা। ওকথা ভেবো না এ্যালিস্। চল আর একটু এগিয়ে। এক্ষুনি লাশ নিয়ে যাওয়ার ভ্যান্ আসবে হাসপাতালে। আমরা একটু তফাতে যাই।

একটা শামিয়ানার নীচে ওরা চা খেতে বসলো।

দোকানের মালিক একজন রোগা চেহারার চীনা স্ত্রীলোক। সে এসে পিজিন ইংলিশে বল্লে—কি দেবো?

বিমল বল্লে—খাবার কি আছে?

—ভাজা মাছ, রুটি, মাখন আর ব্যাঙের—

—থাক্ থাক্, রুটি মাখন ভাজা মাছ নিয়ে এসো—

রুটি-মাখন অন্যত্র চীনা দোকানে পাওয়া যায় না; তবে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউর দোকানগুলো কিছু শৌখিন ও বিদেশী-ঘেঁষা। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিমল একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললে। সুরেশ্বর তো গোগ্রাসে রুটি ও মাখনের সদ্ব্যবহার করতে লাগলো, খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই।

মিনি বল্লে—একটা গল্প বলি শোনো সবাই। আমি তখন স্কুলে পড়ি, মেন্টোনে, কালিফোর্ণিয়ায়। আমার বাবা আমায় একটা চিন্‌চিলা কিনে দিয়েছিলেন—

সুরেশ্বর বল্লে—সে কি?

মিনি হেসে বল্লে—জানো না? একরকম ছোট কাঠবিড়ালির চেয়ে একটু বড় জানোয়ার, খুব চমৎকার লোম গায়ে—লোমের জন্যে ওদের শিকার করা হয়। তারপর আমার সেই পোষা চিন্‌চিলাটা—

বুম্—ম্—ম্!—বিকট আওয়াজ!

সবাই চম্‌কে উঠলো। তিনখানা বাড়ীর পরে একটা বাড়ীর ওপরে জাপানী বম্বার ঘুরছে দেখা গেল—কিন্তু ধোঁয়া উড়ছে বাড়ীটার সামনের রাস্তা থেকে। লোকজন দেখতে দেখতে যে যেখানে পারলে আড়ালে ঢুকে পড়লো। একটু পরে একখানা রিক্‌শা টেনে দুজন লোককে সেদিক থেকে ওদের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেল রিক্‌শায় আধশোয়া আধ-বসা অবস্থায় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। তার মুখটা থেঁৎলে রক্ত গড়িয়ে বুকের সামনে জামাটা রাঙিয়ে দিয়েছে।

শামিয়ানার নীচে আরও তিনটি চীনা খদ্দের বসে চা খাচ্ছিল। তারা উত্তেজিত ভাবে চীনা ভাষায় দোকানীকে কি বল্লে। দোকানীও তার কি জবাব দিলে, তারপরে ওদের মধ্যে একজন একটা সিগারেট ধরালে।

জাপানী বোমারু প্লেন ঘর্ ঘর্ শব্দ করে যেন ওদের মাথার ওপরে ঘুরছে। বিমল একবার চেয়ে দেখলে। নাঃ, একটু দূরে বাঁদিকে। ঠিক মাথার ওপরে নয়।

মিনি বল্লে—তারপর শোনো, আমার সেই চিন্‌চিলাটা—

এ্যালিস্ অধীরভাবে বল্লে—আঃ মিনি, থাক চিন্‌চিলার গল্প। খাও এখন ভাল করে। আমার তো বেজায় ঘুম পাচ্ছে! বিমল, দোকানীকে জিগ্যেস্ করো না, স্যাণ্ড্‌উইচ রাখে না?

বিমল বল্লে—ব্যাঙের মাংসের স্যাণ্ড্‌উইচ বলছে এ্যালিস্—দিতে বলবো?

সুরেশ্বর ও মিনি একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের খাবার জায়গাটা তীব্র সার্চলাইটের আলোয় আলো হতেই ওরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। ভীষণ ধ্বংসের যন্ত্র সেই চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জাপানী বম্বারখানা থেকে রাস্তার যে অংশে ওরা বসে চা খাচ্ছে, সেদিকে সার্চলাইট্ ফেলেছে।

দোকানী চীনা স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে উঠে কি বললে।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ শব্দ—তিনজন চীনা খদ্দের ও রাস্তার পথিকদের মধ্যে জন-দুই ছুটে এসে বিমলদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়লো।

মিনি বল্লে—আঃ, এগুলো কি বোকা! টেবিলের তলায় বাঁচবে এরা? আমার পেয়ালাটা উল্টে ফেলে দিলে মাঝ থেকে—

এ্যালিস্ বল্লে—আমারও। দোকানী, তোমার চায়ের দাম নিয়ে নাও, আমরা অন্য জায়গায় চা খেতে যাই—এ কি রকম উপদ্রব?

বিমল বল্লে—ঠিক তো। মহিলাদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে উৎপাত! বোমা খাবি রাস্তায় দাঁড়িয়ে খা ভদ্রলোকের মত—

মিনি হঠাৎ আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে বল্লে—ঐ দেখো, দেখো—

তিনখানা চীনা এরোপ্লেন তিন দিক থেকে জাপানী বম্বারখানাকে তাড়া করছে। একখানা চীনা প্লেন্ বম্বারখানার খুব কাছে এসে পড়েছে—একটু পরেই সেখানা থেকে মেসিন্‌গানের পট্ পট্ আওয়াজ শোনা গেল—পিছনের আর একখানা চীনা সাহায্যকারী প্লেন্ ওদের ওপরে নীলাভ তীব্র সার্চলাইট্ ফেলতেই জাপানী বম্বারখানা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

ততক্ষণ সবাই আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে আকাশের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা দেখছে। আরও দুজন চীনা খদ্দের অন্য টেবিলে চা খেতে বসে গেল। দোকানী স্ত্রীলোকটি তাদের খাবার দিলে। মিনি তাদের টেবিলের দিকে চেয়ে বল্লে—ওই ওরা ব্যাঙের স্যাণ্ড্-উইচ খাচ্ছে—

মেসিনগানের আওয়াজ তখন বড় বেড়েছে। জাপানী প্লেনখানা পাক দিয়ে ঘুরছে। হঠাৎ পালাবে না।

বিমল বল্লে—না; একটু নিরিবিলি চা খেতে এলাম আর অমনি মাথার ওপরে চীন-জাপানের যুদ্ধ বেধে গেল—পোড়া বরাত এম্‌নি—

একজন ফিরিওয়ালা এসে শামিয়ানার বাইরে দাঁড়িয়ে বল্লে—মোমের ফুল—খুব চমৎকার মোমের ফুল—গোলাপ, ক্রিসেন্‌থিমাম্, গাঁদা—ভারী সস্তা মোমের ফুল—

এমন সময়ে একজন খবরের কাগজওয়ালা 'সাংহাই ডেলি নিউজ্' বলে হেঁকে যাচ্ছে দেখে বিমল ডেকে একখানা কাগজ কিনলে। এ কাগজের একদিকে চীনা ভাষায় ও অন্যদিকে ইংরেজি ভাষায় লেখা খবর—চীনাদের পরিচালিত।

রাস্তায় লোক ভিড় করে কাগজ কিনছে, কাগজ এইমাত্র বেরিয়েছে, এ বেলার যুদ্ধের খবর নিয়ে—সবাই যুদ্ধের খবর জানতে চায়।

এ্যালিস্ বল্লে—যুদ্ধের খবর কি ?

তারপর সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা পড়ে দেখতে লাগলো। শেন্‌সু প্রাচীরের কাছে জাপানী সৈন্য চীনাদের কাছে ধাক্কা খেয়ে হটে গিয়েছে। জাপানীদের বহু সৈন্য মারা পড়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—সর্ব্বৈব মিথ্যা। জাপানীরা জিত্‌ছে। ভুল খবর দিচ্ছে আমাদের, পাছে শহরে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দেখছো না বোমা ফেলবার কাণ্ড ? চীনারা জিতছে! ফুঃ—

ওদের অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হোল, মাত্র তিন মাইল দূরে শেন্‌সু প্রাচীরের কাছে যুদ্ধ চলছে, অথচ ওদের খবরের কাগজ পড়ে জানতে হচ্ছে যুদ্ধের ফলাফল, যেমন কলকাতায় বসে বা আমেরিকায় বসে লোকে জেনে থাকে। তিন মাইল দূরে থেকেও বোঝবার কোনো উপায় নেই যুদ্ধের আসল খবরটা কি। চীনা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে সংবাদ পাঠাচ্ছে সেই সংবাদই ছাপা হচ্ছে। এই রকমই হয় সর্ব্বত্রই, অথচ খবরের কাগজের পাঠকেরা তা জেনেও জানে না। খবরের কাগজে লিখিত সংবাদ বাইবেল বা পুরাণের মত অভ্রান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয়, এইটেই আশ্চর্য্য। এ সম্বন্ধে ওদের অভিজ্ঞতা আরও পরে যা হয়েছিল তা আরও অদ্ভুত।

কাগজের এক কোণে একটি সংবাদের দিকে ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে। মার্শাল চিয়াং কৈ শাক্ চা-পেই পল্লীর বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসবেন রাত ন'টার সময়ে।

মিনি হাতঘড়ি দেখে বল্লে—এখন পৌনে ন'টা।

বিমল বল্লে তা হোলে হাসপাতালেও যাবেন, চল আমরা হাসপাতালে ফিরি। মার্শাল চিয়াংকে কখনও দেখি নি, দেখা যাবে এখন!

এমন সময় ওদের সামনের রাস্তায় একটা হৈ-চৈ উঠলো। রাস্তার দুধারে লোকজন সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চীনা পুলিসম্যান রাস্তার মাঝখানের লোক হটিয়ে দিলে। এক মিনিটের মধ্যে পর পর ছ'খানা মোটরকার দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল। রাস্তার জনতা চীনা ভাষায় চীৎকার করে বলে উঠলো—'মহাচীনের জয়! মার্শাল চিয়াংএর জয়। টেন্‌থ রুট্ আর্মির জয়!'

এ্যালিস্ বল্লে—এই মার্শাল চিয়াং গেলেন!

বিমল বল্লে—তবে আর হাসপাতালে এখন ফিরে কি হবে ? চল কন্‌শেসনে ফিরি। রাত হয়েছে, এ অঞ্চল এখন রাত্রে বেড়াবার পক্ষে নিরাপদ নয়। জাপানী বোমা তো আছেই, তা ছাড়া তার চেয়েও খারাপ চীনা দস্যুদের উপদ্রব। সঙ্গে মেয়েরা—

সুরেশ্বর বল্লে—তা ছাড়া ঘুমুতেও তো হবে। কাল সকাল থেকে আবার ডিউটি—

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

কন্‌শেসনে ফিরবার পথে ওদের এক বিপদ ঘটলো।

কন্‌শেসনে ফিরবার পথে ওরা চ্যাং সো লীন্ এ্যাভিনিউ দিয়ে খানিকটা এসে পড়লো একটা জনবহুল পাড়াতে। সেখানে দু'খানা রিকশাভাড়া করে ওরা তাদের কন্‌শেসনে যেতে

বল্লে। তারপর ওরা গল্প ও গুজবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—যখন ওরা আবার রাস্তার দিকে নজর করলে তখন দেখলে রিকশা একটা নির্জ্জন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। দুধারে দরিদ্র লোকেদের কাঁচা মাটির খাপ্‌রা-ছাওয়া ঘর। রাস্তা জনশূন্য—দূরে দূরে খোলা মাঠের মধ্যে কি যেন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে।

বিমল বল্লে—এ কোথায় নিয়ে এসে ফেল্লে হে ?

সুরেশ্বর পিজিন্ ইংলিশে একজন রিকশাওয়ালাকে বল্লে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্ রে ? এ পথ তো নয় ?

রিকশাওয়ালা কোনো উত্তর না দিয়েই জোরে ছুটতে লাগলো।

বিমলের মনে সন্দেহ হলো। সে বল্লে—এর মনে কোনো বদমাইশি মতলব আছে মনে হচ্ছে। আমরা তো একেবারে নিরস্ত্র। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে—

মিনি ও এ্যালিস্ তখন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। ওরাও বল্লে—আর গিয়ে দরকার নেই—চীনা গুণ্ডা এই সময় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। নামো এখানে সব।

দুখানা রিক্‌শাই পাশাপাশি যাচ্ছিল। এবার মিনিদের রিক্‌শাখানা এগিয়ে গেল এবং বিমল কিছু বলবার পূর্ব্বেই রিক্‌শাখানা হঠাৎ পথের মোড় ঘুরে পাশের একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো !

বিমলদের রিক্‌শাখানা কিন্তু তখন সোজা রাস্তা বেয়েই দ্রুত চলেছে। বিমলের ও সুরেশ্বরের চীৎকার সে আদৌ কর্ণপাত করলে না।

বিমল লাফ দিয়ে রিক্‌শাওয়ালার ঘাড়ে পড়লো রিক্‌শা থেকে। রিক্‌শাখানা উল্টে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সুরেশ্বর রিক্‌শার সঙ্গে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। রিক্‌শাওয়ালাটা সেখানে বসে পড়লো—ওর ওপর বিমল !

রিক্‌শাওয়ালাটা একটু পরেই গা ঝেড়ে উঠে, চীনা ভাষায় কি একটা দুর্ব্বোধ্য কথা বলে উঠে, ওদের দিকে এগিয়ে এল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠলো—সুরেশ্বর, সাবধান !

রিক্‌শাওয়ালার হাতে একখানা বড় চক্‌চকে ছোরা দেখা গেল।

সুরেশ্বর পিছন থেকে তাকে জোরে এক ধাক্কা লাগালে। সে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আবার বিমলেরই উপর। বিমলের সঙ্গে তার ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হোল। বিমলের রীতিমত শরীরচর্চ্চা করা ছিল। মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যে রিক্‌শাওয়ালাকে মাটিতে ফেলে, বিমল তার হাত মুচ্‌ড়ে ছোরাখানা টান দিয়ে ফেলে বল্লে—ওখানা তুলে নাও সুরেশ্বর—তারপর এই বদমাইশটার গলায় বসিয়ে দাও—

ছোরা হাত থেকে খসে যাওয়াতে বদমাইশটা নিরুৎসাহ ও ভীত হয়ে পড়লো—এইবার ছোরা বসানোর কথা শুনে, সে বিমলের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলে। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল পাঁচ-ছ'মিনিটের মধ্যে।

বিমল ঝেড়ে উঠে একটু দম নিয়ে বল্লে—সুরেশ্বর, মেয়েদের গাড়ীখানা !

তারপর ওরা দুজনেই ছুটলো সেই গলিটার দিকে—যেটাব মধ্যে মিনিদের রিক্‌শাখানা ঢুকেছে। গলিটা নিতান্ত নোংরা, দুধারে কাঁচা টালির ছাদওয়ালা নীচু নীচু বাড়ী—কিছু দূরে একটা সাধারণ স্নানাগার—এখানে নীচশ্রেণীর মেয়ে পুরুষে সাধারণতঃ স্নান করে না—করলেও রাত্রে করে। স্নানাগারের সামনে দু-জন চীনেম্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখে, বিমল তাদের পিজিন ইংলিশে জিজ্ঞেস করলে—একখানা রিক্‌শা কোন্ দিকে গেল দেখেছ?

তাদের মধ্যে একজন বল্লে—ওই বাড়ীটার সামনে একখানা রিক্‌শা দাঁড়িয়েছিল একটু আগে।

বিমল ও সুরেশ্বর্ বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বিমল বল্লে—চল বাড়ীর মধ্যে ঢুকি—

ঘরটায় ঢুকেই ওদের মনে হোল, এটা একটা চণ্ডুর আড্ডা। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটা চীনাবাঁশের চেয়ার, একদিকে একটি নীচু বাঁশের তক্তপোশ। চণ্ডু খাবার লম্বা নল, ছিটেগুলি গালার বড় পাত্রে, চণ্ডুর আড্ডার সব জিনিসই মজুদ। দেওয়ালে চীনা দেবতার ভীষণ প্রতিকৃতি। ঘরটি লোকশূন্য, নির্জ্জন। এ ধরণের চণ্ডুর আড্ডা ওরা সিঙ্গাপুরে দেখেছে। কিন্তু বাড়ীর লোকজন কোথায়? বিমল ও সুরেশ্বর বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে গেল।

একটা বড় ঘরের মধ্যে অনেকগুলো লোক বসে মা জং খেলছে। বিমল বুঝতে পারলে, জায়গাটা শুধু চণ্ডু নয়, নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীদের আড্ডাও বটে। ওদের দেখে দুজন লোক উঠে দাঁড়ালো! ওদের মধ্যে একজন কর্কশ কণ্ঠে পিজিন ইংলিশে বল্লে—কি চাই? কে তোমরা? বিমলের মাথায় চট্ করে এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে কর্ত্তৃত্বের গ্রামভারী চালে বল্লে, আমরা ব্রিটিশ কন্‌শেসনের পুলিশের লোক। আমাদের সঙ্গে দশজন কন্‌স্টেবল গলির মোড়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ও রিভলবার আছে। দুজন মেমসাহেবকে এই আড্ডায় গুম্ করা হয়েছে—বার করে দাও, নইলে আমরা জোর করে ভেতরে ঢুকে সন্ধান করবো। দরকার হলে গুলি চালাবো।

এবার একজন প্রৌঢ় লম্বা ধরণের লোক এক কোণ থেকে বলে উঠলো—আমরা কন্‌শেসন পুলিশ মানি নে—সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের সই করা ওয়ারেণ্ট দেখাও—

বিমল বল্লে—তুমি জানো এটা যুদ্ধের সময়! আমরা জোর করে ঢুকবো এবং দরকার হোলে এই মা জংএর জুয়ার আড্ডার প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে সাংহাই পুলিশের হাতে দেবো—এর জন্যে যদি কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় পুলিস মার্শালের কাছে আমরা দেবো—তুমি মেমসাহেবদের বার করে দেবে কিনা বলো—

লোকটা বল্লে—কোন্ মেমসাহেবের কথা বলছো? মেমসাহেবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? আমি ভাবছিলাম, তুমি জুয়া আর চণ্ডুর আড্ডা হিসেবে বাড়ী সার্চ করবে বলছো।

বিমল বল্লে—বেশি কথায় সময় নষ্ট করতে চাইনে—তাহোলে আমাদের জোর করতে হোলো—সুরেশ্বর কন্‌স্টেবলদের ডাকো—

হঠাৎ চীৎকার করে সে বলে উঠলো—মাথা নীচু করে বসে পড়—বসে পড় সুরেশ।

সাঁ করে একটা শব্দ হোল এবং ঝক্‌ঝকে কি একটা জিনিস ওদের চোখের সামনে এক ঝলক খেলে গেল—ওরা তখন দুজনেই বসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেছন দেওয়ালে একটা ভারী জিনিস ঠক্ করে লাগবার শব্দ হোল।

সুরেশ্বর পিছন ফিরে চকিতে চেয়ে দেখলে—একখানা বাঁকা ধারালো চক্‌চকে চীনে-ছোরা, ছুঁড়ে-মারা ছোরা, ছুঁড়ে মারবার জন্যেই এগুলি ব্যবহৃত হয়—ছোরাখানা সবেগে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে, আধখানা ফলাসুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে গেঁথে গিয়েছে।

সুরেশ্বর শিউরে উঠলো—ওরই গলা লক্ষ্য করে ছোরাখানা ছোঁড়া হয়েছিল।

ওদের সঙ্গে সত্যিই হাতাহাতি বাধলে বা সবাই একযোগে আক্রমণ করলে, নিরস্ত্র বিমল ও সুরেশের কি দশা হোত বলা যায় না, কিন্তু বিমল মাটি থেকে উঠেই দেখলে ঘরের মধ্যে আর একজন লোকও নেই।

পালায় নি—হয়তো বা ওরা লোক ডাকতে গিয়েছে! সুরেশ্বর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, খানিকটা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। বিমল গিয়ে তার হাত ধরে টেনে তুলে বল্লে—সুরেশ্বর, এইবেলা উঠে বাড়ীটা খুঁজি এস—এখুনি সব চলে আসতে পারে। একটা ঘর বন্ধ ছিল—বাইরে থেকে তালা দেওয়া। আর সব ঘর খোলা—সেগুলি জনশূন্য। সুরেশ্বর ও বিমল দুজনেই একযোগে ঘরের দরজায় লাথি মারতে লাগলো।

—মিনি—মিনি—এ্যালিস্—এ্যালিস্—

ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বিমল বল্লে—কি ব্যাপার! ঘরের মধ্যে কেউ নেই নাকি?

দুজনের সম্মিলিত লাথির ধাক্কাতেও দরজার কিছুই হোল না। বেজায় মজবুত সেগুন কাঠের দরজা। হঠাৎ বিমলের চোখ পড়লো ঘরের দেওয়ালের ওপরের দিকে। সেখানে একটা ছোট ঘুলঘুলি রয়েছে। কিন্তু অত উঁচুতে ওঠা এক মহা সমস্যা। বিমল খুঁজতে খুঁজতে একটা জলের টব আবিষ্কার করলে। সেটা উপুড় করে পেতে, মা জং খেলার ঘর থেকে বাঁশের চেয়ার এনে, তার ওপর চাপিয়ে উঁচু করে, বিমল অতি কষ্টে তার ওপর উঠলো। সার্কাসের খেলোয়াড় না হোলে ওভাবে ওঠা এবং নিজেকে ঠিকমত দাঁড় করিয়ে রাখা অতীব কঠিন ব্যাপার।

সুরেশ্বর টবটা ধরে রইল—বিমল সন্তর্পণে উঠে ঘুলঘুলির কাছে মুখ নিয়ে গেল। নীচে থেকে সুরেশ্বর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলে—কি দেখছ? কেউ আছে?

—ঘোর অন্ধকার—কিছু তো চোখে পড়ছে না।

—ওদের পরনে নার্সের সাদা পোশাক আছে, অন্ধকারেও তো খানিকটা ধরা যাবে—ভাল করে দেখ—

বিমল ভাল করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে বলে—উঁহু, কিছুই তো তেমন দেখছিনে—সাদা তো কিছুই নেই—সব কালোয় কালো। আমার মনে হচ্ছে ঘরটায় কিছুই নেই—

—উপায়?

—দাঁড়াও আগে নামি। উপায় ভাবতে হবে, তার আগে দরজা ভেঙে ফেলতে হবে, যে করেই হোক্।

নীচে নেমে বিমল গম্ভীর মুখে বল্লে—সুরেশ্বর, মিনি বা এ্যালিস্‌কে এভাবে হারিয়ে আমরা কন্‌শেসনে ফিরে যেতে পারবো না। দরকার হোলে এজন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ—খুঁজে তাদের বার করতেই হবে। তবে তারা যে এই বাড়ীতেই বা এই ঘরেই আছে তারও তো কোনো প্রমাণ আমরা পাই নি। তবুও এই ঘরের দরজা ভেঙে, ভেতরটা না দেখে আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাবো না। তুমি এক কাজ করো। আমি এখানে থাকি—তুমি বাইরে যাও, চীনা পুলিসকে খবর দাও। তাদের বলো কন্‌শেসনে টেলিফোন করতে। দরকার হোলে কন্‌শেসনের পুলিস আসুক। আজ রাতের মধ্যেই তাদের খুঁজে বার করতেই হবে—নইলে তাদের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। তুমি দেরি করো না, চট্ করে বাইরে চলে যাও।

সুরেশ্বর বল্লে—তোমাকে একা ফেলে যাবো? ওরা যদি দল পাকিয়ে আসে? তুমি নিরস্ত্র।

—সেজন্যে ভেবো না। মিনি ও এ্যালিস্ তার চেয়েও অসহায়। সকলের আগে ওদের কথা ভাবতে হবে আমাদের।

সুরেশ্বর চলে গেল।

বিমল একা বাড়ীটাতে। উত্তেজনার প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গেলে বিমল এইবার ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে। মিনি আর এ্যালিস্ নেই। গুণ্ডারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওর মনে হোল, কন্‌শেসনের ডাক্তার বেড্‌ফোর্ড বলেছিলেন—চীনা-সাংহাইতে মধ্য-এসিয়ার বর্ব্বরতার সঙ্গে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা মিলেছে। এখানে কন্‌শেসনের বাইরে মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়। বিশেষ করে এই যুদ্ধ-দুর্দ্দিনের সময়ে, দেশে আইন নেই, পুলিস নেই - প্রত্যেক সবল মানুষ নিজেই পুলিস। সাবধানে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

কি ভুলই করেছে অত রাত্রে অজানা রাস্তায় অজানা চীনে রিক্‌শাওয়ালার গাড়ীতে চড়ে, —সঙ্গে যখন মেয়েরা রয়েছে! তার চেয়েও ভুল, সঙ্গে রিভলবার নিয়ে না বেরুনো!

এখন উপায় কি? যদি ওদের সন্ধান না-ই মেলে! কন্‌শেসনে, সে আর সুরেশ্বর মুখ দেখাবে কেমন করে?

স্তব্ধ নির্জ্জন বাড়ীটা। সাড়াশব্দ নেই কোনো দিকে। মা জং খেলার ঘরে একটা চীনে লণ্ঠন ঝুলছে। আধ-আলো অন্ধকারে বিকট-মূর্ত্তি চীনা দেবতার ছবিটা যেন এক হিংস্র দৈত্যের প্রতিকৃতি মত দেখাচ্ছে—সেই একমাত্র আলো সারা বাড়ীটাতে। বাকীটা অন্ধকার। আশ্চর্য্য, কোথায় কলকাতার শাঁখারিটোলা লেন, আর কোথায় সাংহাইএর এক নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীর আড্ডা! অবস্থার ফেরে কোথা থেকে মানুষকে কোথায় নিয়ে এসে ফেলে!

এ্যালিস্ চমৎকার মেয়ে, মিনিও চমৎকার মেয়ে; ওদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হোলে সে

নিজেকে ক্ষমা করবে না। ওদের জন্যে বিমলই দায়ী! হাসপাতাল থেকে বার হয়ে কন্‌শেসনে ফেরা উচিত ছিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে গিয়েছে। সুরেশ্বরের দেখা নেই। সে কি কন্‌শেসনে ফিরে গিয়েছে নিজেই খবর দিতে?

বিমল আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটলো। রাস্তার আলো হঠাৎ যেন নিবে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এ আবার কি কাণ্ড!

মিনিট পাঁচ-ছয় কি দশ পরে বাইরে থেকে কে একজন উত্তেজিত গলায় চীনা ভাষায় কি বললে—কোনো সাড়া না পেয়ে আবার বল্লে। ঠিক যেন কাউকে ডাকছে।

বিমল অবাক হয়ে ভাবছে গুণ্ডারা ফিরে এল না কি!

হঠাৎ দুজন চীনা ইউনিফর্মপরা পুলিসম্যান বাড়ীর মধ্যে খানিকটা ঢুকে রাগের ও গালাগালির সুরে চেঁচিয়ে কি কথা বলে উঠলো।

বিমল ভাবলে সুরেশ্বরের আনীত পুলিসম্যান বাড়ী খুঁজতে এসেছে। ও এগিয়ে যেতে পুলিসম্যান দুজন একটু আশ্চর্য্য হোল। তারপর পিজিন ইংলিশে উত্তেজিত কণ্ঠে মা জং খেলার ঘরের আলোর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে— আলো এখুনি নিবোও। আমাদের বাঁশি শুনতে পাওনি? আলো জেলে রেখেছ কেন?

বিমল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বল্লে—আলো জেলে রেখেছি কেন?

– হ্যাঁ, আলো জালিয়ে রেখেছ কেন? আলো, আলো, লণ্ঠন—যা থেকে আলো বার হয়, অন্ধকার দূর করে সেই আলো—

—আমি তো জেলে রাখি নি। এ আমার বাড়ী নয়।

চীনা পুলিসম্যান দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। এ বাড়ীর যে এ লোক নয়, তারা সেকথা আগেই বুঝেছিল।

বিমল এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বল্লে—দাঁড়াও, তোমরা যেও না। প্রথমে বলো আলো নিবিয়ে দেবো কেন?

—মিস্টার, সাংহাই পুলিস-মার্শালের নোটিশ দেখো নি? রাত এগারটার পরে শহরের সব আলো নিবিয়ে দিতে হবে। ব্ল্যাক্-আউট। বোমা ফেলছে জাপানীরা। তোমার কি বাড়ী?

—আমার এ বাড়ী নয়। সব বলছি, আমি কন্‌শেসনের লোক—যুদ্ধের ডাক্তার, ভারতবর্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। আমরা চারজনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই পথে রিক্‌শা করে যাচ্ছিলুম—সঙ্গে ছিলেন দুটি মার্কিন মহিলা। রিক্‌শাওয়ালা তাঁদের নিয়ে কোথায় পালিয়েছে। আমাদের রিক্‌শা অন্যপথে নিয়ে গেলে আমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে সন্ধান পাই এই বাড়ীটার সামনে রিক্‌শাটা মেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা বাড়ীতে ঢুকে দেখি, এটা মা-জং জুয়াড়ীদের ও চণ্ডুর আড্ডা। ওদের সঙ্গে মারামারি হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কোথায় পালিয়েছে। আমার বন্ধু পুলিস ডাকতে গিয়েছে। তোমরা

এসেছ ভালই হয়েছে, এই তালা-বন্ধ ঘরটা খোলো—আমার বিশ্বাস এরই মধ্যে মহিলা দুটিকে আটকে রেখেছে।

পুলিসম্যান দুজন আবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে। তারা যে বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছে, মা জং লোর ঘরে চীনে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয়ও ওদের মুখ দেখে বিমলের সেটা বুঝতে দেরি হোল না। যেন ওরা কখনো ওদের ক্ষুদ্র পুলিস জীবনে এমন একটা আজগুবী ব্যাপারের সম্মুখীন হয় নি—ভাবখানা এই রকম।

একজন পুলিস চৌকিদার এগিয়ে বন্ধ ঘরের তালাবন্ধ দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—এই ঘর? কই, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?

—না, সাড়া দেবে কে? ধরো অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছে!

পুলিসম্যান দুটির মধ্যে একজন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের মত অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না, আমার তা মনে হয় না মিস্টার। তুমি জানো না এই-সব জুয়াড়ী ও চণ্ডুর আড্ডাধারী বদমাইশদের। এ ঘরে ওদের রাখে নি। ওদের গায়ে গহনা ছিল?

—একজনের গলায় একটা ঝুটো মুক্তোর মালা ছিল—দুজনের হাতে দুটো সোনার হাত ঘড়ি আর সোনার পাতলা বালা—

এমন সময় বাইরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বাড়ীতে ঢুকলো—আগে-আগে সুরেশ্বর, পেছনে একদল চীনা পুলিশ, সঙ্গে একজন কন্‌শেসন পুলিশ।

সুরেশ্বর ঢুকেই বল্লে—টেলিফোন করে দিয়েছি কন্‌শেসনে—পুলিস মার্শালকে জানানো হয়েছে। এই একজন কন্‌শেসনের পুলিসম্যানকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে আনলুম। এদিকে মহা মুশকিল, শহরে ব্ল্যাক-আউট, আলো জ্বালবার জো নেই—সব ঘুটঘুটে অন্ধকার।

—ভাঙো দরজা সবাই মিলে।

সকলের সমবেত চেষ্টায় ও ধাক্কায় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়লো।

বিমল সকলের আগে ঘরে ঢুকলে। পিছনে ছ'টা পুলিশ টর্চ জেলে ঢুকলো। তিনটি বড় বড় জালা ছাড়া ঘরে কিছু নেই। মানুষের চিহ্ন তো নেই-ই।

একজন পুলিস উঁকি মেরে জালার মধ্যে দেখলে। জালাতে মানুষ তো দূরের কথা, একবিন্দু জল পর্য্যন্ত নেই। খালি জালা।

মাথার ওপর আকাশে আবার অনেকগুলো এরোপ্লেনের ঘর্ ঘর্ আওয়াজ শোনা গেল। দুজন পুলিসম্যান উঠোনে গিয়ে হেঁকে বল্লে—আলো নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, জাপানী বম্বার—

সুরেশ্বর বল্লে—আরে, এরা বেশ তো! সারা সন্ধেবেলা জাপানীরা বোমা ফেল্লে, তখন 'ব্ল্যাক-আউট' করলে না—আর এখন এদের হুঁশ হোল -

বিমল উপরের দিকে মুখ তুলে বললে—হাঁ, জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার। মিনি চিনিয়ে দিয়েছিল কন্‌শেসনে—মনে আছে?

সমস্ত সাংহাই শহর অন্ধকার। সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে—কারণ নক্ষত্রের

আলো সাংহাইয়ের পুলিস মার্শালের আদেশ মানে নি—জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, তাও সব সময় নয়। মাঝে মাঝে যেন সেগুলো কোন্ দিকে চলে যায়, আবার খানিক পরে মাথার ওপরে আসে।

বিমল ভাবছিল, জাপানী বম্বার থেকে আর বোমা ফেলছে না তো!

সুরেশ্বরকে কথাটা বলতে সে বল্লে—ব্ল্যাক-আউটের জন্যে নিশ্চয়। সবাই লুকিয়েছে। রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। কোনো দিকে কোনো শব্দ আছে?

দুজন চীনা পুলিস বল্লে—তোমরা বোঝ নি মিস্টার। ওরা বোমা ফেলবে না, এখন সুবিধে খুঁজছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার। সেই বোমা ফেলে লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে, যেমন সব ভয়ে রাস্তাঘাটে বেরুবে কি পালাতে যাবে, অমনি গ্যাসের বোমা ফেলবে। এখন গ্যাসের বোমা ফেল্লে তো মানুষ মরবে না, কারণ সব ঘরের মধ্যে জানলা দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে ওদের আগে বার করবে রাস্তায়—পরে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বোমা ছাড়বে, এ-ই করে আসছে দেখছি আজ ক'দিন থেকে—

একটু পরে কন্‌শেসনের পুলিস এলো, চীনা পুলিসের ডেপুটি মার্শাল স্বয়ং এলেন বহু লোকজন নিয়ে। ওদের দিয়ে চণ্ডুর ও জুয়াড়ীদের আড্ডার ছোট্ট উঠানটা ভরে গেল।

ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—শহরে ব্ল্যাক আউট, ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিধারে—এক্ষুনি জাপানীরা হাইএক্সপ্লোসিভ্ বম্ব্ ফেলবে, তারপরে ফস্‌পেন্ গ্যাসের বোমায় বিষ ছাড়বে। এ অবস্থায় কি করা যায়? মেয়ে দুটিকে কোথায় আটকে রেখেছে, কি করে খুঁজি?

কন্‌শেসন পুলিসের কর্ম্মচারীরা বল্লেন—আপনার এলাকায় যত বদমাইশের আড্ডা আছে, সব হানা দিই চলুন।

—কিন্তু তাতে সময় নেবে। এখুনি যে সব ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে ছুটে বেরিয়ে পড়বে। দেখছেন না ওপরকার অবস্থা? ওদের প্ল্যান ঠিক করে নিতে যা দেরি! আচ্ছা, দেখি কতদূর কি হয়। মেয়ে দুটিকে গুণ্ডারা আটকে রেখেছে, মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাদের প্রাণের ভয় বর্ত্তমানে নেই একথা ঠিকই। সাংহাইতে এ রকম অনবরত হচ্ছে। এই ভদ্রলোক দুটি এত রাতে মেয়েদের নিয়ে চা-পেই পল্লীতে বেরিয়ে বড় বিবেচনার অভাব দেখিয়েছেন। যত গুণ্ডা আর বদমাইশের আড্ডা এই পাড়ায়।

পুলিসের লিস্ট দেখে কাছাকাছি দুটি বদমাইশের আড্ডায় হানা দেওয়া হোল—কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিললো না।

তারপর—রাত তখন দেড়টা—এমন এক ভীষণ ব্যাপারের সূত্রপাত হয়ে গেল যে, এর আগে যে সব বোমা ফেলার কাণ্ড সুরেশ্বর ও বিমল দেখেছে—এর কাছে সেগুলো সব একেবারে ম্লান হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে মুছে গেল।

বিমল আর সুরেশ্বরের মনে হোল, আকাশ থেকে চারিধারে একসঙ্গে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পড়তে শুরু হয়েছে—অসংখ্য। অনেক, অনেক—গুনে শেষ করা যায় না! সঙ্গে

সঙ্গে বিষম বিস্ফোরণের আওয়াজ, ইট টালি ছোটার শব্দ, দেওয়াল পড়ার ছাদ পড়ার শব্দ—মানুষের কলরব, হৈ-চৈ, কান্না, পুলিসের হুইস্‌ল্‌, মাথার ওপর ঘর্ঘর শব্দ—সবসুদ্ধ মিলিয়ে একটা সুপ্ত দৈত্যপুরীর দৈত্যরা যেন হঠাৎ জেগে উঠে উন্মাদ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে !

ডেপুটি মার্শাল অর্ডার দিলেন, সব কন্‌স্টেবল একত্র হয়ে গেল। কন্‌শেসন পুলিসের কর্ম্মচারীরা সাহায্য করতে চাইলে, হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেই অন্ধকারের মধ্যে টর্চ জ্বেলে অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করে আহত ও চাপা-পড়া মানুষের সন্ধান চলতে লাগলো। কাজ এগোয় না। ভাঙা বাড়ীর ইটের রাশি পদে পদে ওদের বাধা দিতে লাগলো। একটা চীনা মন্দিরের কাছে চারজন লোক মরে পড়ে আছে। দুটি ছোট বাড়ী চুরমার হয়ে সেখানে এমন ভাবে রাস্তা আটকেছে যে, মৃতদেহগুলো টেনে বার করবার উপায়ও রাখে নি। ইটের স্তূপের ওপর উঠে আবার ওদিক দিয়ে নেমে যেতে হোল—তবে জায়গাটা পার হওয়া সম্ভব হোল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠলো—সামনে প্রকাণ্ড বোমার গর্ত্ত, সাবধান !

সবাই চেয়ে দেখলে আন্দাজ ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত একটা প্রকাণ্ড গহ্বর থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে—এবং গর্ত্তের ধারে এখনও ছট্‌কানো ধাতুর খোলা-ভাঙা টুক্‌রো পড়ে আছে, বিমল টুক্‌রোটা হাতে তুলে নিয়েই ফেলে দিলে —গরম আগুন !

কর্ডাইটের উগ্র গন্ধ জায়গাটায়। ওরা সবাই অবাক হয়ে সেই ভীষণ গর্ত্তটার দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময়ে দেখা গেল, ছ'খানা জাপানী প্লেন সার-বন্দী হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে আসছে—ওদের মাথার উপর। বোধ হয় ওদের টর্চের আলো দেখেই আসছে। চীনা পুলিসের ডেপুটি মার্শাল হেঁকে বল্লেন—সাবধান—! বোমার গর্ত্তে লাফ দাও !

সবাই বুঝলে এ অবস্থায় ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত এবং আন্দাজ প্রায় পনেরো ফুট গভীর বোমার গর্ত্তটাই সব চেয়ে নিরাপদ স্থান, সারা চা-পেই পল্লী অঞ্চলের মধ্যে।

ঝুপ্‌ঝাপ্‌! দু সেকেণ্ডের মধ্যে ওপরে আর কেউ নেই—সবাই গর্ত্তটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিমলও ওদের সঙ্গে লাফ দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁটু পর্য্যন্ত পাঁকে পুঁতে গেল, গর্ত্তটার মধ্যে কাদা আর জল—কাদার সঙ্গে বোমার ভাঙা টুকরো মেশানো—সবাই কোনো রকমে জলকাদার মধ্যে মাথা গুঁজে রইল ধার ঘেঁষে—কারণ মাঝখানে থাকলে অনেকখানি নক্ষত্র-খচিত অন্ধকার আকাশ দেখা যায়—তখন আর নিজেকে খুব নিরাপদ বলে মনে হয় না।

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকান পুলিসম্যান ওদের বোঝাচ্ছিল যে, এ অবস্থায় কোন এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেললে ওদের লাগবার কথা নয়—সে নাকি মাঞ্চুকুও রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানে—বোমার গর্ত্তই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

আর একজন বল্লে—কেন, যদি মেসিনগান চালায় ?

আগের লোকটা বল্লে—ফুঃ! মেসিনগান! এই অন্ধকারে!

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল সেই ছ'খানা প্লেন ঠিক ওদের গর্ত্তের ওপর এসে চক্রাকারে উড়ছে এবং ক্রমে নীচু হয়ে নামছে যেন।

কে একজন বল্লে—আমাদের টের পেলে নাকি!

মুখের কথা সবারই ওষ্ঠাগ্রে যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে—বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমাট বেঁধে গেল সকলের। কেবল আগের পুলিসম্যানটি বলতে লাগলো—কোনো ভয় নেই—ওরা মেসিনগান ছুঁড়ে কিছু করতে পারবে না—কাওয়াসাকি বম্বারের মেসিনগানের তরিবৎ সুবিধের নয়—হোত যদি জার্মান হেঙ্কেল্ ফিফ্‌টিওয়ান, কি স্কুল্‌জ্-ব্যাঙ্ক একশো এগারো—

সবাই চাপা গলায় বিষম রাগের সঙ্গে এক সঙ্গে বলে উঠলো—আঃ—চুপ! সঙ্গে সঙ্গে প্লেনগুলো অনেকখানি নেমে এল এবং অকস্মাৎ এক তীব্র সার্চলাইটের আলোয় ওদের বোমার গর্ত্ত এবং চারিপাশের আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো—ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে পট্‌কা বাজির মত মেসিনগান ছোঁড়ার শব্দে ওদের কানে তালা ধরবার উপক্রম হলো।

একজন ফিস্ ফিস্ করে বল্লে—যদি বাঁচতে চাও তো সবাই মড়ার মত পড়ে থাকো—ভান করো যে সবাই মরে গিয়েছো—

আগের সেই মার্কিন পুলিসম্যানটি যুক্তিতর্কে অদম্য। সে বলে উঠলো—কিছু হবে না দেখো—হাঁ হোত যদি হেঙ্কেল্ ফিফ্‌টিওয়ান—কিংবা—

—আবার!

সেই কাদাজলের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে উপুড় হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে বিমল অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো কথা ভাবছিল না। তার চিন্তা শুধু বর্ত্তমানকে আশ্রয় করে। সংসার নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ—শুধু সে আছে, আর আছে—এই দুর্দ্ধর্ষ, বিভীষণ, নিষ্ঠুর বর্ত্তমান। যে কোনো মুহূর্ত্তে মেসিনগানের গুলি ওর জীবলীলা, ওর সমস্ত চৈতন্যের অবসান করে দিতে পারে, সারা দুনিয়া ওর কাছ থেকে মুছে যেতে পারে এক মুহূর্ত্তে—যে কোনো মুহূর্ত্তে। কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে, চোখ বুজে ও পড়ে রইল—ওর পাশে সবাই সেই ভাবেই আছে—বীরত্ব দেখাবার অবকাশ নেই. বাহুবল বা সাহস দেখাবার অবসর নেই—খোঁয়াড়ের শুয়োরের দলের মত ভয়ে কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকা—এর নাম বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ! ওরা আজ দেশপ্রেমিক বীর সৈনিক দল হোলেও এর বেশী কিছু করতে পারতো না—এই একই উপায় অবলম্বন করতেই হোত—অন্য গত্যন্তর ছিল না। অন্য কিছু করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কানের এত কাছে এরোপ্লেনের শব্দ বিমল কখনও পায়নি, এরোপ্লেনের বিরাট আওয়াজ কানে একেবারে তালা ধরালো যে! ওর ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে চোখ চেয়ে দেখে, এরোপ্লেনগুলো গর্ত্তটার কত ওপরে এসেছে।

আওয়াজ—আওয়াজ—এরোপ্লেনের আওয়াজ, মেসিনগানের আওয়াজ! কিন্তু আওয়াজ

যত হোলো, কাজ ততো হলো না। মেশিনগানের একটা গুলিও বোমার গর্ত্তের মধ্যে পড়লো না। দু-তিনবার প্লেনগুলো গর্ত্তের দিকে নেমে এলো পুরো দমে, কিন্তু কিছু করতে পারলে না। আওয়াজ, কেবলই আওয়াজ। ক্রমে প্লেনগুলো সরে গেল গর্ত্তের ওপর থেকে, হয়তো দেখে ভাবলে গর্ত্তের লোকগুলো সব মরে গিয়েছে। মড়ার ওপর মেশিনগানের দামী গুলি চালিয়ে বৃথা অপব্যয় করা কেন?

ওরা সবাই গর্ত্ত থেকে উঠে এল। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলে, কি অদ্ভুত কাদা-মাখা চেহারা হয়েছে সকলকার! পুলিশের স্মার্ট ইউনিফর্ম একেবারে কাদায় আর ঘোলা জলে নষ্ট হয়ে ভিজে-কাঁথা হয়ে গিয়েছে। মার্কিন পুলিশম্যানটি গর্ত্ত থেকে ঠেলে উঠেই বল্লে—বলি নি তোমাদের, এরা মেশিনগান ছুঁড়ে সুবিধে করতে পারে না ও এরোপ্লেন থেকে? স্কুল্‌জ্‌ ব্যাঙ্কস্‌ একশো এগারো যদি হোত, তবে দেখতে একটা প্রাণীও আজ বাঁচতাম না।

মিনিট পনেরো কেটে গেল! বোমারু প্লেনগুলো আকাশের অন্যদিকে চলে গিয়েছে। কি ভীষণ আওয়াজ! বিমলের মনে পড়লো, এ্যালিস্‌ তার নরম সাদা হাত দুটি তুলে কান ঢেকে বস্‌তো—হোয়াট্‌-এ্যান-অ-ফুল্‌ রকেট! এ্যালিসের সেই ভঙ্গিটা, তার মুখের কথা মনে পড়তেই বিমলের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো।

এ্যালিস্‌—মিনি—বেচারী এ্যালিস্‌!—কি ভীষণ কাল-রাত্রি আজ ওদের পক্ষে। সাংহাইয়ের এই দুর্যোগের রাত্রির কথা বিমল কি কখনো ভুলবে জীবনে? কোথায় সে সিঙ্গাপুরে ডাক্তারী করবে বলে বাড়ী থেকে রওনা হোল—অদৃষ্ট তাকে কোথায় কি অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেছে!

হঠাৎ পিনাংএর মন্দিরে সেই নিষ্ঠুর মূর্ত্তি চীনা রণদেবতার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ মনে পড়লো ওর।—রণদেবতা ওদের তাঁর ফাঁদে ফেলেছেন—

একটা প্লেন দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটা বস্তির ওপরে দুটো বোমা ফেললে—ভীষণ আওয়াজ হোল—অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুনের শিখার চমক দেখা গেল, কিন্তু লোকজনের চেঁচামেচি শোনা গেল না। মার্কিন পুলিসম্যানটি বল্লে—পঞ্চাশ পাউণ্ডের বোমা! দেখেছ কি কাণ্ডটা করলে বস্তিতে! লোক সব নিশ্চয় পালিয়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—ওই দেখ, আর একদল বম্বার দেখা দিয়েছে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে—

অন্তত বারোখানা সারবন্দী হয়ে এগিয়ে আসছে। এরা যে এলোমেলো ভাবে বোমা ফেলছে না, তা বেশ বোঝা গেল—এদের ধ্বংস-লীলার মধ্যে প্ল্যান আছে, শৃঙ্খলা আছে, সমস্ত শহরটা এবং তার প্রান্তস্থিত এই দরিদ্র পল্লী চা-পেই ও অন্যান্য ছড়ানো গ্রামগুলোকে ওরা যেন কতকগুলো কাল্পনিক অংশে ভাগ করে নিয়েছে এবং নিয়ম করে প্রত্যেক অংশে বোমা ফেলছে—কোন অংশ পরিত্রাণ না পায়!

বিমল লক্ষ্য করলে অন্ধকারের মধ্যে বস্তির লোকজনেরা খানা-নালার মধ্যে অনেকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—একটা লোক একটা গাছের গুঁড়িতে প্রাণপণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না—মেয়ে কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না, যেন ভীত, সন্ত্রস্ত প্রেতমূর্ত্তি। সন্ধ্যাবেলার সেই বেপরোয়া ভাব আর নেই।

একমুঠো ছড়ানো নক্ষত্রের মত কতকগুলো বোমা পড়লো দূরের একটা পাড়ায়—সাংহাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র সে জায়গাটা—পুলিশম্যানগুলো বলাবলি করছে। ওদিকে সেই প্লেনগুলো আবার আসছে, তবে এবার সার্চলাইট জ্বালায় নি, অন্ধকারেই আসছে। কাছেই একটা পল্লীতে ওরা ছ'টা বোমা ফেল্লে, আন্দাজ এক একটা পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের। পুলিশের ডেপুটি মার্শালের আদেশে ওরা সবাই সেদিকে ছুটলো। সেখানে এক ভীষণ দৃশ্য। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, ভয়ের চোটে সতর্কতা ভুলে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীঘর চুরমার, আয়না, মাদুর, টেবিল, ছবি সব ছিটকে রাস্তায় এসে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে—তারই মধ্যে এক জায়গায় একটা প্রৌঢ়া মহিলার ছিন্নভিন্ন বিকৃত মৃতদেহ। কিছুদূরে একটি সুন্দরী বালিকার দেহ দু টুক্‌রো হয়ে পড়ে আছে, তলপেটের নাড়িভুঁড়ি খানিকটা বেরিয়ে ধুলোতে লুটিয়ে পড়েছে।

এই সব বীভৎস দৃশ্যের মাঝখানে এক জায়গায় একটা ছোট মেয়ে ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে চোখ বুজে ছুটে একটা ছোট মাঠ পার হয়ে পালাচ্ছিল—পুলিশের লোক ওকে ধরে ফেল্লে। মেয়েটির বয়স ন' বছর—সে ভয়ে এমনি দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারলে না।

ওর হাতে একটা পুঁটুলি। পুঁটুলির মধ্যে কিছু শুকনো শূওরের মাংসের টুক্‌রো আর গোটাকতক কিশমিশ। তাকে খানিকক্ষণ ধরে জিগ্যেস করার পরে জানা গেল তাদের বাড়ীতে বোমা পড়বার পরে বাড়ী ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কে কোথায় গিয়েছে তা সে জানে না। সে কিছু খাবার সংগ্রহ করে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে—তার বিশ্বাস, চোখ বুজে ছুটে পালালে বোমা ফেলে যারা, তারা ওকে দেখতে পাবে না। তাকে ডেকে নিয়ে প্রৌঢ়া মহিলার মৃতদেহ দেখানো হোল।

খুকী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, ওই তার মা। পাশের বালিকাটি তার দিদি। ডেপুটি মার্শাল পাড়ার একজন লোক ডেকে মেয়েটির নাম ধাম, বাপের নাম ঠিকানা জেনে নিলেন, কারণ ছেলেমানুষ পুলিশের প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত দিতে পারবে না। মেয়েটি পুলিশের জিম্মাতেই রইল—কারণ শোনা গেল ওর বাবা বছর-তিন মারা গিয়েছেন, বিধবা মা আর দিদি ছাড়া সংসারে ওর আর কেউ ছিল না।

একদল লোককে দেখা গেল ভাঙা বাড়ীগুলো থেকে জিনিসপত্র, মৃতদেহ টেনে বার করছে। ওরা টর্চ জেলে টর্চের মুখ নীচের দিকে নামিয়ে মৃতদেহ কি জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাছে ওপর থেকে বোমারু প্লেনগুলো টের পায়।

বিমল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলে। সাগ্রহে সে ছুটে গেল—প্রোফেসর লি, প্রোফেসর লি—

অন্ধকারের মধ্যে বিমলকে উনি চিনলেন। বল্লেন—আমি আমার ছাত্রের দল নিয়ে

বেরিয়েছি, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার মেয়েরা কোথায়?

এই সৌম্যদর্শন, পরহিতব্রতী বৃদ্ধের স্নেহ-সম্ভাষণে বিমলের মন আর্দ্র হয়ে উঠলো। বল্লে —সে অনেক কথা। আমার মনে হয় আপনি এবং আপনার দলই এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

প্রোফেসর লি হাসিমুখে বল্লেন—যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব আলোচনা করতে এসেছিলুম জানেন তো? এর চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কোথায় পাবো সে আলোচনার?

হঠাৎ একটা প্লেন মাথার ওপর এল। সবাই কথা বন্ধ করে ওপর দিকে চাইলে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি চেঁচিয়ে উঠল—কভার! কভার!

কোথায় আর আশ্রয় নেবে, সেই ভাঙা বাড়ীর ইটকাঠের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ছাড়া। সবাই সেই দিকে ছুটলো। বিমলও চীনা খুকীটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো সেই দিকে।

প্লেন থেকে বোমা পড়ল না। পড়লো কতকগুলো চকচকে রূপোর বাতিদানের মত লম্বা লম্বা জিনিস। প্লেনটা চলে গেলে ওরা সেগুলো দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখলে। সরু সরু রূপোর নলের মত জিনিস, হাত খানেক লম্বা। ঝক্‌ঝকে সাদা। মার্কিন পুলিশম্যান একটা হাতে তুলে নিয়ে বল্লে—ইন্‌সেনডিয়ারি বম্ব্—আগুন লাগাবার বোমা—এলুমিনিয়ম আর ইলেকট্রনের খোল, ভেতরে এলুমিনিয়ম পাউডার আর আয়রন অক্সাইড ভর্ত্তি। এই দেখ ছ'টা করে ফুটো টিউবের গোড়ার দিকে। এই দিয়ে আগুনের ফুলকি বার হয়ে আসবে। এ আগুন নিবোনা যায় না।

জাপানীদের মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার পর লোকজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পালাবে, তখন ওরা শহরে ইন্‌সেনডিয়ারি বম্ব্ ফেলে আগুন লাগিয়ে দেবে, আগুন নিবোতে কে এগোবে তখন।

কি ভীষণ ধ্বংসের আয়োজন! বিমল সেই ঝক্‌ঝকে পালিশ করা সরু টিউবটা হাতে নিয়ে শিউরে উঠলো। এই টিউবের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিদেব এখুনি জেগে উঠে এই এত বড় সাংহাই শহরটা জালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, তারই আয়োজন চলছে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি বল্লে—পঁয়ষট্টি গ্রাম এলুমিনিয়াম পাউডার আর পঁয়ত্রিশ গ্রাম আয়রন অক্সাইড। আমাদের মার্কিন নৌবহরের উড়োজাহাজে আজকাল এর চেয়েও ভালো বোমা তৈরী হচ্ছে—আয়রন অক্সাইডের বদলে দিচ্ছে—

কাছেই আরও দু তিনটা রূপোর বাতিদান পড়লো।

দিনের বেলায় ওরা পরস্পরের ধুলো কাদা মাথা চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রোফেসর লি তখনও কাজে ব্যস্ত, চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে লোকজন টেনে বার করে বেড়াচ্ছেন, তিনি আর তাঁর ছাত্রেরা। পুলিশও এসেছে, দুটো রেড্ ক্রসের হাসপাতাল গাড়ীও এসেছে। আকাশে জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর চিহ্ন নেই।

রাত্রিটা কেটে গিয়েছে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত। বেলা এখন দশটা—এখনও সে

দুঃস্বপ্নের জের মেটে নি। বিনা কারণে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার তাণ্ডব যে চলতে পারে তা এর আগে, ভারতবর্ষে থাকতে বিমল কখনো ভেবেছিল?

কন্‌শেসনে সেই সবজান্তা আমেরিকান্ পুলিশটা বলছিল—দেখবেন ওরা ইন্‌সেনডিয়ারি বোমা ফেলে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করবে। এখানে অনেক বাড়ীই কাঠের। তাতে আবার বোমার আগুন জলে নেবে না। বালি ছড়াতে হয় একরকম কল দিয়ে। প্রথম অবস্থায় বোমাটাকে বালি বোঝাই থলে দিয়ে চেপে ধরলেও আর স্পার্ক ছোটে না—কিন্তু সে সব করে কে?

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—কিন্তু সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমায়। কাল সন্ধ্যা ও রাতের বোমা ফেলার দরুন চা-পেই পাড়া ও সাংহাইয়ের চ্যাং সো লীন এভিনিউতে সাত আটশো বাড়ীর চিহ্ন নেই—মানুষ মারা পড়েছে তিনশোর ওপর, মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে প্রায় পাঁচশো। তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বাঁচবার আশা নেই।

প্রোফেসর লি বল্লেন—আমাদের সব চেয়ে ভীষণ শত্রু যে এই বোমারু প্লেনগুলো, তা ক'দিনের ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারছি। তবুও তো এখনো ওরা সমবেত ভাবে আক্রমণ করে নি—করলেও একশোখানা প্লেনের প্রত্যেক প্লেনখানা থেকে দু টন বোমা ফেললে পাঁচ হাজার লোক কালই মেরে ফেলতো।

সবজান্তা পুলিশম্যানটি বল্লে—জাপানী বম্বারগুলো এক একখানা দু টন বোমা বইতে পারে না মশায়—সে পারে জার্মান ডর্নিয়ের কিংবা ইটালির কাপ্রোণি—কিংবা—

ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—আহা হা, ও সব এখন থাক্—ও তর্কে কি লাভ আছে? এখন আমাদের দেখতে হবে যে দুটি মার্কিন মহিলাকে কাল রাত্রে গুণ্ডারা নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের উদ্ধারের কি উপায় করা যায়, বোমা এখন এবেলা অন্ততঃ আর পড়বে না—

এমন সময়ে একজন চীনা পুলিশ সার্জেণ্ট্ মোটর সাইকেলে ছুটে এসে সংবাদ দিলে, কন্‌শেসন অঞ্চলে চীনা পলাতক নরনারীদের সঙ্গে কন্‌শেসন পুলিশের ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। ওরা ইয়াংসিকিয়াং-এর ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছিল, কন্‌শেসন পুলিশ ব্রিজের ওমুখে মেশিনগান বসিয়েছে—তারা বলছে এত পলাতক লোক জায়গা দেবার স্থান নেই কন্‌শেসনে। খাবার নেই, জল নেই। গেলে সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে।

প্রোফেসর লি বল্লেন—কত লোক পালাচ্ছিল?

—তা বোধ হয় দশ হাজারের কম নয়। অর্দ্ধেক সাংহাই ভেঙ্গে মেয়ে-পুরুষ সব পালাচ্ছে কন্‌শেসনের দিকে। আপনারা সব চলুন, একটু বোঝান ওদের। রাত্রির ব্যাপারে সব ভয় খেয়েছে বড্ড।

কন্‌শেসনের পুলিশদলকে চলে যেতে উদ্যত দেখে বিমল বল্লে—আজই মেয়ে দুটির ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে—দেরি হোলে ওদের খুঁজে বার করা শক্ত হবে হয় তো।

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—সে বিষয়ে ওঁরা কিছু সাহায্য করতে পারবেন না।

আমাদের বদমাইশদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে। আমি আজ এখুনি এর ব্যবস্থা করছি। ব্যস্ত হবেন না—বিদেশী গবর্নমেণ্টের কাছে এজন্যে আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী।

সেদিন সারাদিন ওরা হাসপাতালে গেল না। ডাক্তার সাহেবকে জানিয়ে দিলে মিনি ও এ্যালিসের বিপদের কথা। কন্‌শেসনে যাবার জন্যে দুবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হোল না। সে পথ লোকজনের ভিড়ে বন্ধ হয়ে আছে, তা ছাড়া ইয়াংসিকিয়াংয়ের পুলের ওপারের মুখে মেশিনগান বসানো।

সারাদিন ধরে কি করুণ দৃশ্য সাংহাইয়ের বাইরের বড় বড় রাজপথগুলিতে! লোকজন মোট-পুঁটুলি নিয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে—সাংহাই থেকে হোনান্ যাবার রাজপথ পলাতক নরনারীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভয়ানক গরমে এই ভিড়ে অনেকে সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়ে মারাও পড়ছে।

দুখানা হাসপাতালের গাড়ী ওদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু ভিড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে গাড়ী দুখানা শহরের উপকণ্ঠে এক জায়গায় পথের ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। একখানা গাড়ীর চার্জ নিয়ে বিমল সেখানে রয়ে গেল। সুরেশ্বর রইল তার সহকর্ম্মী হিসাবে।

শীঘ্রই কিন্তু কি ভয়ানক বিপদে পড়ে গেল দুজনেই। ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিল এই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে জাপানী প্লেন যদি বোমা ফেলে তবে যে কি কাণ্ড হবে তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

বেলা দুটো বেজেছে। একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্ম্মচারী মোটরবাইকে সাংহাইয়ের দিক থেকে এসে ওদের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর সামনে নামলো। বল্লে—আপনারা এখান থেকে সরে যান—

বিমল বল্লে—কেন?

—জাপানী সৈন্য শহরের বড় পাচিল ডিনামাইট্ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে—এখনো দুটো পাচিল বাকী—কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে ওরা সমুদ্রের ধারে সমস্ত দিকটা দখল করবে। আর আমরা খবর পেয়েছি পঞ্চাশখানা বোমারু প্লেন্ একঘণ্টার মধ্যে শহরের ওপর আবার বোমা ফেলবে।

—এই লোকগুলোর অবস্থা তখন কি হবে?

—চীনের মহা দুর্ভাগ্য, স্যার্। আপনারা বিদেশী, আপনাদের প্রাণ আমরা বিপন্ন হতে দেবো না। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই। আপনারা সরে যান এখান থেকে।

একটি গাছের তলায় একটি বৃদ্ধা বসে। সঙ্গে একটা পুঁটুলি, গোটা-কতক মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি। মুখে অসহায় আতঙ্কের চিহ্ন।

সামরিক কর্ম্মচারীটি কাছে গিয়ে বল্লে—কোথায় যাবে?

বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সৈনিকটির দিকে চাইলো কিন্তু চুপ করে রইলো। উত্তর দিলে না। সৈনিকটি আবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবে তুমি? তোমার সঙ্গে কে আছে?

এবারও বুড়ী কিছু বল্লে না।

বিমল বল্লে—বোধ হয় কানে শুনতে পায় না। দেখছ না ওর বয়েস অনেক হয়েছে। চেঁচিয়ে বল।

তরুণ সামরিক কর্ম্মচারী বৃদ্ধার নাতির বয়সী। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বল্লে—ও দিদিমা, কোথায় যাচ্ছ ?

বুড়ী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কোথায় আর যাবো ? সবাই যেখানে যাচ্ছে।

—এখানে বসে থেকো না। বোমা পড়বে এক্ষুনি। সঙ্গে কেউ নেই ?

বোমার কথা শুনেই বুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট হোল, ওপরের দিকে চাইলে। বল্লে—আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমার আর কেউ নেই, আমাকে তোমরা একখানা গাড়ীর ওপর উঠিয়ে দাও।

বিমল বল্লে—আমি ওকে এ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড বয়েস হয়েছে, এতখানি পথ ছুটোছুটি করে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে।

দুজনে ওকে ধরাধরি করে গাড়ীতে এনে ওঠালে।

এক জায়গায় একটি গৃহস্থ পরিবারের ঠিক এই অবস্থা। গৃহিণীর বয়েস প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ, সাত আটটি ছেলেমেয়ে, সকলের ছোটটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, বাকী সব দুই, চার, পাঁচ, সাত এমনি বয়েসের। সঙ্গে একটিও পুরুষ নেই। ওরাও হাঁটতে না পেরে বসে পড়েছে।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল বাড়ীর কর্ত্তা জাহাজে কাজ করেন—জাহাজ আজ কুড়ি দিন হোল বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছে। এদিকে এই বিপদ ! কাজেই মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ী থেকে—কোথায় যাবেন ঠিক নেই।

এদের অসহায় অবস্থা দেখে বিমলের খুব কষ্ট হোল। কিন্তু তার কিছু করবার নেই। কত লোককে সে হাসপাতাল গাড়ীতে জায়গা দেবে ?

সেদিন শহরের এমন ভয়ানক অবস্থা গেল যে কে কার খোঁজ রাখে। মিনি ও এ্যালিসের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই হোল না। সারা দিনরাত এমনি করে কাটলো।

রাত্রি শেষে জাপানী নৌসেনা সাংহাই শহরের দক্ষিণ অংশ অধিকার করলে। বিমল ও সুরেশ্বর তখন হাসপাতালে। ওরা কিছুই জানতো না। তবে ওরা এটুকু বুঝেছিল যে অবস্থা গুরুতর। সারারাত্রি ধরে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ থেকে গোলা বর্ষণ করলে। বোমারু প্লেন-গুলোর তেমন আর দেখা নেই, কারণ শহর প্রায় জনশূন্য। পথে ঘাটে লোকজনের ভিড় নেই বললেই চলে।

রাত তিনটে। এমন সময় ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য ঢুকতে দেখে বিমল প্রথমটা বিস্মিত হোল; তারপরই ওর মনে হোল এরা চীনা নয়, জাপানী সৈন্য। ক্রমে পিল্‌পিল্ করে বিশ ত্রিশজন জাপানী সৈন্য হাসপাতালের বড় হলটার মধ্যে ঢুকলো। চারিদিকে শোরগোল শোনা গেল। রোগীর দল অধিকাংশই বোমায় আহত নাগরিক,

তারা ভয়ে কাঠ হয়ে রইল জাপানী সৈন্য দেখে।

বিমল একা আছে ওয়ার্ডে। হাসপাতালের বড় ডাক্তার খানিকটা আগে চলে গিয়েছেন। ওই এখন কর্ত্তা। দুজন চীনা নার্স ভয়ে অন্য ওয়ার্ড থেকে ছুটে এসে বিমলের পেছনে দাঁড়ালো।

হঠাৎ একজন জাপানী সৈন্য বন্দুক তুলে জমির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ধরলে—রাইফেলের আগার ধারালো বেয়নেট ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো। চক্ষের নিমেষে সে এমন একটা ভঙ্গি করলে তাতে মনে হোল বিমলদের দেশে সিঁটকি জালে মাছ ধরবার সময় জালের গোড়ার দিকের বাঁশটা যেমন কাদাজলের মধ্যে ঠেলে দেয়—তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানুষিক আর্ত্তনাদ শোনা গেল। পাশের বিছানায় একটা চীনা যুবক রোগী শুয়ে ভয়ে ভয়ে ওদের দিকে চেয়ে ছিল—বেওনেট্ তার তলপেটটা গিঁথে ফেলেছে। চারিদিকে রোগীরা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো। রক্তে ভেসে গেল বিছানাটা। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

বিমলের মাথা হঠাৎ কেমন বেঠিক হয়ে গেল এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখে। সে এগিয়ে এসে ইংরাজিতে বল্লে—তোমরা কি মানুষ না পশু?

জাপানী সৈন্যেরা ওর কথা বুঝতে পারলে না—কিন্তু ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি ও গলার সুর শুনে অনুমান করলে মানে যাই হোক্, প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা তা নয়।

অমনি সব ক'জন সৈন্য ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুললে।

বিমল চোখ বুজলে—ও-ও বুঝলে এই শেষ।

সেই দুজন চীনা তরুণী নার্স, যারা ওর পেছনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। হাসপাতালের সবাই বিমলকে ভালবাসতো।

এমন সময় বিমলের কানে গেল পেছন থেকে একটা সামরিক আদেশের ক্ষিপ্র, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ সুর। জাপানী ভাষায় হোলেও তার অর্থ যেন কোন অদ্ভুত উপায়ে বুঝে ফেলে চোখ চাইলে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী, লেফ্‌টেনন্টের ইউনিফর্ম পরা। সৈন্যেরা ততক্ষণ বেওনেট নামিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছে।

জাপানী অফিসারটি এগিয়ে এসে জাপানী ভাষাতেই কি প্রশ্ন করলে। তিন চারজন সৈন্য একসঙ্গে ওর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কি বল্লে।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভাঙা ইংরিজিতে বল্লে—তুমি আমার সৈন্যদের গালাগালি দিয়েছ?

বিমল বল্লে—তোমার সৈন্যরা কি করেছে তা আগে দেখ। এটা রেড্‌ক্রস্ হাসপাতাল। এখানে কেউ যোদ্ধা নেই। অকারণে তোমার সৈন্যরা আমার ওই রোগীটিকে খুন করেছে বেওনেটের ঘায়ে।

জাপানী অফিসার একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রক্তাক্ত বিছানা ও মৃত রোগীর দেহটার দিকে চেয়ে দেখলে এবং তারপর সম্ভবত ভৎর্সনার সুরে সৈন্যদের কি বল্লে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি কোন্ দেশের লোক?

—ভারতীয়।

—রেড্‌ক্রসের ডাক্তার ?

—না, আমি চীনা মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার।

—ও, চীনেদের সাহায্য করতে এসেছ ভারতবর্ষ থেকে ?

—হঁ্যা।

—আমার সৈন্যদের অপমান করতে তুমি সাহস কর ?

—আমার সামনে আমার রোগী খুন করলো ওরা, তার প্রতিবাদ মাত্র করেছি।

হঠাৎ জাপানী অফিসারটি ঠাস্‌ করে একটা চড় মারলে বিমলের গালে। পরক্ষণেই সেই ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট সামরিক আদেশের স্বর গেল ওর কানে—রাগে অপমানে, চড়ের প্রবল ঘায়ে দিশাহারা ওর কানে। সব ক'জন সৈন্য মিলে তক্ষুনি ওকে ঘিরে ফেল্লে চক্ষের নিমেষে। দুজন ওকে পিছমোড়া করে বাঁধলে চামড়ার কোমরবন্ধ দিয়ে। তারপরে ওকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে চললো রাইফেলের কুঁদোর ধাক্কা দিতে দিতে। চীনা নার্স দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল।

বিমলকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হোল, সেখানটা একটা ছোট মাঠের মত। একদিকে একটা নীচু বাড়ী।

মাঠের এক পাশে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার পেতে জনৈক জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী বসে। তার চারিপাশে সশস্ত্র জাপানী সৈন্যের ভিড়। কিছুদূরে দেওয়াল থেকে পনেরো হাত দূরে একসারি রাইফেলধারী সৈন্য দাঁড়িয়ে। আরও অনেক জাপানী সৈন্য মাঠটার মধ্যে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলছে।

এ জায়গাটাতে কি হচ্ছে বুঝতে পারলে না।

ওকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কিছু দূরে দাঁড় করালে সৈন্যরা, তখন ও চেয়ে দেখলে দুজন চীনাকে জাপানী সৈন্যরা ঘিরে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। চেয়ারে উপবিষ্ট জাপানী অফিসারটি কি জিজ্ঞেস করছে সৈন্যদের। চীনা দুটি সৈন্য নয়, সাধারণ নাগরিক—বিমল ওদের দেখেই বুঝলে। একটু পরেই জাপানী অফিসারটি কি একটা আদেশ দিয়ে হাত নেড়ে চীনাদুটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বল্লে।

জাপানী সৈন্যেরা তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের ওদিকে যে বাড়ীটা, তার দেওয়ালের গায়ে নিয়ে দাঁড় করালে।

চীনা লোক দুটির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে—তারা কলের পুতুলের মত জাপানীদের সঙ্গে চললো বটে, কিন্তু তাদের চোখের অবাক ভাব দেখে মনে হয় তারা বুঝতে পারে নি কেন তাদের দেওয়ালের গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে।

বিমলও প্রথমটা বুঝতে পারে নি, সে বুঝলে—যখন দশজন জাপানী সৈন্যের সারি এক যোগে রাইফেল তুল্লে।

একটা তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সামরিক আদেশ বাতাস চিরে উচ্চারিত হোল, সঙ্গে সঙ্গে দশটি রাইফেলের এক যোগে আওয়াজ। বিমল চোখ বুজলে।

যখন সে আবার চোখ চাইলে, তখন প্রথমেই যে কথা তার মনে উঠলো, স্থান ও অবস্থা হিসেবে সেটা বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলতে হবে। তার সর্বপ্রথম মনে হোল—জাপানী রাইফেলের ধোঁয়া তো খুব বেশী হয় না! কেন একথা তার মনে হলো এই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে—জীবনের এই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে, কে তা বলবে?

তারপরই বিমল দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা দুটি উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দুজন জাপানী সৈন্য তাদের মৃতদেহের পা ধরে হিঁচড়ে টেনে একপাশে রেখে দিলে। তারা পাশাপাশি পড়ে রইল এমন ভাবে, দেখে বিমলের মনে হোল ওরা কোনো ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে প্রণাম করছে।

মানুষকে মানুষ যে এমন ভাবে হত্যা করতে পারে, বিমল তা আজ প্রথম দেখেছে হাসপাতালে, আর দেখলে এখন।

এবার বিমলের পালা, বিমল ভাবলে।

কিন্তু চেয়ে দেখলে আর চারজন চীনাকে আবার কোথা থেকে নিয়ে এসে জাপানী সৈন্যেরা টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

এবারও পূর্ব্বের মতো কথা-কাটাকাটি হলো জাপানী অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে।

তারপর আবার পূর্ব্বের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি! এই চীনা চারজনও উপুড় হয়ে পড়লো দেয়ালের সামনে আগের দুজনের মত।

চীনা ভাষা যদিও বা কিছু কিছু শিখেছে বিমল, জাপানী ভাষার তো সে বিন্দুবিসর্গ জানে না। কেন যে এদের গুলি করে মারা হচ্ছে, কি অপরাধে এরা অপরাধী, কিছু বোঝা গেল না। আর এখানে জাপানীরাই কথাবার্ত্তা বলছে, চীনাদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

বিমল ভাবছিল—এই দূর বিদেশে এখনি তার প্রাণ বেরুবে। মা বাবার সঙ্গে আর দেখা হলো না, হয়তো তারা জানতেও পারবেন না যে তার কি হয়েছে। শুধু একখানা চিঠি যাবে তাঁদের কাছে, তাতে লেখা থাকবে, ছেলে তাঁদের 'মিসিং'—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!... কিন্তু এ্যালিসের কি হলো! এ্যালিসের সঙ্গেও আর দেখা হবে না। এ্যালিস্‌কে বড় ভাল লেগেছিল। কোথায় যে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে! বেচারী এ্যালিস্! বেচারী মিনি!

কিন্তু বিমলের পালা আসতে বড় দেরি হতে লাগলো।

দলে দলে চীনা নাগরিকদের টেবিলের সামনে দাঁড় করানো চলতে লাগলো। তারপর তাদের হত্যা করাও সমানভাবে চলছে।

মৃতদেহ ক্রমেই স্তূপাকার হয়ে উঠছে।

এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা-দৃশ্য আর দেখা যায় না চোখে।

বিমলকে এইবার দুজন জাপানী সৈন্য নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। বিমল অনুভব করলে তার ভয় হচ্ছে না মনে—কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে।

জ্বর আসবার আগে যেমন গা বমি-বমি করে, ওর ঠিক তেমনি হচ্ছে শরীরের মধ্যে।

মাথাটা যেন হঠাৎ বড় হাল্কা হয়ে গিয়েছে, আর কেমন যেন বমির ভাব হচ্ছে।

জাপানী সামরিক অফিসারটি ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস্ করলে—তুমি রাস্তায় কি করছিলে?

বিমল ইংরিজিতে বল্লে—রাস্তায় সে কিছু করেনি। হাসপাতাল থেকে তাকে ধরে এনেছে।

—কোন্ হাসপাতাল?

—চীনা রেড্‌ক্রস্ হাসপাতাল।

—তুমি সেখানে কি করছিলে?

—আমি ডাক্তার। ডিউটিতে ছিলাম, জাপানী সৈন্যেরা একজন চীনা রোগীকে অকারণে বেওনেটের খোঁচায়—

পিছন থেকে দুজন জাপানী সৈন্য ওকে রুক্ষ স্বরে কি বল্লে, বিমলের মনে হলো তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

জাপানী অফিসারটি বল্লে—থামলে কেন? বলে যাও—

বিমল হাসপাতালের হত্যাকাণ্ডের কথা সংক্ষেপে বলে গেল।

জাপানী অফিসার চারিপাশের জাপানী সৈন্যদের দিকে চেয়ে জাপানী ভাষায় কি প্রশ্ন করলে। বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি সেই সৈন্যকে চিনতে পারবে?

—না। অত ভাল করে দেখিনি তার চেহারা, তখন মাথার ঠিক ছিল না, তা ছাড়া জাপানী সৈন্যেরা সবাই আমার চোখে একই রকম দেখায়। দেখতে অভ্যস্ত নই বলে।

—তুমি সিঙ্গাপুরের লোক?

—আমি ভারতবাসী।

—চীনা হাসপাতালে চাকুরি করো?

—হ্যাঁ।

—সরাসরি এসেছ চীনে?

এ প্রশ্ন করবার কারণ বিমল একটু একটু বুঝতে পারলে। এখানে সে একটা মিথ্যে কথা বল্লে। এই একমাত্র ফাঁক, এই ফাঁক দিয়ে সে এবারের মত গলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তো করবে। তারপর যা হয় হবে। সে বল্লে—সরাসরি আসি নি। আন্তর্জাতিক কন্‌ফেসনে এসেছিলাম; ব্রিটিশ কনস্যুলেট আপিসে আমার নাম রেজেষ্ট্রি করা আছে।

এই সময় একজন জাপানী সৈন্য কি বল্লে অফিসারটিকে। তার হাতে তিনটে জরির ব্যাণ্ড, দেখে মনে হয় সে একজন করপোরাল কিম্বা কম্প্যানি কম্যাণ্ডার।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে ভ্রূকুটি করে বল্লে—তুমি একজন গুপ্তচর।

—আমি একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। আমি ডাক্তার। তোমার সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই জানে আমি হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলাম, ওরা ধরে এনেছে।

—আঙ্গুলের টিপসই দাও দুটো এখানে।

বিমল দুখানা কাগজে টিপসই দিলে। তারপর জাপানী অফিসার কি আদেশ করলে

জাপানী ভাষায়, ওকে দুজন জাপানী সৈন্য ধরে নিয়ে গিয়ে বাইরে একটা কামানের গাড়ীর উপর বসালে। চারিধারে বহু জাপানী সৈন্য গিজ গিজ করছে। সকলেই ব্যস্ত, উত্তেজিত। কোথায় যাবার জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র উৎসুক।

বিমল দেখলে তাকে এরা ছেড়ে দিলে না। মুক্তি যে দিয়েছে তা নয়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? জাপানী ভাষার সে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না। মিনিট পনেরোর মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ করে কামানের গাড়ী টানতে লাগলো একখানা মোটর লরি। ওর দুদিকে সাঁজোয়া গাড়ী চলেছে সারি দিয়ে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড শহর, এর আর যেন শেষ নেই, ঘণ্টা দুই চলবার পরে শহরের বাড়ী ঘর ক্রমে কমে আসতে লাগলো। ফাঁকা মাঠ আর ধানের ক্ষেত। চীনদেশের এ অংশের দৃশ্য ঠিক যেন বাংলাদেশ, তবে এখানে কাছাকাছি নীচু পাহাড় শ্রেণী চোখে পড়ে।

কিছুদূরে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপারে ঘন ধোঁয়া। রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ আসছে।

এক জায়গায় মাঠের মধ্যে পাইন বন। সেখানে কামানের গাড়ী দাঁড়ালো। বিমল দেখলে একটা উঁচু ঢালু মত জায়গায় লম্বা সারি দিয়ে জাপানী সৈন্যরা উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেল ধরে ছুঁড়ছে, এক সঙ্গে পঞ্চাশ ষাটটা রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে।

ওপাশ থেকেও তার জবাব আসচে; এটা যে যুদ্ধক্ষেত্র এতক্ষণ পরে বিমল বুঝতে পারলে! ওদিকে চীনা নাইন্‌থ্ রুট আর্মি জাপানীদের বাধা দিচ্ছে—চীনা সৈন্যবাহিনী সাংহাই ছেড়ে হটে গিয়েছে বটে, কিন্তু জাপানীদের আর এগোতে দেবে না।

আর একটু পরে বিমল লক্ষ্য করে দেখলে, পাইন বনের একপাশে গাছের তলায় একরাশ মৃতদেহ জাপানী সৈন্যের। স্ট্রেচারে করে বিমলের চোখের সামনে আরও দুজন মরা কি জ্যান্ত সৈন্যকে নিয়ে এল, বিমল বুঝতে পারলে না। একটু পরে আহতদের আর্তনাদ কানে যেতেই চিকিৎসক বিমল চঞ্চল হয়ে উঠলো। পাশের একজন জাপানী সৈন্যকে বল্লে পিজিন ইংলিশে—আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমি ডাক্তার, ওদের দেখবো।

সব মানুষের দুঃখই সমান। দুঃখপীড়িত মানুষের জাত নেই—তারা চীনা নয়, জাপানীও নয়। একটু পরে জাপানী অফিসারের সম্মতিক্রমে বিমল হতাহত সৈন্যদের কাছে গেল দেখতে, যদি তার দ্বারা কোন সাহায্য হয়। যদি মড়ার গাদায় জড়ো করা সৈন্যদের মধ্যে দু-একজন সাংঘাতিক আহত লোক বার হয়—কারণ আর্তনাদ সেই গাদার মধ্যে থেকেই আসছিল।

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

বইয়ে পড়া বা কল্পনায় দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

একটা শান্ত পাইন বন, গোটা তিনেক কামানের গাড়ী, রাইফেল হাতে কতকগুলি সৈন্য উপুড় হয়ে আছে—ওপারে পাহাড়ের ওপর কিছু ধোঁয়া।—

কেবল সম্মুখের হতাহত জাপানী সৈন্যগুলি পরিচয় দিচ্ছে যে বিমল কোনো শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই—যেখানে সে রয়েছে সেখানে মানুষের জীবন মরণের সঙ্গে সম্পর্ক বড় বেশী।

কিন্তু ওষুধপত্র কিছু নেই যা দিয়ে এই সব আহত সৈনিকদের চিকিৎসা চলে। এমন কি খানিকটা আইডিন পর্য্যন্ত বিমল অনেককে বলেও জোটাতে পারলে না। এদের হাসপাতাল শিবির অনেক দূরে—সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নেই।

জাপানী সৈন্যেরা কিন্তু দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপারে চীনা সৈন্যদের রাইফেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কারণ যে কি, কিছু বুঝলে না।

আবার কামানের গাড়ীতে চড়ে সৈন্যবেষ্টিত হয়ে যাত্রা।

এবার জাপানীরা বিমলের সঙ্গে খানিকটা ভাল ব্যবহার করলে, কারণ আহত জাপানী সৈনিকদের ও যথেষ্ট সেবা করেছে। ও যে সাধারণ সৈনিক বা স্পাই নয়, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার—এই বিশ্বাস জন্মেছে সকলেরই।

পাহাড়ের ওপারে অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সৈন্যশিবির। ওর মধ্যে ঢুকেই বিমল বুঝতে পারলে, এটা চীনা আর্মির হাসপাতাল—প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল এখানে—এখন কিছু নেই, চীনা সৈন্য সব সঙ্গে করে নিয়ে পালিয়েছে, কেবল একটা বড় দস্তার টব পড়ে আছে—আর কিছু ব্যাণ্ডেজের তুলো। হাসপাতাল শিবির থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক গাছের তলায় এক চীনা সৈন্যকে পাওয়া গেল—হতভাগ্য গুরুতর আহত। রাইফেলের গুলি বোধহয় জাপানীদের, তার শরীরের দুই জায়গায় বিঁধেছে—রক্তে তার ইউনিফর্ম ভিজে উঠেছে। এ-কে যে ওর বন্ধুরা কেন শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়েছে কিছু বোঝা গেল না।

একজন জাপানী সৈন্য ওর পা ধরে খানিকটা হেঁচড়ে নিয়ে চললো। লোকটার বেশ জ্ঞান রয়েছে—সে যন্ত্রণায় অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ করে উঠতেই পেছন থেকে একজন জাপানী অফিসার এগিয়ে গেল তাকে দেখতে।

ওদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে জাপানী ভাষায় কি বলাবলি হোল, বিমল বুঝলে না—হঠাৎ অফিসারটি রিভলভার বার করে আহত সৈনিকের মাথায় প্রায় নল ঠেকিয়ে গুলি করলে।

লোকটা যেন রিভলভার ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়লো। ওর সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

বিমল শিউরে উঠলো—চোখের সামনে এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা দেখতে সে এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। মাইল তিন দূরে একটা চীনা গ্রাম—যুদ্ধক্ষেত্রের বাঁদিক ঘেঁষে। ডানদিকে একটা অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে জাপানী অফিসারটির ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখছে সবাই, সেদিকে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে—বিমল বুঝলে ওই পাহাড়টা বর্ত্তমানে চীনা নাইন্থ্ রুট্ আর্মির দ্বিতীয় ঘাঁটি। প্রথম ঘাঁটি ছিল পূর্ব্বোক্ত পাইন বনের সামনের পাহাড়—তা গিয়েছে।

একস্থানে একদল জাপানী সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের পাশ দিয়ে বিমলদের দল কামানের গাড়ী নিয়ে চলে গেল। ওরা যেন খুব উত্তেজিত হয়ে কি বলাবলি করছে, বিমল বুঝতে পারলে না। একজন পিজিন ইংলিশ জানা জাপানী সৈন্যকে জিজ্ঞেস

করলে—ওখানে কি হচ্ছে ? সৈন্যটি বল্লে—শোনো নি তুমি ? সাংহাই শহর এখন আমাদের হাতে। আজ সকালে আমাদের হাতে এসেছে।

—এত বড় সাংহাই শহর তোমাদের হাতে সবটা এসেছে ?

—সব। ওরা এইমাত্র ফিল্ড্ টেলিফোনে খবর পেয়েছে।

—যুদ্ধ হোল কখন ?

—কাল সারারাত প্রায় দুশো বম্বার প্লেন্ বোমা ফেলেছে—শুনছি বিস্তর লোক মরেছে সাংহাইতে—

—সকলেই সাধারণ নাগরিক বোধ হয় ?

—বেশীর ভাগ। হাজার দুই তো শুধু চা-পেইতেই মরেছে—আর শুনছি কন্‌শেসনে বোমা ফেলে ছ'শো পলাতক চীনাকে মারা হয়েছে। ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে—হবেই তো —আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। সাংহাই কি, সারা এশিয়া আমরা দখল করবো—তোমাদের ভারতবর্ষ তো বটেই। দেখে নিও তুমি—নাও, এগিয়ে চল।

বিমল ভাবছিল সুরেশ্বর কি বেঁচে আছে! বোধ হয় নয়। চা-পেই পল্লীর অত্যন্ত কাছে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউতে চীনা রেড্‌ক্রস্ হাসপাতাল। জাপানী বম্বারগুলোর বিশেষ দৃষ্টি হাসপাতালের ওপর। কাল রাত্রেই সুরেশ্বরের ডিউটি থাকবার কথা। সম্ভবতঃ হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে—রোগী, ডাক্তার, নার্স সুদ্ধু। ভাগ্যে এ্যালিস্ আর মিনি ওখানে ছিল না!

কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক কন্‌শেসনে বোমা ফেলে আশ্রয়হীন চীনা নরনারীদের মেরেছে, এ কথাটা বিমলের ভাল বিশ্বাস হলো না। আন্তর্জ্জাতিক কন্‌শেসনে বোমা ফেলতে সাহস করে কখনো ? ওটা নিতান্ত বাজে কথা বলছে।

ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক কন্‌শেসনের সম্পর্কে বিমলের এ অলৌকিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব দূর হয়েছিল—সাংহাই অধিকার করার পূর্ব্বে ও পরে জাপানী বম্বার প্লেনগুলো সে কন্‌শেসনের পবিত্রতা মানে নি—এ সংবাদ বিমল আরও ভাল জায়গা থেকে এর পরে শুনেছিল।

পথের মধ্যে একটা চীনা গ্রাম। বড় বড় ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে। তখন সন্ধ্যা হবার বেশী দেরি নেই। পূর্ব্বোক্ত পাহাড় ও পাইনবন থেকে অন্ততঃ পাচ মাইল তখন আসা হয়েছে। জাপানী সৈন্যের একটা দল গ্রামটা দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলো—এবং সবাই তক্ষুনি হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে প্রায় বুক ঠেকিয়ে, চুপি চুপি অগ্রসর হোতে লাগলো গ্রামখানার দিকে। বিমল শুধু ভাবছিল,.ভগবান করেন—গ্রামটাতে লোক না থাকে—সব যেন পালিয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তা হোল না। এ গ্রামের লোক যুদ্ধের বিশেষ কোন খবর রাখতো না—সাংহাই থেকে অন্ততঃ পনেরো ষোল মাইল দূরে এই গ্রামখানা। এরা বেশ নিশ্চিন্ত ছিল যে চীনা নাইন্‌থ্-রুট্ আর্মি তাদের রক্ষা করছে। হঠাৎ যে নাইন্‌থ্-রুট্ আর্মি ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছে—তা ওরা সম্ভবতঃ জানতো না।

জাপানী সৈন্যরা গ্রামখানাকে আগে চুপি চুপি গোল করে ঘিরে ফেল্লে। গ্রামে অনেকগুলো সাদা সাদা খোলার ঘর, খড়ের ঘর। শস্যের গোলা, দোকান-পত্রও আছে। বেশ করে ঘেরার পরে জাপানীরা হঠাৎ একযোগে ভীষণ পৈশাচিক চীৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত নরনারী ঘুম ভেঙে বাইরে এসে অনেকে দাঁড়ালো—অনেকে ব্যাপারটা কি না বুঝতে পেরে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে জানলা খুলে চেয়ে দেখতে লাগলো।

তারপর যে দৃশ্যের সূচনা হোল তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানুষিক। বিমলের চোখের সামনে বর্ব্বর জাপানী সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগলো, এবং বিনা দোষে বেওনেটের কিংবা বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত আট-জনকে একদম মেরে ফেললে। ছুতো এই যে, তারা নাকি বাধা দিয়েছিল। বাকীগুলোকে এক জায়গায় জড় করে দাঁড় করিয়ে রাখলে—চারিধারে বেওনেট্-চড়ানো রাইফেল হাতে জাপানী সৈন্যের দল।

দু-তিনখানা খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দুটো ছোট ছোট বাছুরকে ভয় দেখিয়ে মজা করতে লাগলো, একটা পিচ্ গাছের ডালগুলো অকারণে ভেঙে গাছটাকে ন্যাড়া করে দিলে। তবুও বিমল সবটা দেখতে পাচ্ছিল না—একে অন্ধকার, গ্রামটাও লম্বায় বড়, ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে জানে না—তার সামনে যেগুলো ঘটছে সেগুলো সে কেবল জানে। তবে নারী ও শিশুকণ্ঠের চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, ওদিকের জাপানী সৈন্যেরা ঠিক বুদ্ধদেবের বাণী আবৃত্তি করছে না। মিনিট কুড়ি পচিশ এমনি চললো—বেশীক্ষণ ধরে নয়। তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে, কেবল জ্বলন্ত ঘরের চালের আলোয় সামনেটা আলোকিত।

হঠাৎ বিমলের যেন হুঁশ হোল—সে তার আশেপাশে চেয়ে দেখলে তার খুব কাছে কোনো জাপানী সৈন্য নেই—লুঠপাটের লোভে সবাই গ্রামের ঘর-দোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে জটলা করছে।

বিমল একবার পিছনের দিকে চাইলে—সেদিকে একখানা কামানের গাড়ী দাঁড়িয়ে। গাড়ীর কাছে সৈন্য নেই। গাড়ীখানা থেকে পঞ্চাশ গজ আন্দাজ দূরে একটা প্রাচীন সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভ। চীনদেশের অনেক পাড়াগাঁয়ে সহমৃতা বিধবার এমন পুরোনো আমলের স্মৃতিস্তম্ভ সে আরও দু-একটা দেখেছে। ততদূর পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের আলোয়, কিন্তু তার ওপারে অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না।

বিমল আস্তে আস্তে পিছনে হট্‌তে হট্‌তে দশ বারো পা গিয়ে হঠাৎ পেছনে ফিরে ছুট্ দিয়ে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার আড়ালে একটা অন্ধকার স্থানে এসে দাঁড়ালো।

ওর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। যদি জাপানীরা তাকে এখন ধরে, তবে এখুনি গুলি করে মারবে। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হয়ে এভাবে থাকার চেয়ে মৃত্যুপণ করেও মুক্তির চেষ্টা তাকে করতে হবে।

স্মৃতিস্তম্ভটার গায়ে একটা ডোবা। অন্ধকারের মধ্যেও মনে হোল ডোবাটায় বেশ জল

আছে। বিমল তাড়াতাড়ি ডোবার জলে নামলো—তার কেমন মনে হলো জলে নেমে সে যদি গলা ডুবিয়ে থাকে, তবেই সব চেয়ে নিরাপদ—ডাঙ্গায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে বেশীদূর যেতে না যেতেই সে ধরা পড়বে।

এই ডোবায় নামবার জন্যেই যে এ যাত্রা বেঁচে গেল—সেটা সে খানিকটা পরেই বুঝতে পারলে।

অল্পক্ষণ—বোধ হয় দশ বারো মিনিটের পরেই ভীষণ চীৎকার ও বহু রাইফেলের সম্মিলিত আওয়াজ শোনা গেল। খুব একটা হৈ চৈ দুপ্ দাপ্ পালানোর শব্দ, আবার চেঁচামেচি — একটা ঘোর বিশৃঙ্খলার ভাব!

বিমল তখন ডোবার জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে। যদি ডাঙ্গায় থাকতো তবে অন্ধকারে ছুটন্ত রাইফেলের গুলিতে হয়তো তার প্রাণ যেতো।

ব্যাপারটা কি? বিমল দেখাল সেই জাপানী কামানের গাড়ীটা ঘিরে একটা খণ্ডযুদ্ধ ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়েছে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার ওপারে। হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ ফাটাবার ভীষণ আওয়াজে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যেন কেঁপে উঠলো। একটা—দুটো—তিনটে। জাপানী কামানের গাড়ীর কাছ থেকে জাপানী সৈন্যেরা হটে যাচ্ছে একটা বাগানের দিকে।

বিমল এবার ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝলে। চীনা সৈন্যের একটা দল জাপানীদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। জাপানীরা ফিল্ড গানগুলো একেবারে ছুঁড়তে পারলে না—দুটোর একটাও না। চীনারা বুদ্ধি করে আগেই সে দুটো কামানই ঘেরাও করে দখল করলে। চীনা সৈন্যের এই দলটা হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ ছুঁড়ে জাপানীদের দলের জটলা ভেঙে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে রাইফেলের ও হ্যাণ্ড্গ্রিনেডের আওয়াজ থেমে গেল। জাপানীরা কামানের গাড়ী ও বন্দীদের ফেলে পালিয়েছে। বিমল বেশ দেখতে পেলে কাছাকাছি কোথাও জাপানী সৈন্য একটাও নেই। কাদামাখা পোশাকে সতর্কতার সঙ্গে সে ধীরে ধীরে ডোবার জল থেকে উঠলো ডাঙায়।

একজন সৈনিকের চড়া আওয়াজ তার কানে গেল—কে ওখানে?

বিমল আশ্চর্য্য হোল এ পুরুষের গলা নয়—মেয়েমানুষের মত সরু গলা। বিমল কথার উত্তর দেবার আগে দুজন রাইফেলধারী চীনা সৈনিক ওর দিকে এগিয়ে এল ইলেক্ট্রিক্ টর্চ হাতে। তারা ওকে দেখে যেমন অবাক হোল, বিমলও ওদের দেখে তেমনি অবাক হয়ে গেল।

এরা পুরুষ মানুষ নয়, দুজনেই মেয়ে; বয়েসও বেশী নয়। কুড়ি পঁচিশের মধ্যে। বেশ সুশ্রী দুজনেই—সৈন্যবিভাগের আঁট-সাঁট খাকী পোশাকে এদের দেহের লাবণ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

তারা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল গ্রামের সদর রাস্তার ওপরে।

অবাক কাণ্ড! সকলেই মেয়ে সৈনিক! এদের মধ্যে পুরুষ মানুষ নেই একজন। এই সুশ্রী তরুণীর দল এতক্ষণ হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ ছুঁড়ছিল এবং এরাই জাপানী ফিল্ড্ গান্ দুটো ঘেরাও করে দখল করেছে।

বিমলের মনে পড়লো চীনা নাইন্থ্-রুট্ আর্মির সঙ্গে একটি নারী বাহিনী আছে—সে সাংহাই চীনা রেড্ক্রস্ হাসপাতালে শুনেছিল বটে।

এরাই সেই চীনা মেয়ে-যোদ্ধার দল।

এদের কম্যাণ্ডাণ্ট্ কিন্তু মেয়ে নয়—পুরুষ। একটা পাইনকাঠের পুরোনো ভাঙ্গা টেবিলের সামনে সম্ভবতঃ একটা উপুড় করা কলসী বা ওই রকম কোন হাস্যকর জিনিস পেতে খুব লম্বা গোঁপ-ওয়ালা কম্যাণ্ডাণ্ট্ বসে ছিলেন। মেয়েরা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল সেখানে।

বিমলের মনে হোল সমগ্র নারী বাহিনীর মধ্যে এই লোকটি ইংরাজী জানে এবং বেশ ভাল আমেরিকান্ টানের ইংরাজী বলে।

বিমলের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে প্রশ্ন করলে—তুমি জাপানীদের লোক ?

— না। আমি চীনা হাসপাতালের ডাক্তার।

—কোথাকার হাসপাতাল ?

—সাংহাইয়ের রেড্ক্রস্ হাসপাতাল। আমাকে ওরা বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল।

—তুমি কোন্ দেশের লোক ?

—ভারতবর্ষের। চীনা মেডিকেল ইউনিটের আমি সভ্য।

কম্যাণ্ডাণ্ট্ বিস্ময়ের স্বরে বল্লে—ও! তা ডোবার জলে কি করছিলে ? বিমল লজ্জিত হোল। এতগুলি মেয়ের সামনে!

বল্লে—লুকিয়ে ছিলুম। ওদের অসতর্ক মুহূর্ত্তে ওদের হাত থেকে পালিয়ে ডোবার জলে লুকিয়েছিলুম। তার পর হঠাৎ হ্যাণ্ড্গ্রিনেডের আওয়াজ আর চীৎকার শুনলাম, তখনই ভাবলাম চীনা সৈন্য আক্রমণ করেছে ওদের।

কথাবার্ত্তা চলছে এমন সময়ে গ্রামের পথে কি একটা গোলমাল উঠলো। কম্যাণ্ডাণ্ট্কে ঘিরে যারা ছিল, তারা চমকে উঠে সেদিকে ছুটতে লাগল। আবার কি জাপানী সৈন্যের দল আক্রমণ করেছে ?

বিমল চেয়ে দেখল জনকয়েক সৈন্য যেন কাউকে ধরে আনছে—তাদের পেছনে পেছনে অনেক সৈন্য মজা দেখতে আসছে।

ব্যাপার কি ? হয়তো কোন জাপানী সৈন্য ওদের হাতে ধরা পড়েছে, তাকে সকলে মিলে ধরে আনছে—নিশ্চয়ই।

কিন্তু দলটি কম্যাণ্ডাণ্টের কাছে এসে পৌছে যখন ওদের প্রথামত সামরিক অভিবাদন করে দুজন বন্দীকে এগিয়ে নিয়ে দাঁড় করাল কম্যাণ্ডাণ্টের সামনে—বিমল চমকে উঠে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। কারণ কিছুক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরুলো—এ্যালিস্! মিনি! সামনের শীর্ণকায়া মূর্ত্তি দুটি এ্যালিস্ ও মিনি ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ওদের হাত পা বাঁধা—মুখে কাপড় দিয়ে বাঁধা। এমন শক্ত করে বাঁধা যে ওদের কথা বলবার উপায় নেই।

ভয়ানক রাগ হোল বিমলের এক মুহূর্ত্তে এই চীনা নারী-বাহিনীর ওপর। মেয়ে হয়ে মেয়ের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার! ওদের এমন করে বেঁধে আনার অর্থ কি ? ওরা ছিলই বা কোথায় ?

কমাণ্ডাণ্ট্ উত্তেজিত সুরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। ইতিমধ্যে এ্যালিস্ ও মিনির হাত-পা মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হোল। ব্যাপারটা ক্রমশঃ যা জানা গেল তা হোল এই—

চীনা নারী সৈন্যেরা এদের গ্রামের একটা ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণে এই অবস্থাতেই পায়। বাইরে থেকে ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল—কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজে সন্দেহ করে ওরা দরজা ভেঙে দেখতে পায় এদের। ওরা বুঝতে পেরেছে যে এরা ইউরোপীয় বা আমেরিকান্ মহিলা। কিন্তু চীনের এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে একটা অন্ধকার ঘরের কোণে এদের কে এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তা না বুঝতে পেরে সবাই মহা বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

হঠাৎ বিমল বলে উঠলো—এ্যালিস্! মিনি!

প্রথমে চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে এ্যালিস্। বিমলকে দেখে সে যেন প্রথমটা চিনতে পারলে না—তারপর প্রায় ছুটে ওর কাছে এসে বিস্মিত চকিত আনন্দভরা কণ্ঠে বল্লে—তুমি এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে মিনিও ছুটে এল। মিনির চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে নানা কষ্টে, উদ্বেগে, এবং খুব সম্ভবতঃ অনাহারেও বটে। সে বল্লে, তোমার বন্ধু কই?

ঘণ্টা কয়েক পরে।

একটা রিচ গাছের তলায় বসে মিনি, এ্যালিস্ ও বিমল কথা বলছিল। এখনও রাত আছে, তবে পূর্ব্ব আকাশে শুকতারা উঠেছে—ভোর হওয়ার বেশী দেরি নেই।

মিনি ও এ্যালিস্ তাদের গল্প বলে যাচ্ছিল। ওদের ভাল করে খেতে দেওয়া হয়েছে, কারণ ওদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পেট ভরে খাওয়া ওদের অদৃষ্টে অনেকদিন ধরে জোটেনি।

বিমল বল্লে—এখানে তোমরা কি করে এলে?

এ্যালিস্ বল্লে—এখনও ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু বড্ড খুশী হয়েছি তোমায় দেখে, বিমল। আমরা তো আশঙ্কা করছিলাম জাপানীরা আক্রমণ করেছে—এইবার ঘর জ্বালিয়ে আমাদের বন্দী অবস্থায় পুড়িয়ে মারবে—কে আর উদ্ধার করবে আমাদের? আর আমাদের অস্তিত্ব জানেই বা কে?

—কবে তোমরা এ গ্রামে এসেছ?

—আজ তিন দিন হোল খুব সম্ভব—কারণ দিনরাত্রির জ্ঞান আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—কে তোমাদের আনে?

—কয়েকজন চীনা দস্যু।

—সাংহাইয়ের চণ্ডুর আড্ডায় তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল ধরে?

এ্যালিস্ বিস্ময়ের সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি কি করে জানলে?

বিমল হেসে বল্লে—আমি আর সুরেশ্বর সেই চণ্ডুর আড্ডাতে যাই তোমাদের খুঁজতে।

কিন্তু বড় বিভ্রাট বেধে গেল সে রাত্রে। জাপানী বম্বারগুলো সেই রাত্রে ভীষণ বোমা বর্ষণ শুরু কল্লে। মিনি বল্ল, আমরা খুব জানি। আমরা তখন হাতমুখ বাঁধা অবস্থায় একটা গরুর গাড়ীর মধ্যে শুয়ে। একটা বোমা তো আমাদের গাড়ির পাশেই পড়লো।

এ্যালিস্ বল্লে—তারপর ওরা আমাদের নানা জায়গায় ঘোরালে। দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ না দিলে আমাদের ছাড়বে না। দেশের বাপমায়ের কাছে চিঠি লিখবে বলে ঠিকানা চেয়েছিল—আমরা দিইনি। আজ ওরা আমাদের শাসিয়েছিল জাপানী সৈন্যেরা গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে—ঠিকানা যদি না দিই তবে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে পালাবে—আমরা নিঃশব্দে পুড়ে মরবো। করেছিলও তাই। চীনা মেয়ে-সৈন্যেরা না এলে জাপানীরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। আমরাও পুড়ে মরতাম।

বিমল বল্লে—কি সর্ব্বনাশ!

এ্যালিস্ বল্লে—সর্ব্বনাশ আর কি, পুড়ে মরতাম এর আর সর্ব্বনাশ কি? কতই তো মরছে! কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে, বিমল?

—আমাকে হাসপাতাল থেকে জাপানীরা বন্দী করে এনেছিল। আমি নাকি স্পাই। এতদিন গুলি করেই মারতো যদি একথা ওদের না বলতুম যে ব্রিটিশ কনস্যুলেট আপিসে আমার নাম রেজেষ্ট্রি করা আছে।

মিনি বল্লে—সুরেশ্বর কোথায় গেল একটা খোঁজ করতে হয়। আর আমেরিকান কনস্যুলেটে আমাদের বিষয়ে একটা খবর দিতে হয়—চলো কমাণ্ডান্ট্‌কে বলি।

জনকয়েক তরুণী চীনা মেয়ে-সৈন্য ওদের হাসিমুখে ঘিরে দাঁড়ালো। এদের হাস্যদীপ্ত সুন্দর চেহারা বিমলের বড় ভাল লাগলো, এমন একটা জিনিস নতুন দেখছে সে—বহুশতাব্দীর জড়তা দূর করে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী—রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা, কঠোরতার মধ্যে। দেশের দুর্দ্দিনে দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে তারা আজ মস্ত বড় হোতা—মিথ্যে জড়তা, মিথ্যে লজ্জা-সঙ্কোচ দূর করে ফেলেছে টেনে।

একটি মেয়ে ইংরেজিতে বল্লে—তোমরা হ্যাংচাউতে রাজকুমারী তাংএর দেউল দেখেছ?

এ্যালিস্ বল্লে—না, সে কি?

—পাঁচশো বছর আগে মিং রাজবংশের একজন রাজকুমারী ছিলেন তাং। তাঁর পুণ্যচরিত্র এখনও আমাদের দেশের লোকের মুখে মুখে আছে। এখান থেকে বেশী দূর নয় —দেখে যেও।

বিমল বল্লে—তুমি বেশ ইংরেজি বলতে পারো তো?

মেয়েটি এমন হাসলে যে তার তেরচা চোখ দুটো বুজে গিয়ে দুটো কালো রেখার মত দেখাতে লাগলো।

—ভাল ইংরিজি বলছি? তবুও এ ইয়াংকি ইংরিজি। মিশনারী স্কুলে পাঁচ বছর পড়েছিলুম একসময়ে। ইংরিজি গান পর্য্যন্ত গাইতে পারি—শুনবে?

হঠাৎ বিউগল বেজে উঠলো। সবাই ব্যস্ত হয়ে কমাণ্ডান্টের তাঁবুর দিকে চললো। এখনি

মার্চ শুরু করতে হবে। খবর পাওয়া গিয়েছে জাপানীদের বড় একটা দল এখানে আসছে।

বিমল বাঁ দিকে চেয়ে দেখলে।

একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মত লম্বা ঢিবির আড়াল থেকে মাঝে মাঝে যেন সাদা ধোঁয়া বার হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌ফট্ শব্দ হচ্ছে। শব্দটা অনেকটা যেন বিমলদের দেশের লিচু-বাগানে পাখী তাড়াবার জন্যে চেরা বাঁশের ফটাফট্ আওয়াজের মত।

রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ। আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেলে শব্দ হয় খুব কম—বিমল জানতো।

সবাই বল্লে—মাথা নীচু করো—মাথা নীচু করো—

জাপানী সৈন্যরা আক্রমণ করে ওই ঢিবিটাতে আড়াল নিয়েছে—কিন্তু হয়তো এখুনি বেওনেট্ চার্জ করবে কিংবা হ্যাণ্ড্ গ্রিনেড্ নিয়ে ছুটে আসবে।

চক্ষের নিমেষে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেলের মুখ ঢিবিটার দিকে ফেরালে। একটি মেয়ে হঠাৎ অস্পষ্ট চীৎকার করে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে গেল—তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে গিয়ে পড়লো আর একটি মেয়ের পিঠের ওপরে—সে কিছু দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল বন্দুক বাগিয়ে। এ্যালিস্ ছুটে উঠে গিয়ে মেয়েটির মাথা নিজের কোলে তুলে নিলে—আশ-পাশের মেয়েরা বল্লে—মাথা নীচু—মাথা নীচু—শুয়ে পড়ো—

বিমল শঙ্কিত চোখে অল্পক্ষণের জন্যে এ্যালিসের দিকে চেয়ে দেখলে—তারপর সেও উঠে গিয়ে এ্যালিসের পাশে বসলো। আহত মেয়ে-সৈনিকের হাতের নাড়ী দেখে বল্লে—এ শেষ হয়ে গিয়েছে। এঃ, এই ছাখো গলায় লেগেছে গুলি—তোমার কাপড় যে রক্তে ভেসে গেল।

এ্যালিস্‌কে এক রকম জোর করে টেনে বিমল তাকে আবার উপুড় করে শোয়ালে। বিমল ভাবছিল, এখুনি যদি দুর্দ্দান্ত জাপানী গ্রিনেডিয়ারেরা হ্যাণ্ড্ গ্রিনেড্ নিয়ে ছুটে আসে ঢিবিটা ডিঙিয়ে, তবে এই শায়িতা নারী-সৈনিকের দল একটাও টিকৃবে না। জাপানী হ্যাণ্ড্ গ্রিনেডের বিস্ফোরণের ফল অতি সাংঘাতিক, এদের কমাণ্ডাণ্ট্ কি ভরসায় এদের এখনো শুইয়ে রেখেছে? মরবে তো সবগুলোই মরবে। যা করে করুক, ওদের সৈন্য ওরা বাঁচাতে হয় বাঁচাক, নয় তো যা হয় করুক। কিন্তু মিনি ও এ্যালিসের জীবন আবার বিপন্ন হোল।

ফটাফট্—ফটাফট্—

আবার একটা অস্ফুট শব্দ! তারপর বিমল চেয়ে দেখলে চীৎকার না করেও সারির মাঝামাঝি দুটি মেয়ে উপুড় অবস্থাতেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। হাতের শিথিল মুঠিতে তখনও রাইফেল ধরাই রয়েছে। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ থেকে রক্ত বার হয়ে সামনের মাটি রাঙা হয়ে গিয়েছে। আর একটি মেয়েও দেখতে দেখতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। আঃ—কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড! পুরুষদের এরকম অবস্থায় দেখলে সহ্য করা হয় তো যায়—কিন্তু এই ধরণের নারী-বলির দৃশ্যটা বিমলের কাছে অতি করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠলো!

বিমল বল্লে—এ্যালিস্! কমাণ্ডাণ্ট্টি কেমন লোক? এদের দাঁড়িয়ে খুন করাচ্ছে কেন? হঠে যাবার অর্ডার না দেওয়ার মানে কি? জাপানীরা বেওনেট্ কি হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ চার্জ করলে একজনও বাঁচবে?

এ্যালিস্ বিমলের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে—তার ওদিকে মিনি।

মিনি বল্লে—কমাণ্ডাণ্টের এ-রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোন মানে আছে।

মানে কি আছে তা জানবার আগেই আরও দুটি মেয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল—এদের এই নিঃশব্দ মৃত্যু বিমলের কাছে বড় মর্ম্মস্পর্শী বলে মনে হোলো। হঠাৎ একটা লম্বা কাশীর পেয়ারার আকারে বস্তু শায়িতা মেয়েদের সারির অদূরে এসে পড়লো—বিমল ও এ্যালিস্ দুজনেই বলে উঠলো—গ্রিনেড্!

কিন্তু হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্টা ফাট্লো না। বোধ হয় এবার জাপানীরা চার্জ করবে। এ্যালিস্ ও মিনির জন্যে বিমল শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময় কমাণ্ডাণ্ট্ ওদের হঠবার অর্ডার দিলে।

পেছনের সারি শুয়ে-শুয়ে পিছুদিকে হঠতে লাগলো। সামনের সারিগুলো ততক্ষণ রাইফেল বাগিয়ে তাদের রক্ষা করছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামনের সারিও হঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা চার্জ করলে। দলে দলে ওরা ঢিবিটা পেরিয়ে 'বানজাই' বলে ভীষণ বাজখাঁই চীৎকার করতে করতে ছুটে এল—এদিকে নারী-বাহিনীর সব বন্দুকগুলো একসঙ্গে গর্জ্জন করে উঠলো। এখানে ওখানে জাপানী সৈন্য ধুপ-ধাপ করে মুখ থুব্ড়ে পড়তে লাগলো। তবুও ওদের দল এগিয়ে আসছে।

সব পেছনের সারি উঠে দাঁড়িয়ে একযোগে সাত আটটা হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ ছুঁড়লো, চার পাঁচটা ফাটলো। আরও কতকগুলো জাপানী সৈন্য মাটিতে পড়ে গেল। তিন জন মাত্র জাপানী এদের দলের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে দুজন বেওনেটের ঘায়ে সাংঘাতিক আহত হোল—বাকী একজনের মাথায় গুলি লেগে সাবাড় হোল।

ততক্ষণ নারী-বাহিনী প্রায় একশো দেড়শো গজ দূরে চলে গিয়েছে। এতদূর থেকে হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ কোন কাজে আসবে না—কেবল কার্য্যকরী হতে পারে মিল্স্-বম্ব্ জাতীয় বোমা। সে কোন দলের কাছেই নেই, বেশ বোঝা গেল।

কমাণ্ডাণ্ট্ বিমলকে ডেকে বল্লেন—এরকম কেন করেছি, আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছেন। আর কিছু দূরে মিং-চাউএর রেল স্টেশন। দুটো সৈন্যবাহী ট্রেন পর পর চলে যাবার কথা। জাপানীরা রেল স্টেশন আক্রমণ করতো। আমি ওদের বাধা দিয়ে এখানে আটকে রাখলাম। টাইম অনুসারে ট্রেন দুটো চলে গিয়েছে। এখন আর আমাদের সৈন্যদের মৃত্যুর সম্মুখীন করা অনাবশ্যক। জাপানীরাও তা বুঝেছে, ওরাও আর আসবে না। ওদের লক্ষ্যস্থল আমরা নই—সেই ট্রেন দুখানা।

—কিন্তু এরোপ্লেন যদি বোমা ফেলে?

—আমার ঘাঁটি পার করে দিলাম নিরাপদে—তারপর অন্য এলাকার লোক গিয়ে

বুঝুক সে কথা।

মিং-চাউয়ের রেল স্টেশনে পৌঁছে সবাই খাওয়া-দাওয়া করবার হুকুম পেলে। বিমল ব্যস্ত হয়ে পড়লো মিনি ও এ্যালিস্‌কে কিছু খাওয়াতে। খাবার কিছুই নেই। অন্ততঃ সভ্য খাদ্য কিছু নেই। কমাণ্ডাণ্ট্‌কে বলে কিছু চাল যোগাড় করে একটা গাছতলায় এ্যালিস্ একটা পুরানো সস্‌-প্যানে ভাত চাপিয়ে দিলে তিন জনের মত।

বেলা প্রায় বারোটা! রৌদ্র বেশ প্রখর, কিন্তু গরম নেই, বেশ শীত।

ভাত প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় দলে দলে ছোট্ট শীর্ণকায় ছেলেমেয়ে গাছতলায় নীরবে এসে দাঁড়ালো। তারা ক্ষুধার্ত্তের ব্যগ্র দৃষ্টিতে সস্‌-প্যানের দিকে চেয়ে রইল। জনৈক মেয়ে সৈনিক বল্লে—এরা আশপাশের গ্রামের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ছেলেমেয়ে ; আমাদের দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে। ওরা খাবার লোভে এসেছে।

এ্যালিস্ বল্লে—পুওর লিট্‌ল ডিয়ারস্!···ওদের কি খেতে দিই, বিমল?

বিমল মুশকিলে পড়ে গেল। নিজের খাওয়ার জন্যে নয়—মিনি ও এ্যালিস্ কত দিন পেট ভরে খায়নি বলেই ও ওদের খাওয়াতে ব্যগ্র ছিল। নিজে না হয় না খাবে, কিন্তু এ্যালিস্ যেমন মেয়ে নিজের মুখের ভাত সব এক্ষুনি তুলে দেবে এখন এদের।

সুখের বিষয় একটা সমাধান হোল। ওরা চীনা ছেলে-মেয়ে, চীনা খাবার খেতে আপত্তি নেই। অন্য অন্য মেয়ে-সৈনিকরা ওদের দেশীয় খাদ্য কিছু কিছু দিলে। তারা চলে গেল তাই খেয়ে। এ্যালিসের ইচ্ছে ওদের মধ্যে একটা ছোট্ট ছেলে নিয়ে যায়। বল্লে—বিমল, বলো না ওদের মধ্যে কাউকে আমার সঙ্গে যাবে। আমি খুব যত্ন করবো। বিমল হাসলে, তা কি কখনো হয়?

একটু পরে একখানা ট্রেন এল। তাতে সব খোলা ট্রাক্, কয়লার গাড়ীর মত। কমাণ্ডাণ্টের আদেশে সবাই তাতে উঠে পড়লো। ট্রেনের গার্ডের মুখে শোনা গেল জাপানীরা এখান থেকে বাইশ মাইল ডাউন লাইনে একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন এরোপ্লেন থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

ট্রেন ছাড়লো। গার্ড বল্লে—ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা। ওরা প্রত্যেক সৈন্যবাহী ট্রেনের ওপর কড়া লক্ষ্য রেখেছে। পৌঁছে দিতে পারবো কিনা নিরাপদে তার ঠিক নেই।

মাইল ত্রিশেক দুধারে ফাঁকা মাঠ, ধানের ক্ষেত, গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলল। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে, রোদ নেই। মাঠে ঘন ছায়া পড়ে এসেছে। এমন সময় একটা পরিচিত আওয়াজ শুনে বিমলের বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠলো। মুখ উঁচু করে দেখতে গিয়ে দেখলে ট্রেনের সবাই মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। অনেকগুলি এরোপ্লেনের সম্মিলিত ঘর্-ঘর আওয়াজ। ট্রেন যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে জোরে চলতে লাগলো।

মিনি বল্লে—ওই দেখো বিমল এরোপ্লেনের সারি! বম্বার!—

চক্ষের নিমেষে এরোপ্লেন সারি নিকটবর্ত্তী হোল—কিন্তু ট্রেনখানাকে গ্রাহ্য না করেই যেন এরোপ্লেনগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ একখানা বম্বার দল ছেড়ে বেশ নীচু

হয়ে এলো। ট্রেনের সকলের মুখ শুকিয়েছিল আগেই—এখন যেন বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমে গেল। এই ফাঁকা মাঠে বোমা ফেললে ট্রেনের চিহ্ন খুঁজে মিলবে না। তার ওপরে ছাদ-খোলা ট্রাক্ গাড়ী বোঝাই সৈন্য, কারও মৃত-দেহ এর পর সনাক্ত পর্য্যন্ত করা যাবে না। এ্যালিস্ ও মিনিকে বাঁচানো গেল না শেষ পর্য্যন্ত।

এরোপ্লেনখানা নীচে নেমে ছোঁ-মারা চিলের মত একটা বোমা ফেলেই তখনি ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ! সমস্ত ট্রেনখানা কেঁপে নড়ে উঠলো যেন, কিন্তু ট্রেনের বেগ কমলো না। বিমল চেয়ে দেখলে রেললাইন থেকে দশ গজ দূরে একটা জায়গায় বিশাল গর্ত্তের সৃষ্টি করে মাটি, ধুলো, ঘাস, বালি, অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ হাত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে কালো ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে বোমাটা সমাধি লাভ করেছে। বোমারু তাগ্ ঠিক করতে পারে নি।

আর মাইল পাঁচ ছয় পরে একটা রেলস্টেশন। গাড়ীখানা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পূর্ব্বেই দেখা গেল স্টেশন থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে—লোকজন ছোটাছুটি করছে—একটা হট্টগোল, কলরব, ব্যস্ততার ভাব। ট্রেনখানা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াতেই বোঝা গেল জাপানী বিমান থেকে বোমা ফেলে স্টেশনটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। টিনের ছাদ দুমড়ে বেঁকে ছিট্‌কে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে, একপাশে আগুন লেগে গিয়েছে—গোটা প্ল্যাটফর্মে মানুষের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ, কারো হাত, কারো পা, কারো মুণ্ড।

নিকটে একখানা গ্রাম। গ্রামের চিহ্ন রাখেনি বোমারুর দল। ইন্‌সেনডিয়ারি বোমা ফেলে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ট্রেন থেকে সবাই নেমে সাহায্য করতে ছুটলো। গ্রামের লোক বেশী মরে নি—তবুও বিমল দেখলে গ্রামের পথে চার-পাচটা বীভৎস মৃতদেহ পড়ে আছে। এরোপ্লেনগুলোর চিহ্ন নেই আকাশে, তাদের কাজ শেষ করে তারা চলে গিয়েছে। গ্রামের নরনারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে পালিয়েছিল, যদিও বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেখানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, একটি মেয়ে একটা ভাঙা ঘরের সামনে ভাঙাচোরা হাঁড়িকুড়ি বেতের পেটরা কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে আর কাঁদছে। একজন মেয়ে-সৈন্য তার কাছে গিয়ে চীনা ভাষায় কি জিজ্ঞেস্ করলে। বিমলের দল গ্রামের অন্য অন্য লোকজনের সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

একটু পরেই সেখানে ভারী একটি অদ্ভুত দৃশ্য সবারই চোখে পড়লো।

গ্রামের পাশে একটা ছোট্ট মাঠ—তারই এক গাছতলায় জনৈক বৃদ্ধ গ্রামের লোকজনকে চারিপাশে নিয়ে কি বলছেন বক্তৃতার ধরণে। বিমল চিনলে—প্রোফেসর লি!

এ্যালিস্ সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—ড্যাডি! চিনতে পারো?

সৌম্য মূর্ত্তি শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ বক্তৃতা থামিয়ে একগাল হেসে ওর দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন—তোমরা কোথা থেকে?

এ্যালিস্ হেসে বল্লে—এই ট্রেনে নামলাম। আর একটু হোলে আমাদের কাউকে দেখতে

পেতে না—আমাদের ট্রেনেও বোমা পড়েছিল।

বিমল বল্লে—গুড্‌ মর্নিং, প্রোফেসর লি। আপনার দলবল কোথায়? আপনি কি করছেন এখানে?

বৃদ্ধ বল্লেন—দলবল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর একখানা বোমায় বিধ্বস্ত গ্রামে সাহায্য করছে। আমি এদের উপদেশ দিচ্ছি এরোপ্লেন বোমা ফেলতে এলে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়। এরা কিছুই জানে না—দাঁড়িয়ে মরছে, নইলে দেখ গ্রামের অধিকাংশ লোক ফাঁকা মাঠে ছুটে পালায়?

—আপনাকে তো সর্ব্বত্রই দেখি, প্রোফেসর লি। পরের সাহায্য করতে এমন আর ক'জন লোক চীনদেশে আছেন জানি না। আপনাকে দেখে আপনার দেশের ওপর ভক্তি আমার অনেক বেড়ে গেল।

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—আমার দেশ অতি হতভাগ্য, আমরা অতি প্রাচীন সভ্য জাতি কিন্তু জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছি। ভগবান নদীর এক কূল ভাঙেন আর এক কূল গড়েন। জাপান আজ উঠছে—আবার আমাদের দিন আসবে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, যে ক'দিন বাঁচি, মূঢ়তা ও বর্ব্বরতার দ্বারা অত্যাচারিত দেশের সেবা করে দিন কাটিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমার দ্বারা আর কতটুকু উপকারই বা হবে?

বিমল বল্লে—বড় ইচ্ছে হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথা অনুসারে আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আপনি কি অনুমতি করবেন? বৃদ্ধ মহাচীন যেন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন আপনার মূর্ত্তিতে।

বিমলের দেখাদেখি মিনি, এ্যালিস্ এবং আরও কয়েকটি মেয়ে-সৈনিক বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে হাসিমুখে।

ট্রেন হুইস্‌ল্ দিলে। কমাণ্ডাণ্টের হুকুম শোনা গেল—ট্রেনে গিয়ে উঠে পড়।

এ্যালিস্ বল্লে—ড্যাডি, তোমার সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে? আমরা দুটি মেয়ে এবং আমার এই ভারতবর্ষীয় বন্ধুটি তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাই—অনুমতি দেবে ড্যাডি?

বৃদ্ধ বল্লেন—এখন তোমরা যাও খুকীরা—শীগ্‌গীর আমার সঙ্গে দেখা হবে। এ কাজ তোমাদের নয়।

ট্রেন আবার চললো।

দুধারে শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ধোঁয়ায় কালো অগ্নিদগ্ধ গ্রাম। জাপানী বোমারু বিমানের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।

এ্যালিস্ বল্লে—বিমল, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? প্রোফেসর লি-কে আবার আমাদের মধ্যে পেতে। এত ভাল লেগেছে ওঁকে! আমার নিজের বাবা নেই, ওঁকে দেখে সেই বাবার কথা মনে আসে।

বিমল দেখলে এ্যালিসের বড় বড় চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

মিনি বল্লে—আমারও বড় ভক্তি হয় সত্যি! ভারি চমৎকার লোক।

বিমল বল্লে—অথচ কি ভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ তা জানো? আমি যখন প্রথম চীনদেশে আসি—আজ প্রায় একবছর আগের কথা—তখন হ্যাং-চাউ রেলস্টেশনে উনি ওঁর ছাত্রদল নিয়ে উঠলেন—বল্লেন, যুদ্ধের সময় ওখানকার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন। শুনে আমারও হাসি পেয়েছিল।

এ্যালিস্ বল্লে—তখন কি জানতে উনি একজন মহাপুরুষ লোক! উনি যুদ্ধ-উপদ্রুত অঞ্চলের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন এটা ঠিকই—কিন্তু পরের দুঃখ দেখে সে সব ওঁর ভেসে গেল। People such as these are the salts of the Earth—নয় কি?

বিমল মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

একটি নদীর পুল বোমায় ভেঙে দিয়েছে! আর ট্রেন যাবার উপায় নেই। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্ম্মচারীরা দিনরাত খাটছে যদি পুলটা কোন রকমে মেরামত করে কাজ চালানো যায়।

কাছেই একটা তাঁবু। মাঠের মধ্যে কিছুদূরে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। এটা ফীল্ড হাসপাতাল।

ট্রেন থেকে মেয়ে-সৈন্যদের পথেই নামিয়ে দেওয়া হোল। ট্রেনখানা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবে বলে পিছু হটে চলে গেল। কোনো বড় স্টেশনে গিয়ে এঞ্জিনখানা সোজা করে জুড়ে নেবে। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। যেন অনেকটা পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় জলা-অঞ্চলের মত! ফসলের ক্ষেত নেই—সামনে একটা বিল কিংবা ঐ ধরণের জলাশয়—দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাসের বন জলের ধারে। দূরে দূরে মেঘের মত নীল পাহাড়। জায়গাটার নাম সিং-চাং। বিমল নেমে চারিদিক দেখে অবাক হয়ে গেল।

ট্রেনে করে এতদূরে এসে এখানে আবার যুদ্ধক্ষেত্র কি করে এল।

বিমলের ধারণা ছিল জাপানীদের আসল ঘাঁটি কোন্‌কালে পার হয়ে আসা গিয়েছে।

কিন্তু কমাণ্ডাণ্ট্ তাকে বুঝিয়ে বল্লেন এখান থেকে আরও প্রায় পঁচিশ মাইল দূর হ্যাং কাউ শহর পর্য্যন্ত ওদের সৈন্য-রেখা বিস্তৃত। সমুদ্রের উপকূল ভাগে অনেক দূর অবধি ওরা নিজেদের লাইন ছড়িয়ে রেখেছে। মাটিতে একটা নক্সা এঁকে বুঝিয়েও দিলেন।

বিমল একটা অনুচ্চ ঢিবির ওপর উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

কিছুদূরে একটা গ্রাম—পাশে কাদের অনেকগুলো ছোট বড় তাঁবু—সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধ হয় রান্নাবান্না চলছে। পশ্চিম দিকে একটা বড় শস্যক্ষেত্র, তার ধারে লম্বা লম্বা কি গাছের সারি। মোটের ওপর সবটা নিয়ে বেশ শান্তিপূর্ণ পল্লীদৃশ্য।

এ কি ধরণের যুদ্ধক্ষেত্র?

কিন্তু বিমলদের সেখানে উপস্থিত হবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ছ'জন আহত সৈন্যকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতাল তাঁবুতে আনা হোল। সকলেই রাইফেলের গুলিতে আহত।

বিমল জিজ্ঞেস করে জানল যুদ্ধক্ষেত্র যে বেশীদূর তাও নয়—ওই গাছের সারির পাশেই,

এখান থেকে আধমাইলের মধ্যে। একটা ক্ষুদ্র গ্রাম জাপানীরা দখল করে সেখানে ঘাঁটি করেছে—চীন সৈন্য ওদের সেখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে।

কমাণ্ডাণ্টের আদেশে মেয়ে-সৈনিকরা রান্নাবান্না করে খাবার আয়োজন করতে লাগলো—কারণ অনেকক্ষণ তারা বিশেষ কিছু খায়নি। বিমল বল্লে—খাইয়ে নিয়ে এদের কি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে? কমাণ্ডাণ্ট্ বল্লে—না, এরা পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ হয় না—ওদের অন্ততঃ দশঘণ্টা বিশ্রাম করতে দেবো।

—তারপর?

—তারপর যুদ্ধে পাঠাতে পারি—রিজার্ভ রাখতে পারি। এখান থেকে সাত মাইল দূরে হ্যান্‌কাউ-ক্যাণ্টন রেলের ধারে একটা গ্রামে নাইন্‌থ্-রুট্ আর্মির এক ঘাঁটি। সেখানে জেনারেল মাও-সি-তুং আছেন—তাঁর হুকুম মত কাজ হবে।

—হুকুম আসবে কি করে?

—ঘোড়ার পিঠে যায় আসে ডেস্‌প্যাচ্ দল। আমাদের ফিল্ড্ টেলিফোন নেই।

কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বিমল হাসপাতাল তাঁবুতে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার কাজে মন দিল। তিনটি হতভাগ্য সৈনিক কোনোপ্রকার সাহায্য পাবার পূর্ব্বেই মারা গেল। বাকী কয়েকজনের করুণ আর্ত্তনাদে হাসপাতাল মুখরিত হয়ে উঠলো। কি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ব্যাপার এই যুদ্ধ! একথা বিমলের মনে না এসে পারলো না।

এ্যালিস্ এসে বল্লে—এদের জন্যে বৃথা চেষ্টা। এদের একজনও বাঁচবে না।

বিমল বল্লে—তাই মনে হয়। না আছে ওষুধ, না আছে যন্ত্রপাতি, কি দিয়ে চিকিৎসা করবো?

—বিমল, এদের জন্যে আমেরিকান রেড্‌ক্রসে লিখে কিছু জিনিস আনার চেষ্টা করবো?

—লেখো না। নইলে সত্যি বলছি আমাদের খাটুনি বৃথা হবে।

—ঠিকই তো? এটা কি একটা হাসপাতাল? কি ছাই আছে এখানে?

—মিনি কোথায় গেল?

—সে রাঁধছে। খেতে হবে তো? রাঁধবারও কোন বন্দোবস্ত নেই। দুটি চাল ছাড়া আর কিছু দেয় নি।

—টিনবন্দী খাবার কিছু সাংহাই থেকে আনিয়ে নিই। ও খেয়ে তোমরা বাঁচবে না।

—একটা কথা শোনো। তুমি একবার সাংহাই যাও—মিনি সুরেশ্বর সম্বন্ধে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে আমায় বলছিল। ও আমায় কাল থেকে বলচে তোমায় বলতে।

—আমিও যে তা না ভেবেছি এমন নয়। কিন্তু সাংহাই পর্য্যন্ত কোনো ট্রেন এখান থেকে যাচ্চে না তো? আচ্ছা, কাল কমাণ্ডাণ্ট্‌কে বলে দেখি।

আবার চারজন আহত সৈনিককে স্ট্রেচারে করে আনা হোল। একজনের মাথার খুলি অর্দ্ধেকটা উড়ে গিয়েছে বল্লেই হয়। বিমল বল্লে—এ তো গেল! একে এখানে কেন এনেছে?

কিন্তু অদ্ভুত জীবনীশক্তি চীনা সৈনিকটির। মাথার ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দুবার ব্যাণ্ডেজ বদলাতে হোল, তবুও সৈনিকটি মারা গেল না—বিমল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে।

একজন সৈনিক ডেস্‌প্যাচ রাইডার হাসপাতালে ঢুকে বল্লে—আমাদের তাঁবু ওঠাতে হবে এখান থেকে—শত্রু খুব নিকটে এসে পড়েছে। রেললাইনের ওপর ওদের লক্ষ্য কিনা! রেললাইনটি দখল করবে। আমাদের সৈন্য প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে কিন্তু আজ সারাদিনে জাপানীরা প্রায় এক মাইল এগিয়েছে। দেখবে এসো।

তারপরে সৈনিকটি একটা ফীল্ড্‌গ্লাস বা'র করে বিমলের হাতে দিয়ে বল্লে—পূর্ব্বদিকে ওই যে গাঁ-খানা দেখা যাচ্ছে ওদিকে চেয়ে দেখ—বিমল একখানা গ্রাম বেশ স্পষ্ট দেখছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু না। সৈনিকটি বল্লে—ওই গ্রামখানির পেছনেই শত্রুর লাইন। গ্রামখানা দখল করতে ওরা আজ ক'দিন চেষ্টা করছে—ওখানেই আমরা বাধা দিচ্ছিলাম। আজ গ্রামের অর্দ্ধেকটা দখল করেছে। সুতরাং বোধ হয় কাল কি পরশু রেললাইনে এসে পৌছবে।

—গ্রামে লোকজন আছে?

—পাগল! কবে পালিয়েছে। পশ্চিমদিকে একটা নদী আছে—তার ওপারে পলাতক গৃহহারাদের একটা বস্তি বসে গেছে। আট দশখানা গ্রামের লোক জড় হয়েছে ওখানে।

—খাবার দিচ্ছে কে?

—কে দেবে? অনাহারে অনেকে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুর্দ্দশা দেখলে বুঝবে বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ কি নিষ্ঠুর ব্যাপার।

বিমল কথায় কথায় জানতে পারলে, ডেস্‌প্যাচ-রাইডার সৈনিকটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান—পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—পূর্ব্বে স্কুল মাস্টারি করতো, যুদ্ধ বাধবার পর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে।

বিমল বল্লে—তুমি আমাকে ওই গ্রামে নিয়ে চলো না?

—এমনিই তো যেতে হবে। বোধহয় ওখানেই হাসপাতাল উঠে যাবে—কারণ শত্রুর লাইন থেকে, জায়গাটা দূরে।

—এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে বারণ করেছে কে?

—কেউ না। সে তো সর্ব্বত্রই ফেলছে। তবে একটা পাইনবনের তলায় এ বস্তি—জাপানী প্লেন্ হঠাৎ সন্ধান পাবে না। ভয়ে ওরা রান্না করে না—পাছে ধোঁয়া দেখে বোমারু প্লেন্ সন্ধান পায়।

সৈনিকটি চলে গেলে বিমল এ্যালিস্‌কে ডেকে কথাটা বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্রেনের শব্দ শোনা গেল দূরে।

এ্যালিস্ তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে এসে বল্লে—ট্রেন আসছে, না এরোপ্লেন? বিমল বল্লে—ট্রেনই। বোধহয় আরও সৈন্য আসছে। চল দেখি গিয়ে। অনেকে রেললাইনের ধারে জড় হোল। এখানে স্টেশন নেই। একজন লোক নিশান হাতে অপেক্ষা করছিল—নিশান দেখিয়ে ট্রেন দাঁড় করাবে। ট্রেন এসে পড়লো। সারি সারি খোলা মাল-গাড়ীতে

সৈন্য বোঝাই—অন্য সাধারণ যাত্রীও আছে। কতকগুলো ছাদ-আঁটা মাল-গাড়ী পেছনের দিকে—তাতে সৈন্যদের রসদ বোঝাই।

গাড়ী থেকে দলে দলে সৈন্য নামতে লাগলো। জাপানী সৈন্যদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা করবার জন্যে এরা আসছে ক্যাণ্টন থেকে। রসদ বোঝাই মাল-গাড়ীগুলো থেকে রসদ নামানোর ব্যবস্থা করা হতে লাগলো—কারণ বেশীক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে এখুনি কোনদিক থেকে জাপানী বিমান আকাশ পথে দেখা দেবে হয়তো। হঠাৎ এ্যালিস্ উত্তেজিত স্বরে বল্লে—বিমল, বিমল—ও কে? প্রোফেসর লি না?

তারপরই সে হাসিমুখে সামনের দিকে ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল—ড্যাডি—ড্যাডি—

সত্যিই তো—হাস্যমুখ বৃদ্ধ একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ভিড় ঠেলে বাইরে আসতে চেষ্টা করছেন।

বিমল এগিয়ে গিয়ে বল্লে—নমস্কার প্রোফেসর লি—ব্যাগটা আমার হাতে দিন। আপনি কোথা থেকে?

এ্যালিস্ ততক্ষণ গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ তার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বিমলের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন—তোমরা এখানে আছ? বেশ বেশ। আমি এসেছি পলাতক গ্রামবাসীদের যে বস্তি আছে নদীর ওপারে—সেখানে কয়েক পিপে আপেল বিলি করতে। আমেরিকান জুনিয়র রেড্‌ক্রস্ দুশো পিপে ভাল কালিফোর্নিয়ার আপেল পাঠিয়েছে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের খাওয়াবার জন্যে। আমার ঠিকানাতেই পাঠিয়েছিল। আর সব বিলি করে দিয়েছি অন্য অন্য স্থানে—দশ পিপে মজুত আছে এখনও। তা তোমরা আছ ভালই হয়েছে—তোমরা সাহায্য করো এখন।

এ্যালিস্ তো বেজায় খুশী। বল্লে—ড্যাডি, খুব ভাল কথা। তা বাদে আরও অনেক কাজ হবে যখন তুমি এসে পড়েছো। চলো, আপেলের পিপে সব নামিয়ে নিই।

এমন সময় মিনি ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে ছুটে এসে ব্যস্ত ভাবে বল্লে—শীগগির এসো বিমল, শীগগির এসো এ্যালিস্—স্থরেশ্বর নামছে ওই দেখ ট্রেন থেকে—

স্থরেশ্বর সত্যিই নামছে বটে—তার সঙ্গে দুজন চীনা ডাক্তার, এদেরও বিমল চেনে—সাংহাই চীনা রেড্‌ক্রস্ হাসপাতালে এরা ছিল।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি—একটু আমায় ক্ষমা করুন, পাঁচমিনিটের জন্যে আসছি।

স্থরেশ্বর তো ওদের দেখে অবাক্। বল্লে—তোমরা এখানে! মিনি আর এ্যালিস্ই বা এখানে কি করে এল! সাংহাইতে বেজায় গুজব এদের চীনা গুণ্ডারা গুম করেছে—আর বিমল তুমি জাপানীদের হাতে বন্দী। মিনি কেমন আছে?

বিমল বল্লে—সে সব কথা হবে এখন। চলো এখন সবাই মিলে তাঁবুতে গিয়ে বসা যাক্। অনেক কথা আছে। প্রোফেসর লি'কে ডেকে আনি—উনিও আমাদের সঙ্গে আসুন। তোমরা এগিয়ে চলো ততক্ষণ। আমি ওঁর আপেলের পিপেগুলো নামবার কি ব্যবস্থা হোল দেখে আসি।

কিছুক্ষণ পরে দুঃস্থ চীনা নরনারীদের তাঁবুতে সুরেশ্বর, বিমল, এ্যালিস্ ও মিনি আপেল-বিলি কাজে প্রফেসর লি'র সাহায্য করছিল। এ জায়গা ঠিক তাঁবু নয়, একটা পাইন বন, তার মাঝে মাঝে পুরোনো ক্যাম্বিস, চট, মাদুর, ভাঙা টিন প্রভৃতি জোড়াতালি দিয়ে আশ্রয় বানিয়ে তারই মধ্যে হতভাগ্য গৃহহারার দল মাথা গুঁজে আছে। ওদের দুর্দ্দশা দেখে বিমলের কঠিন মনেও দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হোল। ছোট ছোট উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত্ত, কাদামাটিমাখা শিশুদের ব্যগ্র প্রসারিত হাতে আপেল বিলি করবার সময় সময় এ্যালিসের চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখলে বিমল। নাঃ—বড় ছেলেমানুষ এই এ্যালিস্!···এ্যালিসের প্রতি একটা কেমন অকারণ স্নেহে ও মমতায় বিমলের মন গলে যায়। কি সুন্দর মেয়ে এ্যালিস্ আর কি ছেলেমানুষ!

হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। আপেল বিলি করতে করতে প্রোফেসর লি এক সময় একটা আপেলের পিপের মধ্যে ঘাড় নীচু করে দেখে বল্লেন—চারটে আপেল আর বাকী আছে। আমি কালিফোর্নিয়ার আপেল কখনো খাইনি—একটি আমি খাবো।

বলেই সদানন্দ বৃদ্ধ বালকের মত আনন্দে একটা আপেল তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। বিমল অবাক, সে যেন একটা স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলে। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তার মাথা লুটিয়ে পড়তে চাইল বৃদ্ধের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরণের ভালবাসা এসে তার মনে উপস্থিত হোল, বৃদ্ধের প্রতি। এঁকে ছেড়ে আর সে থাকতে পারবে না—অসম্ভব! যেমন সে আর এ্যালিস্‌কে ছেড়ে কখনো থাকতে পারবে না। চীনদেশে তার আসা সার্থক হয়েছে এই দু'জনের সাক্ষাৎ পেয়ে। এই যুদ্ধের বর্ব্বরতা, হত্যা, বোমাবর্ষণ, রক্তপাত, অনাহার, দারিদ্র্য, এই চারিদিকের বীভৎস নরবলীর হৃদয়হীন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রোফেসর লি আর এ্যালিস্ (অবশ্য মিনিও আছে)—এদের আবির্ভাব দেবতার আবির্ভাবের মতই অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর।

এ্যালিস্ ও মিনি ছুটে গেল ছেলেমানুষের মত।

—ড্যাডি, ড্যাডি, আমাদের একটা আপেল দেবে না?···

বৃদ্ধ হাসিমুখে বল্লেন—মেয়েদের না দিয়ে কি বুড়ো বাবা খায়? দুটি রেখে দিয়েছি তোমাদের দুজনের জন্যে—আর একটি বাকী আছে, কে নেবে?

বিমল বল্লে—সুরেশ্বর নাও।

সুরেশ্বর বল্লে—বিমল, তুমি নাও, আমি আপেল খাই না।

এ্যালিস্ বল্লে—খাও, সুরেশ্বর, আমি আমার আধখানা বিমলকে দিচ্ছি।

মিনি বল্লে—তা নয়, বিমল খাও, আমি আধখানা সুরেশ্বরকে দেবো।

প্রোফেসর লি মীমাংসা করে দিলেন—একটা আপেল ভাগাভাগি করে খাবে বিমল ও সুরেশ্বর। মেয়েরা আস্ত আপেল খাবে। তাঁর কথার ওপর আর কেউ কথা বলতে সাহস করলে না।

সেই সৈনিক ডেসপ্যাচ-রাইডারটি এসে খবর দিলে, হাসপাতাল তাঁবু এখানেই উঠে

আসছে—পাইনবনের মাঝখানে। সামনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কমাণ্ডান্ট্ খবর পাঠিয়েছেন। ডেসপ্যাচ-রাইডার আরও এক করুণ সংবাদ দিলে—আজ সকালে জাপানীদের হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ চার্জে নারীবাহিনীর সতেরোটি তরুণী একদম মারা পড়েছে। একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দেহ—হাত, পা, মুণ্ড, আঙুল—ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে।

মিনি শিউরে উঠে বল্লে—ও হাউ সিম্পলি ড্রেড্ফুল !

কেন জানি না এই দুঃসংবাদে বিমলের মন এ্যালিসের প্রতি মমতায় ভরে উঠলো। এ্যালিসের মতই উদার, নিঃস্বার্থ সতেরোটি তরুণী—কত গৃহ অন্ধকার করে, কত বাপমায়ের হৃদয়-শূন্য করে চলে গেল !—মানুষ মানুষের ওপর কেন এমন নিষ্ঠুর হয় ?

হঠাৎ পলাতকদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত্ত শোরগোল উঠলো। সবাই ছুটছে, গাছের তলায় গুঁড়ি মেরে বসছে, ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে—একটা হুড়োহুড়ি, এ ওকে ঠেলছে, দু একজন উৰ্দ্ধশ্বাসে খোলা মাঠের দিকে ছুটছে।

ডেসপ্যাচ-রাইডার সৈনিক যুবকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্লে—নীচু হয়ে বসে পড়ুন—সবাই শুয়ে পড়ুন—জাপানী বম্বার !

আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশই স্পষ্ট হয়ে উঠলো···বিমল চোখ তুলে দেখলে পাইনবনের মাথার ওপর আকাশে দুখানা কাওয়াসাকি বম্বার···নিজের অজ্ঞাতসারে সে তখনি এ্যালিসের হাত ধরে তাকে একটা গাছের তলায় নিয়ে দাঁড় করালে।

—প্রোফেসর লি—প্রোফেসর লি—এদিকে আসুন—

ভীষণ একটা আওয়াজ···বিদ্যুতের মত আলোর চমক··ধোঁয়া, মাটি পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো ভূমিকম্পের মত··সবারই কানে তালা···চোখ অন্ধকার···জাপানী বম্বার বোমা ফেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আৰ্ত্তনাদ কান্না···গোঙানি··নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত্ত চীৎকার।

আবার একটা···বিমলের মনে হোল পৃথিবীর প্রলয় সমাগত··পৃথিবী দুলছে, আকাশ দুলছে···কেউ বাঁচবে না ; মিনি, এ্যালিস্, সে, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি, সবাই এই প্রলয়ের অনলে ধ্বংস হবে।

তার পর ক'টা বোমা পড়লো এরোপ্লেন থেকে—তা আর গুণে নেওয়া সম্ভব হোল না বিমলের পক্ষে। বিস্ফোরণের আওয়াজ ও মনুষ্য-কণ্ঠের আৰ্ত্তনাদের একটা একটানা শব্দপ্রবাহ তার মস্তিষ্কের মধ্যে বয়ে চলেছে—একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করে নেওয়া শক্ত।

তারপর হঠাৎ যখন সব থেমে গেল, এরোপ্লেন চলে গিয়েছে—যখন বিমল আবার সহজ বুদ্ধি ফিরে পেল—তখন দেখলে এ্যালিসের একখানা হাত শক্ত করে তার নিজের মুঠোর মধ্যে ধরা।—মিনি, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি সকলে মাটিতে শুয়ে—হয়তো সবাই মারা গিয়েছে—সে-ই একমাত্র রয়েছে বেঁচে।

প্রথমে মাটি থেকে ঝেড়ে উঠলো এ্যালিস্। তারপর প্রোফেসর লি, তারপর সুরেশ্বর।—মিনি মূর্চ্ছা গিয়েছে—অনেক কষ্টে তার চৈতন্য সম্পাদনা করা হোল। হঠাৎ এ্যালিস চমকে

উঠে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখিয়ে প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

সেই তরুণ ডেস্‌প্যাচ-রাইডারের দেহ অস্বাভাবিক ভাবে শায়িত কিছু দূরে। রক্তে আশপাশের মাটি ভেসে গিয়েছে—একখানা হাত উড়ে গিয়েছে—বীভৎস দৃশ্য। সেদিকে চাওয়া যায় না।

কিন্তু দেখা গেল পলাতক গৃহহীন ব্যক্তিদের খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। কয়েকটি ছেলেমেয়ে এবং একটি বৃদ্ধ জখম হয়েছে মাত্র। পাইনবনের পাতার আড়ালে ছিল এরা—ওপর থেকে বোমার লক্ষ্য ঠিকমত হয়নি।

প্রোফেসর লি'র সঙ্গে এ্যালিস্ ও মিনি আহতদের সাহায্যে অগ্রসর হোল।

সন্ধ্যার পরে একখানা ট্রেন এসে দাঁড়াল। নাইন্‌থ্-রুট্ আর্মির একটা ব্যাটালিয়ন ট্রেন থেকে নামলো— এরা এসেছে রেলপথ রক্ষা করতে এবং দুটো সাঁকো পাহারা দিতে।

বিমল সুরেশ্বরকে বল্লে —আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বলতে গেলে একরকম বাস করচি, অথচ লড়াই যে কোন্‌দিকে হচ্ছে—কি ভাবে হচ্ছে—তা কিছুই জানি নে, চোখেও দেখতে পাচ্ছি নে।

রাত্রে কমাণ্ডাণ্টের সারকুলার বেরুলো—রেললাইনের প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে —আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আক্রমণ করবে—সকলে তৈরী থাকো, যারা সৈন্য নয় যুদ্ধ করছে না—এমন শ্রেণীর লোক দূরে চলে যাও।

রাত প্রায় বারোটা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

সুরেশ্বর বর্ষাতি কোট গায়ে বাইরে থেকে হাসপাতাল তাঁবুতে ঢুকে বল্লে—আমাদের আয়ু মনে হচ্ছে ফুরিয়ে এসেছে। সারকুলার দেখেছ ?

বিমল বল্লে—গতিক সেই রকমই বটে। জাপানীরা হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্ চার্জ করলে কেউ বাঁচবে না।

—আমি ভাবছি মেয়েদের কথা—

—প্রোফেসর লি'কে কথাটা বলা ভালো। উনি কি বলেন দেখি।

প্রোফেসর লি'কে ডাকতে গিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য বিমলের চোখে পড়লো। হাসপাতাল তাঁবুর পাশে একটা ছোট্ট চটে-ছাওয়া তাঁবুতে এ্যালিস্ ও মিনি কি রান্না করছে আগুনের ওপর—বৃদ্ধ লি ওদের কাছে উনুন ঘেঁষে বসে বুড়ো ঠাকুরদাদার মত গল্প করছেন।

এ্যালিস্ বল্লে—তোমার বন্ধু কোথায় বিমল—খেতে হবে না তোমাদের আজ ? ড্যাডি আমাদের এখানে খাবেন। উঃ—কি সত্যি কথা। গোলমালে তার মনেই নেই যে সন্ধ্যা থেকে কারো পেটে কিছু যায় নি ! বিমল সুরেশ্বরকে ডেকে নিয়ে এল। খাবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু ভাত ও শুক্‌নো সিঙ্গাপুরী কাঁচকলা, চর্ব্বিতে ভাজা।

একজন ডেস্‌প্যাচ-রাইডার ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাইরে এসে বিমলকে ডাক দিলে। তার হাতে একখানা ছোট্ট সিল-করা খাম।

—আপনি হাসপাতালের ডাক্তার ? আপনার চিঠি। ট্রেন এখুনি একখানা আসছে,

টেলিগ্রামে অর্ডার দিয়ে আনানো হচ্ছে। আপনি আপনার নার্স ও রোগী নিয়ে হ্যান্‌কাউতে এই ট্রেনে যাবেন: আপনাকে একথা বলার আদেশ আছে আমার ওপর। গুড্‌নাইট।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। কেন হঠাৎ এ আদেশ জানেন?

—আমরা এই রেলের জন্যে আর লোক ক্ষয় করবো না। জেনারেল চু-টে'র আদেশ এসেছে হেড্‌ কোয়াটার্স থেকে। পরবর্ত্তী যুদ্ধ হবে এর দশ মাইল দূরে। আর এখুনি আপনারা তৈরী হোন। আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আড্ডা দখল করবে। তার আগে হয়তো গোলা ছুঁড়তে পারে।

প্রোফেসর লি কাছেই দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলেন। তিনি বল্লেন—আমি এই ট্রেনে গরীব গ্রামবাসীদের উঠিয়ে নিয়ে যাবো। নইলে জাপানী বোমা থেকে যাও বা বেঁচেছে, গোলা আর হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্‌ খেলে তাও যাবে! আপনি দয়া করে আমার এই অনুরোধ কমাণ্ডাণ্ট্‌কে জানিয়ে আমায় খবর দিয়ে যাবেন?

ডেস্‌প্যাচ্‌-রাইডার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হোল।

আরও দেড়ঘণ্টা পরে এল ট্রেন। ট্রেনখানা প্রায় খালি। তবে পেছনের গাড়ীগুলো শুঁটকি মাছ বোঝাই—বিষম দুর্গন্ধ। বিমল হাসপাতালের সব লোকজন নিয়ে ট্রেনে উঠলো—মিনি, এ্যালিস্‌, দুটি চীনা নার্স, সাত আটটি রোগী। প্রোফেসর লি ইতিমধ্যে তাঁর দলবল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু ট্রেনের সামরিক গার্ড কমাণ্ডাণ্টের বিনা আদেশে তাঁর দলবল গাড়ীতে উঠাতে চাইলে না।

এ্যালিস্‌ বল্লে—বিমল, ওদের বলো তাহোলে আমরাও যাবো না। ওঁকে ফেলে আমরা যাবো না! ট্রেনের সামরিক গার্ড বল্লে—আমার কোন হাত নেই। আপনারা না যান, পনেরো মিনিট পরে আমি গাড়ী ছেড়ে দেবো।

এ্যালিস্‌ ও মিনি নামলো। চীনা নার্স দুটিও এদের দেখাদেখি নামলো। ট্রেনের গার্ড বল্লে—রোগীরা কাদের চার্জে যাবে? একজন ডাক্তার চাই। আমি রিপোর্ট করলে আপনাদের কোর্ট মার্শাল হবে। আপনারা হাসপাতালের কর্ম্মচারী, সামরিক আদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য।

বিমল বল্লে—সে এঁরা নন্‌—এই মেয়ে দুটি। এঁরা আমেরিকান রেড্‌ক্রস্‌ সোসাইটির। চীনা পার্লামেণ্টের হাত নেই এঁদের ওপর।

এদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময়ে ডেসপ্যাচ-রাইডারটিকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ পরে প্রোফেসর লি তাঁর দলবল নিয়ে হুড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়লেন। ট্রেনও ছেড়ে দিল।

দিন পনেরো পরে।

হ্যান্‌কাউ শহরের উপকণ্ঠে পবিত্র ফা-চিন্‌ মন্দির। মিং রাজবংশের রাজকুমারী ফা-চিন্‌ তাঁর প্রণয়ীর স্মৃতির মান রাখবার জন্যে চিরকুমারী ছিলেন—এবং একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মঠে দেহত্যাগ

করেন একষট্টি বছর বয়সে। তাঁর দেহের পুণ্য ভস্মরাশির ওপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিধারে অতি মনোরম উদ্যান ও ফোয়ারা।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এ্যালিস্ ও বিমল মার্বেলের চৌবাচ্চায় মন্দিরের অতি বিখ্যাত লালমাছ দেখছিল। অনেক দূর থেকে লোকে এই লালমাছ দেখতে আসে—আর আসে নব-বিবাহিত দম্পতি—তাদের বিবাহিত জীবনের কল্যাণ কামনায়।

একটা গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে এ্যালিস্ ক্লান্তভাবে বসলো।

বিমল বল্লে—মিনিরা কোথায়?

—মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। এখানে বসো। কেমন সুন্দর লাল মাছ খেলা করছে দেখো। আমি কি ভাবছি বিমল জানো, এমন পবিত্র মন্দির, এমন সুন্দর শান্তি, এই প্রাচীন পাইন গাছের সারি—সব জাপানী বোমায় একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধের এই পরিণাম, প্রাচীন দিনের শান্তি ও সৌন্দর্য্যকে চুরমার করে বর্ব্বরতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

—এ্যালিস্, আর কতদিন চীনে থাকবে?

—যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, যতদিন একজন আহত চীন সৈনিকও হাসপাতালে পড়ে থাকে। যতদিন ড্যাডি লি তাঁর সাহায্যকারিণী মেয়ের দরকার অনুভব করেন।

এ্যালিস্ বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—কিন্তু বিমল ততদিন তোমাকেও তো থাকতে হবে—তোমাকে যেতে দেবো না।

পাইনগাছের ওদিকে নিকটেই প্রোফেসর লি'র প্রাণখোলা হাসি ও কথাবার্ত্তার আওয়াজ শোনা গেল।

এ্যালিস্ বল্লে—ওরা এদিকেই আসছে।

এ্যালিসের ভুল হয়েছিল, মিনি আর সুরেশ্বর এল না—এলেন প্রোফেসর লি। এই বয়সেও তাঁর চোখের অমন অদ্ভুত দীপ্তি যদি না থাকতো, তবে তাঁকে জনৈক বৃদ্ধ চীনা রিক্‌শাওয়ালা বলে ভুল করা অসম্ভব হয় না—এমনি সাদাসিধে তাঁর পরিচ্ছদ।

প্রোফেসর লি বল্লেন—হ্যান্‌কাউ শহরে এসে আমার গরীব গ্রামবাসীরা আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তৈরী মাটির নীচের ঘরে লুকিয়ে থাকলে আমার চলবে না এ্যালিস্, আমি কালই এখান থেকে গ্রামে চলে যাবো।

এ্যালিস্ বল্লে, কেন?

—দক্ষিণ চীনে সর্ব্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ। লোক না খেয়ে মরছে, তার সাথে বোমা আছে। মড়ক লেগেছে। আমার এখানে বসে থাকলে চলে? আমি আবেদন পাঠিয়েছি আমেরিকায় মার্কিন রেড্‌ক্রস্ সোসাইটির মধ্যস্থতায়। তারাই আপেল পাঠিয়েছিল এদের খাওয়াতে। যতদূর জানা গিয়েছে, ওরা কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে। টাকাটা শীগগির আসবে।

এ্যালিস্ বল্লে—ড্যাডি, আমার একটা প্রস্তাব শুনবেন? আমার মাসীমা নিঃসন্তান, বিধবা, অনেক টাকার মালিক। আমায় তিনি উইল করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন,

টাকাটা আমি চাইলেই পাবো। সেই টাকা আপনাকে দিচ্ছি—হ্যান্‌কাউ শহরে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের জন্যে একটা 'হোম' খুলুন। আপনি লেখালেখি করলে গবর্নমেণ্টও কিছু সাহায্য করবে। আমি আর মিনি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করবো।

প্রোফেসর লি বল্লেন—তোমায় ধন্যবাদ, এ্যালিস। অতি দয়াবতী মেয়ে তুমি, কিন্তু তোমার টাকা নেবো না। তা ছাড়া, এমন কোনো বড় আশ্রয়স্থল আমরা গড়তে পারবো না, যাতে সকল দুঃস্থ বালক-বালিকাদের আমরা জায়গা দিতে পারি। সারা দক্ষিণ-চীন বিপন্ন, কত ছেলেমেয়েকে আমরা পুষতে পারি? মাঝে পড়ে তোমার টাকাগুলো যাবে।

বিমল একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এ্যালিসের ওপর প্রোফেসর লি'র স্নেহ নিজের সন্তানের ওপর পিতার স্নেহের মতই। উনি চান না এ্যালিসের টাকাগুলো খরচ করিয়ে দিতে। নইলে উনি 'হোম' গঠনের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখালেন, সেটা এমন কিছু জোরালো নয়। সব দুঃস্থ লোকদের আশ্রয় দিতে পারছিনে বলে তাদের মধ্যে কাউকেও আশ্রয় দেবো না?

এমন সময় সুরেশ্বর ও মিনি এসে বল্লে—এসো এ্যালিস, এসো বিমল, একটা জিনিস দেখে যাও।

ওরা বাগানের বেঞ্চি থেকে উঠে মন্দিরের উঁচু চত্বরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দেখলে ওদের আগে আগে দুটি চীনা তরুণ-তরুণী মন্দিরে উঠছে। তাদের হাতে ছোট ছোট ধ্বজা, মোমবাতি ও ফুল।

মিনি বল্লে—ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ছেলেটি বেশ ইংরাজী জানে। ওর ডাক পড়েছে যুদ্ধে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে ওই মেয়েটিকে কাল বিয়ে করেছে; অনেকদিন থেকে মেয়েটি ওর বাগদত্তা। ফা-চিন্‌ মন্দিরে আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছে—

বিমল ও এ্যালিস নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিউরে উঠলো। বর্ত্তমান যুগের ভীষণ মারণাস্ত্রের সামনে যুদ্ধ। আয়ু ফুরিয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্ত্তে। একটা বোমার অপেক্ষা মাত্র। তরুণীর বয়স অল্প—ষোল সতেরো।

চীন দেশে সম্ভ্রান্ত-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নেই।

তরুণ-তরুণীর মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময়। কোন দিকে ওদের লক্ষ্য নেই। মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে মোমবাতি জ্বলছে। ওরা খোদাই-করা কাঠের চৌকাট পার হ'য়ে রাজকুমারী ফা-চিন-এর কৃত্রিম সমাধির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলে, ফুল ছড়িয়ে দিলে, দুজনে পাশাপাশি বসে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে। তারপর ওরা উঠলো—ঘর থেকে বাইরে এসে মন্দিরে চত্বরে দাঁড়ালো, দুজনে দুজনের হাত ধরে আছে—দুজনের হাসি-হাসি মুখ।

এ্যালিস বল্লে—মিনি, ওঁদের এখানে দাঁড়াতে বলো না? আমাদের অনুরোধ—

মিনি বল্লে—আপনারা একটু দয়া করে যদি দাঁড়ান—মন্দিরের চত্বরে—

যুবক ওদের দিকে হাসিমুখে চাইলে, তারপর মেয়েটিকে চীনাভাষায় কি বল্লে। তরুণীও অল্প হাসিমুখে ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে চোখ নীচু করলে।

যুবক হাসিমুখে বল্লে—ফটো নেবে বুঝি? আলো নেই মোটে—ফটো উঠবে?

এ্যালিস এই সময় মন্দিরের বাইরের ফুলের দোকান থেকে একরাশ ফুল কিনে নিয়ে এল। বৃদ্ধ লি'কেও সে ডেকে এনেছে বাগান থেকে। হাসিমুখে বল্লে—ড্যাডি, এই ফুল নিয়ে ওদের আশীর্ব্বাদ করুন—তোমরাও সবাই ফুল নাও।

যুবকের সঙ্গে প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় কি কথাবার্ত্তা বল্লেন, তারপর সকলে অর্দ্ধচক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো নবদম্পতীকে।

প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় গম্ভীর স্বরে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করে ওদের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিলেন—তারপর সকলে ফুল ছড়ালে ওদের ওপর। এ্যালিস ও মিনির কি হাসি ফুল ছড়াতে ছড়াতে!

তরুণ-তরুণী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলো—সন্ধ্যা নেমেছে। কোথাও আর রোদ নেই—এই পবিত্র, প্রাচীন ফা-চিন মন্দির, পাইন বন, লাল মাছের চৌবাচ্চা, শান্ত গভীর সন্ধ্যা—এই কলহাস্যমুখরা বিদেশিনী মেয়ে দুটি,—এই নবদম্পতী। দেখে মনেও হয় না এই পবিত্র স্থানের তিন মাইলের মধ্যে মানুষ মানুষকে অকারণে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে বিষবাষ্প দিয়ে, বোমা দিয়ে, কলের কামান দিয়ে। যুদ্ধ বর্ব্বরের ব্যবসায়। অথচ এই হাসি, এই আনন্দ, তরুণ দম্পতীর কত আশা, উৎসাহ!

এ্যালিস ঠিকই বলেছে। সব যাবে—কাল সকালেই হয়তো যাবে, জাপানী বোমায়। পবিত্র ফা-চিন্ মন্দির যাবে, পাইন গাছের সারি যাবে, লালমাছ যাবে, এই তরুণ দম্পতী যাবে, সে যাবে, মিনি, এ্যালিস, সুরেশ্বর, বৃদ্ধ লি—সব যাবে। যুদ্ধ বর্ব্বরের ব্যবসায়।

ফুল ছড়ানো শেষ হয়েছে! মন্দিরের বাঁকানো ঢালু ছাদে পোষা পায়রার দল উড়ে এসে বসেছে। পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটা ফুলে ভর্ত্তি। নবদম্পতী তখন হাসছে—এ একটা ভারি অপ্রত্যাশিত আমোদের ব্যাপার হয়েছে তাদের কাছে। ওদের হাসি ও আনন্দ যেন দানবীয় শক্তির ওপর,—মৃত্যুর ওপর,—মানুষের জয়লাভ। মহাচীনের নবজন্ম হয়েছে এই তরুণ-তরুণীতে। স্বর্গ থেকে ফা-চিন্-এর পবিত্র অমর আত্মা ওদের আশীর্ব্বাদ করুন।

এ্যালিস্ এসে বিমলের হাত ধরলো।

—চল যাই বিমল। হাসপাতালে ডিউটি রয়েছে—তোমার আমার এক্ষুনি—

* * *


মিসমিদের
কবচ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্যামপুর গ্রামে সেদিন নন্দোৎসব।

শ্যামপুরের পাশের গ্রামে আমার মাতুলালয়। চৌধুরী-বাড়ীর উৎসবে আমার মামার বাড়ীর সকলের সঙ্গে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—সুতরাং সেখানে গেলাম।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা একটা শতরঞ্জি পেতে বৈঠকখানায় ব'সে আসর জমিয়েচেন। আমার বড় মামা বিদেশে থাকেন, সম্প্রতি ছুটি নিয়ে দেশে এসেচেন—সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করলে।

—এই যে আশুবাবু, সব ভালো তো? নমস্কার!

—নমস্কার। একরকম চলে যাচ্ছে—আপনাদের সব ভালো?

—ভালো আর কই? জ্বরজাড়ি সব। ম্যালেরিয়ার সময় এখন, বুঝতেই পারচেন।

—আপনার সঙ্গে এটি কে?

—আমার ভাগ্নে, সুশীল। আজই এসেচে—নিয়ে এলাম তাই।

—বেশ করেচেন, বেশ করেচেন, আনবেনই তো। কি করেন বাবাজি?

এখানে আমি মামাকে চোখ টিপবার সুবিধে না পেয়ে তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলি টিপে দিলাম।

মামা বল্লেন—আপিসে চাকরি করে—কলকাতায়।

—বেশ, বেশ। এসো বাবাজি, বসো এসে এদিকে।

মামার আঙুল টিপবার কারণটা বলি। আমি কলকাতার বিখ্যাত প্রাইভেট-ডিটেক্‌টিভ নিবারণ সোমের অধীনে শিক্ষানবিশি করি। কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না আমার।

নন্দোৎসব এবং আনুষঙ্গিক ভোজনপর্ব্ব শেষ হলো। আমরা বিদায় নেবার যোগাড় করচি, এমন সময় গ্রামের জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার মামাকে ডেকে বল্লেন—কাল আপনাদের পুকুরে মাছ ধরতে যাবার ইচ্ছে আছে। সুবিধে হবে কি?

—বিলক্ষণ! খুব সুবিধে হবে! আসুন না গাঙ্গুলিমশায়, আমার ওখানেই তাহ'লে দুপুরে আহারাদি করবেন কিন্তু।

—না না, তা আবার কেন? আপনার পুকুরে মাছ ধরতে দিচ্চেন এই কত, আবার খেয়ে বিব্রত করতে যাবো কেন?

—তাহোলে মাছ ধরাও হবে না ব'লে দিচ্চি। মাছ ধরতে যাবেন কেবল ওই এক শর্ত্তে।

গাঙ্গুলিমশায় হেসে রাজী হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে হরিশ গাঙ্গুলিমশায় মামার বাড়ীতে এলেন। পল্লীগ্রামের পাকা ঘুঘু মাছ-ধরায়, সঙ্গে ছ'গাছা ছোট-বড় ছিপ, দু'খানা হুইল লাগানো—বাকি সব বিনা হুইলের, টিনে ময়দার চার, কেঁচো, পিঁপড়ের ডিম, তামাক খওয়ার সরঞ্জাম, আরও কত কি।

মামাকে হেসে বল্লেন—এলাম বড়বাবু, আপনাকে বিরক্ত করতে। একটা লোক দিয়ে গোটাকতক কঞ্চি কাটিয়ে যদি দেন—কেঁচোর চার লাগাতে হবে।

মামা জিজ্ঞেস করলেন—এখন বসবেন, না, ওবেলা ?

—না, এবেলা বসা হবে না। মাছ চারে লাগতে দু'ঘণ্টা দেরি হবে। ততক্ষণ খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া যায়। একটু সকাল-সকাল যদি আহারের ব্যবস্থা…

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব হয়ে গেছে। আমিও জানি, আপনি এসেই খেতে বসবার জন্যে তাগাদা দেবেন। মাছ যারা ধরে, তাদের কাছে খাওয়া-টাওয়া কিছুই নয় খুব জানি। আর ঘণ্টা-খানেক পরেই জায়গা ক'রে দেবো খাওয়ার।

যথাসময়ে হরিশ গাঙ্গুলি খেতে বসলেন এবং একা প্রায় তিনজনের উপযুক্ত খাদ্য উদরসাৎ করলেন।

আমি কলকাতার ছেলে, দেখে তো অবাক্!

আমার মামা জিজ্ঞেস করলেন—গাঙ্গুলিমশায়, আর একটু পায়েস ?

—তা একটুখানি না হয়……ওসব তো খেতে পাইনে! একা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই। বাড়ীতে মেয়েমানুষ নেই, বৌমায়া থাকেন বিদেশে আমার ছেলের কাছে। কে ওসব ক'রে দেবে ?

—গাঙ্গুলিমশায় কি একাই থাকেন ?

—একাই থাকি বইকি। ছেলেরা কলকাতায় চাকরি করে, আমার শহরে থাকা পোষায় না। তাছাড়া কিছু নগ্‌দী লেন-দেনের কারবারও করি, প্রায় তিনহাজার টাকার ওপর। টাকায় দু'আনা মাসে সুদ। আপনার কাছে আর লুকিয়ে কি করবো? কাজেই বাড়ী না থাকলে চলে কৈ ? লোকে প্রায়ই আসচে টাকা দিতে-নিতে।

গাঙ্গুলিমশায় এই কথাগুলো যেন বেশ একটু গর্ব্বের সঙ্গে বল্লেন।

আমি পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞ না হোলেও আমার মনে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দিলে। টাকা-কড়ির কথা এ-ভাবে লোকজনের কাছে ব'লে লাভ কি! বলা নিরাপদও নয়—শোভনতা ও রুচির কথা যদি বাদই দিই।

গাঙ্গুলিমশায়কে আমার বেশ লাগলো।

মাছ ধরতে-ধরতে আমার সঙ্গে তিনি অনেক গল্প করলেন।

…থাকেন তিনি খুব সামান্য ভাবে—কোনো আড়ম্বর নেই—খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও কোনো ঝঞ্ঝাট নেই তাঁর।…এই ধরণের অনেক কথাই হোলো।

মাছ তিনি ধরলেন বড়-বড় দুটো। ছোট গোটা-চার-পাঁচ। আমার মামাকে অর্দ্ধেক-গুলি দিতে চাইলেন, মামা নিতে চাইলেন না। বল্লেন—কেন গাঙ্গুলিমশায়? পুকুরে মাছ ধরতে এসেছেন, তার খাজনা নাকি ?

গাঙ্গুলিমশায় জিব কেটে বল্লেন—আরে রামো! তাই ব'লে কি বলচি? রাখুন অন্তত গোটা-দুই!

—না গাঙ্গুলিমশায়, মাপ করবেন, তা নিতে পারবো না। ও নেওয়ার নিয়ম নেই আমাদের।

অগত্যা গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলেন। আমায় ব'লে গেলেন—তুমি বাবাজী একদিন আমার ওখানে যেও একটা ছুটিতে। তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় আনন্দ হোলো আজ।

কে জানতো যে তাঁর বাড়ীতে আমাকে অল্পদিনের মধ্যেই যেতে হবে; তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে—অন্য উদ্দেশ্যে।

গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে খোশগল্প করার জন্যে নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলে আমি মামাকে বল্লাম—আপনি মাছ নিলেন না কেন? উনি দুঃখিত হোলেন নিশ্চয়।

মামা হেসে বল্লেন—তুমি জানো না, নিলেই দুঃখিত হোতেন—উনি বড় কৃপণ।

—তা কথার ভাবে বুঝেচি।

—কি ক'রে বুঝলে?

—অন্য কিছু নয়, বৌ-ছেলেরা কলকাতায় থাকে, উনি থাকেন দেশের বাড়ীতে। একটা চাকর কি রাঁধুনী রাখেন না, হাত পুড়িয়ে এ-বয়সে রেঁধে খেতে হয় তাও স্বীকার। অথচ হাতে দু'পয়সা বেশ আছে।

—আর কিছু লক্ষ্য করলে?

—বড় গল্প বলা স্বভাব। আমার ধারণা, একটু বাড়িয়েও বলেন।

—ঠিক ধরেচো। মাছ নিইনি তার আর-একটা কারণ, উনি মাছ দিয়ে গেলে সব জায়গায় সে গল্প ক'রে বেড়াবেন, আর লোকে ভাববে আমরা কি চামার—পুকুরে মাছ ধরেচে ব'লে ওঁর কাছ থেকে মাছ নিইচি।

—না মামা, এটা আপনার ভুল। এ-কথা ভাববার কারণ কি লোকদের? তা কখনো কেউ ভাবে?

—তা যাই হোক, মোটের ওপর আমি ওটা পছন্দ করিনে।

—উনি একটা বড় ভুল করেন মামাবাবু। টাকার কথা অমন ব'লে বেড়ান কেন?

—ওটা ওঁর স্বভাব। সর্ব্বত্র ওই করবেন। যেখানে বসবেন, সেখানেই টাকার গল্প। ক'রেও আজ আসচেন বহুদিন। দেখাতে চান, হাতে দু'পয়সা আছে।

—আমার মনে হয় ও-স্বভাবটা ভালো নয়—বিশেষ ক'রে এইসব পাড়াগাঁয়ে। একদিন আপনি একটু সাবধান ক'রে দেবেন না?

—সে হবে না। তুমি ওঁকে জানো না। বড্ড একগুঁয়ে। কথা তো শুনবেনই না—আরও ভাববেন, নিশ্চয়ই আমার কোনো মতলব আছে।

আমি সেদিন কলকাতায় চলে এলাম বিকেলের ট্রেনে। আমার ওপর-ওয়ালা নিবারণবাবু লিখেছেন, খুব শীগ্‌গির আমায় একবার এলাহাবাদে যেতে হবে বিশেষ একটা

জরুরী কাজে। অপিসে যেতেই খবর পেলাম, তিনি আর-একটা কাজে দু'দিনের জন্ম পাটনা গিয়েচেন চলে— আমার এলাহাবাদ যাবার খরচের টাকা ও একখানা চিঠি রেখে গিয়েচেন তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে।

আমার কাছে তাঁর ড্রয়ারের চাবি থাকে। ড্রয়ার খুলে চিঠিখানা প'ড়ে দেখলাম, বিশেষ কোনো গুরুতর কাজ নয়—এলাহাবাদ গবর্নমেণ্ট থাম্ব-ইম্‌প্রেশন্‌-বুরোতে যেতে হবে, কয়েকটি দাগী বদমাইশের বুড়ো-আঙুলের ছাপের একটা ফটো নিতে।

মিঃ সোম বুড়ো-আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

এলাহাবাদের কাজ শেষ করতে আমার লাগলো মাত্র একদিন, আট-দশদিন রয়ে গেলাম তবুও।

সেদিন সকালবেলা হঠাৎ মিঃ সোমের এক টেলিগ্রাম পেলাম। একটা জরুরী কাজের জন্ম আমায় সেইদিনই কলকাতায় ফিরতে লিখেচেন। আমি যেন এলাহাবাদে দেরি না করি।

ভোরে হাওড়ায় ট্রেন এসে দাঁড়াতেই দেখি, মিঃ সোম প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একটু অবাক্ হয়ে গেলাম, কারণ, এরকম কখনো উনি আসেন না।

আমায় বল্লেন—সুশীল, তুমি আজই মামার বাড়ী যাও। তোমার মামা কাল দু'খানা আর্জেণ্ট্‌-টেলিগ্রাম করেছেন তোমায় সেখানে যাবার জন্যে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম—মামার বাড়ী কারো অসুখ? সবাই ভালো আছে তো?

—সে-সব নয় বলেই মনে হলো। টেলিগ্রামের মধ্যে কারো অসুখের উল্লেখ নেই।

—কোনো লোক আসে নি সেখান থেকে?

—না। আমি তার ক'রে দিয়েচি, তুমি এলাহাবাদে গিয়েচো। আজই তোমার ফিরবার তারিখ তাও জানিয়ে দিয়েচি।

আমি বাসায় না গিয়ে সোজা শেয়ালদ' স্টেশনে চলে এলাম মামার বাড়ী যাবার জন্যে।

মিঃ সোম আমার সঙ্গে এলেন শেয়ালদ পর্যন্ত—বার-বার ক'রে ব'লে দিলেন, কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটলে তাঁকে যেন খবর দিই—তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন।

মামার বাড়ী পা দিতেই বড় মামা বল্লেন—এসেছিস সুশীল? যাক্, বড্ড ভাবছিলাম?

—কি ব্যাপার মামাবাবু? সবাই ভালো তো?

—এখানকার কিছু ব্যাপার নয়। শ্যামপুরের হরিশ গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছেন। সেখানে এখুনি যেতে হবে।

আমি ভীত ও বিস্মিত হয়ে বল্লাম—গাঙ্গুলিমশায়! সেদিন যিনি মাছ ধরে গেলেন! খুন হয়েচেন?

—হ্যাঁ, চলো একবার সেখানে। শীগ্‌গির স্নানাহার ক'রে নাও। কারণ, সারাদিনই হয়তো কাটবে সেখানে।

বেলা দুটোর সময় শ্যামপুরে এসে পৌঁছুলাম। ছোট্ট গ্রাম। কখনো সেখানে কারো একটা ঘটি চুরি হয়নি—সেখানে খুন হয়ে গিয়েচে, সুতরাং গ্রামের লোকে দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেছে। গ্রামের মাঝখানে বারোয়ারি-পূজা-মণ্ডপে জড় হয়ে সেই কথারই আলোচনা করছে সবাই।

আমার মামা এখানে এর পূর্ব্বে অনেকবার এসেছিলেন এই ঘটনা উপলক্ষে, তা সকলের কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা গেল। আমার কথা বিশেষ কেউ জিগ্যেস করলে না বা আমার সম্বন্ধে কেউ কোনো আগ্রহও দেখালে না। কেউ জানে না, আমি প্রাইভেট-ডিটেক্‌টিভ মিঃ সোমের শিক্ষানবিশ ছাত্র—এ-সব অজ পাড়াগাঁয়ে ওঁর নামই কেউ শোনে নি—আমাকে সেখানে কে চিনবে?

মামা জিগ্যেস করলেন—লাশ নিয়ে গিয়েছে?

ওরা বল্লে—আজ সকালে নিয়ে গেল। পুলিস এসেছিল।

আমি ওদের বল্লাম—ব্যাপার কি ভাবে ঘটলো? আজ হোলো শনিবার। কবে তিনি খুন হয়েচেন?

গ্রামের লোকে যে রকম বল্লে তাতে মনে হোলো, সে-কথা কেউ জানে না। নানা লোক নানা কথা বলতে লাগলো। পুলিসের কাছেও এরা এইরকমই ব'লে ব্যাপারটাকে রীতিমত গোলমেলে ক'রে তুলেচে।

আমি আড়ালে মামাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লাম—আপনি কি মনে ক'রে এখনে এনেচেন আমায়?

মামা বল্লেন—তুমি সব ব্যাপার শুনে নাও, চলো, অনেক কথা আছে। এই খুনের রহস্য তোমায় আবিষ্কার করতে হবে—তবে বুঝবো মিঃ সোমের কাছে তোমায় শিক্ষানবিশ করতে দিয়ে আমি ভুল করিনি। এখানে কেউ জানে না তুমি কি কাজ করো—সে তোমার একটা সুবিধে।

—সুবিধেও বটে, আবার অসুবিধেও বটে।

—কেন?

—বাইরের বাজে লোককে কেউ আগ্রহ ক'রে কিছু বলবে না। গোলমাল একটু থামলে একজন ভালো লোককে বেছে নিয়ে সব ঘটনা খুঁটিয়ে জানতে হবে। গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে কোথায়?

—সে লাশের সঙ্গে মহকুমায় গিয়েছে। সেখানে লাশ কাটাকুটি করবে ডাক্তারে, তারপর দাহকার্য্য ক'রে ফিরবে।

—লাশ দেখলে বড্ড সুবিধে হোতো। সেটা আর হোলো না।

—সেইজন্যেই তো বলছি, তুমি কেমন কাজ শিখেচো, এটা তোমার পরীক্ষা। এতে যদি পাশ করো তবে বুঝবো তুমি মিঃ সোমের উপযুক্ত ছাত্র। নয়তো তোমাকে আমি আর ওখানে রাখবো না—এ আমার এক-কথা জেনো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তারপর গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী গেলাম।

গিয়ে দেখি, যেখানটাতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী—তার দু'দিকে ঘন-জঙ্গল। একদিকে দূরে একটা গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা, একদিকে একটি হচ্ছে বাড়ী।

আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের কথা জিগ্যেস ক'রে জানলাম, সে এখনও মহকুমা থেকে ফেরে নি। তবে একটি প্রৌঢ়ার সঙ্গে দেখা হোলো—শুনলাম তিনি গাঙ্গুলিমশায়ের আত্মীয়া।

তাঁকে জিগ্যেস করলাম—গাঙ্গুলিমশায়কে শেষ দেখেছিলেন কবে?

—বুধবার।

—কখন?

—বিকেল পাঁচটার সময়।

—কিভাবে দেখেছিলেন?

—সেদিন হাটবার ছিল—উনি হাটে যাবার আগে আমার কাছে পয়সা চেয়েছিলেন।

—কিসের পয়সা?

—সুদের পয়সা। আমি ওঁর কাছে দুটো টাকা ধার নিয়েছিলাম ও-মাসে।

—আপনার পর আর কেউ দেখেছিল?

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর ঠিক পশ্চিম গায়ে যে বাড়ী, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে প্রৌঢ়া বল্লেন—ওই বাড়ীর রায়-পিসি আমার পরও তাঁকে দেখেছিলেন।

আমি বৃদ্ধা রায়-পিসির বাড়ী গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই বৃদ্ধা আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে একখানা পিঁড়ি বার ক'রে দিয়ে বল্লেন—বোসো বাবা।

আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে বল্লাম—আপনি একা থাকেন নাকি এ বাড়ীতে।

—হ্যাঁ বাবা। আমার তো কেউ নেই—মেয়ে-জামাই আছে, তারা দেখাশুনো করে।

—মেয়ে-জামাই এখানে থাকেন?

—এখানেও থাকে, আবার তাদের দেশ এই এখান থেকে চার ক্রোশ দূর সাধুহাটি গাঁয়ে, সেখানেও থাকে।

—গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি বুধবার কখন দেখেন?

—রাত্তিরে যখন উনি হাট থেকে ফিরলেন—তখন আমি বাইরের রোয়াকে বসে জপ করছিলাম। তারপর আর চোখে না দেখলেও ওঁর গলার আওয়াজ শুনেচি রাত দশটা পর্য্যন্ত—উনি ওঁর রান্নাঘরে রাঁধছিলেন আলো জেলে, আমি যখন শুতে যাই তখন পর্য্যন্ত।

—তখন রাত কত হবে?

—তা কি বাবা জানি? আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক—ঘড়ি তো নেই বাড়ীতে। তবে

তখন ফরিদপুরের গাড়ী চলে গিয়েচে। আমরা শব্দ শুনে বুঝি কখন কোন্ গাড়ী এলো গেল।

—একা থাকতেন, আর রাত পর্য্যন্ত রান্না করছিলেন—এত কি রান্না?

—সেদিন মাংস এনেছিলেন হাট থেকে। মাংস সেদ্ধ হতে দেরি হচ্ছিলো।

—আপনি কি ক'রে জানলেন?

—পরে আমরা জেনেছিলাম। হাটে যারা ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে মাংস কিনেছিল - তারা বলেছিল। তাছাড়া যখন রান্নাঘর খোলা হোলো—বাবাগো!

ব'লে বৃদ্ধা যেন সে দৃশ্যের বীভৎসতা মনের পটে আবার দেখতে পেয়ে শিউরে উঠে কথা বন্ধ করলেন। সঙ্গে যে প্রৌঢ়া আত্মীয়াটি ছিলেন গাঙ্গুলিমশায়ের, তিনিও বল্লেন—ও বাবা, সে রান্নাঘরের কথা মনে হোলে এখনও গা ভোল দেয়!

আমি আগ্রহের সঙ্গে ব'লে উঠলাম—কেন? কেন?—কি ছিল রান্নাঘরে?

বৃদ্ধা বল্লেন—থালার চারদিকে ভাত ছড়ানো—মাংসের ছিবড়ে আর হাড়গোড় ছড়ানো। বাটিতে তখনও মাংস আর ঝোল রয়েচে—ঘরের মেঝেতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন—তিনি খেতে বসেছিলেন এবং তাঁর খাওয়া শেষ হবার আগেই যারা তাঁকে খুন করে তারা এসে পড়ে।

প্রৌঢ়াও বল্লেন—হ্যাঁ বাবা, এ সবাই দেখেচে। পুলিসও এসে রান্নাঘর দেখে গিয়েচে। সকলেরই মনে হোলো, ব্রাহ্মণের খাওয়া শেষ হবার আগেই খুনেরা এসে তার ওপর পড়ে।

—আচ্ছা বেশ, এ গেল বুধবার রাতের ব্যাপার। সেদিনই হাট ছিল তো?

—হ্যাঁ বাবা, তার পরদিন সকালে উঠে আমরা দেখলাম, ওঁর ঘরের দরজা বাইরের দিকে তালা-চাবি দেওয়া। প্রথম সকলেই ভাবলে উনি কোথাও কাজে গিয়েচেন, ফিরে এসে রান্না-বান্না করবেন। কিন্তু যখন বিকেল হয়ে গেল, ফিরলেন না—তখন আমরা ভাবলাম, উনি ওঁর ছেলেদের কাছে কলকাতায় গেছেন।

—তারপর?

—বিষ্যুদবার গেল, শুক্রবার গেল, শুক্রবার বিকেলের দিকে বন্ধ-ঘরের মধ্যে থেকে কিসের দুর্গন্ধ বেরুতে লাগলো—তাও সবাই ভাবলে, ভাদ্রমাস, গাঙ্গুলিমশায় হয়তো তাল কুড়িয়ে ঘরের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন তাই পচে অমন গন্ধ বেরুচ্চে।

—শনিবার আপনারা কোন্ সময় টের পেলেন যে, তিনি খুন হয়েচেন?

—শনিবারে আমি গিয়ে গ্রামের ভদ্রলোকদের কাছে সব বললাম। অনেকেই জানতো না যে, গাঙ্গুলিমশায়কে এ ক'দিন গাঁয়ে দেখা যায়নি। তখন সকলেই এলো। গন্ধ তখন খুব বেড়েচে! পচা তালের গন্ধ ব'লে মনে হচ্ছে না!

—কি করলেন আপনারা?

—তখন সকলে জানলা খোলবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু সব জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। দোর ভাঙাই সাব্যস্ত হোলো। পরের ঘরের দোর ভেঙে ঢোকা ঠিক নয়—এরপর যদি তা নিয়ে কোনো কথা ওঠে? তখন চৌকিদার আর দফাদার ডেকে এনে তাদের সামনে দোর ভাঙা হোলো।

—কি দেখা গেল ?

—দেখা গেল, তিনি ঘরের মধ্যে মরে প'ড়ে আছেন! মাথায় ভারি জিনিস দিয়ে মারার দাগ। মেজে খুঁড়ে রাশীকৃত মাটি বার করা, ঘরের বাক্স-প্যাট্‌রা সব ভাঙা, ডালা খোলা—সব তচ্‌নচ্‌ করেচে জিনিসপত্র।…তারপর ওঁর ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হোলো।

—এ-ছাড়া আর কিছু আপনারা জানেন না ?

—না বাবা, আর আমরা কিছু জানিনে।

গাঙ্গুলিমশায়ের প্রতিবেশিনী সেই বৃদ্ধাকে জিগ্যেস করলাম—রাত্রে কোনোরকম শব্দ শুনেছিলেন ? গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী থেকে ?

—কিছু না। অনেক রাত্তিরে আমি যখন শুতে যাই—তখনও ওঁর রান্নাঘরে আলো জ্বলতে দেখেচি। আমি ভাবলাম, গাঙ্গুলিমশায় আজ এখনও দেখি রান্না করচেন!

—কেন, এরকম ভাবলেন কেন ?

—এত রাত পর্য্যন্ত তো উনি রান্নাঘরে থাকেন না; সকালরাত্তিরেই খেয়ে শুয়ে পড়েন। বিশেষ ক'রে সেদিন গিয়েছে ঘোর অন্ধকার রাত্তির—অমাবস্যা, তার ওপর টিপ্‌-টিপ্‌ বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে থেকেই।

—তখন তো আর আপনি জানতেন না যে, উনি হাট থেকে মাংস কিনে এনেচেন ?

—না, এমন কিছুই জানিনে।…হ্যাঁ বাবা, ‥যখন এত ক'রে জিজ্ঞেস করচো, তখন একটা কথা আমার এখন মনে হচ্চে—

কি, কি, বলুন ?

—উনি ভাত খাওয়ার পরে রোজ রাত্তিরে কুকুর ডেকে এঁটো পাতা, কি পাতের ভাত তাদের দিতেন, রোজ-রোজ ওঁর গলার ডাক শোনা যেতো। সেদিন আমি আর তা শুনি নি।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হয়তো।

—না বাবা, বুড়ো-মানুষ—ঘুম সহজে আসে না। চুপ ক'রে শুয়ে থাকি বিছানায়। সেদিন আর ওঁর কুকুরকে ডাক দেওয়ার আওয়াজ আমার কানেই যায় নি।

ভালো ক'রে জেরা করার ফল অনেক সময় বড় চমৎকার হয়। মিঃ সোম প্রায়ই বলেন—লোককে বারবার ক'রে প্রশ্ন জিগ্যেস করবে। যা হয়তো তার মনে নেই, বা, খুঁটিনাটির ওপর সে তত জোর দেয় নি—তোমার জেরায় তা তারও মনে পড়বে। সত্য বার হয়ে আসে অনেক সময় ভালো জেরার গুণে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিনই আমার সঙ্গে গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের দেখা হোলো। সে তার পিতার দাহকার্য্য শেষ ক'রে ফিরে আসছে কাছাগলায়।

আমি তাকে আড়ালে ডেকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলাম। শ্রীগোপালের চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ ক'রে জল পড়তে লাগলো। সে আমাকে সব-রকমে সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিলে।

আমি বল্লাম—কারো ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

—কার কথা বলবো বলুন। বাবার একটা দোষ ছিল, টাকার কথা জাহির ক'রে বেড়াতেন সবার কাছে। কত জায়গায় এ-সব কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে কে এ-কাজ করলে কি ক'রে বলি?

—আচ্ছা, কথা একটা জিগ্যেস করবো—কিছু মনে করবেন না। আপনার বাবার কত টাকা ছিল জানেন?

—বাবা কখনো আমাদের বলতেন না। তবে, আন্দাজ, দু'হাজারের বেশি নগদ টাকা ছিল না।

—সে টাকা কোথায় থাকতো?

—সেটা জানতাম। ঘরের মেজেতে বাবা পুঁতে রাখতেন—কতবার বলেচি, টাকা ব্যাঙ্কে রাখুন। সেকেলে লোক, ব্যাঙ্ক বুঝতেন না।

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর পর বাড়ী এসে আপনি মেজে খুঁড়ে কিছু পেয়েছিলেন?

—মেজে তো খুঁড়ে রেখেছিল যারা খুন করেচে তারাই। আমি এক পয়সাও পাই নি—তবে একটা কথা বলি—দু'হাজার টাকার সব টাকাই তো মেজেতে পোঁতা ছিল না—বাবা টাকা ধার দিতেন কিনা! কিছু টাকা লোকজনকে ধার দেওয়া ছিল।

—কত টাকা আন্দাজ?

—সেদিক থেকেও মজা শুনুন, বাবার খাতাপত্র সব ওই সঙ্গে চুরি হয়ে গিয়েচে। খাতা না দেখলে বলা যাবে না কত টাকা ধার দেওয়া ছিল।

—খাতাপত্র নিজেই লিখতেন?

—তার মধ্যেও গোলমাল আছে। আগে নিজেই লিখতেন, ইদানীং চোখে দেখতে পেতেন না ব'লে একে-ওকে ধ'রে লিখিয়ে নিতেন।

—কাকে-কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন জানেন?

—বেশির ভাগ লেখাতেন সদ্‌গোপ-বাড়ীর ননী ঘোষকে দিয়ে। সে জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করে—তার হাতের লেখাও ভালো। বাবার কথা সে খুব শুনতো।

—ননী ঘোষের বয়েস কত?

—ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

—ননী ঘোষ লোক কেমন? তার ওপর সন্দেহ হয়?

—মুশ্‌কিল হয়েচে, বাবা তো একজনকে দিয়ে লেখাতেন না। যখন যাকে পেতেন, তখন তাকেই ধ'রে লিখিয়ে নিতেন যে! স্কুলের ছেলে গণেশ ব'লে আছে, ওই মুখুয্যেবাড়ী থেকে পড়ে—তাকেও দেখি একদিন ডেকে এনেছেন। শুধু ননী ঘোষের ওপর সন্দেহ ক'রে কি করবো?

—আর কাকে দেখেছেন ?

—আর মনে হচ্ছে না।

—আপনি হিসাবের খাতা দেখে ব'লে দিতে পারেন, কোন্ হাতের লেখা কার ?

—ননীর হাতের লেখা আমি চিনি। তার হাতের লেখা বলতে পারি—কিন্তু সে খাতাই-বা কোথায় ? খুনেরা সে খাতা তো নিয়ে গিয়েচে !

—কাকে বেশী টাকা ধার দেওয়া ছিল, জানেন ?

—কাউকে বেশী টাকা দিতেন না বাবা। দশ, পাঁচ, কুড়ি—বড়জোর ত্রিশের বেশি টাকা একজনকেও তিনি দিতেন না।

শ্যামপুরের জমিদার-বাড়ী সেবেলা খাওয়া-দাওয়া করলাম।

একটা বড় চত্বর, তার চারিধারে নারিকেল গাছের সারি, জামরুল গাছ, বোম্বাই-আমের গাছ, আতা-গাছ। বেশ ছায়াভরা উপবন যেন। ডিটেক্‌টিভগিরি ক'রে হয়তো ভবিষ্যতে খাবো—তা ব'লে প্রকৃতির শোভা যখন মন হরণ করে—এমন মেঘমেদুর বর্ষা-দিনে গাছপালার শ্যামশোভা উপভোগ করতে ছাড়ি কেন ?

বসলুম এসে চত্বরের একপাশে, নির্জ্জন গাছের তলায়।

ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলুম :

...কি করা যায় এখন ? মামা বড় কঠিন পরীক্ষা আমার সামনে এনে ফেলেচেন ?

মিঃ সোমের উপযুক্ত ছাত্র কি-না আমি, এবার তা প্রমাণ করার দিন এসেচে।

কিন্তু ব'সে-ব'সে মিঃ সোমের কাছে যতগুলি প্রণালী শিখেচি খুনের কিনারা করবার—সবগুলি পাশ্চাত্ত্য-বৈজ্ঞানিক-প্রণালী—স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভের প্রণালী। এখানে তার কোনটিই খাটবে না। আঙুলের ছাপ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা হয় নি—সাত-আটদিন পরে এখন জিনিসপত্রের গায়ে খুনীর আঙুলের ছাপ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে।

পায়ের দাগ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।

খুন হবার পর এত লোক গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে ঢুকেচে—তাদের সকলের পায়ের দাগের সঙ্গে খুনীর পায়ের দাগ একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েচে। গ্রামের কৌতূহলী লোকেরা আমায় কি বিপদেই ফেলেচে ! তারা জানে না, একজন শিক্ষানবিশ-ডিটেক্‌টিভের কি সর্ব্বনাশ তারা করেচে !

আর-একটা ব্যাপার, খুনটা টাটকা নয়, সাতদিন আগে খুন হয়ে লাশ পর্য্যন্ত দাহ শেষ—সব ফিনিশ্‌—গোলমাল চুকে গিয়েচে।

চোখে দেখি নি পর্য্যন্ত সেটা—অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন-টিহ্নগুলো দেখলেও তো যা হয় একটা ধারণা করা যেতো। এ একেবারে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া ! ভীষণ সমস্যা !

মিঃ সোমকে কি একখানা চিঠি লিখে তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাবো ? এমন অবস্থায় পড়লে তিনি নিজে কি করতেন জানাতে বলবো ?

কিন্তু তাও তো উচিত নয়!

মামা যখন বলেচেন, এটা যদি আমার পরীক্ষা হয়, তবে পরীক্ষার হলে যেমন ছেলেরা কাউকে কিছু জিগ্যেস ক'রে.নেয় না—আমায় তাই করতে হবে।

যদি এর কিনারা করতে পারি, তবে মামা বলেচেন, আমাকে এ-লাইনে রাখবেন—নয়তো মিঃ সোমের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবেন, নিয়ে হয়তো কোনো আর্টিস্টের কাছে রেখে ছবি আঁকতে শেখাবেন, বা, বড় দরজির কাছে রেখে শার্ট তৈরী, পাঞ্জাবী তৈরী শেখাবেন।

তবে শিক্ষানবিশের প্রথম পরীক্ষা-হিসেবে পরীক্ষা যে বেশ কঠিন, এতে কোন ভুল নেই।...

ব'সে-ব'সে আরও অনেক কথা ভাবলুম :

...হিসেবের খাতা যে লিখতো, সে নিশ্চয়ই জানতো ঘরে কত টাকা মজুত, বাইরে কত টাকা ছড়ানো। তার পক্ষে জিনিসটা জানা যত সহজ, অপরের পক্ষে তত সহজ নয়।

এ-বিষয়েও একটা গোলমাল আছে। গাঙ্গুলিমশায় টাকার গর্ব্ব মুখে ক'রে বেড়াতেন যেখানে-সেখানে। কত লোক শুনেচে—কত লোক হয়তো জানতো।

একটা কথা আমার হঠাৎ মনে এলো।

কিন্তু, কাকে কথাটা জিগ্যেস করি?

ননী ঘোষের বাড়ী গিয়ে ননী ঘোষের সঙ্গে দেখা করা একবার বিশেষ দরকার। তাকেই এ-কথা জিগ্যেস করতে হবে। সে নাও বলতে পারে অবিশ্যি—তবুও একবার জিগ্যেস করতে দোষ নেই।...

ননী ঘোষ বাড়ীতেই ছিল। আমায় সে চেনে না, একটু তাচ্ছিল্য ও ব্যস্ততার সঙ্গে বল্লে —কি দরকার বাবু? বাড়ী কোথায় আপনার?

আমি বল্লাম—তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে। ঠিক উত্তর দাও। মিথ্যে বল্লে বিপদে প'ড়ে যাবে।

ননীর মুখ শুকিয়ে গেল। দেখলাম সে ভয় পেয়েচে। বুঝেচে যে, আমি গাঙ্গুলিমশায়ের খুন-সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছি—নিশ্চয়ই পুলিসের সাদা পোশাক-পরা ডিটেক্‌টিভ।

সে এবার বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বল্লে—বাবু, যা জিগ্যেস করেন, করুন।

—গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা তুমি লিখতে?

ননী ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে—তা ইয়ে—আমিও লিখিচি দু' একদিন—আর ওই গণেশ ব'লে একটা স্কুলের ছেলে আছে, তাকে দিয়েও—

আমি ধমক দিয়ে বল্লাম—স্কুলের ছেলের কথা হচ্ছে না—তুমি লিখতে কিনা?

ননী ভয়ে-ভয়ে বল্লে—আজ্ঞে, তা লেখতাম।

—কতদিন লিখচো? মিথ্যে কথা বল্লেই ধরা প'ড়ে যাবে। ঠিক বলবে।

—প্রায়ই লেখতাম। দু'বছর ধ'রে লিখচি।

—আর কে লিখতো ?

—ওই যে স্কুলের ছেলে গণেশ—

—তার কথা ছেড়ে দাও, তার বয়েস কত ?

—পনের-ষোলো হবে।

—আর কে লিখতো ?

—আর, সরফরাজ তরফদার লিখতো, সে এখন—

—সরফরাজ তরফদারের বয়েস কত ? কি করে ?

—সে এখন মারা গিয়েছে।

—বাদ দাও সে-কথা। কতদিন মারা গিয়েচে ?

—দু'বছর হবে।

—এইবার একটা কথা জিগ্যেস করি—গাঙ্গুলিমশায়ের কত টাকা বাইরে ছিল জানো ?

—প্রায় দু'হাজার টাকা।

—মিথ্যে বোলো না। খাতা পুলিসের হাতে পড়েচে—মিথ্যে বল্লে মারা যাবে।

—না বাবু, মিথ্যে বলিনি। দু'হাজার হবে।

—ঘরে মজুত কত ছিল ?

—তা জানিনে।

—আবার বাজে কথা ? ঠিক বলো।

—বাবু, আমায় মেরেই ফেলুন আর যাই করুন—মজুত টাকা কত তা আমি কি ক'রে বলবো ? গাঙ্গুলিমশায় আমায় সে টাকা দেখায় নি তো ? খাতায় মজুত-তবিল লেখা থাকতো না।

—একটা আন্দাজ তো আছে ? আন্দাজ কি ছিল ব'লে তোমার মনে হয় ?

—আন্দাজ আর সাত-আট শো টাকা।

—কি ক'রে আন্দাজ করলে ?

—ওঁর মুখের কথা থেকে তাই আন্দাজ হোতো।

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর কতদিন আগে তুমি শেষ খাতা লিখেছিলে ?

—প্রায় দু'মাস আগে। দু'মাসের মধ্যে আমি খাতা লিখিনি—আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলচি। তাছাড়া খাতা বেরুলে হাতের লেখা দেখেই তা আপনি বুঝবেন।

—কোনো মোটা টাকা কি তাঁর মরণের আগে কোনো খাতকে শোধ করেছিল ব'লে তুমি মনে কর ?

—না বাবু! ঊর্দ্ধসংখ্যা ত্রিশ টাকার বেশি তিনি কাউকে ধার দিতেন না, সেটা খুব ভালো করেই জানি। মোটা টাকা মানে, দু'শো একশো টাকা কাউকে তিনি কখনো দেননি।

—এমন তো হতে পারে, পাঁচজন খাতকে ত্রিশ টাকা ক'রে শোধ দিয়ে গেল একদিনে ? দেড়শো টাকা হোলো ?

—তা হতে পারে বাবু, কিন্তু তা সম্ভব নয়। একদিনে পাঁচজন খাতকে টাকা শোধ দেবে না। আর-একটা কথা বাবু। চাষী-খাতক সব—ভাদ্রমাসে ধান হবার সময় নয়—এখন যে চাষী-প্রজারা টাকা শোধ দিয়ে যাবে, তা মনে হয় না। ওরা শোধ দেয় পৌষ মাসে—আবার ধার নেয় ধান-পাট বুনবার সময়ে চৈত্র-বৈশাখ মাসে। এ-সময় লেন-দেন বন্ধ থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কোনো কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না ননীর কাছে। তবুও আমার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে গেল না। ননী হয় সম্পূর্ণ নির্দোষ, নয়তো সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত। মিঃ সোম একটা কথা সব-সময়ে বলেন, "বাইরের চেহারা বা কথাবার্ত্তা দ্বারা কখনো মানুষের আসল রূপ জানবার চেষ্টা কোরো না—করলেই ঠকতে হবে। ভীষণ চেহারার লোকের মধ্যে অনেক সময় সাধুপুরুষ বাস করে—আবার অত্যন্ত সুশ্রী ভদ্রবেশী লোকের মধ্যে সমাজের কণ্টকস্বরূপ দানব-প্রকৃতির বদমাইশ বাস করে। এ আমি যে কতবার দেখেচি!"

ননীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর পেছনটা একবার ভালো ক'রে দেখবার জন্যে গেলাম।

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীতে একখানা মাত্র খড়ের ঘর। তার সঙ্গে লাগাও ছোট্ট রান্নাঘর। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে যাওয়া যায়। এসব আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখলাম।

তাকে বল্লাম—আপনার পিতার হত্যাকারীকে যদি খুঁজে বার করতে পারি, আপনি খুব খুশী হবেন?

সে প্রায় কেঁদে ফেলে বল্লে—খুশী কি, আপনাকে পাঁচশো টাকা দেবো।

—টাকা দিতে হবে না। আমায় সাহায্য করুন। আর-কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে।

—নিশ্চয় করবো। বলুন কি করতে হবে?

—আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন আপাততঃ। তারপর বলবো যখন যা করতে হবে। আচ্ছা, চলুন তো বাড়ীর পিছন দিকটা একবার দেখি?

—বড্ড জঙ্গল, যাবেন ওদিকে?

—জঙ্গল দেখলে তো আমাদের চলবে না—চলুন দেখি।

সত্যিই ঘন আগাছার জঙ্গল আর বড়-বড় বনগাছের ভিড় বাড়ীর পেছনেই। পাড়াগাঁয়ে যেমন হয়ে থাকে—বিশেষ ক'রে এই শ্যামপুরে জঙ্গল একটু বেশি। বড়-বড় ভিটে লোকশূন্য ও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বহুকাল থেকে। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে দেশ উৎসন্ন গিয়েছিল বিশ-ত্রিশ বছর আগে। এখন পাড়ায়-পাড়ায় নলকূপ হয়েচে জেলাবোর্ডের অনুগ্রহে, ম্যালেরিয়াও অনেক কমেচে—কিন্তু লোক আর ফিরে আসেনি!

জঙ্গলের মধ্যে বর্ষার দিনে মশার কামড় খেয়ে হাত-পা ফুলে উঠলো। আমি প্রত্যেক

স্থান তন্নতন্ন ক'রে দেখলাম। সাত-আটদিনের পূর্ব্বের ঘটনা, পায়ের চিহ্ন যদি কোথাও থাকতে পারে—তবে এখানেই তা থাকা সম্ভব।

কিন্তু জায়গাটা দেখে হতাশ হোতে হোলো।

জমিটা মুথো-ঘাসে ঢাকা—বর্ষায় সে ঘাস বেড়ে হাতখানেক লম্বা হয়েচে। তার ওপর পায়ের দাগ থাকা সম্ভবপর নয়।

আমার মনে হোলো, খুনী রাত্রে এসেছিল ঠিক এই পথে। সামনের পথ লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে—কখনই সে-পথে আসতে সাহস করে নি।

অনেকক্ষণ তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখেও সন্দেহজনক কোনো জিনিস চোখে পড়লো না—কেবল এক জায়গায় একটা সেওড়াগাছের ডাল ভাঙা অবস্থায় দেখে আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলেকে বল্লাম—এই ডালটা ভেঙে কে দাঁতন করেছিল, আপনি ?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে আশ্চর্য হয়ে বল্লে—না, আমি এ-জঙ্গলে দাঁতন-কাঠি ভাঙতে আসবো কেন ?

—তাই জিগ্যেস করচি।

—আপনি কি ক'রে জানলেন, ডাল ভেঙে কেউ দাঁতন করেচে ?

—ভাল করে চেয়ে দেখুন। একরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুচ্ড়ে ভেঙেচে ডালটা—তাছাড়া এতগুলো সেওড়া-ডালের মধ্যে একটিমাত্র ডাল ভাঙা। মানুষের হাতে ভাঙা বেশ বোঝা যাচ্চে। দাঁতনকাঠি সংগ্রহ ছাড়া অন্য কি উদ্দেশ্যে এভাবে একটা ডাল কেউ ভাঙতে পারে ?

—আপনার দেখবার চোখ তো অদ্ভুত ! আমার তো মশাই ও চোখেই পড়তো না !

—আচ্ছা, দেখে বলুন তো, কত দিন আগে এ-ডালটা ভাঙা হয়েচে ?

—অনেক দিন আগে।

—খুব বেশি দিন আগে না। মোচ্ড়ানো-অংশের গোড়াটা দেখে মনে হয়, ছ'সাতদিন আগে। এর চেয়েও নিখুঁতভাবে বলা যায়। ঐ অংশের সেলুলোজ্ অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলে ধরা পড়বে। আমি এই গাছের ভাঙা-ডালটা কেটে নিয়ে যাবো, একটা দা' আনুন তো দয়া ক'রে ?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের মুখ দেখে বুঝলাম সে বেশ একটু অবাক হয়েচে। ভাঙা-দাঁতন-কাঠি নিয়ে আমার এত মাথাব্যথার কারণ কি বুঝতে পারচে না।

সে পিছন ফিরে দা' আনতে যেতে উদ্যত হোলো—কিন্তু দু'চার পা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ঘাসের মধ্যে থেকে কি একটা জিনিস হাতে তুলে নিয়ে বল্লে—এটা কি ?

আমি তার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে দেখলাম, সেটা একটা কাঠের ছোট্ট গোলাকৃতি পাত। ভালো করে আলোয় নিয়ে এসে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, পাতের গায়ে একটা খোদাই কাজ। একটা ফুল, ফুলটার নীচে একটা শেয়ালের মত জানোয়ার।

শ্রীগোপাল বল্লে—এটা কি বলুন তো ?

আমি বুঝতে পারলাম না, কি জিনিস এটা হতে পারে তাও আন্দাজ করতে পারলাম না।

জিনিসটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। যাবার আগে সেওড়াগাছের ভাঙা-ডালের গোড়াটা কেটে নিয়ে এলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন থানায় গিয়ে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি আমায় সমাদর ক'রে বসালেন—আমায় বল্লেন, তাঁর দ্বারা যতদূর সাহায্য হওয়া সম্ভব, তা তিনি করবেন।

আমি বল্লাম—আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু তদন্ত করেচেন?

—তদন্ত করা শেষ করেচি। তবে, আসামী বার-করা ডিটেকটিভ ভিন্ন সম্ভব নয় এক্ষেত্রে!

—ননী ঘোষকে আমার সন্দেহ হয়।

—আমারও হয়, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ হবে না।

—ওকে চালান দিন্ না, ভয় খেয়ে যাক্! খুনের রাত্রে ও অনুপস্থিত ছিল। কোথায় ছিল তার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারে নি।

—আপনি ওকে চালান দিতে পরামর্শ দেন?

—দিলে ভালো হয়। এর মধ্যে আর-একটা উদ্দেশ্য আছে—বুঝেচেন নিশ্চয়ই।

দারোগাবাবু হেসে বল্লেন—এতদিন পুলিসের চাকরি ক'রে তা আর বুঝিনি মশায়? ওকে চালান দিলে সত্যিকার হত্যাকারী কিছু অসতর্ক হয়ে পড়বে এবং যদি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তবে বেরিয়ে আসবে—এই তো?

—ঠিক তাই—যদিও ননী ঘোষকে আমি বেশ সন্দেহ করি। লোকটা ধূর্ত্ত-প্রকৃতির।

—কাল আমি লোকজন নিয়ে গ্রামে গিয়ে ডেকে বলবো—ননীকে কালই চালান দেবো।

—চালান দেওয়ার সময় গ্রামের সব লোকের সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার।

দারোগাবাবু বল্লেন—দাঁড়ান, একটা কথা আছে। হিসেবের খাতার একখানা পাতা সে-দিন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে। পাতাখানা একবার দেখুন।

একখানা হাতচিঠে-কাগজের পাতা নিয়ে এসে দারোগাবাবু আমার হাতে দিলেন।

আমি হাতে নিয়ে বল্লাম—এ তো ননীর হাতের লেখা নয়!

—না, এ গণেশের হাতের লেখাও নয়।

—সরফরাজ তরফদারও নয়। কারণ, সে মারা যাওয়ার পরে এ লেখা। তারিখ দেখুন।

—তবে, খুনের অনেকদিন আগে এ লেখা হয়েচে—চার মাসেরও বেশী আগে।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিল হয়ে পড়চে মশায়। আমি একটা জিনিস আপনাকে তবে দেখাই।

দারোগাবাবুর হাতে কাঠের পাতটা দিয়ে বল্লাম—এ জিনিসটা দেখুন।

দারোগাবাবু সেটা হাতে নিয়ে বল্লেন—কি এটা ?

—কি জিনিসটা তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর পেছনের জঙ্গলে এটা কুড়িয়ে পেয়েচি। আর-একটা জিনিস দেখুন।

ব'লে সেওড়াডালের গোড়াটা তাঁর হাতে দিতেই তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—এ তো একটা শুকনো গাছের ডাল—এতে কি হবে ?

—ওতেই একটা মস্ত সন্ধান দিয়েচে। জানেন ? যে খুন করেচে, সে ভোর রাত পর্য্যন্ত গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী ছাড়ে নি। ভোরের দিকে রাত পোহাতে দেরি নেই দেখে সরে পড়েচে। যাবার সময় অভ্যাসের বশে সেওড়াডালের দাঁতন করেচে।

দারোগামশায় হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্লেন—আপনারা যে দেখচি মশায়, স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন ! এত কল্পনা ক'রে পুলিসের কাজ চলে ? কোথায় একটা দাঁতনকাঠির ভাঙা গোড়া !

—আমি জানি আমার গুরু মিঃ সোম একবার একটা ভাঙা দেশলাইয়ের কাঠিকে সূত্র ধ'রে আসামী পাকড়েছিলেন।

দারোগাবাবু হাসতে-হাসতে বল্লেন—বেশ, আপনিও ধরুন না দাঁতনকাঠি থেকে, আমার আপত্তি কি ?

—যদি আমি এটাকে এত প্রয়োজনীয় মনে না করতাম, তবে এটা এতদিন সঙ্গে নিয়ে বেড়াই ? যে দুটো জিনিস পেয়েচি, তাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে—এও আমার বিশ্বাস।

—কি রকম ?

—যে দাঁতনকাঠি ভেঙেচে—তার বা তাদের দলের লোকের এই কাঠের পাতখানাও !

—পাতখানা কি ?

—সে-কথা পরে বলবো। আর-একটা সন্ধান দিয়েচে এই দাঁতনকাঠিটা।

—কি ?

—সেটা এই : দোষীর বা দোষীর দলের কারো দাঁতন করবার অভ্যেস আছে। দাঁতন করবার যার প্রতিদিনের অভ্যেস নেই—সে এরকম দাঁতন নিপুণভাবে মোচড় দিয়ে ভাঙতে জানবে না। এবং সম্ভবত সে বাঙালী এবং পল্লীগ্রামবাসী। হিন্দুস্থানীরা দাঁতন করে, কিন্তু দেখবেন, তারা সেওড়াডালের দাঁতন করতে জানে না—তারা নিম, বা বাব্‌লাগাছের দাঁতন-কাঠি ব্যবহার করে সাধারণত। এ লোকটা বাঙালী এ-বিষয়ে ভুল নেই।

সেইদিনই আমি কলকাতায় মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা করলাম। সেওড়াডালের গোড়াটা আমি তাঁকে দেখাই নি—কাঠের পাতটা তাঁর হাতে দিয়ে বল্লাম—এটা কি ব'লে আপনি মনে করেন ?

* * *

তিনি জিনিসটা দেখে বল্লেন—এ তুমি কোথায় পেলে ?

—সে-কথা আপনাকে এখন বলবো না, ক্ষমা করবেন।

—এটা আসামে মিস্‌মি-জাতির মধ্যে প্রচলিত রক্ষাকবচ। দেখবে ? আমার কাছে আছে।

মিঃ সোমের বাড়ীতে নানা দেশের অদ্ভুত জিনিসের একটা প্রাইভেট মিউজিয়াম-মত আছে। তিনি তাঁর সংগৃহীত দ্রব্যগুলির মধ্যে থেকে সেই রকম একটা কাঠের পাত এনে আমার হাতে দিলেন।

আমি বল্লাম—আপনারটা একটু বড়। কিন্তু চিহ্ন একই—ফুল আর শেয়াল।

—ওটা ফুল নয়, নক্ষত্র—দেবতার প্রতীক, আর নীচে উপাসনাকারী মানুষের প্রতীক—পশু!

—কোন দেশের জিনিস বল্লেন ?

—নাগা পর্ব্বতের নানা স্থানে এ-কবচ প্রচলিত—বিশেষ ক'রে ডিব্রু-সদিয়া অঞ্চলে।

আমি তাঁর হাত থেকে আমার পাতটা নিয়ে তারপর বল্লাম—এই সেওড়াডালটা ক'দিনের ভাঙা ব'লে মনে হয় ?

তিনি বল্লেন—ভালো ক'রে দেখে দেবো ? আচ্ছা, বোসো।

সেটা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটু পরে ফিরে এসে বল্লেন—আট ন'দিন আগে ভাঙা।

আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম নিজের বাসায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমার মনে একটা বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠচে। গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করতে এবং খুনের পরে তাঁর ঘরের মধ্যে খুঁড়ে দেখতে খুনীর লেগেছিল সারারাত। যুক্তির দিক থেকে হয়তো এর অনেক দোষ বার করা যাবে—কিন্তু আমি অনেক সময় অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে অগ্রসর হয়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছি।

কিন্তু ননী ঘোষকে আমি এখনও রেহাই দিই নি। শ্যামপুরে ফিরেই আমি আবার তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমায় দেখে ননীর মুখ শুকিয়ে গেল—তাও আমার চোখ এড়ালো না।

বল্লাম—শোনো ননী, আবার এলাম তোমায় জ্বালাতে—কতকগুলো কথা জিগ্যেস করবো।

—আজ্ঞে, বলুন!

—গাঙ্গুলিমশায় যেদিন খুন হন, সে-রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে ?

ননীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বল্লে, আজ্ঞে···

—বলো কোথায় ছিলে। বাড়ী ছিলে না—

—আজ্ঞে না। সামটায় শ্বশুরবাড়ী যেতে-যেতে সেদিন দেবনাথপুরের হাটতলায় রাত কাটাই।

—কেউ দেখেচে তোমায়?

ননী বল্লে—আজ্ঞে, তা যদিও দেখে নি—

—কেন দেখে নি?

—রাত হয়ে গেল দেখে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন কেউ সেখানে ছিল না।

—খেয়াঘাট পার হওনি দেবনাথপুরে?

—হ্যাঁ বাবু। অনেক লোক একসঙ্গে পার হয়েছিল। আমায় তো পাটনি চিনে রাখে নি!

—বাড়ী এসেছিলে কবে?

—শনিবার দুপুরবেলা।

—গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েচেন কার মুখে শুনলে?

—আজ্ঞে, গাঁয়ে ঢুকেই মাঠে কাপালিদের মুখে শুনি।

—কার মুখে শুনেছিলে তার নাম বলো।

—আজ্ঞে, ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধ হয় হীরু কাপালি—

—তার কাছে গিয়ে প্রমাণ ক'রে দিতে পারবে?

ননী ইতস্তত ক'রে বল্লে—আজ্ঞে, ঠিক তো মনে নেই; যদি হীরু না হয়?

ননীর কথায় আমার সন্দেহ আরো বেশী হোলো। সে-রাত্রে ও ঘরে ছিল না, অথচ কোথায় ছিল তা পরিষ্কার প্রমাণও দিতে পারছে না। গোপনে সন্ধান নিয়ে আরও জানলাম, ননী সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিল। আজ দু'দিন হোলো এসেচে। ননীকে জিগ্যেস ক'রে কোনো লাভ নেই, ও সত্যি কথা বলবে না। একটা কিছু কাণ্ড ও ঘটাচ্চে নাকি তলে-তলে? কিছু বোঝা যাচ্চে না।

দু'দিন পরে শ্রীগোপাল এসে আমায় খবর দিলে, গ্রামের মহীন্ সেকরাকে সে ডেকে এনেচে—আমার সঙ্গে দেখা করবে, বিশেষ কাজ আছে।

মহীন্ সেকরার বয়স প্রায় পঞ্চাশের ওপর। নিতান্ত ভালোমানুষ গ্রাম্য-সেকরা, ঘোরপেঁচ জানে না বলেই মনে হোলো।

শ্রীগোপালকে বল্লাম—একে কেন এনেচ?

—এ কি বলচে শুনুন।

—কি মহীন্?

—বাবু, ননী ঘোষ আমার কাছে এগারো ভরি সোনার তাবিজ আর হার তৈরী ক'রে নিয়েচে—আজ তিন-চারদিন আগে।

—দাম কত?

—সাতাশ টাকা ক'রে ভরি, হিসেব করুন।

—টাকা নগদ দিয়েছিল ?

—হ্যাঁ বাবু।

—সে টাকা তোমার কাছে আছে ? নোট, না নগদ ?

—নগদ। টাকা নেই বাবু, তাই নিয়ে মহাজনের ঘর থেকে সোনা কিনে এনে গহনা গড়ি !

—দু' একটা টাকাও নেই ?

—না বাবু।

—তোমার মহাজনের কাছে আছে ?

—বাবু, রাণাঘাটের শীতল পোদ্দারের দোকানে কত সোনা কেনা-বেচা হচ্ছে দিনে। আমার সে টাকা কি তারা বসিয়ে রেখেচে ?

—শীতল পোদ্দার নাম ? আমার সঙ্গে তুমি চলো রাণাঘাটে আজই।

বেলা তিনটের ট্রেনে মহীন্ সেকরাকে নিয়ে রাণাঘাটে শীতল পোদ্দারের দোকানে হাজির হোলাম। সঙ্গে মহীন্‌কে দেখে বুড়ো পোদ্দারমশায় ভাবলে, বড় খরিদ্দার একজন এনেচে মহীন্। তাদের আদর-অভ্যর্থনাকে উপেক্ষা ক'রে আমি আসল কাজের কথা পাড়লাম, একটু কড়া—রুক্ষস্বরে।

বল্লাম—সেদিন এই মহীন্ আপনাদের ঘরে সোনা কিনেছিল এগারো ভরি ?

পোদ্দারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো ভয়ে—ভাবলে, এ নিশ্চয়ই পুলিসের হাঙ্গামা ! সে ভয়ে-ভয়ে বল্লে—হ্যাঁ বাবু, কিনেছিল।

—টাকা নগদ দেয় ?

—তা দিয়েছিল।

—সে টাকা আছে ?

—না বাবু, টাকা কখনো থাকে ? আমাদের বড় কারবার, কোথাকার টাকা কোথায় গিয়েচে !

আমিও ওকে ভয় দেখানোর জন্যে কড়া সুরে বল্লাম—ঠিক কথা বলো। টাকা যদি থাকে আনিয়ে দাও—তোমার ভয় নেই। চুরির ব্যাপারে নয়, মহীনের কোনো দোষ নেই। তোমাদের কোনো পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে না—কেবল কোর্টে সাক্ষী দিতে হতে পারে। টাকা বার করো।

মহীন্‌ও বল্লে—পোদ্দারমশায়, আমাদের কোনো ভয় নেই, বাবু বলেচেন। টাকা যদি থাকে, দেখান বাবুকে।

পোদ্দার বল্লে—কিন্তু বাবু, একটা কথা। টাকা তো সব সমান, টাকার গায়ে কি নাম লেখা আছে ?

—সে-কথায় তোমার দরকার নেই। নাম লেখা থাক্ না থাক্—টাকা তুমি বার করো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শীতল পোদ্দার টাকা বার ক'রে নিয়ে এলো একটা থলির মধ্যে থেকে। বল্লে—সেদিনকার তহবিল আলাদা করা ছিল। সোনা বিক্রির তহবিল আমাদের আলাদা থাকে, কারণ, এই নিয়ে মহাজনের সোনা কিনতে যেতে হয়। টাকা হাতে নিয়ে দেখবার আগেই শীতল একটা কথা বল্লে—যা আমার কাছে আশ্চর্য ব'লে মনে হোলো। সে বল্লে—বাবু, এগুলো পুরোনো টাকা, পোঁতা-টোতা ছিল ব'লে মনে হয়, এ চুরির টাকা নয়।

আমি প্রায় চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। মহীন্ সেকরার মুখ দেখি বিবর্ণ হয়ে উঠেচে।

আমি বল্লাম—তুমি কি ক'রে জানলে এ পুরোনো টাকা?

—দেখুন আপনিও হাতে নিয়ে! পুরোনো কলঙ্ক-ধরা রূপো দেখলে আমাদের চোখে কি চিনতে বাকি থাকে বাবু! এই নিয়ে কারবার করচি যখন!

—কতদিনের পুরোনো টাকা এ?

—বিশ-পঁচিশ বছরের।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, বিশ বৎসরের পরের কোনো সালের অঙ্ক টাকার গায়ে লেখা নেই। বল্লাম—মাটিতে পোঁতা টাকা ব'লে ঠিক মনে হচ্চে?

—নিশ্চয়ই বাবু। পেতলের হাঁড়িতে পোঁতা ছিল। পেতলের কলঙ্ক লেগেচে টাকার গায়ে।

আচ্ছা, তুমি এ-টাকা আলাদা ক'রে রেখে দাও। আমি পুলিস নই, কিন্তু পুলিস শীগ্‌গির এসে এ-টাকা চাইবে, মনে থাকে যেন।

শীতল পোদ্দার আমার সামনে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বল্লে—দোহাই বাবু, দেখবেন, যেন আমি এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি। কোনো দোষে দূষী নই বাবু, মহীন্ আমার পুরোনো খাতক আর খদ্দের, ও কোথা থেকে টাকা এনেচে তা আমি কেমন ক'রে জানবো বাবু, বলুন?

মহীন্‌কে নিয়ে দোকানের বাইরে চলে এলাম। দেখি, ও ভয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠেচে। বল্লাম—কি মহীন্ তোমার ভয় কি? তুমি গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করো নি তো?

মহীন্ বল্লে—খুন? গাঙ্গুলিমশায়কে? কি যে বলেন বাবু!

দেখলাম ওর সর্ব্বশরীর যেন থরথর ক'রে কাঁপচে।

কেন, ওর এত ভয় হোলো কিসের জন্যে?

আমরা ডিটেক্‌টিভ, আসামী ধরতে বেরিয়ে কাউকে সাধু ব'লে ভাবা আমাদের স্বভাব নয়। মিঃ সোম আমার শিক্ষাগুরু—তাঁর একটি মূল্যবান্ উপদেশ হচ্ছে, যে-বাড়ীতে খুন হয়েচে বা চুরি হয়েচে—সে-বাড়ীর প্রত্যেককেই ভাববে খুনী ও চোর। প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখবে, তবে খুনের কিনারা করতে পারবে—নতুবা পদে-পদে ঠকতে হবে।

ননী ঘোষ তো আছেই এর মধ্যে, এ সন্দেহ আমার এখন বদ্ধমূল হোলো। বিশেষ

ক'রে টাকা দেখবার পরে আদৌ সে-সন্দেহ না থাকবারই কথা।

কিন্তু এখন আবার একটা নতুন সন্দেহ এসে উপস্থিত হোলো।

এই মহীন্ সেকরার সঙ্গে খুনের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

কথাটা ট্রেনে ব'সে ভাবলাম। মহীন্‌ও কামরার একপাশে ব'সে আছে। সে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে নি—জানলা দিয়ে পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে ভীত চোখে বাইরের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মহীনের যোগাযোগে ননী ঘোষ খুন করে নি তো? দুজনে মিলে হয়-তো এ-কাজ করেচে! কিংবা এমনও কি হতে পারে না যে, মহীন্‌ই খুন করেচে, ননী ঘোষ নির্দ্দোষী?

তবে একটা কথা, ননী ঘোষের হাতেই খাতাপত্র—কত টাকা আসচে-যাচ্ছে, ননীই তো জানতো, মহীন্ সেকরা সে খবর কি ক'রে রাখবে!...

তখুনি একটা কথা মনে পড়লো। গাঙ্গুলিমশায় ছিলেন সরলপ্রাণ লোক, যেখানে-সেখানে নিজের টাকা-কড়ির গল্প ক'রে বেড়াতেন, সবাই জানে।

মহীন্‌কে বল্লাম—তোমার দোকানে অনেকে বেড়াতে যায়, না?

মহীন্ যেন চমকে উঠে বল্লে—হ্যাঁ বাবু।

—গাঙ্গুলিমশায়ও যেতেন?

—তা যেতেন বইকি বাবু।

—গিয়ে গল্প-টল্প করতেন?

—তা করতেন বইকি বাবু!

—টাকাকড়ির কথা কখনো বলতেন তোমার দোকানে ব'সে?

—সেটা তো তাঁর স্বভাব ছিল—সে-কথাও বলতেন মাঝে মাঝে।

—ননী ঘোষের সঙ্গে তোমার খুব মাখামাখি ভাব ছিল?

—আমার দোকানে আসতো গহনা গড়াতে। আমার খদ্দের। এ থেকে যা আলাপ—তাছাড়া সে আমার গাঁয়ের লোক। খুব মাখামাখি ভাব আর এমন কি থাকবে? যেমন থাকে।

—তুমি আর ননী দু'জনে মিলে গাঙ্গুলিমশায়কে খুন ক'রে টাকা ভাগাভাগি ক'রে নিয়েচো—কেমন কি না?

এই প্রশ্ন ক'রেই আমি ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম। ভয়ের রেখা ফুটে উঠলো ওর মুখে! ও আমার মুখের দিকে বড়-বড় চোখ ক'রে বল্লে—কি যে বলেন বাবু! আমি ব্রহ্মহত্যার পাতক হবো টাকার জন্যে! দোহাই ধর্ম্ম, আপনাকে সত্যি কথা বলচি বাবু!

কিছু বুঝতে পারা গেল না। কেউ-কেউ থাকে, নিপুণ ধরণের স্বাভাবিক অভিনেতা। তাদের কথাবার্ত্তা, হাবভাবে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়—এ আমি কতবার দেখেচি।

শ্যামপুরে ফিরে আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দেখা করলাম।

শ্রীগোপাল বল্লে—থানা থেকে দারোগাবাবু আর ইন্‌স্পেক্টরবাবু এসেছিলেন। আপনাকে খুঁজছিলেন।

—তুমি গহনার কথা কিছু বল্লে নাকি তাঁদের ?

—না। আমি কেন সে-কথা বলতে যাবো ? আমাকে কোন কথা তো ব'লে দেন নি ?

—বেশ করেচো।

—ওঁরা আপনার সেই কাঠের তক্তামত-জিনিসটা দেখতে চাইছিলেন।

—কেন ?

—সে-কথা কিছু বলেন নি।

—তাঁরা ও দেখে কিছু করতে পারেন, আমি তাঁদের দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাঁরা পারবেন ব'লে আমার ধারণা নেই।

বিকেলের দিকে আমি নির্জ্জনে ব'সে অনেকক্ষণ ভাবলাম।…আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিস্‌মি-জাতির কাষ্ঠনির্ম্মিত রক্ষাকবচের সঙ্গে এই খুনীর যোগ আছে। সেই রক্ষাকবচ প্রাপ্তি এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে, আমার কাছে সেটা রীতিমত সমস্যা হয়ে উঠচে ক্রমশ।

ননী ঘোষের সঙ্গেও এর সম্পর্ক এমন নিবিড় হয়ে উঠেচে, যেটা আর কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। শীতল পোদ্দারের দোকানের টাকার কথা যদি পুলিসকে বলি, তবে তারা এখুনি ননীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সে-দিক থেকে মস্ত বাধা হচ্ছে, সে-টাকা যে ননী ঘোষ দিয়েছিল মহীন্‌কে, তার প্রমাণ কি ?

মহীনের কথার উপর নির্ভর করা ছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রমাণ নেই।

শীতল পোদ্দারও তো ভুল করতে পারে।

হয়তো এমনও হোতে পারে, মহীন্ সেকরাই আসল খুনী। তার দোকানে ব'সে গাঙ্গুলি-মশায় কখনো টাকার গল্প ক'রে থাকবেন—তারপর সুবিধে পেয়ে মহীন্ গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করেছে, পোঁতা-টাকা পোদ্দারের দোকানে চালিয়ে এখন ননীর ওপর দোষ চাপাচ্ছে…

ননী ঘোষের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা করলাম।

ওকে দেখেই কিন্তু আমার মনে কেমন সন্দেহ হোলো, লোকটার মধ্যে কোথায় কি গলদ আছে, ও খুব সাচ্চা লোক নয়। আমাকে দেখে প্রতিবারই ও কেমন হয়ে যায় !

লোকটা ধূর্ত্তও বটে। ওর চোখ-মুখের ভাবেও সেটা বোঝা যায় বেশ।

ওকে জিগ্যেস করলাম—তুমি মহীনের দোকান থেকে তাবিজ গড়িয়েছ সম্প্রতি ?

ননী বিবর্ণমুখে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ বাবু—

—অত টাকা হঠাৎ পেলে কোথায় ?

—হঠাৎ কেন বাবু ! আমরা তিনপুরুষে ঘি-মাখনের ব্যবসা করি। টাকা হাতে ছিল, তা ভাবলাম, নগদ টাকা পাড়াগাঁয়ে রাখা—

—টাকা নগদ দিয়েছিলেন, না, নোটে ?

—নগদ।

—সব টাকা তোমার ঘি-মাখন বিক্রির টাকা?

—হ্যাঁ বাবু।

ননীকে ছেড়ে দিয়ে গ্রামের মধ্যে বেড়াতে বেরুলাম। ননী অত্যন্ত ধূর্ত্ত লোক, ওর কাছ থেকে কথা বার করা চলবে না দেখা যাচ্চে।

বেড়াতে-বেড়াতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর কাছে গিয়ে পড়েছি, এমন সময় দেখি কে একজন ভদ্রলোক গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইচেন।

আমাকে দেখে শ্রীগোপাল বল্লে—এই যে! আসুন, চা খাবেন।

—না, এখন খাবো না। ব্যস্ত আছি।

—আসুন, আলাপ করিয়ে দিই···ইনি সুশীল রায়, আর ইনি জানকীনাথ বড়ুয়া, আমাদের পাড়ার জামাই—আমার বাড়ীর পাশের ওই বুড়ি-দিদিমার জামাই। উনিও একটু—একটু—মানে—ওঁকে সব বলেছিলাম।

আমি বুঝলাম, জানকী বড়ুয়া আর যাই হোক্, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর-একজন প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ। মনটা হঠাৎ যেন বিরূপ হয়ে উঠলো শ্রীগোপালের প্রতি। সে আমার ওপর এরই মধ্যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে এবং কোথা থেকে আর-একজন গোয়েন্দা আমদানি ক'রে তাকে সব ঘটনা খুলে বলছিল, আমাকে আসতে দেখে থেমে গিয়েচে।

আমি জানকীবাবুকে বল্লাম—আপনি কি বুঝচেন?

—কি সম্বন্ধে?

—খুন সম্বন্ধে।

—কিছুই না। তবে আমার মনে হয়—

—কি, বলুন?

—এখানকার লোকই খুন করেচে।

—আপনি বলছেন—এই গাঁয়ের লোক?

—এই গাঁয়ের জানাশোনা লোক ভিন্ন এ-কাজ হয় নি। ননী ঘোষের সম্বন্ধে আপনার মনে কি হয়?

আমি বিস্মিতভাবে জানকীবাবুর মুখের দিকে চাইলাম! তাহোলে শ্রীগোপাল দেখচি ননী ঘোষের কথাও এই ভদ্রলোকের কাছে বলেচে! ভারি রাগ হোলো শ্রীগোপালের ব্যবহারে।

আমার ওপর তাহোলে আদৌ আস্থা নেই ওর দেখচি।

একবার মনে হোলো, জানকীবাবুর কথার কোনো উত্তর আমি দেবো না। অবশেষে ভদ্রতা-বোধেরই জয় হোলো। বল্লাম—ননী ঘোষের কথা আপনাকে কে বল্লে?

—কেন, শ্রীগোপালের মুখে সব শুনেচি।

—আপনি তাকে সন্দেহ করেন?

—খুব করি! তার সঙ্গে এখুনি দেখা করা দরকার। তার হাতেই যখন টাকার হিসেব লেখা হোতো···

—দেখুন না, ভালোই তো।

হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বল্লেন—আচ্ছা, আপনি ঘটনাস্থলে ভালো ক'রে খুঁজেছিলেন ?

—খুঁজেছিলাম বই কি।

—কিছু পেয়েছিলেন ?

আমি জানকীবাবুর এ-প্রশ্নে দস্তুরমত বিস্মিত হোলাম। যদি তিনি নিজেও একজন গোয়েন্দা হন, তবে তাঁর পক্ষে অন্য-একজন সমব্যবসায়ী লোককে এ-কথা জিগ্যেস করা শোভনতা ও সৌজন্যের বিরুদ্ধে, বিশেষত যখন আগে-থেকেই এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত আছি।

আমি নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলাম—না, এমন বিশেষ কিছু না।

জানকীবাবু পুনরায় জিগ্যেস করলেন—তাহোলে কিছুই পান নি ?

—কিছুই না তেমন।

কাঠের পাতের কথাটা জানকীবাবুকে বলবার ইচ্ছে হোলো না। জানকীবাবুকে ব'লে কি হবে ? তিনি কি বুঝতে পারবেন জিনিসটা আসলে কি ? মিঃ সোমের সাহায্য ব্যতীত কি আমারই বোঝার কোনো সাধ্য ছিল ? মিঃ সোমের মত পণ্ডিত ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা খুব বেশী নেই এদেশে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

জানকীবাবু চলে গেলে আমি শ্রীগোপালকে বল্লাম—তুমি এঁকে কি বলেছিলে ?

—কি বলবো !

—ননী ঘোষের কথা বলেচো ?

—হ্যাঁ, তা বলেছি।

আমি ওকে তিরস্কারের সুরে বল্লাম—আমাকে তোমার বিশ্বাস না হোতে পারে—তা ব'লে আমার আবিষ্কৃত ঘটনা-সূত্রগুলো তোমার অন্য ডিটেক্‌টিভকে দেওয়ার কি অধিকার আছে ?

শ্রীগোপাল চুপ ক'রে রইলো। ওর নির্ব্বুদ্ধিতায় ও অবিবেচকতায় আমি যারপরনাই বিরক্তি বোধ করলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি মহীন্ সেকরার সঙ্গে আবার দেখা করতে গেলাম। মহীন্ আমায় দেখে ভয়ে-ভয়ে একটা টুল পেতে দিলে বসবার জন্যে।

আমি বল্লাম—মহীন্, একটা সত্যি কথা বলবে ?

—কি, বলুন !

—তোমার সঙ্গে ননীর ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল কিছুকাল আগে ?

মহীন্ আমার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে বল্লে—ননী বলেচে বুঝি? সব মিথ্যে কথা ওর বাবু, সব মিথ্যে।

আমি কড়াসুড়ে বল্লাম—ঝগড়া হয়েছিল তাহোলে? সত্যি বলো!

মহীন্ চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে-আস্তে বল্লে—হয়েছিল বাবু, কিন্তু আমার তাতে কোনো দোষ…

—আমি সে-কথা বলি নি—ঝগড়া হয়েছিল কিনা জিগ্যেস করচি।

—হ্যাঁ বাবু।

—কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, বলো এবার!

—সোনার দর নিয়ে বাবু।

—আচ্ছা, তুমি শ্রীগোপালের কাছে ননী ঘোষের তাবিজ গড়ানোর কথা এইজন্যে বলেছিলে—কেমন, ঠিক কিনা?

—হ্যাঁ বাবু।

—তুমি তখন ভেবেছিলে যে, ননী ঘোষই খুন করেচে?

—তা—না—

—ঠিক বলো।

—না বাবু।

—তাহোলে তুমিও যে দোষী হবে আইনত; তাই ভাবচো বুঝি?

—মহীন্ সেকরা ভয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো, বল্লে—বাবু, তা—তা—

—তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্যে থানায় খবর দেবো!

মহীন্ আমার পা জড়িয়ে ধরে বল্লে—দোহাই বাবু, আমার সব কথা শুনুন আগে। আপনি দেশের লোক—আমার সর্ব্বনাশ করবেন না বাবু—কাচ্চা-বাচ্চা মারা যাবে।

—কি, বলো!

—তখন আমিও লুটের টাকা ব'লে সন্দেহ করি নি। কি ক'রে করবো! বলুন বাবু, তা কি সম্ভব?

—তবে, কখন সন্দেহ করলে?

—বাবু, শ্রীগোপালই আমায় বল্লে, আপনি ননী ঘোষকে সন্দেহ করেন। তখন আমি ভাবলাম, গহনার কথাটা প্রমাণ না করলে আমি মারা যাবো এর পরে। তাই বলেছিলাম।

শ্রীগোপালের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখচি নানা দিক থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। যদি ওর বাবার খুনের আসামী ধরা না পড়ে, তবে সেটা ওর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যেই ঘটবে।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাটা শ্রীগোপালকে বলবার জন্যে তার বাড়ীর দিকে চল্লাম।

রাস্তাটা বাড়ীর পেছনের দিকে—শীগ্‌গির হবে ব'লে 'শর্ট-কাট' করতে গেলাম বনের মধ্যে দিয়ে। সেই বন—যেখানে আমি সেদিন মিস্‌মি-জাতির কবচ ও দাঁতনকাঠির গোড়া সংগ্রহ করেছিলাম।

অন্ধকারেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা সাদা-মত কি কিছুদূরে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলাম। জিনিসটা নড়চে-চড়চে আবার। অন্ধকারের জন্যে ভয় যেন বুকের রক্ত হিম ক'রে দিলে।

এই বনের পরেই গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী—গাঙ্গুলিমশায়ের ভূত নাকি রে বাবা!

হঠাৎ একটা টর্চ জ্বলে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে কে কড়া-গলায় হাঁকলে, কে ওখানে?

—আমিও তো তাই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম—কে আপনি?

—ও

আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো একটা মনুষ্যমূর্ত্তি এবং টর্চের আলো-আঁধার কেটে গেলে দেখলাম, সে জানকীবাবু ডিটেক্‌টিভ!

বিস্ময়ের সুরে বল্লাম—আপনি কি করছিলেন অন্ধকারে বনের মধ্যে?

জানকীবাবু অপ্রতিভ সুরে বল্লেন—আমি এই—এই—

—ও, বুঝেচি। কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এখানে।

—না না, কিছু না।

তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলি এগিয়ে। ভদ্রলোক শুধু অপ্রতিভ নয়, যেন হঠাৎ ভীত ও ত্রস্তও হয়ে পড়েচেন। কি মুশকিল! এসব পাড়াগাঁয়ে শহরের মত বাথরুমের বন্দোবস্ত না থাকাতে সত্যিই অনেকের বড়ই অসুবিধে হয়।

জানকী বড়ুয়া প্রাইভেট-ডিটেক্‌টিভ্‌কে এই অন্ধকারে গাঙ্গুলিমশায়ের ভূত ব'লে মনে হয়েছিল ভেবে আমার খুব হাসি পেলো। ভদ্রলোককে কি বিপন্নই ক'রে তুলেছিলাম!

সেদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীগোপালের বাড়ী ব'সে চা খাচ্ছি, এমন সময় জানকীবাবু আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁকেও চা দেওয়া হোলো। জানকীবাবু দেখলাম বেশ মজলিসি লোক, চা খেতে-খেতে তিনি নানা মজার-মজার গল্প বলতে লাগলেন। আমায় বল্লেন—আমি তো মশায় গাঁয়ের জামাই, আজ চোদ্দ বছর বিয়ে করেচি, কাকে না চিনি বলুন গ্রামে, সকলেই আমার আত্মীয়।

আমি বল্লাম—আপনি এখানে প্রায়ই যাতায়াত করেন? তাহোলে তো হবেই আত্মীয়তা!

—আমার স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ বছর তিনেক। তারপর আমি প্রায়ই আসি না। তবে শাশুড়ীঠাকরুণ বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, আমার আসার জন্যে চিঠি লেখেন, না এসে পারিনে।

—ছেলেপুলে কি আপনার ?

—একটি ছেলে হয়েছিল, মারা গিয়েচে। এখন আর কিছুই নেই।

—ও।

হঠাৎ জানকীবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে আমায় জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা, গাঙ্গুলি-মশায়ের খুন সম্বন্ধে পুলিস কোনো সূত্র পেয়েছে ব'লে আপনার মনে হয় ?

—কেন বলুন তো ?

—আমার বিশেষ কৌতূহল এ-সম্বন্ধে। গাঙ্গুলিমশায় আমার শ্বশুরের সমান ছিলেন। বড় স্নেহ করতেন আমায়। তাঁর খুনের ব্যাপারের একটা কিনারা না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। আমার মনে কোনো অহঙ্কার নেই মশায়। আমি এ খুনের কিনারা করি, বা আপনি করুন, বা পুলিসই করুক, আমার পক্ষে সব সমান। যার দ্বারা হোক কাজ হলেই হোলো। নাম আমি চাইনে।

—নাম কে চায় বলুন ? আমিও নয়।

—তবে আসুন-না আমরা মিলে-মিশে কাজ করি ? পুলিসকেও বলুন।

—পুলিস তো খুব রাজী, তারা তো এতে খুব খুশী হবে।

—বেশ, তবে কাল থেকে—

—আমার কোন আপত্তি নেই।

—আচ্ছা, প্রথম কথা—আপনি কোনো কিছু সূত্র পেয়েচেন কিনা আমায় বলুন। আমি যা পেয়েচি আপনাকে বলি।

- আমি এখানে এখন বলবো না। পরে আপনাকে জানাবো।

—ননী ঘোষের ব্যাপারটা আপনি কি মনে করেন ?

—সেদিন তো আপনাকে বলেচি। ওকে আমার সন্দেহ হয়। আপনি ওকে সন্দেহ করেন ?

—নিশ্চয় করি।

—আপনি ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পেয়েচেন ?

—সেই গহনার ব্যাপারটাই তো ওর বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

—তা আমারও মনে হয়েচে, কিন্তু ওর মধ্যে গোলমালও যথেষ্ট।

—মহীন্ সেকরাকে নিয়ে তো ? আমি মহীন্‌কে সন্দেহ করিনে।

—কেন বলুন তো ?

—মহীন্ তো খাতা লিখতো না গাঙ্গুলিমশায়ের। ভেবে দেখুন কথাটা।

—সে-সব আমিও ভেবেচি। তাতেও জিনিসটা পরিষ্কার হয় না।

—চলুন না, দু'জনে একবার ননীর কাছে যাই।

—তার কাছে আমি গিয়েছিলাম। তাতে কোন ফল হবে না।

—হিসাবের খাতাখানা কোথায় ?

—পুলিসের জিম্মায়।

—আপনি ভালো ক'রে দেখেচেন খাতাখানা?

—দেখেচি বলেই তো ননীকে জড়াতে পারিনে ভালো ক'রে।

—কেন?

—শুধু ননীর হাতের লেখা নয়, আরও অনেকের হাতের লেখা তাতে আছে।

—কার কার?

জানকীবাবু ব্যগ্রভাবে এ-প্রশ্নটা ক'রে আমার মুখের দিকে যেন উৎকণ্ঠিত-আগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলেন। আমি মৃত-মুসলমান ভদ্রলোকটির ও স্কুলের ছাত্রটির কথা তাঁকে বল্লাম। জানকীবাবু বল্লেন—ও, এই! সে তো আমি জানি—শ্রীগোপালের মুখে শুনেচি।

—যা শুনেচেন, তার বেশি আমারও কিছু বলবার নেই।

পরদিন সকালে ননী ঘোষ এসে আমার কাছে হাজির হোলো। বল্লে—বাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি?

—জানকীবাবু এ গাঁয়ের জামাই ব'লে খাতির করি। কিন্তু উনি কাল রাতে আমায় যে-রকম গালমন্দ দিয়ে এসেচেন, তাতে আমি বড় দুঃখিত। বাবু, যদি দোষ ক'রে থাকি, পুলিসে দিন—গালমন্দ কেন?

—তুমি বড় চালাক লোক ননী। আমি সব বুঝি। পুলিসে দেবার হোলে, তোমাকে একদিনও হাজতের বাইরে রাখবো ভেবেচো?

—বাবুও কি আমাকে এখনও সন্দেহ করেন?

লোকটা সাংঘাতিক ধূর্ত্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ-খুন যে-ই করুক, ননী তার মধ্যে নিশ্চয়ই জড়িত। অথচ ও ভেবেচে যে, আমার চোখে ধুলো দেবে!

বল্লাম—সে-কথা এখন নয়। এক মাসের মধ্যেই জানতে পারবে।

—বাবু, আপনি আমাকে যতই সন্দেহ করুন, ধর্ম্ম যতদিন মাথার উপর আছে—

ধূর্ত্ত লোকেরাই ধর্ম্মের দোহাই পাড়ে বেশি! লোকটার উপর সন্দেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

সারাদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

সন্ধ্যার পরে আহারাদি সেরে অনেকক্ষণ বই পড়লাম। তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে নিদ্রা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেন জানি না—অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম হোলো না এবং বোধহয় সেই জন্যই সে রাত্রে আমার প্রাণ বেঁচে গেল।

ব্যাপারটা কি হোলো খুলে বলি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেও এক কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকার রাত্রি। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি পড়চে আবার থেমে যাচ্চে, অথচ গুমট কাটে নি। আমার ঘরটার উত্তরদিকে একটা মাত্র কাঠের গরাদে দেওয়া জানলা, জানলার সামনাসামনি দরজা। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে জানলা নেই—একটা ঘুল-ঘুলি আছে মাত্র।

রাত প্রায় একটা কি তার বেশি। আমার ঘুম আসে নি, তবে সামান্য একটু তন্দ্রার ভাব এসেচে।

হঠাৎ বাইরে ঘুলঘুলির ঠিক নীচেই যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল! গরু কি ছাগলের পায়ের শব্দ হওয়া বিচিত্র নয়—বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না।

তারপর শব্দটা সেদিক থেকে আমার শিয়রের জানলার কাছে এসে থামলো। তখনও আমি ভাবচি, ওটা গরুর পায়ের শব্দ। এমন সময় আমার বিস্মিত-দৃষ্টির সামনে দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে কার একটা সুদীর্ঘ হাত একেবারে আমার বুকের কাছে —ঠিক বুকের ওপর পৌঁছলো—হাতে ধারালো একখানা সোজা-ছোরা, অন্ধকারেও যেন ঝক্‌ঝক্ করচে!

ততক্ষণে আমার বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গিয়েচে।

আমি তাড়াতাড়ি পাশমোড়া দিয়ে ছোরা-সমেত হাতখানা ধরতে গিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য একটা বাঁশের লাঠিকে চেপে ধরলাম।

পরক্ষণেই কে এক জোর ঝট্‌কায় লাঠিখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে। সঙ্গে-সঙ্গে ছোরার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের আঘাতে আমার হাতের কব্জি ও বুকের খানিকটা চিরে রক্তারক্তি হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ জ্বেলে দেখি, বিছানা রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েচে। তখুনি নেকড়া ছিঁড়ে হাতে জলপটি বেঁধে লণ্ঠন জ্বাললাম।

লাঠির অগ্রভাগে তীক্ষ্ণাগ্র ছোরা বাঁধা ছিল—আমার বুক লক্ষ্য ক'রে ঠিক কুড়ুলের কোপের ধরনে লাঠি উঁচিয়ে কোপ মারলেই ছোরা পিঠের ওদিক দিয়ে ফুঁড়ে বেরুতো। তারপর বাঁধন আল্‌গা ক'রে ছোরাখানা আমার বিছানার পাশে কিংবা আমার ওপর ফেলে রাখলেই আমি যে আত্মহত্যা করেচি, এ-কথা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্য লোককে ভুল করে বোঝানো চলতো।

আমি নিরস্ত্র ছিলাম না—মিঃ সোমের ছাত্র আমি। আমার বালিশের তলায় ছ' নলা অটোমেটিক ওয়েব্‌লি লুকোনো। সেটা হাতে ক'রে তখুনি বাইরে এসে আলো ধ'রে ঘরের চারিদিকে সর্ব্বত্র খুঁজলাম—জানলার কাছে জুতো-সুদ্ধ টাট্‌কা পায়ের দাগ!

ভালো ক'রে টর্চ ফেলে দেখলাম।

কি জুতো?...রবার-সোল, না, চামড়া?...অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না।

এখুনি এই জুতোর সোলের একটা ছাঁচ নেওয়া দরকার। কিন্তু তার কোনো উপকরণ দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আমার কাছে নেই।

আমার মনে কেমন ভয় করতে লাগলো, আকাশের দিকে চাইলাম। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর মেঘান্ধকার রজনী।

এমনি রাত্রে ঠিক গত কৃষ্ণপক্ষেই গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছিলেন।

আমি শ্রীগোপালের বাড়ী গিয়ে ডাকলাম—শ্রীগোপাল, শ্রীগোপাল, ওঠো—ওঠো!

শ্রীগোপাল জড়িত-কণ্ঠে উত্তর দিলে—কে?

—বাইরে এসো—আলো নিয়ে এসো—সব বলচি।

শ্রীগোপাল একটা কেরোসিনের টেমি জ্বালিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বিস্মিতমুখে বার হয়ে এসে বল্লে—কে? ও, আপনি? এত রাত্রে কি মনে ক'রে?

—চলো বসি—সব বলচি। এক গ্লাস জল খাওয়াও তো দেখি!

—চা খাবেন? স্টোভ আছে। চা-খোর আমি, সব মজুত রাখি—ক'রে দিই।

চা খেয়ে আমি আর বসতে পারচি না। ঘুমে যেন চোখ ঢুলে আসচে! শ্রীগোপাল বল্লে—বাকি রাতটুকু আমার এখানেই শুয়ে কাটিয়ে দেবেন এখন।

ব্যাপার সব শুনে শ্রীগোপাল বল্লে—এর মধ্যে ননী আছে ব'লে মনে হয়। এ তারই কাজ।

—না।

—না? বলেন কি?

—না, এ ননীর কাজ নয়।

—কি ক'রে জানলেন?

—এখানকার লোক ছোরার ব্যবহার জানে না—বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে ছোরার ব্যবহার নেই।

—তবে?

—এ-কাজ যে করেচে সে বাংলার বাইরে থাকে। তুমি কাউকে রাতের কথা বোলো না কিন্তু!

—আপনাকে খুন করতে আসার উদ্দেশ্য?

—আমি দোষী খুঁজে বার করবার কাজে পুলিসকে সাহায্য করচি—এছাড়া আর অন্য কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

ভোর হোলো। আমি উঠে আমার ঘরে চলে গেলাম।

জানলার বাইরে সেই পায়ের দাগ তেমনি রয়েচে। রবার-সোলের জুতো বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। ক' নম্বরের জুতো তাও জানা গেল।

বিকেলে আমি ভাবলাম, একবার মামার বাড়ী যাবো। এ-গ্রামে ডাক্তার নেই

ভালো—মামার বাড়ী গিয়ে আমার ক্ষতস্থানটা দেখিয়ে ওষুধ দিয়ে নিয়ে আসবো। ঘরের মধ্যে জামা গায়ে দিতে গিয়ে মনে হোলো—আমার ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকেছিল।

কিছুই থাকে না ঘরে। একটা ছোট চামড়ার স্যুটকেস্—তাতে খানকতক কাপড়-জামা। কে ঘরের মধ্যে ঢুকে স্যুটকেসটা মেজেতে ফেলে তার মধ্যে হাতড়ে কি খুঁজেচে—কাপড়-জামা, বা, একটা মনিব্যাগে গোটা-দুই টাকা ছিল সেগুলো ছোঁয় নি। বালিশের তলা—এমন কি, তোশকটার তলা পর্য্যন্ত খুঁছেচে।

আমি প্রথমটা ভাবলাম, এ কোনো ছিঁচকে চোরের কাজ। কিন্তু চোর টাকা নেয় নি—তবে কি, রিভলভারটা চুরি করতে এসেছিল? সেটা আমার পকেটেই আছে অবিশ্যি—সে উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয়।

জানকীবাবুকে ডেকে সব কথা বল্লাম। জানকীবাবু শুনে বল্লেন—চলুন, জায়গাটা একবার দেখে আসি।

ঘরে ঢুকে আমরা সব দিক ভাল ক'রে খুঁজে দেখলাম। সব ঠিক আছে। জানকীবাবু আমার চেয়েও ভালো ক'রে খুঁজলেন, তিনিও কিছু বুঝতে পেরেচেন ব'লে মনে হোলো না।

বল্লাম—দেখলেন তো?

—টাকাকড়ি কিছু যায় নি?

—কিছু না।

—আর কোনো জিনিস আপনার ঘরে ছিল?

—কি জিনিস?

—অন্য কোনো দরকারি—ইয়ে—মানে—মূল্যবান?

—এখানে মূল্যবান জিনিস কি থাকবে?

—তাই তো!

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়লো। মিস্‌মিদের সেই কবচ আর দাঁতনকাঠির টুক্‌রোটা আমি এই ঘরে কাল পর্য্যন্ত রেখেছিলাম, কিন্তু কাল কি মনে ক'রে শ্রীগোপালের বাড়ী যাবার সময় সে জিনিস দু'টি আমি পকেটে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম—এখনও পর্য্যন্ত সে দু'টি আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কথাটা জানকীবাবুকে বলি-বলি ক'রেও বলা হোলো না।

জানকীবাবু যাবার সময় বল্লেন—ননীর ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

—হয় খানিকটা।

—একবার ওকে ডাকিয়ে দেখি।

—এখন নয়। আমি মামার বাড়ী যাই, তারপর ওকে ডেকে জিগ্যেস করবেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি জানকীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মামার বাড়ী চলে এলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমার মামার বাড়ীর পাশে সুরেশ ডাক্তারের বাড়ী। সে আমার সমবয়সী—গ্রামে প্র্যাক্‌টিশ করে। মোটামুটি যা রোজগার করে, তাতে তার চলে যায়। ওর কাছে ক্ষতস্থান ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে আবার শ্রীগোপালদের গ্রামেই ফিরলাম। জানকীবাবুর সঙ্গে পথে দেখা। তিনি বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েচেন। আমায় বল্লেন—আজই ফিরলেন ?

তাঁর কথার উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়লো, মিস্‌মিদের কবচখানা আমার পকেটেই আছে এখনও—সামনে রাত আসচে আবার, ও-জিনিসটা সঙ্গে এনে ভালো করিনি, মামার বাড়ি রেখে আসাই উচিত ছিল বোধ হয়।

জানকীবাবুর পরামর্শটা একবার নিলে কেমন হয়, জিনিসটা দেখিয়ে ?

কিন্তু ভাবলাম, এ-জিনিসটা ওঁর হাতে দিতে গেলে এখন বহু কৈফিয়ৎ দিতে হবে ওঁর সঙ্গে। হয়তো তিনি জিনিসটার গুরুত্ব বুঝবেন না—দরকার কি দেখানোর ?

জানকীবাবুর শ্বশুরবাড়ী শ্রীগোপালের বাড়ীর পাশেই।

ওঁর বৃদ্ধা শাশুড়ী, দেখি বাইরের রোয়াকে ব'সে মালা জপ করচেন। আমি তাঁকে আরও কিছু জিগ্যেস করবার জন্যে সেখানে গিয়ে বসলাম।

বুড়ী বল্লে—এসো দাদা, বসো।

—ভালো আছেন, দিদিমা ?

—আমাদের আবার ভালোমন্দ—তোমরা ভালো থাকলেই আমাদের ভালো।

—আপনি বুঝি একাই থাকেন ?

—আর কে থাকবে বলো—আছেই-বা কে ? এক মেয়ে ছিল, মারা গিয়েচে।

—তবে তো আপনার বড় কষ্ট, দিদিমা !

—কি করবো দাদা, অদেষ্টে দুঃখ থাকলে কেউ ঠ্যাকাতে পারে ?

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। বুড়ীর সামনের গোয়ালের ছিটেবেড়ায় একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েচে—জিনিসটা হচ্চে, খুব বড় একটা পাতার টোকা। পাতাগুলো শুকনো তামাক-পাতার মত ঈষৎ লাল্‌চে। পাতার বোনা ও রকম টোকা, বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে কখনো দেখি নে।

জিগ্যেস করলাম—দিদিমা, ও জিনিসটা কি ? এখানে তৈরি হয় ?

বৃদ্ধা বল্লেন—ওটা এ-দেশের নয় দাদা।

—কোথায় পেয়েছিলেন ওটা ?

—আমার জামাই এনে দিয়েছিল।

—আপনার জামাই ? জানকীবাবু বুঝি ?

—হ্যাঁ দাদা। ও আসামের চা-বাগানে থাকতো কিনা, ও-ই আর বছর এনেছিল।

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগলো···আসাম !···চা বাগান ! এই ক্ষুদ্র

গ্রামের সঙ্গে সুদূর আসামের যোগ কিভাবে স্থাপিত হতে পারে—এ আমার নিকট একটা মস্ত-বড় সমস্যা। একটা ক্ষীণ সূত্র মিলেচে।

আমি বল্লাম—জানকীবাবু বুঝি আসামে থাকতেন ?

—হ্যাঁ দাদা, অনেকদিন ছিল। এখন আর থাকে না। আমার সে মেয়ে মারা গিয়েচে কিনা! তবুও জামাই মাঝে-মাঝে আসে। গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে বড় ভাব ছিল। এলেই ওখানে ব'সে গল্প, চা খাওয়া—

—ও!

—বুড়ো খুন হয়েছে শুনে জামাইয়ের কি দুঃখু!

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর ক'দিন পরে এলেন উনি ?

—তিন-চার দিন পরে দাদা!

—আপনার মেয়ে মারা গিয়েচেন কতদিন হোলো দিদিমা ?

—তা, বছর-তিনেক হোলো—এই শ্রাবণে।

—মেয়ে মারা যাওয়ার পর উনি যেমন আসছিলেন, তেমনই আসতেন, না, মধ্যে কিছুদিন আসা বন্ধ ছিল ?

—বছর-দুই আর আসে নি। মন তো খারাপ হয়, বুঝতেই পারো দাদা! তারপর এলো একবার শীতকালে। এখানে রইলো মাসখানেক। বেশ মন লেগে গেল। সেই থেকে প্রায়ই আসে।

আমি বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সেদিন আর কোথাও বেরুলাম না। পরদিন সকালে উঠে. স্থির করলাম একবার থানায় দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার। বিশেষ আবশ্যক।

পথেই জানকীবাবুর সঙ্গে দেখা। আমায় জিগ্যেস করলেন—এই যে! বেড়াচ্ছেন বুঝি ?

আমি বল্লাম—চলুন, ঘুরে আসা যাক একটু। আপত্তি আছে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন না যাই।

—আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন ?

—হ্যাঁ, খানিকটা করিও বটে, খানিকটা না-ও বটে। কেন বলুন তো ?

—আমার নিজের ওতে একেবারে বিশ্বাস নেই। তাই বলচি। আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেচেন, আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি।

হঠাৎ জানকীবাবু আমার চোখের সামনে এমন একটা কাণ্ড করলেন, যাতে আমি স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্যে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কাণ্ডটা এমন কিছুই নয়, খুবই সাধারণ।

জানকীবাবু পথের পাশে ঝোপের জঙ্গলের দিকে চেয়ে বল্লেন—দাঁড়ান, একটা দাঁতন ভেঙে নি। সকালবেলাটা…

তারপর তিনি আমার সামনে পথের ধারে একটা সেওড়াডাল ঘুরিয়ে ভেঙে নিলেন দাঁতন-কাঠির জন্যে।

আমার ভাবান্তর অতি অল্পক্ষণের জন্যে।

পরক্ষণেই আমি সামলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুরে এসে আমি ভাঙা-সেওড়াডালটা ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখি, সঙ্গে সেদিনকার সেই দাঁতনকাঠির শুকনো গোড়াটা এনেছিলাম,– যে বিশেষ ভঙ্গিতে আগের গাছটা ভাঙা হয়েচে, এটাও অবিকল তেমনি ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভাঙা!

কোনো তফাৎ নেই।

আমার মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। আসাম, দাঁতনকাঠি—দুটো অতি সাধারণ, অথচ অত্যন্ত অদ্ভুত সূত্র।

জানকীবাবুর এখানে গত এক বছর ধ'রে ঘন ঘন আসা-যাওয়া, পত্নীবিয়োগ সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ী আসার তাগিদ, গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব!

মিঃ সোম একবার আমায় বলেছিলেন, অপরাধী ব'লে যাকে সন্দেহ করবে, তখন তার পদমর্য্যাদা বা বাইরের ভদ্রতা—এমন কি, সম্বন্ধ, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদিকে আদৌ আমল দেবে না।

জানকীবাবুর সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ জাগলো মনে।

একটা সূত্র এবার অনুসন্ধান করা দরকার। অত্যন্ত দরকারী একটা সূত্র।

সকালে উঠে গিয়ে দারোগার সঙ্গে দেখা করলাম থানায়।

দারোগাবাবু আমায় দেখে বল্লেন—কি? কোনো সন্ধান করা গেল?

—ক'রে ফেলেচি প্রায়। এখন—যে খাতার পাতাখানা আপনার কাছে আছে, সেই-খানা একবার দরকার।

—ব্যাপার কি, শুনি?

—এখন কিছু বলচিনে। হাতের লেখা মেলানোর ব্যাপার আছে একটা।

—কি রকম!

—গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা লিখতো যে-ক'জন—তাদের সবার হাতের লেখা জানি, কেবল একটা হাতের লেখার ছিল অভাব—তাই না?

—সে তো আমিই আপনাকে বলি।

—এখন সেই লোক কে হতে পারে, তার একটা আন্দাজ ক'রে ফেলেচি। তার হাতের লেখার সঙ্গে এবার সেই পাতার লেখাটা মিলিয়ে দেখতে হবে।

—লোকটার বর্তমান হাতের লেখা পাওয়ার সুবিধে হবে?

—যোগাড় করতে চেষ্টা করচি। যদি মেলে, আমি সন্দেহক্রমে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবো।

—আমায় বলবেন, আমি গিয়ে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আসবো। ওয়ারেণ্ট বের করিয়ে নিতে যা দেরি।

—বাকিটুকু কিন্তু আপনাদের হাতে।

—সে ভাববেন না, যদি আপনার সংগৃহীত প্রমাণের জোর থাকে, তবে বাকী সব আমি ক'রে নেবো। এই কাজ করচি আজ সতেরো বছর।

আমি গ্রামে ফিরে একদিনও চুপ ক'রে ব'সে রইলাম না। এ-সব ব্যাপারে দেরি করতে নেই, করলেই ঠকতে হয়। জানকীবাবুর শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করলাম। শুনলাম, জানকীবাবু মাছ ধরতে গিয়েচেন কোথাকার পুকুরে—আর মাত্র দু'দিন তিনি এখানে আছেন—এই দু'দিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেলতে হবে।

আমি বললাম—দিদিমা, জানকীবাবু আপনাকে কিছু-কিছু টাকা পাঠান শুনেচি?

—না দাদা, ও-কথা কার কাছে শুনেচো? জামাই তেমন লোকই নয়।

—পাঠান না?

—আরও উল্টে নেয় ছাড়া দেয় না। মেয়ে থাকতে তবুও যা দিতো, এখন একেবারে উপুড়-হাতটি করে না কোনোদিন।

—যাক্, চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজখবর নেন্ তো—তাহোলেই হোলো।

—তাও কখনো-কখনো। বছরে একবার বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে একখানা লেখে।

—খাম, না পোস্টকার্ড?

—হ্যাঁ, খাম না রেজিস্টারি চিঠি। তুমিও যেমন দাদা। মেয়ে বেঁচে না থাকলেই জামাই পর হয়ে যায়। তার উপর কি কোনো দাবী থাকে দাদা? দু'লাইন লিখে সেরে দেয়।

—কই, দেখি? আছে নাকি চিঠি?

—ওই চালের বাতায় গোঁজা আছে, ছাখো না।

খুঁজে-খুঁজে নাম দেখে একখানা পুরনো পোস্টকার্ড চালের বাতা থেকে বের ক'রে বৃদ্ধাকে প'ড়ে শোনালুম। বৃদ্ধা বললেন—ওই চিঠি দাদা।

আরও দু'একটা কথা ব'লে চিঠিখানা নিয়ে চলে এলাম সঙ্গে ক'রে। জানকীবাবু যদি এ-কথা এখন শুনতেও পান যে, তাঁর লেখা চিঠি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেচি, তাতেও আমার কোনো ক্ষতির কারণ নেই।

থানায় দারোগার সামনে ব'সে হাতের লেখা দুটো মেলানো হলো।

অদ্ভুত ধরণের মিল। দু'একটা অক্ষর লেখার বিশেষ ভঙ্গিটা উভয় হাতের লেখাতেই একই রকম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দারোগাবাবু বল্লেন—তবুও একজন হাতের লেখা-বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া দরকার নয় কি ?

—সে তো কোর্টে প্রমাণের সময়। এখন ওসব দরকার নেই। আপনি সন্দেহক্রমে চালান দিন।

—আমায় অন্য কারণগুলো সব বলুন।

—একে-একে সব বলবো—তার আগে একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার।

মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা করলাম কলকাতায়। সব বললাম তাঁকে খুলে।

তিনি বল্লেন—একটা কথা বলি। তোমাদের সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ-সূত্রাদির চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে। এটা সূত্র ধ'রে অপরাধী বের করতে বড্ড সাহায্য করে। অন্তত আমায় তো অনেকবার যথেষ্ট সাহায্য করেচে। সেটা হলো—অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্ক, chanceএর আঁক কষে বোঝা যায় যে, একজন লোক যে আসামে থাকে বলবে, অথচ দাঁতন করবে, অথচ তার হাতের লেখার সঙ্গে যাকে সন্দেহ করা হচ্চে তার হাতের লেখার হুবহু মিল থাকবে, এ-ধরণের ব্যাপার হয়তো তিন হাজারের মধ্যে একটা ঘটে। এক্ষেত্রে যে সে-রকম ঘটেচে, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই—সুতরাং ধ'রে নিতে হবে এ সেই লোকই।

সেদিন কলকাতা থেকে চলে এলাম। আসবার সময় একবার থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বল্লেন, আপনি লোক পাঠালেই আমি সব ব্যবস্থা করবো।

—ওয়ারেণ্ট বার হয়েচে ?

—এখনও হস্তগত হয়নি, আজ-কাল পেয়ে যাবো।

গ্রামে ফিরে দু'দিন চুপচাপ বসে রইলাম শ্রীগোপালের বাড়ীতে। খবর নিয়ে জানলাম, জানকীবাবু দু'একদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবেন। থানার দারোগার কাছে চিঠি দিয়ে আসতে ব'লে দিলাম।

পকেটে মিস্‌মিদের কবচখানা রেখে আমি জানকীবাবুর সন্ধানে ফিরতে থাকি এবং একটু পরে পেয়েও যাই। জানকীবাবুকে কৌশল ক'রে নির্জ্জনে গাঁয়ের মাঠের দিকে নিয়ে গেলাম।

আজ একবার শেষ পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার !

জানকীবাবু বল্লেন—আপনার কাজ কতদূর এগুলো ?

—এক পাও না। আপনি কি বলেন ?

—আমি তো ভাবচি, ননীর সম্বন্ধে থানায় গিয়ে বলবো।

—সন্দেহের কারণ পেয়েচেন ?

—না পেলে কি আর বলচি ?

—আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি বুঝি আসামে ছিলেন ?

—কে বল্লে ?

—আমি শুনলাম যেন সেদিন কার মুখে।

—না, আমি কখনো আসামে ছিলাম না। যিনি বলেচেন, তিনি জানেন না।

আমার মনে ভীষণ সন্দেহ হোলো। জানকীবাবু এ-কথা বলতে চান কেন? তবে কি তিনি মিস্‌মিদের কবচ' হারানোর এবং বিশেষ ক'রে সেখানে যদি আমার হাতে পড়ে বা পুলিসের কোনো সুযোগ্য ডিটেক্‌টিভের হাতে পড়ে তবে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত?

আমি তখন আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলেচি। বল্লাম—মানে, অন্য কেউ বলে নি, আপনার দেওয়া একটা পাতার টোকা সেদিন আপনার শ্বশুরবাড়ীতে দেখে ভাবলাম এ-টোকা আসাম সদিয়া অঞ্চল ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না—মিস্‌মিদের দেশে অমন টোকার ব্যবহার আছে।

—আপনার ভুল ধারণা।

আমি তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে পকেট থেকে মিস্‌মিদের কাঠের কবচখানা বের ক'রে তাঁর সামনে ধ'রে বল্লাম—দেখুন দিকি এ জিনিসটা কি?…চেনেন? যে-রাত্রে গাঙ্গুলি-মশায় খুন হন, সে-রাত্রে তাঁর বাড়ীর পেছনে এটা কুড়িয়ে পাই। আসামে মিস্‌মিজাতের মধ্যে এই ধরণের কাঠের কবচ পাওয়া যায় কিনা—তাই।

আমার খবরের সঙ্গে সঙ্গে জানকীবাবুর মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল—কিন্তু অত্যন্ত অল্প-কালের জন্যে। পরমুহূর্ত্তেই ভীষণ ক্রোধে তাঁর নাক ফুলে উঠলো, চোখ বড়-বড় হোলো। হঠাৎ আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন বাঘের মত এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবচ-সুদ্ধ হাতখানা চেপে' ধ'রে জিনিসটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দু'হাতেই আমার গলা চেপে ধরলেন পাগলের মত।

আমি এর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম।

বরং জানকীবাবুই আমার যুযুৎসুর আড়াই-পেঁচির ছুটের জন্যে তৈরি ছিলেন না।

তিনি হাতের মাপের অন্তত তিন হাত দূরে ছিট্‌কে প'ড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

আমি হেসে বল্লাম—এ লাইনে যখন নেমেচেন, তখন অন্তত দু'একটা প্যাঁচ জেনে রাখা আপনার নিতান্ত দরকার ছিল জানকীবাবু! কবচ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন না। কবচ আপনাকে ছেড়ে দিয়েচে। এখন এটা আমার হাতে। এখন ভাগ্যদেবী আমায় দয়া করবেন।

—কি বলচেন আপনি?

—এ-কথার জবাব দেবেন অন্য জায়গায়। দাঁড়ান একটু এখানে।

থানার দারোগাবাবু কাছেই ছিলেন, আমার ইঙ্গিতে তিনি এসে হাসিমুখে বল্লেন—দয়া ক'রে একটু এগিয়ে আসুন জানকীবাবু! খুনের অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম …এই, লাগাও!

কনস্টেবলরা এগিয়ে গিয়ে জানকীবাবুর হাতে হাতকড়ি লাগালো।

জানকীবাবু কি বলতে চাইলেন। দারোগাবাবু বল্লেন—আপনি এখন যা কিছু বলবেন, আপনার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হবে, বুঝেসুঝে কথা বলবেন।

জানকীবাবুর বিরুদ্ধে পুলিস আরও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করে। গাঙ্গুলিমশায় খুন হওয়ার পাঁচদিনের মধ্যে তিনি জেলার লোন্‌-আফিস্‌ ব্যাঙ্কে সাড়ে ন'শো টাকা জমা রেখেছেন, পুলিসের খানা-তল্লাসীতে তার কাগজ বার হয়ে পড়লো।

তারপর বিচারে জানকীবাবুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একটা বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল জানবার। জানকীবাবুর সঙ্গে আমি জেলের মধ্যে দেখা করলাম। তখন তাঁর প্রতি দণ্ডাদেশ হয়ে গিয়েচে।

আমাকে দেখে জানকীবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছেন জানকীবাবু?

—ধন্যবাদ! কোনো কথা জিগ্যেস করতে হবে না আপনাকে।

—একটু বেশী রাগ করেচেন ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমায় কর্ত্তব্য পালন করতে হয়েচে, তা বুঝতেই পারচেন।

—থাক ওতেই হবে।

—দেখুন জানকীবাবু, মনের অগোচর পাপ নেই। আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন, আপনি কতদূর হীন কাজ করেচেন। একজন অসহায়, সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—যিনি আপনাকে গাঁয়ের জামাই জেনে আপনার প্রতি আত্মীয়ের মত—এমন কি, আপনার শ্বশুরের মত ব্যবহার করতেন, আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে তাঁর টাকাকড়ির হিসেব আপনাকে দিয়ে লেখাতেন—তাঁকে আপনি খুন করেচেন। পরকালে এর জবাবদিহি দিতে হবে যখন, তখন কি করবেন ভাবলেন না একবার?

—মশায়, আপনাকে পাদ্রি-সায়েবের মত লেক্‌চার দিতে হবে না। আপনি যদি এখনই এখান থেকে না যান—আমি ওয়ার্ডারকে ডেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেবো—বিরক্ত করবেন না।

লোকটা সত্যিই অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। নররক্তে হাত কলুষিত করেচে, অথচ এখনও মনে অনুতাপের অঙ্কুর পর্য্যন্ত জাগে নি ওর।

আমি বল্লাম—আপনি সংসারে একা, ছেলেপুলে নেই, স্ত্রী নেই। তাঁরা স্বর্গে গিয়েচেন, কিন্তু আপনার এই কাজ স্বর্গ থেকে কি তাঁরা দেখবেন না আপনি ভেবেচেন? তাঁদের কাছে মুখ দেখাবেন কি ক'রে?

জানকীবাবু চুপ ক'রে রইলেন এবার। আমি ভাবলুম, ওষুধ ধরেচে। আগের কথাটা আরও সুস্পষ্টভাবে বললাম। জানি না আজও জানকীবাবুর হৃদয়ের নিভৃত কোণে তাঁর পরলোকগত স্ত্রী-পুত্রের জন্য এতটুকু স্নেহপ্রীতি জাগ্রত আছে কিনা! কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তাঁর মনের সে দিকটাতে আঘাত দেবার চেষ্টা করলাম—বহুদিনের মরচেপড়া হৃদয়ের দোর যদি এতটুকু খোলে!

বল্লাম—ভেবে দেখুন জানকীবাবু, আপনার কাছে কত পবিত্র স্মৃতির আধার হওয়া উচিত যে গ্রাম, সেই গ্রামে ব'সে আপনি নরহত্যা করেচেন—এ যে কত পাপের কাজ তা যদি আজও বোঝেন, তবুও অনুতাপের আগুনে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অনুতাপে মানুষকে নিষ্পাপ করে, মহাপুরুষেরা বলেচেন। আপনি বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, মহাপুরুষদের বাণী তো ব'লে মিথ্যা হয়ে যাবে না।

জানকীবাবু আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—মশায়, আপনি কি কাজ করেন? এই কি আপনার পেশা?

—খারাপ পেশা নয় তা স্বীকার করবেন বোধহয়!

—খারাপ আর কি?

—দোষীকে প্রায়শ্চিত্ত করবার সুবিধে ক'রে দিই, যাতে তার পরকালে ভালো হয়।

—আচ্ছা, এ আপনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন?

—নিশ্চয়ই করি।

—তবে শুনুন বলি, বসুন।

—বেশ কথা, বলুন।

—আমার দ্বারাই এ-কাজ হয়েচে।

—অর্থাৎ গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি…

—ও-কথা আর বলবেন না।

—বেশ। কেন করলেন?

—সে অনেক কথা। আমার উপায় ছিল না।

—কেন?

—আমি ব্যবসা করতুম শুনেচেন তো? ব্যবসা ফেল প'ড়ে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলাম, চারিদিকে দেনা। লোভ সামলাতে পারলাম না।

—আপনার সান্ত্বনা আপনার কাছে। কিন্তু এটা লাগ্‌সই কৈফিয়ৎ হোলো না।

—আমি তা জানি। দুর্ব্বল মন আমাদের—কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে বড় ইচ্ছে হয়।

—স্বচ্ছন্দে বলুন।

—আপনি ওই কবচখানা পেয়েছিলেন যেদিন, সেদিন আপনি বুঝতে পেরেছিলেন ওখানা কি?

—না!

—কবে পারলেন?

—আমার শিক্ষাগুরু মিঃ সোমের কাছে কবচের বিষয় সব জেনেছিলাম। আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করবো?

—বলুন!

—আপনি কেন আবার এ-গ্রামে এসেছিলেন, খুনের পরে ?

—আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝেচেন।

—আন্দাজ করেছি। কবচখানা হারিয়ে গিয়েছিল খুনের রাত্রেই—সেখানা খুঁজতে এসেছিলেন।

—ঠিক তাই।

—সেদিন গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর পেছনের জঙ্গলে অন্ধকারে ওটা খুঁজছিলেন কেন, দিনমানে না খুঁজে ?

—দিনেই খুঁজতে শুরু করেছিলাম, রাত হয়ে পড়লো।

—ওখানেই যে হারিয়েছিলেন, তা জানলেন কি ক'রে ?

—ওটা সম্পূর্ণ আন্দাজি-ব্যাপার! কোনো জায়গায় যখন খুজে পেলাম না তখন মনে পড়লো, ওই জঙ্গলে দাঁতন ভেঙেছিলাম, তখন পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে! তাই—

আমি ওঁর মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে দেখলাম। বল্লাম—সব কথা খুলে বলুন। আমি এখনও আপনার সব কথা শুনিনি! তবে আপনার মুখ দেখে তা বুঝতে পারচি!

জানকীবাবু ফিস্‌ফিস ক'রে কথা বলতে লাগলেন, যেন তাঁর গোপনীয় কথা শুনবার জন্যে জেগে সেই ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে কেউ লুকিয়ে ওৎ পেতে বসে রয়েচে। তাঁর এ ভাব-পরিবর্ত্তনে আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ভয়ে দুঃখে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি ?

আমায় বল্লেন—ওখানা এখন কোথায় ?

—একজিবিট্ হিসেবে কোর্টেই জমা আছে।

—তার পর কে নিয়ে নেবে ?

—আপনার সম্পত্তি, আপনার ওয়ারিশান কোর্টে দরখাস্ত করলে—

জানকীবাবু ভয়ে যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে দেবার ভঙ্গিতে হাত নাড়তে-নাড়তে বল্লেন—না না, আমি ও চাইনে, আমার ওয়ারিশান কেউ নেই, ও আমি চাইনে—ওই সর্ব্বনেশে কবচই আমাকে আজ এ-অবস্থায় এনেচে। আপনি জানেন না ও কি!

এই পর্য্যন্ত বলেই তিনি চুপ ক'রে গেলেন। যেন অনেকখানি বেশি ব'লে ফেলেচেন—যা বলবার ইচ্ছে ছিল তার চেয়েও বেশি। আর তিনি কিছু বলতে চান না বা ইচ্ছে করেন না।

আমি বল্লাম—আপনি যদি না নিতে চান, আমি কাছে রাখতে পারি।

আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বল্লেন—আপনি সাহস করেন ?

—এর মধ্যে সাহস করবার কি আছে ? আমায় দেবেন।

—আপনি আমায় পুলিসে ধরিয়ে দিয়েচেন, আপনি আমার শত্রু—তবুও এখন ভেবে দেখচি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েচেন আপনি! আপনার ওপর

আমার রাগ নেই। আমি আপনাকে বন্ধুর মত পরামর্শ দিচ্চি—ও-কবচ আপনি কাছে রাখতে যাবেন না।

—কেন ?

—সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বল্লাম—ও-জিনিসটা দূরে রেখে চলবেন।

আমি যেজন্যে আজ জানকীবাবুর কাছে এসেছিলাম, সে উদ্দেশ্য সফল হতে চলেচে। আমি এসেছিলাম আজ ওঁর মুখে কবচের ইতিহাস কিছু শুনবো ব'লে। আমার ওভাবে কথা পাড়বার মূলে ওই একটা উদ্দেশ্য ছিল। অনুনয়ের সুরে কোনো কথা ব'লে জানকীবাবুর কাছে কাজ আদায় করা যাবে না এ আমি আগেই বুঝেছিলাম। সুতরাং আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লাম—আমার কোনো কুসংস্কার নেই জানবেন।

জানকীবাবু খোঁচা খেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বল্লেন—কুসংস্কার কাকে বলেন আপনি ?

—আপনার মত ওইসব মন্ত্র-তন্ত্র-কবচে বিশ্বাস—ওর নাম যদি কুসংস্কার না হয়, তবে কুসংস্কার আর কাকে বলবো ?

জানকীবাবু ক্রোধের সুরে বল্লেন—আপনি হয়তো ভালো ডিকেক্‌টিভ হতে পারেন, কিন্তু দুনিয়ার সব জিনিসই তা ব'লে আপনি জানবেন ?

আমি পূর্ব্বের মত তাচ্ছিল্যের সুরেই বল্লাম—আমার শিক্ষাগুরু একজন আছেন, তাঁর বাড়ীতে ওরকম একখানা কবচ আছে।

—কে তিনি ?

—মিঃ সোম, বিখ্যাত প্রাইভেট্‌-ডিকেক্‌টিভ।

যিনিই হোন, আমার তা জানবার দরকার নেই। একটা কথা আপনাকে বলি। যদি আপনি তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তবে অবিলম্বে তাঁকে বলবেন সেখানা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে। কতদিন থেকে তাঁর সঙ্গে সেখানা আছে, জানেন ?

—তা জানিনে, তবে খুব অল্পদিনও নয়। দু'তিন বছর হবে।

—আর আমার সঙ্গে এ-কবচ আছে সাত বছর। কিন্তু থাক্‌গে।

ব'লেই জানকীবাবু চুপ করলেন। আর যেন তিনি মুখই খুলবেন না, এমন ভাব দেখালেন।

আমি বল্লাম- বলুন, কি বলতে চাইছিলেন ?

—অন্য কিছু নয়, ও-কবচখানা আপনি আপনার গুরুকে টান মেরে ভাসিয়ে দিতে বলবেন—আর, এখানাও আপনি কাছে রাখবেন না।

—আমি তো বলেচি আমার কোনো কুসংস্কার নেই !

—অভিজ্ঞতা দ্বারা যা জেনেচি, তাকে কুসংস্কার ব'লে মানতে রাজী নই। বেশি তর্ক আপনার সঙ্গে করবো না। আপনি থাকুন কি উচ্ছন্ন যান, তাতে আমার কি ?

—এই যে খানিক আগে বলছিলেন, আমার ওপর আপনার কোন রাগ নেই ?

—ছিল না, কিন্তু আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা আর দেমাক দেখে রাগ হয়ে পড়েছে।

—দেমাক দেখলেন কোথায় ? আপনি তো কোনো কারণ দেখান নি। শুধুই ব'লে যাচ্ছেন—কবচ ফেলে দাও। আজকালকার কোনো দেশে এসব মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাস করে ভেবেচেন ? একখানা কাঠের পাত মানুষের অনিষ্ট করতে পারে ব'লে, আপনিও বিশ্বাস করেন ?

—আমিও আগে ঠিক এই কথাই ভাবতাম, কিন্তু এখন আমি বুঝেছি। কিন্তু বুঝেছি এমন সময় যে, যখন আর কোনো চারা নেই।

—জিনিসটা কি, খুলে বলুন না দয়া ক'রে!

—শুনবেন তবে ? ওই কবচই আমার এই সর্ব্বনাশের কারণ।

আমি বুঝেছিলাম এ-সম্বন্ধে জানকীবাবু কি একটা কথা আমায় কাছে চেপে যাচ্ছেন। আগে একবার বলতে গিয়েও বলেন নি, হঠাৎ গুম্ খেয়ে চুপ ক'রে গিয়ে অন্য কথা পেড়েছিলেন। এবার হয়তো তার পুনরাবৃত্তি করবেন।

সুতরাং, আমি যেন তাঁর আসল কথার অর্থ বুঝতে পারি নি এমন ভাব দেখিয়ে বল্লাম—তা বটে। একদিক থেকে দেখতে হোলে, ওই কবচখানাই তো আপনার বর্ত্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী!

জানকীবাবু আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—আপনি কি বুঝেছেন, বলুন তো ? কিভাবে দায়ী ?

—মানে, ওখানা না হারিয়ে গেলে তো আপনি আজ ধরা পড়তেন না—যদি ওখানা পকেট থেকে না প'ড়ে যেতো ?

—কিছুই বোঝেন নি।

—এ-ছাড়া আর কি বুঝবার আছে ?

—আজ যে আমি একজন খুনী, তাও জানবেন ওই সর্ব্বনেশে কবচের জন্যে। কবচ যদি আমার কাছে না থাকতো তবে আজ আমি একজন মার্চ্চেণ্ট—হতে পারে ব্যবসাতে লোকসান দিয়েছিলাম—কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান কার না হয় ? আমার বুকে সাহস ছিল, লোকসান আমি লাভে দাঁড় করাতে পারতাম। কিন্তু ওই কবচ তা আমায় করতে দেয় নি। ওই কবচ আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেচে!

জানকীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, গল্প বলবার আসন্ন নেশায় তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেচেন। চুপ ক'রে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

জানকীবাবু বল্লেন—আজ প্রায় পঁচিশ বছর আমি সদিয়া-অঞ্চলে ব্যবসা করচি। পরশুরামপুর-তীর্থের নাম শুনেছেন ?

—খুব।

—ঘন জঙ্গলের পাশে ওই তীর্থটা পড়ে। ওখান থেকে আরও সত্তর মাইল দূরে ভীষণ দুর্গম বনের মধ্যে আমি জঙ্গল ইজারা নিয়ে পাটের ব্যবসা শুরু করি। ওখানে দফ্‌লা, মিরি, মিস্‌মি এইসব নামের পার্বত্য-জাতির বাস। একদিন একটা বনের মধ্যে কুলিদের নিয়ে

ঢুকেছি, জায়গাটার একদিকে ঝর্ণা, একদিকে উঁচু পাহাড়, তার গায়ে ঘন বাঁশবন। ওদিকে প্রায় সব পাহাড়েই বাঁশবন অত্যন্ত বেশি। কখনো গিয়েচেন ওদিকে?

আমি বল্লাম—না, তবে খাসিয়া পাহাড়ে এমন বাঁশবন দেখেচি, শিলং যাওয়ার পথে।

জানকীবাবুর গল্পটা আমি আমার নিজের ধরণেই বলি।

সেই পাহাড়ী-বাঁশবনে বন কাটবার জন্যে ঢুকে তাঁরা দেখলেন, এক জায়গায় একটা বড় শালগাছের নীচে আমাদের দেশের বৃষ-কাষ্ঠের মত লম্বা ধরণের কাঠের খোদাই এক বিকট-মূর্ত্তি দেবতার বিগ্রহ!

কুলিরা বল্লে—বাবু, এ মিস্‌মিদের অপদেবতার মূর্ত্তি, ওদিকে যাবেন না।

জানকীবাবুর সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, তাঁর শখ হোলো মূর্ত্তিটার ফটো নেবেন। কুলিরা বারণ করলে, জানকীবাবু তাদের কথায় কর্ণপাত না ক'রে ক্যামেরা তেপায়ার উপর দাঁড় করিয়েছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধ মিস্‌মি এসে তাদের ভাষায় কি বল্লে। জানকীবাবুর একজন কুলি সে ভাষা জানতো। সে বল্লে—বাবু, ফটো নিও না, ও বারণ করচে।

অন্য-অন্য কুলিরাও বল্লে—বাবু, এরা জবর জাত—সরকারকে পর্য্যন্ত মানে না। ওদের দেবতাকে অপমান করলে গাঁ-সুদ্ধ তীর-ধনুক নিয়ে এসে হাজির হয়ে আমাদের সবগুলোকে গাছের সঙ্গে গেঁথে ফেলবে। ওরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না, কারো তোয়াক্কা রাখে না—ওদের দেবতার ফটো খিঁচ্‌বার দরকার নেই।

জানকীবাবু ক্যামেরা বন্ধ করলেন—এতগুলো লোকের কথা ঠেলতে পারলেন না। তারপর নিজের কাজকর্ম্ম সেরে তিনি যখন জঙ্গল থেকে ফিরবেন, তখন আর একবার সেই দেবমূর্ত্তি দেখবার বড় আগ্রহ হোলো।

সন্ধ্যার তখন বেশি দেরি নেই, পাহাড়ী-বাঁশবনের নিবিড় ছায়া-গহন পথে বন্য-জন্তুদের অতর্কিত আক্রমণের ভয়, বেণুবনশীর্ষে ক্ষীণ সূর্য্যালোক ও পার্ব্বত্য-উপত্যকার নিস্তব্ধতা সকলের মনে একটা রহস্যের ভাব এনে দিয়েচে, কুলিদের বারণ সত্ত্বেও তিনি সেখানে গেলেন।

সবাই ভীত ও বিস্মিত হয়ে উঠলো যখন সেখানে গিয়ে দেখলে, কোন্ সময় সেখানে একটি শিশু বলি দেওয়া হয়েচে! শিশুটির ধড় ও মুণ্ড পৃথক-পৃথক প'ড়ে আছে, কাঠে-খোদাই বৃষ-কাষ্ঠ জাতীয় দেবতার পাদমূলে! অনেকটা জায়গা নিয়ে কাঁচা আধ-শুকনো রক্ত।

সেখানে সেদিন আর তাঁরা বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না…

জানকীবাবু বল্লেন—আমার কি কুগ্রহ মশায়, আর যদি সেখানে না যাই তবে সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু তা না ক'রে আমি আবার পরের দিন সেখানে গিয়ে হাজির হোলাম। কুলীদের মধ্যে একজন লোক আমায় যথেষ্ট নিষেধ করেছিল, সে বলেছিল, 'বাবু, তুমি কলকাতার লোক, এসব দেশের গতিক কিছু জানো না। জংলী-দেবতা হোলেও ওদের একটা শক্তি আছে—তা তোমাকে ওদের পথে নিয়ে যাবে, তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে—ওখানে অত যাতায়াত কোরো না বাবু।' কিন্তু কারো কথা শুনলাম না, গেলাম শেষ পর্য্যন্ত। লুকিয়েই গেলাম, পাছে কুলিরা টের পায়।

কেন যে জানকীবাবু সেখানে গেলেন, তিনি তা আজও ভালো জানেন না।

কিংবা হয়তো রক্ত-পিপাসু বর্ব্বর দেবতার শক্তিই তাঁকে সেখানে যাবার প্ররোচনা দিয়েছিল …কে জানে!

জানকীবাবু বল্লেন— ক্যামেরা নিয়ে যদি যেতাম, তাহোলে তো বুঝতাম ফটো নিতে যাচ্ছি —তাই বলছিলাম, কেন যে সেখানে গেলাম, তা নিজেই ভালো জানিনে!

আমি বল্লাম—সে-মূর্ত্তির ফটো নিয়েছিলেন?

—না, কোনোদিনই না। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ করেছিলাম, এখন তা বুঝতে পারচি।

জানকীবাবু যখন সেখানে গেলেন, তখন ঠিক থম্‌থম্ করচে দুপুরবেলা, পাহাড়ী-পাখীদের ডাক থেমে গিয়েচে, বনতল নীরব, বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে শুকনো বাঁশের খোলা পাতা পড়বার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

দেবমূর্ত্তির একেবারে কাছে যাবার অত্যন্ত লোভ হোলো—কারণ, কুলিরা সঙ্গে থাকায় এতক্ষণ তা তিনি করতে পারেন নি।

গিয়ে দেখলেন, শিশুর শবের চিহ্নও সেখানে নেই। রাত্রে বন্যজন্তুতে খেয়েই ফেলুক, বা, জংলীরাই নিজেরা খাবার জন্যে সরিয়ে নিয়ে যাক্। অনেকক্ষণ তিনি মূর্ত্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন—কেমন এক ধরণের মোহ, একটা সুতীব্র আকর্ষণ! সত্যিকার নরবলি দেওয়া হয় যে দেবতার কাছে, এমন দেবতা কখনো দেখেন নি বলেই বোধ হয় আকর্ষণটা বেশি প্রবল হোলো, কিংবা অন্য-কিছু তা বলতে পারেন না তিনি।

সেই সময় ওই কাঠের কবচখানা দেবমূর্ত্তির গলায় ঝুলতে দেখে জানকীবাবু কিছু না ভেবে—চারিদিকে কেউ কোথাও নেই দেখে - সেখানা চট ক'রে মূর্ত্তিটার গলা থেকে খুলে নিলেন।…

আমি বিস্মিতস্বরে বল্লাম—খুলে নিলেন! কি ভেবে নিলেন হঠাৎ?

—ভাবলাম একটা নিদর্শন নিয়ে যাবো এদেশের জঙ্গলের দেবতার, আমাদের দেশের পাঁচ-জনের কাছে দেখাবো! নরবলি খায় যে দেবতা, তার সম্বন্ধে যখন বৈঠকখানা জাঁকিয়ে ব'সে গল্প করবো তখন সঙ্গে-সঙ্গে এখানাও বার ক'রে দেখাবো। লোককে আশ্চর্য্য ক'রে দেবো, বোধহয় এইরকমই একটা উদ্দেশ্য তখন থেকে থাকবে। কিন্তু যখন নিলাম গলা থেকে খুলে, তখনই মশায় আমার সর্ব্বশরীর যেন কেঁপে উঠলো! যেন মনে হোলো একটা কি অমঙ্গল ঘনিয়ে আসচে আমার জীবনে। ও-ধরণের দুর্ব্বলতাকে কখনোই আমল দিই নি—সেটা খুলে নিয়ে পকেটজাত ক'রে ফেললাম একেবারে। মিস্‌মিদের অনেকে এ রকম কবচ গলায় ধারণ করে, সেটাও দেখেচি কিন্তু তারপরে। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সময় বিশেষ ক'রে এ-কবচ তারা পরবেই।

—তারপর?

—তারপর আর কিছুই না। সাতবছর কবচ আছে আমার কাছে। জংলী-জাতের

জংলী-দেবতার কবচ, ও ধীরে-ধীরে আমায় নামিয়েচে এই সাত বছরে। এক-একটা জিনিসের এক-একটা শক্তি আছে। আমায় দিয়ে জাল করিয়েচে, পাওনাদারের টাকা মেরে দেবার ফন্দি দিয়েচে—শেষকালে মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে দিলে পর্য্যন্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যবসাদার ছিলুম মশায়— আজ কোথায় এসে নেমেছি দেখুন! এ-প্রবৃত্তি জাগাবার মূলে ওই কবচখানা! আমি দেখেচি, যখনই ওখানা আমার কাছে থাকতো, তখনই নানারকম দুষ্টবুদ্ধি জাগতো মনে—কাকে মারি, কাকে ফাঁকি দিই। লোভ জিনিসটা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠতো। গাঙ্গুলিমশায়ের খুনের দিনের রাত্রে আমি দশটার গাড়ীতে অন্ধকারে ইস্টিশানে নামি। কেউ আমায় দেখে নি। আমার পকেটে ঐ কবচ—কিন্তু যাক্ সে-কথা, আর এখন বলবো না।

—বলুন না।

—না। আমার ঘাড় থেকে এখন ভূত নেমে গিয়েচে, আর সে ছবি মনে করতে পারব না। এখন করলে ভয় হয়। নিজের কাজ করেই কবচ সরে পড়লো সে-রাত্রেই। আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ওর প্রতিহিংসা পূর্ণ হোলো বোধহয়—কে বলবে বলুন! স্টীমারে আমায় একজন বারণ করেছিল কিন্তু। আসাম থেকে ফিরবার পথে ব্রহ্মপুত্রের ওপর স্টীমারে একজন বৃদ্ধ আসামী-ভদ্রলোককে ওখানা দেখাই। তিনি আমায় বল্লেন, 'এ কোথায় পেলেন আপনি? এ মিরি আর মিস্‌মিদের কবচ, পশু এখানে মানুষের স্থান নিয়েচে, ওরা যখন অপরের গ্রাম আক্রমণ করতে যেতো—অপরকে খুন-জখম করতে যেতো—তখন দেবতার মন্ত্রপুত এই কবচ পরতো গলায়। এ-আপনি কাছে রাখবেন না, আপনাকে এ অমঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে।' তখনও যদি তাঁর কথা শুনি তাহোলে কি আজ এমন হয়? তাই আপনাকে আমি বলচি, আমি তো গেলামই—ও কবচ আপনি আপনার কাছে কখনো রাখবেন না।

জানকীবাবু চুপ করলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা পূর্ণ হয়েচে। জানকীবাবুর মুখে কবচের ইতিহাসটা শুনবার জন্যেই আসা।

বল্লাম—আমি যা করেচি, কর্ত্তব্যের খাতিরে করেচি। আমার বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখবেন না মনে। আমায় ক্ষমা করবেন। নমস্কার!

বিদায় নিয়ে চলে এলাম ওঁর কাছ থেকে।

* * * *

যতদূর জানি—এখন তিনি আন্দামানে।


তাল নবমী

তালনবমী

ঝমঝম বর্ষা।

ভাদ্র মাসের দিন। আজ দিন পনরো ধরে বর্ষা নেমেচে, তার আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। ক্ষুদিরাম ভট্চাজের বাড়ী আজ দু'দিন হাঁড়ি চড়ে নি।

ক্ষুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমিজমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্য-যজমানের বাড়ী ঘুরে-ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়ীতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে,—ক্ষুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থ মাত্র! যজমান-বাড়ী থেকে যে ক'টি ধান এসেছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েচে।—ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষীদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল ক্ষুদিরামের দুই ছেলে। নেপালের বয়স বছর বারো, গোপালের দশ। ক'দিন থেকে পেট ভরে না-খেতে পেয়ে ওরা দুই ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেচে।

নেপাল বললে, "এই গোপলা, ক্ষিদে পেয়েচে না তোর?"

গোপাল ছিপ চাঁচতে চাঁচতে বললে, "হুঁ, দাদা!"

"মাকে গিয়ে বল্; আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।"

"মা বকে; তুমি যাও দাদা।"

"বকুক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবি নে?"

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুজ্যের ছেলে চুনিকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে, "ও চুনি, শুনে যা!"

চুনি বয়সে নেপালের চেয়ে বড়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে, বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "কি?"

"আয় না ভেতরে।"

"না যাবো না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটি পিসীমাদের বাড়ী যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েচে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।"

"কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?"

"ওদের ডাল ভাঙতে গিয়েচে। তালনবমীর বের্তো আসচে এই মঙ্গলবার; ওদের বাড়ী লোকজন খাবে।"

"সত্যি?"

"তা জানিস্ নে বুঝি? আমাদের বাড়ীর সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। গাঁয়েও বলবে।"

"আমাদেরও করবে?"

"সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?"

চুনি চলে গেলে নেপাল ছোট ভাইকে বললে, "আজ কি বার রে? তা তুই কি জানিস্? আজ শুক্কুরবার বোধ হয়। মঙ্গলবারে নেমন্তন্ন।"

গোপাল বললে, "কি মজা! না দাদা?"

"চুপ করে থাক,—তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই; তালনবমীর বের্তোয় তালের বড়া করে, তুই জানিস্?"

গোপাল সেটা জানতো না! কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশী হয়ে উঠলো। সত্যিই তা যদি হয়, তবে সে সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্ত্তী নয়, ঘনিয়ে এসেচে কাছে। আজ কি বার সে জানে না, সামনের মঙ্গলবারে। নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ী যাবার পথে পড়ে জটি পিসীমার বাড়ী। নেপাল বললে, "তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ী ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ী তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে।"

এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদীঘি, নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটি পিসীমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী; গ্রামশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে তাঁকে ডাকে জটি পিসীমা।

পিসীমা বললেন, "কি রে?"

"তাল নেবেন পিসীমা?"

"হ্যাঁ, নেব বই কি। আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।"

ঠিক এই সময় দাদার পিছু পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েচে। জটি পিসীমা বললেন, "পেছনে কে রে? গোপাল? তা সন্ধ্যেবেলা দুই ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?"

নেপাল সলজ্জমুখে বললে, "মাছ ধরতে।"

"পেলি?"

"ওই দুটো পুঁটি আর একটা ছোট বেলে···তাহ'লে যাই পিসীমা?"

"আচ্ছা, এসোগে বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেল; অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় বর্ষাকালে।"

জটি পিসীমা তাল সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ দেখালেন না বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না,—যদিও দু'জনেরই আশা ছিল হয়তো জটি পিসীমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন। দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিগ্যেস্ করলে, "তাল নেবেন তা হ'লে?"

"তাল? তা দিয়ে যেও বাবা। ক'টা করে পয়সায়?"

"দুটো করে দিচ্ছি পিসীমা। তা নেবেন আপনি, তিনটে করেই নেবেন।"

"বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো। আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভালো তাল চাই।"

"মিশ্‌কালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।"

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে, "কবে তাল দিবি দাদা?"

"কাল।"

"তুই ওদের কাছে পয়সা নিস্ নে দাদা!"

নেপাল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কেন রে?"

"তাহ'লে আমাদের নেমন্তন্ন করবে, দেখিস এখন।"

"দূর! তা হয় না। আমি কষ্ট করে তাল কুড়বো—আর পয়সা নেবো না?"

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হু হু বাদলার হাওয়া সেই সঙ্গে। পূবদিকের জানলার কপাট দড়ি-বাঁধা; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সারারাত খট্ খট্ শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে। সে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌চে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে,—তবে ওরা আর নেমন্তন্ন করবে না। তা কখনো করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখন ওঠে নি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েচে,—সামান্য একটু টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদীঘির ধারে। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তরপাড়ার গণেশ কাওরা লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে বললে, "কি খোকা ঠাকুর, যাচ্ছ কনে এত ভোরে?"

"তাল কুড়ুতে দীঘির পাড়ে।"

"বড্ড সাপের ভয় খোকাঠাকুর। বর্ষাকালে ওখানে যেও না একা-একা।"

গোপাল ভয়ে ভয়ে দীঘির তালপুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগলো। বড় আর কালো কুচকুচে একটা মাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসবার পথে আরও গোটা-তিনেক ছোট তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, এত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই, দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটি পিসীমার বাড়ী হাজির।

জটি পিসীমা সবেমাত্র সদর দোর খুলে দোরগোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক্ হয়ে বললেন, "কিরে খোকা?"

গোপাল একগাল হেসে বললে, "তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসীমা!"

জটি পিসীমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে, তালনবমী কবে জিগ্যেস করে; কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। সারাদিন গোপালের মন খেলাধুলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে, মুখ উঁচু করে দেখে—নারকোল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়চে, বাঁশ ঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়চে বাদলার হাওয়ায়, বকুলতলার ডোবার কট্‌কটে ব্যাঙের দল থেকে থেকে ডাকচে।

গোপাল জিগ্যেস্ করলে, "ব্যাংগুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?"

গোপালের মা বলেন, "নতুন জলে ডাকে, এখন পুরোনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।"

"আজ কি বার, মা?

"সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কি দরকার?"

"মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা ?"

"তা হয়তো হবে। কি জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কি দরকার আমার ?"

সারাদিন কেটে গেল। নেপাল বিকেলের দিকে জিগ্যেস করলে, "জটি পিসীমার বাড়ীতে তাল দিইছিলি আজ সকালে ? কোথায় পেলি তুই ? আমি তাল দিতে গেলে পিসী বললেন, 'গোপাল তাল দিয়ে গেচে, পয়সা নেয় নি।'—কেন দিতে গেলি তুই ? একটা পয়সা হ'লে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম !"

"ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস্ দাদা, কাল তো তালনবমী !"

"সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে, পয়সা নিলেও করবে। তুই একটা বোকা !"

"আচ্ছা দাদা, কাল তো মঙ্গলবার না ?"

"হুঁ।"

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ীর পাশের বড় বকুল গাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে ; জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে— কাল সকালটা হ'লে হয়। কতক্ষণে যে রাত পোহাবে !···

জটি পিসীমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়, 'খোকা, কাঁকুড়ের ডাল্না আর নিবি ? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে।" জটি পিসীমার বড় মেয়ে লাবণ্য-দি একখানা থালায় গরম-গরম তিল-পিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললে, "খোকা, ক'খানা নিবি তিল-পিটুলি ?"—বলেই লাবণ্য-দি থালাখানা উপুড় করে তার পাতে ঢেলে দিলে। তার পর জটি পিসীমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন "খোকা যাই তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হ'ল !···খা, খা,—খুব খা—আজ যে তালনবমী রে !"—কত কি চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারির গন্ধ—বাতাসে ! খেজুর গুড়ের পায়েসের সুগন্ধ—বাতাসে ! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠলো। সে বসে বসে খাচ্ছে, কেবলই খাচ্ছে !···সবারই খাওয়া শেষ, ও তবুও খেয়েই যাচ্ছে লাবণ্য-দি হেসে হেসে বলছে, "আর নিবি তিল-পিটুলি ?"

"ও গোপাল ?"

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে—জানলার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপ-ঝাড়, তাদের সেই আতা গাছটা···সে শুয়ে আছে তাদের বাড়ীতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেচে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বলচেন, "ওঠ ওঠ বেলা হয়েচে কত ! মেঘ করে আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না।"

বোকার মত ফ্যাল্ফ্যাল্ করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

"আজ কি বার, মা··· ?"

"মঙ্গলবার।"

তাও-তো বটে! আজই তো তালনবমী! ঘুমের মধ্যে ওসব কি হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়লো, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েচে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইলো। বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা সিরসির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইলো বটে, কিন্তু কই, পিসীমাদের বাড়ী থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এলো না!

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুজ্যের বড় ছেলে পাঁচু আর ও-পাড়ার হরেন…

গোপাল ভাব্‌লে, এরা যায় কোথায়?

এ-দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভট্‌চাজ ও তার ছোট ভাই দীনু, সঙ্গে এক পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেছে।

দীনু ভট্‌চাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে, "এখানে বসে কেন রে? যাবিনে?"

গোপাল বললে, "কোথায় যাচ্ছিস তোরা?"

"জটি পিসীমাদের বাড়ী তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। করে নি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেচে কিনা, সবাইকে তো বলেনি…"

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? আমরা এর পরে যাবো…"

রাগ করবার মতো কি কথা সে বলেচে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক্ হয়ে বললে, "বারে! তা অত রাগ করিস কেন? কি হয়েচে?"

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়লো—বোধ হয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে কদিন থেকে! কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল? তার সজল ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুটকে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে একে তার বাড়ীর সামনে দিয়ে জটি পিসীমাদের বাড়ীর দিকে চলে গেল…

রক্কিণী দেবীর খড়্গ

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।

আমার জীবনে একবার এইরূপ 'একটা' ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার যুক্তি-যুক্ত কারণ তখন বা আজ কোনদিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমি খালাস, তাঁহারা যদি সে রহস্যের কোনো স্বাভাবিক সমাধান নির্দ্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিব।

ঘটনাটা এইবার বলি।

কয়েক বছর আগেকার কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখন মাস্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাংলাদেশের একঘেয়ে সমতলভূমির কোনো পল্লী আর চোখে ভালো লাগে না। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বি ভাবে সারা গ্রামের বাড়ীগুলি অবস্থিত—সর্ব্বশেষ সারির বাড়ীগুলির খিড়কি দরজা খুলিলেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুরিচ, বিল্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল, একটা সুবৃহৎ বটগাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদী, ছোট বড় শিলাখণ্ড ও ভেলা কাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথম ও-গ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া এক জায়গায় শালবনের মধ্যে একটি পাথরের ভাঙা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দুটি উপরের ক্লাসের ছাত্র—তাহারা মানভূমবাসী বাঙালী। একটা কথা—চেরো গ্রামে বেশির ভাগ অধিবাসী মাদ্রাজী, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে, অনেকে বাংলা আচার-ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কি করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানে এতগুলি মাদ্রাজী অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজবাড়ীর দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মতো ধরনটা—এ অঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও বিগ্রহশূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালের পাথরের চাঁই কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ও চারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়,—অনুভূতিটা

ভয়ের। ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল একথা তারপর বাড়ী ফিরিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম মন্দিরটা ভালো করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়া বলিল, "যাবেন না স্যার ওদিকে…"

"কেন?"

"জায়গাটা ভালো না। সাপের ভয় আছে সন্ধ্যেবেলা। তা ছাড়া লোকে বলে অনেক রকম ভয়ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।"

"ওটা কি মন্দির?"

"ওটা রঙ্কিণীদেবীর মন্দির, স্যার! কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও কোনোদিন ওখানে পুজো হ'তে দেখে নি—মূর্ত্তিও নেই বহুকাল। ওইরকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদার আমলেরও আগে থেকে।…চলুন স্যার নামি।"

ছেলে দুটা যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল নামিবার জন্য।

রঙ্কিণীদেবী বা তাঁহার মন্দির সম্বন্ধে দু-একজন বৃদ্ধ লোককে ইহার পর প্রশ্নও করিয়াছিলাম —কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন, আমার মনে হইয়াছে রঙ্কিণী দেবী সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা বলিতেও তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে-বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম।

বছর খানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজকর্ম্ম খুব হাল্কা, অবসর-সময়ে এ-গ্রামে ও-গ্রামে বেড়াইয়া এ অঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ বাতিক আমার অনেকদিন হইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে খাড়া উঁচু একটা অদ্ভুত গঠনের পাহাড়ের মাথায় জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাসে বড় মেলা বসে। বি-এন-আর লাইনের একটা ছোট স্টেশনও আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূমপ্রবাসী উড়িয়া ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হইয়া গেল --তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করিতেন। পট, পুঁথি, ঘট সংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামে চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহার মুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টারও। এদেশে প্রচলিত কত রকম আজগুবি ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের—কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশি) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবং এই সব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিনে বৃদ্ধ পোস্টমাস্টারের বাড়ীতে গিয়া যে হানা দিয়াছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এই সব আরণ্য অঞ্চল সভ্যজগতের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত, এখানকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক, জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছায়ায়

শালবন-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় সেগুলি শুনিবার সময় মনে হইত—এদেশে এরূপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কি! কলিকাতা বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়।

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন, "চেরো পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবীর মন্দির দেখেচেন?" আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম।

রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমি আর কোনো কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, সেদিন সন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা সামান্য কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম, "মন্দির দেখেচি, কিন্তু রঙ্কিণী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিগ্যেস্ করেচি সেই চুপ করে গিয়েচে কিংবা অন্য কথা পেড়েচে—এর কারণ কিছু বলবেন?"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "রঙ্কিণী দেবীর নামে সবাই ভয় খায়।"

"কেন বলুন তো?"

"মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করতো। তাদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদেরও ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মতো নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর—আগে ওই মন্দিরে নরবলি হ'ত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিণী মন্দিরে নরবলি হয়েচে। অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিণী দেবী অসন্তুষ্ট হ'লে রক্ষা নেই—অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তাহ'লে। এরকম অনেকবার হয়েচে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ অঞ্চলে, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্তমাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথমে এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে একথা শুনেছিলাম।"

"রঙ্কিণী দেবীর বিগ্রহ দেখেছিলেন মন্দিরে?"

"না, আমি এসে পর্য্যন্ত ওই ভাঙা মন্দিরই দেখচি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায় অন্য কোন্ দেশে। রঙ্কিণী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইত বংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তাঁর বাড়ী ছিল ওই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি—তখন তার বাড়ী অনেকবার গিয়েচি। দেবীর খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার কথাও তাঁর মুখে শুনি। এখন তাঁদের বংশে আর কেউ নেই। তার পর চেরো গ্রামেও আর বহুদিন যাই নি—বয়েস হয়েচে, বড় বেশি কোথাও বেরুই নে।"

"বিগ্রহের মূর্ত্তি কি?"

"শুনেছিলাম কালীমূর্ত্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকতো অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েচে তার লেখা-জোখা নেই—এখনও মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢিবি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।"

সাধে এদেশের লোক ভয় পায়! শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথে আমারই গা ছমছম করিতে লাগিল।

আরও বছর দুই সুখে-দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে হয়তো সেখানে আরও অনেকদিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালীদের সঙ্গে মাদ্রাজীদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজীরা স্কুলের জন্যে বেশি টাকাকড়ি দিত, তাহারা দাবি করিতে লাগিল কমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরাজির মাস্টার একজন মাদ্রাজী রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজি পড়াইতাম—মাঝে হইতে আমার চাকুরী রাখা দায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের দেশে একটি হাই স্কুল হইয়াছিল, পূর্ব্বে একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাস্টারি আমার ছাড়িতে হয় নাই। কিসের জন্য ছাড়িয়া দিলাম পরে সে কথা বলিব।

এই সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেরো গ্রামে কি কার্য্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহার গরুর গাড়ী সমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়ীতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্ব্বেই কখনও আমার বাসায় আসেন নাই ; বাড়ীতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, "এই বাড়ীতে থাকেন আপনি ?"

বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ী তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরে থাকতাম। বছর খানেক হ'ল স্কুলের সেক্রেটারি রঘুনাথন্ এটা ঠিক করে দিয়েচেন।"

পুরানো আমলের পাথরের গাঁথুনির বাড়ী। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকে একটা সরু যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা – হাজার ভূমিকম্পেও এ বাড়ীর একটু চুন বালি খসাইতে পারিবে না। বৃদ্ধ বসিয়া আবার বাড়ীটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়ীটার গড়ন তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, বলিলাম, "সেকালের গড়ন, খুব টন্‌কো—আগাগোড়া পাথরের।"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "না, সেজন্যে নয়। আমি এই বাড়ীতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম—এই বাড়ীই হ'ল রুক্মিণী দেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আর কেউ নেই। আপনি যে এবাড়ীতে আছেন তা জানতাম না।...তা বেশ বেশ। অনেকদিন পরে বাড়ীটাতে ঢুকলাম কিনা, আমার বড় অদ্ভুত লাগচে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, আর এখন হ'ল প্রায় ষাট।" তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

আরও বছর খানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরীর আশ্বাস পাইলেও আমি এখনও যাই নাই, কারণ এখানকার বাঙালী-মাদ্রাজী সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে, আপাততঃ আমার চাকুরীটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম—মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গরুর গাড়ী করিয়া রওনা হই,

রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখহরি আমার রাঁধে, এ কয়দিন স্কুলের ছুটি ছিল, রাখহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই রাখহরি বলিয়া উঠিল, "এঃ, বাবু, এ কিসের রক্ত! দেখুন..."

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম।

তাই বটে! বাহিরের দরজায় চৌকাঠের ঠিক ভিতর দিক হইতেই রক্তের ধারা উঠান বাহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য যেন কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আমি তো অবাক! কিসের রক্তের ধারা এ! কোথা হইতেই বা আসিল, আজ দুদিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ীর ভিতরের উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার উপর সদ্য তাজা রক্ত!

অবশ্য কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এ ক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকে বলিলাম, "দেখতো রে, রক্তটা কোন্ দিকে যাচ্চে—এ সেই বড় হুলো বেড়ালটার কাজ..."

রক্তের ধারাটা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নিচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণ অন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোরা পুরনো মালে ভর্ত্তি বলিয়া আমি কোনোদিন চোর-কুঠুরি খুলি নাই। চোরকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালা বন্ধ, যদি বিড়ালের ব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্রপথ দরকার হয়।

চোরকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ঘরটায় পুরনো, ভাঙা, তোবড়ানো টিনের বাক্স, পুরনো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচাধরা সড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতি ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি বাবু! এতে কি করে এমনধারা রক্ত লাগলো..."

তারপর সে কি একটা জিনিস হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখুন কাণ্ডটা বাবু..." জিনিসটাকে হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

একখানা মরিচাধরা হাতলবিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রাম-দা—আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড় চওড়া ফলাটা তাজা রক্তে টকটকে রাঙা! একটু আধটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত মাখানো, মনে হয় যেন খাঁড়াখানা হইতে এখনি টপটপ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে!

সেই মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে আমার অনেক কথা মনে হইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। রুক্মিণীদেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ী এটা। পুরানো

জিনিসের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে রুক্মিণী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়াছিল হয়তো।...মড়কের আগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার প্রবাদ!

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

মড়ক কোথায় ভাবিতে পারিতাম যদি সময় পাইতাম সন্দেহ করিবার। কিন্তু তাহা পাই নাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় চেয়ো গ্রামে প্রথম কলেরা রোগীর খবর পাওয়া গেল। তিন দিনের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া মড়ক দেখা দিল—প্রথমে চেয়ো, তারপর পাশের গ্রাম কাজরা, ক্রমে জয়চণ্ডীতলা পর্য্যন্ত মড়ক বিস্তৃত হইল। লোক মরিয়া ধুলধাবাড় হইতে লাগিল। চেয়ো গ্রামের মান্দ্রাজী বংশ প্রায় কাবার হইবার যোগাড় হইল।

মড়কের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম; তারপর আর কখনো চেয়োতে যাই নাই—গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্বেই দেশের স্কুলের চাকুরীটা পাইয়াছিলাম।

সেই হইতে রুক্মিণী দেবীকে মনে মনে ভক্তি করি! তিনি অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকেই অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।

মেডেল

কয়েক বছর পূর্ব্বে এ ঘটনা ঘটেচে, তাই এখন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আগা-গোড়া মিথ্যে; আমারই কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতার দরুন হয়তো চোখে ভুল দেখে থাকবো বা ওই রকম কিছু।—কিন্তু আমার মন বলে, তা নয়, ঘটনাটা মিথ্যে ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ ঘটে নি। আমার তখনকারের অভিজ্ঞতাই সত্যি, এখন যা ভাবচি, তাই মিথ্যে।

ঘটনাটি খুলে বলা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে গোড়াতেই বলে রাখি যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার শরীরে কোনো রোগ-বালাই নেই। আমার মন বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং যে সময়ের কথা বলচি, এখন থেকে বছর চারেক আগে, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। আমার স্কুলমাস্টারের জীবনে অত্যাশ্চর্য্য বা অবিশ্বাস্য ধরণের কখনও কিছু দেখি নি। অন্য পাঁচজন স্কুলমাস্টারের মতোই অত্যন্ত সাধারণ ও একঘেয়ে রুটিন বাঁধা কর্ত্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটিয়ে চলেছি আজ বহু বৎসর।

সে বছর বর্ষাকালে, গরমের ছুটির কিছু পরে একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এমন সময় একটি ছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করে কি একটা কেড়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করচে, আমার চোখে পড়লো। আমি ওদের দু'জনকে অমনোযোগিতার জন্যে ধমক দিতে, অন্য একটি ছেলে বলে উঠলো, "স্যার, কামিখ্যে সুধীরের মেডেল কেড়ে নিচ্ছে..."

"কার মেডেল? কিসের মেডেল?"

সুধীর নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমার মেডেল, স্যার।"

অন্য ছেলেটির দিকে চেয়ে বললুম, "ওর মেডেল তুমি নিচ্ছিলে, কামিখ্যে?"

কামিখ্যে ওরফে কামাখ্যাচরণ মৌলিক নামে ছেলেটি বললে, "নিচ্ছিলুম না স্যার, দেখতে চাইছিলুম; তা, ও দেবে না..."

"ওর মেডেল যদি ও না দেয়; তোমার কেড়ে নেবার কি অধিকার আছে? বোসো, ও রকম আর করবে না..."

কথা শেষ করে সুধীরের দিকে চেয়ে ক্লাসের ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সখ্য থাকার ঔচিত্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেবার পরে ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, "কই, কি মেডেল দেখি? কোথায় পেলে মেডেল?"

ভেবেছিলুম আজকাল কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে সব ব্যাডমিণ্টন খেলা, সাঁতারের বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারই কোন কিছুতে সুধীর হয়তো চতুর্থ স্থান বা ওই ধরনের কোনো সাফল্যলাভ করে ছোট্ট এতটুকু একটা আধুলির মতো মেডেল পেয়ে থাকবে—এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে সেটা ক্লাসে এনে পাঁচজনকে গর্ব্ব-ভরে দেখাতে চাইবে, এমন কি এই ছুতো অবলম্বন করে ক্লাস সুদ্ধ, হেডমাস্টারের কাছে দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে একবেলার জন্যে ছুটিও চাইতে পারে। সুতরাং মেডেলটা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছুলো, তখন সেটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাত পেতে নিলুম; কিন্তু মেডেলটার দিকে একবার চেয়ে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলুম। না, এ তো পাড়ার ব্যাডমিণ্টন্ ক্লাবের বাজে মেডেল নয়, মেডেলটা পুরনো, বড় ও ভারি চমৎকার গড়ন!—কি জিনিস দেখি?

মেডেলের গায়ে কি লেখা রয়েচে, আধ-অন্ধকার ক্লাসরুমে ভালো পড়তে পারলুম না—ও-পিঠ উল্টে দেখি, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অল্প-বয়সের মূর্ত্তি খোদাই করা। পকেটে চশমা নেই, মনে হ'ল অফিস ঘরের টেবিলে ফেলে এসেচি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছেলে ভিড় করেচে আমার চেয়ারের চারিপাশে—মেডেল দেখবার জন্যে। তাদের ধমক দিয়ে বললুম, "যাও, বোসোগে সব, ভিড় কোরো না এখানে।"

একটা ছেলেকে বললুম, "কি লেখা আছে মেডেলের গায়ে পড়ো তো?"

ক্লাস ফোরের ছেলে—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পড়লে, "ক্রাইমিয়া, সিবাস্টোপোল, ভিক্টোরিয়া রেজিনা...।"

"ও পিঠে?"

"সার্জেণ্ট এস্. বি. পার্কিন্‌স্, সিক্সথ ড্রাগন্ গার্ডস্—আঠারো শ' চুয়ান্ন সাল..."

দস্তরমতো অবাক্ হয়ে গেলুম। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় সিবাস্টোপোলের রণক্ষেত্রে কোনো সাহসের কাজ করবার জন্যে এই মেডেল দেওয়া হয়েছিল ইংলণ্ডের সামরিক দপ্তর থেকে ড্রাগন্ গার্ডস্ সৈন্যদলের সার্জেণ্ট পার্কিন্‌সকে। এ তো সাধারণ জিনিস মোটেই নয়!

ক্রাইমিয়া...সিবাস্টোপোল?...চার্জ অফ্ দি লাইট ব্রিগেড্! কিন্তু কলকাতার নীলমণি

দাসের লেনের সুধীর সাহার কাছে সে মেডেল কোথা থেকে আসে ?

"এদিকে এসো, এ মেডেল কোথায় পেয়েচ ?"

"ওটা আমার স্যার !"

"তোমার তা বুঝলুম। পেলে কোথায় ?"

"আমার দাদু দিয়েচেন স্যার।"

"তোমার দাদু কোথায় পেয়েছিলেন জানো ?"

"হ্যাঁ, স্যার জানি। আমার দাদুর বাবার কাছে এক সাহেব জমা রেখে গিয়েছিল।"

"কি ভাবে ?"

"আমাদের মদের দোকান ছিল কিনা, স্যার্! মদ খেয়ে টাকা কম পড়লে ওটা বাঁধা রেখে গিয়েছিল, আর নিয়ে যায় নি—দাদুর মুখে শুনেচি।"

হিসেব করে দেখলুম ছিয়াশি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে সেই বছরটি থেকে, যে বছরে সার্জেণ্ট পার্কিন্‌স্ (সে যেই হোক্) এ মেডেল পায়। তখন তার বয়স যদি কুড়ি বছরও থেকে থাকে, এখন তার বয়স হওয়া উচিত একশো ছয়। সুতরাং সে মরে ভূত হয়ে গেছে কোন্ কালে।

সেদিন ছিল শনিবার, সকাল সকাল স্কুল ছুটি হবে এবং অনেক দিন পরে সেদিন দেশে যাবো পূর্ব্বেই ঠিক করে রেখেছিলুম। আমার এক গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশায় ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, বেশ পড়াশুনো আছে, গ্রামেই থাকেন। ভাবলুম, তাঁকে মেডেলটা দেখালে খুশি হবেন খুব। সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটি চেয়ে নিলুম, সোমবারে ফেরত দোব বললুম। স্কুলের ছুটির পরে বাসা থেকে সুটকেস্ নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে আড়াইটের গাড়ী ধরলুম। দেশের স্টেশনে যখন নামলুম, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। দু'মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ী পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই হয়তো পৌঁছুতে পারা যেত—কিন্তু আমি খুব জোরে হাঁটি নি।

ভাদ্র মাসের শেষ, অথচ বৃষ্টি তত বেশী না-হওয়ায় পথ-ঘাট বেশ শুকনো খট্‌খটে। পথের ধারের বর্ষা-শ্যামল গাছপালা চোখে বড় ভালো লাগছিল অনেক দিন কলকাতা বাসের পরে—তাই জোরে পা না-চালিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিলুম। এখানে প্রথমেই বলি, আমার বাড়ীতে কেউ থাকে না। পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধা, আমি গেলে রান্না করে দিয়ে আসতেন বরাবর। আমার এক বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন, অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকে, পিসিমার মুখে শুনলুম, আজ দিন পনরো হ'ল বৃন্দাবন বাড়ী এসেচে। শুনে বড় আনন্দ হ'ল, সন্ধ্যার পরেই ওর সঙ্গে দেখা করবো ঠিক করে, চা খেয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বার হলুম—যাবার সময় সুটকেসটা খুলে মেডেলটা পকেটে নিলুম, বৃন্দাবনকেও দেখাবো।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি—বর্ষার দরুণ নদীর জল ভয়ানক বেড়েচে, নদীর জল কূল ছাপিয়ে দু'ধারের মাঠে পড়েচে। অনেকক্ষণ বসে রইলুম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো একটু একটু, বাদুড়ের দল বাসায় ফিরচে। কেউ কোনো দিকে নেই।—এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে নদীর

পাড় ভেঙে গিয়েচে। অনেকটা উঁচু পাড়, নিচে খরস্রোতা বর্ষার নদী। জায়গাটা দিয়ে যেতে যেতে একবার কি-রকম ভেঙেচে দেখবার ইচ্ছে গেল। পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে জলের আবর্ত্ত দেখচি, পাড়টা সেখানে অনেকখানি উঁচু, জল অনেক নিচে—হঠাৎ আমার মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জেগে উঠলো—আমি লাফ দিয়ে পাড় থেকে জলে পড়বো!···দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছাটা যেন ক্রমে বেড়ে উঠচে···লাফাই···দিই লাফ···! অথচ বর্ষার খরস্রোতা নদী, কুটো ফেললে দু'খানা হয়ে যায়! আমি সাঁতার জানি না,—গভীর জল পাড়ের নিচেই! ইচ্ছাটা কিছুতেই যেন সামলাতে পারচিনে! এমন কি আমার মনে হ'ল আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাকে লাফ দিতেই হবে, নইলে আমার জীবনের সুখ চলে যাবে!···

তাড়াতাড়ি নদীর পাড় থেকে এক রকম জোর করেই চলে এলুম। কারণ যেন মনে হচ্ছিল এর পর আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, পা দুটো যেন ক্রমশ সীসের মত ভারি হয়ে উঠচে—এর পর ওই বিপজ্জনক নদীর পাড় থেকে পা দুটোকে নাড়াবার ক্ষমতা চলে যাবে আমার!···

নদীর ধার থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ী আসবার পথে ও সব ইচ্ছে আর কিছু নেই। আমি নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম—কি অদ্ভুত! এ রকম হওয়ার মানে কি? ট্রেনে বসে অতিমাত্রায় ধূমপান করেছিলাম মনে পড়লো। ওই ভাদ্র মাসের গরমে অত ধূমপান করা ঠিক হয় নি, তার ওপর বাড়ী এসে দু'তিন পেয়ালা চা খেয়েচি। এ সবেই ওরকমটা হয়ে থাকবে।—নিশ্চয়ই তাই।

বৃন্দাবনের বাড়ী গেলুম। বৃন্দাবনকে অনেক দিন পরে দেখে সত্যিই আনন্দ হ'ল। দুজনে অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে অনেক গল্প করলুম। অনেক-বছর-ধরে-জমানো অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় গরম আজ, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্রমাসের গুমোট গরম। বৃন্দাবন বললে, "চল্ ভাই, ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি, তবুও একটু হাওয়া পাওয়া যাবে।···তুই আমাদের এখানে খেয়ে যাবি—মা বলে দিয়েচেন। তোদের বাড়ীতেও খবর দেওয়া হয়েচে।"

দুজনে ছাদে উঠলুম। বাড়ীটা দো-তলা। দো-তলার ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর আছে। আমি জানতুম, বৃন্দাবনের কাকা ওই ঘরটায় থাকেন। দো-তলার ছাদে উঠে দেখলুম—বাড়ীর পেছন দিক্‌টায় বাঁশের ভারা-বাঁধা। বললুম, "বাড়ীতে রাজমিস্ত্রি খাটচে বুঝি, বৃন্দাবন?"

"হ্যাঁ ভাই, কাকার ঘরটা মেরামত হবে; উত্তর দিকে দেওয়ালটার গা থেকে নোনা ধরা ইটগুলো বার করা হচ্ছে।"

বৃন্দাবন দোতলায় ঘরটার মধ্যে ঢুকলো—আমার কিন্তু মনে কেমন একটা অস্থির ভাব! খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গল্প করে আমি একটু জল খেতে চাইলুম। বৃন্দাবন জল আনতে নিচে নেমে গেল, আমি ছাদে পায়চারি করতে লাগলুম। ছাদে কেউ নেই। অন্ধকার ছাদটা। ···যে দিকটায় রাজমিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করচে, পায়চারি করতে করতে সেখানটাতে গিয়ে

দাঁড়িয়ে দেখচি, হঠাৎ আমার মনে হ'ল—ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়িনে কেন ?

বেশ হবে!...লাফ দেবো ? প্রায় দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হ'ল লাফ দেবার। লাফ দেওয়াই ভালো।...লাফ দিতেই হবে।...দিই লাফ ?...এমন সময় বৃন্দাবন ছাদের ওপর এসে বললে, "আয় ঘরের মধ্যে, মা চা পাঠিয়ে দিচ্চেন ; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?"

আরও প্রায় আধ-ঘণ্টা কথা বলবার পরে, নিচে থেকে চা ও খাবার এসে পৌঁছুলো! আমরা দুই বন্ধুতে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব করলুম। তার পর বৃন্দাবন খাওয়ার কতদূর যোগাড় হ'ল দেখতে নিচে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরের ছাদে খোলা হাওয়ায় আবার বেড়াতে লাগলুম। রাজমিস্ত্রিদের ভারার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমার মনে হ'ল—লাফ এবার দিতেই হবে। কেউ নেই ছাদে। কেউ বাধা দিতে আসবে না—এই উপযুক্ত অবসর! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের গভীর তলায় কে যেন বলচে—'লাফ দিও না, মূর্খ! লাফ দিও না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে।'... আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করচে!...

কতক্ষণ পরে জানিনে, এবং কিসে থেকে কি হ'ল তাও জানিনে,—হঠাৎ বৃন্দাবনের চীৎকারে আমার চমক ভাঙলো ? দেখি, বৃন্দাবন আমাকে হাত ধরে টেনে তুলচে!

"একি সর্ব্বনাশ! তুই লাফ দিয়ে পড়লি দেখলুম যেন! ভাগ্যিস, বাঁশে পা-বেধে গিয়েচে তাই রক্ষে...কি হ'ল তোর ?"

আমার মাথা যেন কেমন ঘুরছিল, গা ঝিম্‌ঝিম করছিল। বৃন্দাবনকে বললুম, "আমি ভাই কিছুই জানিনে তো ?..."

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দিলে। সকলে বললে ট্রেনে আসার দরুন আর গরমে শরীর কি রকম খারাপ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। আমি জানি মাথা ঘুরে পড়ে আমি যাই নি, লাফ আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলুম—তবে ঠিক যে সময়টাতে আমি লাফ দিয়েচি সে সময়ের কথাটা আমি অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।

বিছানায় শুয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলুম। পাশ ফিরতে হঠাৎ যেন কি একটা শক্ত জিনিস বুকের কাছে ঠেকলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি—সুধীরের সেই মেডেলটা।

আশ্চর্য্য, এটার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম! বৃন্দাবনকে সেটা দেখালুম। ওদের বাড়ীর সকলে মেডেলটা হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে।

রাত্তিরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। আমার বাড়ীতে কেউ নেই বর্ত্তমানে, একাই থাকি এক ঘরে। একটা জিনিস লক্ষ্য করচি ; যখন থেকে বৃন্দাবনের বাড়ী থেকে বার হয়ে পথে পা দিয়েছি, তখন থেকেই কেমন এক ধরনের ভয় করচে আমার! বাড়ীতে যখন ঢুকলুম, তখন ভয়টা যেন বাড়লো। একা ঘরে কতবার এর আগে শুয়েচি—এমন ভয় হয় নি মনে কোন দিন।...না, শরীরটা সত্যিই খারাপ। শরীর খারাপ থাকলে মনও দুর্ব্বল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার শিয়রের কাছে একটা বড় জানলা—জানলা

দিয়ে বাড়ীর পেছনের বন-বাগান চোখে পড়ে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—কৃষ্ণ-পক্ষের একাদশীর জ্যোৎস্না। হাওয়া আসবে বলে জানলা খুলে রেখেচি। কতক্ষণ ঘুম হয়েছিল জানি নে, ঘণ্টা-খানেকের বেশি হবে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হ'তে লাগলো আমার শিয়রের দিকের জানলায় কে দাঁড়িয়ে! যেন মাথা তুলে সেদিকে চেয়ে দেখলেই তাকে দেখা যাবে! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হ'ল। অথচ কিসের যে ভয় জানিনে। এমন ভয় যে, কিছুতেই শিয়রের জানলার দিকে তাকাতে পারলুম না। চোখে না দেখলেও আমার বেশ মনে হ'ল, জানলার গরাদেতে দুটো হাত রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে—জ্বলন্ত চোখে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েচে—আমি ওদিকে চাইলেই দেখতে পাবো।

প্রাণপণে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম,—কিছুতেই চাইবো না। ঘুমুবার চেষ্টা করলুম,—কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কি ইঁদুর পচেছে? কিসের পচা গন্ধ? যেন আয়োডিন্, লিণ্ট, মলম প্রভৃতি উগ্র গন্ধের সঙ্গে পচা ক্ষতের গন্ধ মেশানো? এতকাল বাড়ীতে থাকা নেই, যার ওপর বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখার ভার, সে কিছুই দেখাশোনা করে না বোঝা গেল। ·

কে যেন আমার মনের ভেতর বলচে, "চেয়ে দেখ, তোমার মাথার শিয়রের জানলার দিকে চেয়ে দেখ না?"

ঘরের চারিধারে কিসের যেন একটা প্রভাব—কোনো অমঙ্গলজনক, হিংস্র, উগ্র, অশান্ত ধরনের ব্যাপারটা,—ঠিক বলে বোঝানো যায় না। আমি যেন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সে এমন বিপদ, যা আমাকে মরণের দোর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে—এমন কি সে দোরের চৌকাঠ পার করে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিমশীতল নীরবতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতেও পারে!···

···আমি চাইবো না···কিছুতেই চাইবো না শিয়রের জানলার দিকে।

কিন্তু যে প্রভাবই হোক্, আমার ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের এ পিঠে তার অধিকার নেই। বহুকাল ধরে পূর্ব্বপুরুষেরা বাস্তু শালগ্রামের অর্চ্চনা করেচেন এ ঘরে···এর মধ্যে কারো কিছু খাটবে না। আমার মনই আবার এ কথাগুলি যেন বললে! অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন ঘরে মন কত কথা কয়!

জানলার ধারে কি যেন একটা শব্দ হ'ল!

অদ্ভুত ধরনের শব্দটা। কে যেন জানলার গরাদের ওপর ঠোকা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইচে!···একবার···দুবার, তিনবার···ভয়ে আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগলো···কাউকে ডাকবো চীৎকার করে?···একবার চেয়ে দেখবো জানলার দিকে জিনিসটা কি? হঠাৎ আমার মনে পড়লো একটা ধাড়ি বেঁজী অনেকদিন থেকে বাইরের দেওয়ালে, কড়িকাঠের খোলে বাসা বেঁধে আছে··আজ বিকেলেও সেটাকে একবার দেখেচি। জানলার ওপরকার কাঠে সেটা পোকামাকড় বা জোনাকি ধরছে···এ তারই শব্দ।

কথাটা মনে হ'তেই মনের মধ্যে সাহস আবার ফিরে এলো।···উঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন!···শরীর অসুস্থ থাকলে কত সামান্য কারণ থেকে ভয় পায় মানুষ! পাশ ফিরে

এবার ঘুমুবার চেষ্টা করলুম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু আমার এ ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। এ-ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই গেল না যে, আজ রাত্রে আমি একা নই—আরও কে এখানেই আছে! নিদ্রাহীন চোখে সে আমার ওপর খরদৃষ্টি দিয়ে পাহারা রেখেচে—আমায় সে নিরাপদে বিশ্রাম করতে দেবে না আজ।...

বার বার ঘুম আসে, আবার তন্দ্রা ছুটে যায়, অমনি জেগে উঠি; কিন্তু চোখ চাইতে, বা বিছানার ওপর উঠে বসতে সাহস হয় না...আর সেই শব্দটা মাঝে মাঝে জানলার গরাদের ওপর হ'তে শুনি—খুব মৃদু করাঘাতের শব্দ যেন!...যেন শব্দটা বলচে—"চেয়ে দেখ...পেছন ফিরে জানলার দিকে চেয়ে দেখ..."

ঘামে দেখি বিছানা ভেসে গিয়েচে, ভাদ্রের গুমট গরম কিনা! এই অবস্থায় ভোর হ'ল। দিনের আলো ফুটলে, লোকজনের শব্দ কানে যেতে রাত্রের ভয়টা মন থেকে কোথায় গেল মিলিয়ে! নিশ্চিন্ত মনে বেলা ন'টা পর্য্যন্ত পড়ে ঘুম দিলুম। তার পর উঠে, চা খেয়ে, পাড়ায় বেড়াতে বার হওয়া গেল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো—তখন আমি তার বিশেষ কোন মূল্য দিই নি—কিন্তু পরে সব কথা মনে মনে আলোচনা করে দেখে সেটা ভারী আশ্চর্য্য বলেই মনে হয়েছিল। ও-পাড়ার পথে আমার সেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা, তাঁকে দেখাবার জন্যে আমি মেডেলটা কাল রাত্রে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম—কিন্তু বৃন্দাবনদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি...

আমায় দেখে তিনি বললেন, "এই যে সুরেন, ভালো আছ? কাল তুমি এসেচ দেখলুম, তখন অনেক রাত, তা আর ডাকলুম না। বোধ হয় বৃন্দাবনের বাড়ী থেকে ফিরছিলে? আমি তখন ছাদে পায়চারি করচি, যে গরম গিয়েচে বাবা কাল রাত্তিরে...তোমার সঙ্গে লোক রয়েচে দেখে আরও ডাকলুম না। ও লোকটি কে? খুব লম্বা বটে—যেন শিখ কি পাঞ্জাবীর মতো লম্বা—তোমার বন্ধু বুঝি? বাঙালীর মধ্যে এমন চেহারা—বেশ, বেশ!"

আমি অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললুম, "আমার সঙ্গে লম্বা লোক কাল রাত্তিরে! সে কি জ্যাঠামশায়?"

জ্যাঠামশায় আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে লোক ছিল না বলচো? একা যাচ্ছিলে? আমার চোখের দৃষ্টি একেবারে কি এত খারাপ হয়ে যাবে বাবা..."

আমি হেসে বললুম, "তাই হবে, জ্যাঠামশায়। চোখে কি রকম ঝাপ্‌সা দেখে থাকবেন। বয়েস হয়েচে তো?...আমার সঙ্গে কেউ ছিল না, তা ছাড়া আপনাদের বাড়ীর সামনের আম-গাছটার ছায়া...কি রকম আলো-আঁধার দেখেচেন চোখে...অমন ভুল হয়।"

জ্যাঠামশায় যেন রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন! বললেন, "কি আশ্চর্য্য কাণ্ড? এতটা ভুল হবে চোখে? আমগাছের এদিকে যখন তুমি টর্চ জ্বাললে, তখন দেখলুম তুমি আর তোমার পেছনে একজন লম্বা মতো লোক...তার পর তুমি টর্চ নিবিয়ে আমগাছের ছায়ার মধ্যে ঢুকলে, তখনও জ্যোৎস্নার আলো আর আমগাছের ছায়ার অন্ধকারে আমি বেশ দেখতে

পেলুম লোকটি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে…তোমার মাথার চেয়েও যেন এক হাত লম্বা …তোমার একেবারে ঠিক পেছনে…তবে খুব ভালো তো দেখতে পেলুম না…অতদূর থেকে আর আলো-অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না তো! এমন কি একবার এ পর্য্যন্ত মনে হ'ল তোমায় ডেকে জিজ্ঞেস করি তোমার বন্ধুটি কে?…একেবারে এত ভুল হবে চোখের?"

জ্যাঠামশায়কে পুনরায় বুঝিয়ে বললুম, আমার সঙ্গে কাল কেউ ছিল না। আমি একাই ছিলুম, সুতরাং তাঁর দৃষ্টিশক্তির গোলমাল ছাড়া এ-ব্যাপারের অন্য কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না।

সারাদিন বৃন্দাবনের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটানো গেল। গতকাল রাত্রের ভয়ের ব্যাপার দিনের আলোয় এত হাস্যকর বলে আমার নিজের কাছেই মনে হ'ল যে, বৃন্দাবনকে সে কথাটা বলিও নি।

রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবো। বৃন্দাবনদের বাড়ী থেকে চা খেয়ে বাড়ী এসে সুটকেসটা নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েচি, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ নেমেচে। বাউরিপাড়ার বড় বাগানটার মধ্যে দিয়ে আসচি…বাগানটা পার হ'তে প্রায় পাঁচ-ছ মিনিট লাগে—মস্ত বড় বাগান।

বাগানের ঠিক মাঝামাঝি এসে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইলুম কি ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচম্‌কা ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঠ হয়ে গেল।

কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে?

রাস্তা থেকে একটু পাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে আধ-অন্ধকার এক অদ্ভুত মূর্ত্তি! খুব লম্বা, তার মাথায় ঘোড়ার বালামচির সেই এক লম্বা ধরণের টুপি, পাতলা লোহার চেন দিয়ে থুতনির সঙ্গে বাঁধা—ছবিতে গোরা সৈনিকদের মাথায় যে ধরনের টুপি দেখা যায়!…মূর্ত্তিটা যেন নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে! আমার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ কি তারও কম দূরে! মরীয়ার মতো আর একটু এগিয়ে গেলুম। এই ভয়ানক কৌতুহল আমাকে চরিতার্থ করতেই হবে যেন! মূর্ত্তি নড়ে না চড়ে না—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তি। কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখচি সাত আট গজ মাত্র দূরে তখন মূর্ত্তিটা। আর ঘোড়ার বালামচির লম্বা টুপি ও ইস্পাতের চেনের স্ট্র্যাপ্‌ স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

আমার পা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলো, সারা দেহ কেমন অবশ হয়ে আসচে, মাথাটা হঠাৎ বড় হালকা হয়ে গিয়েচে! বোধ হয় আর আধ মিনিট এ-ভাবে থাকলে মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে যেতুম—কারণ সেই ভীষণ মূর্ত্তিটার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে—আমার পা দুটো বেজায় ভারী হয়েচে—নাড়বার উপায় নেই মূর্ত্তির সামনে থেকে…

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাউরিবাগানের পথে লণ্ঠন নিয়ে কারা ঢুকলো। দু-তিন জন

লোকের গলার শব্দ শুনে আমার সাহস ফিরে এলো। আমি ওদের ডাক দিলুম চীৎকার করে। ওরা ছুটে এলো। আমায় ওখানে বনের মধ্যে দেখে তারা খুব আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "ওখানে কি বাবু? কি হয়েচে?"

তারপর লণ্ঠন তুলে ওরা আমার মুখ দেখে বললে, "ও, আপনি? কি হয়েছে আপনার? মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েচে—ভয়টয় পেলেন নাকি? বাউরিবাগান জায়গাটা ভালো না। সন্ধ্যের পর এখানে অনেকে ভয় পায়।"

ওদের লণ্ঠনটা যখন উঁচু করে তুলে ধরলে আমার মুখে, সেই আলোয় দেখলুম—সামনের মূর্ত্তিটা তখনও সেখানে ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে। একজন বললে, "কি দেখছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে বাবু—এই ষাঁড়াগাছটা?"

আর একজন বললে, "গাছটার ডালপালা কেটে মাথায় ঝোপের মতো করে রেখেচে, যেন মানুষ বলে অন্ধকারে ভুল হয় বটে…চলে আসুন বাবু!"

আমিও দেখলুম ষাঁড়াগাছই বটে। মাথার দিকের পাতাগুলো ছেঁটে গাছটাকে দেখতে হয়েচে ঠিক হর্স্‌গার্ড্‌সদের ঘোড়ার বালামচির টুপি! লোকের চোখের কি ভুলই হয়? কাল আমি আবার জ্যাঠামশায়কে চশমা নিতে বলছিলুম! ভেবে লজ্জা হ'ল মনে মনে। তিনি বৃদ্ধ লোক, তাঁর চোখের ভুল তো হ'তেই পারে—আমারই যখন এই অবস্থা!

ওরা আমায় আলো ধরে স্টেশনে পৌঁছে দিলে।

পরের দিন স্কুলে সুধীরের মেডেলটা ফেরত দিলুম।

সুধীর বললে, "আপনাকে দাদু একবার ডেকেচেন, আমার সঙ্গে ছুটির পর আমাদের বাড়ী আসুন। নিয়ে যেতে বলেচেন।"

সুধীরের দাদু বললেন, "যাক্, আমার বড় ভয় হয়েছিল, মাস্টারবাবু! সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটা নিয়ে গিয়েছেন দেশে শুনলাম কিনা? আপনার দেশের ঠিকানা জানতুম না—তা'হলে একটা তার করে দিতুম।…ও মেডেলটা আমার বাবাকে একজন গোরা সৈন্য দিয়ে যায়—আমি তখন জন্মাই নি। বাঁধা দিয়েছিল আর উদ্ধার করতে পারে নি। বেজায় মাতাল আর গোঁয়ার ছিল লোকটা। ও মেডেলের বিপদ হচ্ছে—আমাদের বংশের লোক ছাড়া অন্য কেউ নিলে তার বড় বিপদ ঘটে। আমার এক ভগ্নীপতি একবার কিছুতেই শুনলে না—অনেককাল আগের কথা—বাড়ী নিয়ে গেল মেডেল দেখাতে; সেই দিনই সন্ধ্যের সময় ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মৃতদেহের পকেট থেকে মেডেলটা বেরুলো।…"

আমি কলের পুতুলের মতো শুধু বললুম, "ছাদ থেকে?…পকেটে মেডেল পাওয়া গেল?…"

"হ্যাঁ, মাস্টারবাবু। আমার নিজের ভগ্নীপতি, মিথ্যে কথা তো বলবো না। আজ সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা।…ওটা আরও দু-এক জন নিয়েচে—তক্ষুনি ফেরত দিয়ে গিয়েচে বলে রাতে ভয় পায়, গা ছমছম করে। কে যেন পেছনে ফলো করচে বলে মনে

হয়! ও বাইরের লোকের সহ্য হয় না। প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়।···তাই ভাবছিলুম একটা তার করে দেবো···”

একটা কথা বলা দরকার। মাসখানেক পরে আমি আবার দেশে যাই। বাউরিবাগানে ঢুকে যেখানে সে-রাত্রে ভয় পেয়েছিলুম, সেদিকে চেয়ে দেখে সে ষাঁড়াগাছটা কোথাও আমার চোখে পড়লো না। যে আমগাছটার ধারে ষাঁড়াগাছটা দেখেছিলুম, সেখানে দিনমানে বেশ ভালো করে দেখেছি—কোথাও সে ষাঁড়াগাছ নেই—বা গাছ কেটে নিলে যে গুঁড়িটি থাকবে, তারও কোন চিহ্ন নেই। কস্মিন্‌কালে সেখানে একটা বড় ষাঁড়াগাছ ছিল বলে মনেও হয় না জায়গাটা দেখে।···

মসলাভূত

বড়বাজারের মসলাপোস্তায় দুপুরের বাজার সবে আরম্ভ হয়েচে। হাজারি বিশ্বাস প্রকাণ্ড ভুঁড়িটি নিয়ে দিব্যি আরামে তার মশলার দোকানে বসে আছে। বাজার একটু মন্দা। অনেক দোকানেই বেচা-কেনা একেবারে নেই বললেই চলে, তবে বিদেশী খদ্দেরের ভিড় একটু বেশি। হাজারির দোকানে লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। ডান হাতে তালপাতার পাখার বাতাস টানতে টানতে হাজারি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ কার পরিচিত গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠলো।

—“বলি ও বিশ্বেস,—বিশ্বেস মশাই!—” বার দুই হাঁক ছেড়ে যতীন ভদ্র তার ডান হাতের লাঠিটা একটা কোণে রেখে দিয়ে সম্মুখের খালি টুলটার উপর ধপাস্ করে বসলো।

যতীন হাজারি বিশ্বাসের সমবয়স্ক—অনেক দিনের বন্ধু। ভাগ্যলক্ষ্মী এতকাল তার ওপর অপ্রসন্ন ছিল। হালে সে হাজারির পরামর্শে মসলার বাজারে দালালী আরম্ভ করেচে। দু'পয়সা পাচ্ছেও সে। যতীনের মোটা গলার কড়া আওয়াজ পেয়ে হাজারি খুব আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে বসলো। হাজারি বিলক্ষণ জানতো যে, যতীন যখনই আসে কোন একটা দাঁও বিষয়ে পাকাপাকি খবর না নিয়ে সে আসে না। তাই সে যতীনকে খুবই খাতির করে।

যতীন বললে, “দেখ, শুধু দোকানদার হয়ে খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকলে তাতে আর টাকা আসে না—ঘুমই আসে। পাঁচটা খবরাখবর রাখতে হয়, বুঝলে?”

হাজারি বললে, “এসো এসো, যতীন। ভালো আছ? অনেক দিন দেখি নি। কিছু খবর আছে নাকি?”

“সেই খবর দিতেই তো আসা। এ-বাজারে শুধু গণেশের পায়ে মাথা ঠুকলেই টাকা করা

যায় না—। অনেক হদিস জানতে হয়—অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে টাকা, বুঝলে ?…এখন কি দেবে বলো। জানই তো যতীন ভদ্র বকে একটু বেশি, কিন্তু খবর যা আনে তা একদম পাকা। যাক্, এখন আসল কথা তোমায় যা বলি বেশ মন দিয়ে শোন…"

যতীন অতঃপর হাজারিকে কাছে বসিয়ে চুপি চুপি তার কথাটা বলে গেল। যতীনের কথায় টাকার গন্ধ পেয়ে হাজারি কান খাড়া করে এমনি একাগ্রভাবে শুনে যেতে লাগলো, যে সত্যনারায়ণের পাঁচালীও লোকে অতটা মন দিয়ে শোনে না।

ব্যাপারটি এই।—

গ্রেহাম্ ট্রেডিং কোম্পানীর একটা মস্ত মাল জাহাজ এস্. এস্. রেঙ্গুন, ডাচ্ ইস্ট্ ইণ্ডিজের কোন এক বন্দর থেকে প্রচুর মাল নিয়ে কলকাতায় আসছিলো। যতরকম মাল বোঝাই ছিল, তার মধ্যে মসলার বস্তাই সব চেয়ে বেশি। লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তেজপাতা প্রভৃতি কত রকমের মসলা। প্রতি বস্তাটি ওজনে আড়াই মণের কম নয়। এরকম শত শত বস্তার গাদায় জাহাজখানা আগাগোড়া ঠাসা। সেই মালজাহাজখানি গঙ্গার ভেতরে ঢুকতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে শেষ রাত্রির ভাঁটার মুখে গঙ্গার চোরাবালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। জাহাজ যখন সবে ডায়মণ্ড হারবার পেরিয়ে গঙ্গায় এসেচে—তখন এই ব্যাপার। সারেঙ্গ শত চেষ্টা করেও কিছুতে সামাল দিতে পারলে না। জাহাজডুবির সঙ্গে কতক লোকও জলে ডুবে মারা যায়। জাহাজের কতক মাল নষ্ট হয়ে যায় আর বাদবাকী মাল সব গঙ্গার জলে ভাসতে থাকে। মসলার বস্তাগুলো প্রায়ই ডোবে নি—বিশেষ ক্ষতিও হয় নি। দূর থেকে ঐ মসলাবস্তার গাদাগুলো ভেসে যেতে দেখে পোর্টকমিশনারের লোকেরা সে সব তুলে পারে টেনে নেয়। কাল সাড়ে আটটার সময় নিলাম ডেকে সেই বস্তাবন্দী মসলাগুলো বিক্রী করা হবে।

ধড়িবাজ হাজারি বিশ্বাস যতীনের কথাবার্ত্তা শুনে চট করে সব বুঝে নিলে। কত লোককে চরিয়ে কত পাকা ধানে মই দিয়ে তবে সে আজ এত টাকার মালিক। কথাবার্ত্তা তখনই সব ঠিক হয়ে গেল। যাবার সময় যতীন আবার হাজারিকে বেশ করে মনে করিয়ে দিয়ে বললে, "দেখো ভায়া! টাকা যদি পিটতে চাও তবে এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া নয়। জলের দামে মাল বিকিয়ে যাচ্ছে। কাল সকাল সাড়ে আটটায় নিলেম। আমি সাতটার সময়েই এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।"

পরদিন হাজারি যতীনকে নিয়ে যথাসময়ে খিদিরপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। নিলামের জায়গায় পৌছুতে আর বেশি দেরি নেই, দূর থেকে কলরব শোনা যাচ্ছে। যতীন আগে আগে চলেচে—হাজারি পেছনে পেছনে ছুটচে। এতবড় সস্তার কিস্তিটা ফস্‌কে না যায়। হাজারি যতীনকে বরাবর নিলামের কাছে বস্তাগুলো গুনতি করতে পাঠিয়ে দিয়েই নিজে সটান এক দৌড়ে সাহেবের কাছে গিয়ে মস্ত বড় এক সেলাম করলে। সাহেবের সঙ্গে দুমিনিট ফিসফাস করে কি কথাবার্ত্তা বলে হাজারি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে নিলামের ডাক বন্ধ করে দিলে।

যতীন বললে, "কি খবর ভায়া—সুবিধে করতে পেরেছ তো?"

হাজারি খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললে, "পরে বলবো। কাজ হাসিল। এখন কত বস্তা গুনলে বলো দেখি?"

"একশো বস্তা গোনা হয়ে গেছে।"

বাস্তবিক, উঁচু উঁচু গাদা-করা মসলার বস্তাগুলোর দিকে চেয়ে হাজারির চোখ জুড়িয়ে গেল। সে যে দিকেই তাকায়, দেখে যে অগুন্তি বস্তা সারবন্দী থামের মতো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঃ, এমন দাঁও জীবনে কারো ভাগ্যে একবার বই দুবার আসে না! এখন মসলাপোস্তায় কোনরকমে তার গুদোমে এগুলো চালান দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

"আর দেরি নয়"—হাজারি যতীনকে তাড়া দিয়ে ডেকে বললে, "ওহে ভায়া, শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন? এখন লরী ডেকে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করে পোস্তায় চালান দিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ এগিয়ে যাই।"

একেবারে সব মাল লরীতে ধরলো না। দ্বিতীয় ক্ষেপ বস্তা চাপিয়ে যতীন যখন পোস্তায় ফিরে গেল তখনও বিকেল আছে। সে এসে দেখে, সবই অব্যবস্থা। রাশীকৃত বস্তার গাদা হাজারির দোকানের সামনে ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিনটি লোক এতগুলো মাল তোলবার জন্যে লাগানো হয়েচে। চতুর্দ্দিকে লোকের মহা ভিড়—হৈ হৈ ব্যাপার! এদিকে পুলিস তাড়া দিচ্ছে—"জল্‌দি মাল হঠাও!" হাজারি কেবল চেঁচাচ্ছে। সে যেন কিছুই গোছগাছ করে উঠতে পারছে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে যতীন নিজেই কোমর বেঁধে লেগে গেল। প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সব মাল তোলা হয়ে গেল। বস্তাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা গেল ঘরে আর কুলোয় না। তখন বস্তার ওপর বস্তা চাপিয়ে দিয়ে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত মাল ঠাসা হ'ল। গম্বুজের মতো এক একটা ফুলো ফুলো বস্তা, আর বস্তাগুলো উঁচুও কি কম! এই ভাবে বস্তা ভরাট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যতীন আর হাজারি যখন বাড়ী ফিরলো তখন রাত দশটা। সে রাত্রে গুদামে তালা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মতো হাজারির চাকর বাইরে শুয়ে রইলো।

শেষ রাত্রে মসলার গুদোমে কি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আশে-পাশে দোকানদারদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা চোরের আশঙ্কা করে চাকরটাকে ডেকে তুললে। চাকরটা শশব্যস্ত হয়ে আলো জ্বেলে বেশ পরখ করে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু চোর ঘরে ঢুকলো কি করে? গুদোমের দরজার তালা বন্ধ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদে আবার দুম্ দুম্ শব্দ! সকলে কান খাড়া করে রইলো। বেশ মনে হ'ল এবারকার শব্দটা যেন হাজারির মসলার গুদোমের ভেতর থেকেই আসচে। অথচ ঘরের দোর-জানলা বন্ধ, বাইরে থেকে মোটা তালা দেওয়া। কি আশ্চর্য্য, চোর ভেতরে যাবেই বা কি করে? আর চোরটোর যদি না এলো তবে শব্দও বা করে কে? মাঝে মাঝে মনে হ'তে লাগলো, ঘরের ভেতর থেকে

ঠেলে বেরিয়ে আসবার জন্যে কারা ভেতর দরজায় ধাক্কা মারচে। শেষ রাতের বাকী সময়টা এইভাবেই শব্দ শুনে কেটে গেল। আরও আশ্চর্য্য, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুদোমঘর থেকে শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সে রাত্রি এই পর্য্যন্ত।

পরদিন সকালে মসলাপট্টির দোকানদারদের মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে হাজারির দোকানে বিষম কাণ্ড, ভীষণ চুরি! আসলে সত্যি যা নয় তার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মিথ্যে রটাতে লাগলো। ক্রমে কথাটা হাজারির কানে উঠলো। হাজারি বিশ্বাস খবর পাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে তালা খুলে গুদোমে ঢুকে দেখে বস্তাগুলো ঠিকই আছে, একটি মালও বেহাত হয়নি। কি ব্যাপার? তখন সে ভাবলে কিছু নয়; তার মসলা-বস্তাগুলো দেখে যাদের চোখ টাটিয়েছিল—এ নিশ্চয়ই সেই বদমাশদের মিথ্যে কারসাজি; তারাই মজা দেখবার জন্যে চুরির গুজব রটিয়েচে, কিন্তু হরে চাকরটাও যে বললে, ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল? এই শব্দ-রহস্যটা হাজারি কিছুতেই কিনারা করতে পারলে না। চোর যদি এসেই থাকবে, তবে কিছু নিলেও না, উপরন্তু শব্দ করে জানান দিয়ে চলে গেল—এ কি ব্যাপার? তবে কি তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই রাত্রিবেলা দুর্ব্বৃত্তেরা এই সব আয়োজন করচে? সাতপাঁচ ভেবে হাজারি সেদিনকার মতো কথাটা চেপে গেল, ভাবলে আজ রাতে আর বাড়ী না গিয়ে নিজেই দোকান পাহারা দেবে!

করলেও তাই। রাত্রে ঘুমোবার আগে হাজারি বেশ করে চাকরটাকে নিয়ে গুদোমের উপর থেকে আরম্ভ করে নিচে পর্য্যন্ত পাতিপাতি প্রত্যেকটি বস্তার গাদা দেখতে লাগলো। তারপর ভেতর থেকে জানলাটা খুলে রেখে ঘরে তালা লাগিয়ে দিল। তবে, আজ একটা নয়—হবসের চার লিভারের দুটো মস্ত ভারী তালা। হাজারি চাকরটাকে নিয়ে ঘরের সামনে শুয়ে নানা কথাবার্ত্তার পর যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন রাত দুপুর।

শেষ রাত্রের দিকে কি একটা শব্দ হ'তেই হাজারির ঘুম ভেঙ্গে গেল। হরে চাকরটা আগেই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। গত রাত্রের ব্যাপারও তার বেশ মনে আছে। তাই সে নিজে আর কোন কথা না বলে চুপ করেই পড়ে ছিল। কিন্তু খানিক বাদেই ও আবার কিসের শব্দ? ধপাস্—ধুপ্—দুম্—দুম্—দাম্! ঘরের ভেতর বস্তায় বস্তায় কি বিষম ধস্তাধস্তি! যেন দৈত্য দানবে লড়াই বেধেচে। হরে আর হাজারি তখন ধড়মড় করে এক লাফে বিছানা ছেড়ে আলো জালিয়ে দেখতে লাগলো তালা ঠিক আছে কিনা। তালা দুটো ঠিকই আছে। হাজারি জানলার ফাঁকে চোখ তাকিয়ে দেখতে পেলে—দুটো প্রকাণ্ড বস্তা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ঢুঁ মারছে। ভয়ে হাজারির চোখ দুটো ডাগর হয়ে উঠলো। বস্তা জীবন্ত হয়ে উঠলো নাকি? না, সে চোখে ভুল দেখছে? না, অনিদ্রায় আর দুর্ভাবনায় তার মাথার ঠিক নেই? হাজারি ভয়ে ভয়ে খানিকটা চোখ বুজে রইলো।

হাজারি চোখ যখন খুললে তখন ভোরের আলো জানলার গরাদ দিয়ে ঘরে স্পষ্ট দেখা দিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-টব্দও সব থেমে গিয়েচে। হরে অমনি বলে উঠলো, "বাবু সেদিনও দেখেচি—ভোর হতেই শব্দ থেমে যায়।" হাজারি আর দ্বিরুক্তি না করে তালা খুলে ঘরে

ঢুকে দেখলে কোথাও কিছু নেই। মালপত্র ঠিকই আছে, তবে কালকের থেকে আজ তফাত এই যে বস্তাগুলো যেটি যে জায়গায় দাঁড় করানো ছিল, সেটি ঠিক সেখানে নেই। প্রত্যেক বস্তাটিই যেন সরে সরে তফাত হয়ে গেছে। একটা বস্তা আর একটার ঘাড়ে কাত হয়ে পড়েচে। বিশেষ করে পেছন দিকের কতগুলো বস্তা হাঙুল-বাঙুল অবস্থায় পড়ে রয়েচে!—হাজারি মহা ভাবনায় পড়ে গেল। চোরই যদি হয় তবে শব্দের সৃষ্টিপাত কেন? আর চোর ঢোকেই বা কোথা থেকে? আর বেরিয়েই বা যায় কেমন করে? অসম্ভব! তবে কি জাহাজডুবির লোকগুলো ডুবে মরে ভূত হয়ে মসলাবস্তায় যে যার ঢুকে বসে আছে?

লাটের মাল কিনে অবধি দু'রাত্রি তো এই ভাবে কাটলো। আজ তৃতীয় রাত্রি। হাজারির রোখ অসম্ভব বেড়ে গেছে! আজ সে মরীয়া হয়ে দুজন লোক নিয়ে সারা রাত্রি গুদামের বাইরে জেগে বসে রইলো। হাতের কাছে যাকেই সে পাবে, কিছুতেই আজ আর তাকে আস্ত রাখবে না। তার এই অভীষ্টসিদ্ধি করার জন্যে দিনমানেই সে খুব ঘুমিয়ে নিয়েচে —পাছে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। টং টং টং টং—পাশের ঘরের ঘড়িতে চারটে বেজে গেল। হাজারির চোখের পাতা পড়ে না। সে ঠায় জেগে আছে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু হঠাৎ এ কি কাণ্ড! শত শত লোক একত্র খুব দম দিয়ে নিশ্বাস টেনে ছেড়ে দিলে যেমন একটা ঝড়ের মতো সাঁই সাঁই করে শব্দ হয়—অবিকল তেমনি একটা শব্দ শোনা গেল।

হাজারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েই এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলো! দরজার দোরগোড়ায় যে দুটো লোক শুয়ে ছিল, হাজারি চট্ করে তাদের জাগিয়ে দিয়ে বললে, "তোরা শীগ্‌গির ঘরের পেছনটায় দৌড়ে গিয়ে দেখ দেখি—চোরেরা সেখানে কোন সিঁধ কেটেচে নাকি।" তারপর হাজারি গুদোমের তালা খুলে ফেললে।

কিসের সিঁধ, আর কোথায় বা চোর! বস্তাগুলো যে সব হাই ছেড়ে সারবন্দী দাঁড়াতে লাগলো! হরে চাকরটা ভয়ের সুরে বললে, "বাবু এদিকে চেয়ে দেখুন!"—হাজারি দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে বললে, "এঁ্যা, বলে কি? আমার মসলার বস্তারা নাচ্‌চে?" চাকর দুজন এ দৃশ্য দেখেই ভয়ে দে চম্পট।

তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড!

বস্তাগুলো সব একটির পর একটি ঠক্ ঠক্ করে ঠিক্‌রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সৈন্ধব লবণের প্রকাণ্ড জাঁদরেল গোছের বস্তাটা তো সর্ব্বাগ্রে বেরিয়ে পড়েই সটান্ গঙ্গার দিকে দে ছুট। অন্য বস্তাগুলো সব সারি দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ধিনিক্ ধিনিক্ করে খানিকটা নেচে নিয়ে তারপর সামনে লাফিয়ে মার্চ করে স্ট্র্যাণ্ড রোড ট্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে চলতে লাগলো। নিলামে কেনা বস্তাগুলো দলের অগ্রণী হয়ে চলেচে, পেছনে পেছনে চলেচে সারবন্দী গুদোমের অন্য অন্য বস্তা। এই ভাবে হাজারির মসলার গুদোম উজাড় হয়ে গেল!

শেষ রাত্রি। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ। গঙ্গার জলে মেটে জ্যোৎস্না। হাজারি বিশ্বাস একা দাঁড়িয়ে। একি সত্যি, না স্বপ্ন! নির্ব্বাক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখচে। লোক ডেকে চেঁচিয়ে উঠবে সে শক্তিও তার লুপ্ত। সারবন্দী মসলার বস্তাগুলো

গঙ্গার ধারে পৌঁছলো এবং গঙ্গার উঁচু বাঁধানো পোস্তার ওপর থেকে ধপাস ধপাস করে নিচে গঙ্গার জলে দিলে ডুব। এইভাবে পরপর সমস্ত বস্তা একে একে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো! এবারেও আগে ডুবলো নিলামের বস্তাগুলো—তারপর গুদোমের অন্য অন্য বস্তা।

এক রাত্রির মধ্যে হাজারি বিলক্ষণ নিঃস্ব হয়ে গেল।

এই ঘটনা শোনার পর হাজারির প্রতিবেশী দোকানদারেরা সকলেই বিজ্ঞের মতো ঘাড নেড়ে এক বাক্যে বললে, "হুঁ, হুঁ, আমরা অনেক আগেই জানতুম। ভরা অমাবস্যায় জাহাজডুবি। আর সেই লাটের মাল কিনলে কিপ্টে হাজারি বিশ্বেস! ভাগ্যিস বুদ্ধি করে আমরা ঘেঁষি নি। এ মাল কিনলে আমাদেরও কি রক্ষা থাকতো!"

বামা

আমার যখন বাইশ চব্বিশ বছর বয়েস তখন নানা দেশ বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেল আমার অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব্য ঔষধের মাদুলি বিক্রি করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশ কবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্প বয়সের প্রথম চাকরি, খুব উৎসাহের সঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হ'ত সাধু ও সাত্বিক বামুনের মতো। ওটা ছিল ব্যবসায়ের অঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানোর কাপড় পরণে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় মালা, হাতে থাকতো একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকতো।

বছর তিনেক সেই চাকরি করি, তারপর শরীরে সইলো না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্দ্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর বলে একটা গ্রামে। এটা মাদুলি বিক্রির জন্যে নয়; মাখমপুরে শচীশ কবিরাজের শ্বশুরের বাড়ী। সেখানকার জমিজমার ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেন পৌষ-কিস্তির সময় জমিজমার খাজনা যতটা পারি আদায় করে আনতে।

কিন্তু তা হ'লেও পরণে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিল, যদি পথেঘাটে কিছু বিক্রি হয়ে যায়, কমিশনটা তো আমি পাব!

কখনও ও অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দুটোর সময়ে হাঁটচি তো হেঁটেই চলেছি, পথ আর ফুরোয় না। এক জায়গায় একটা ছোট বাজার পড়লো, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পথ হাঁটি।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রি করে বেশ কিছু রোজগারও করা গেল, দেরিও হ'ল বিশেষ করে সেই জন্যে। আর একটা বাজার পড়লো। সেখানে দোকানদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে অন্ততঃ রাত নটা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে, "সন্ধ্যের পরে আগে গিয়ে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এই সব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড় ভয়,

বিদেশী দেখলে মেরেধরে যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে বড় বড় মাঠের মধ্যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে। সাবধান, একটা দীঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ তিনেক দূরে, জায়গাটা ভালো নয়…"

বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছ ঘেরা দীঘি দেখা গেল বটে। আমার বুক ঢিপঢিপ করে উঠলো। দীঘির ও-পাশে সঞ্চয়পুর বলে একটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিলো। কিন্তু সন্ধ্যা তো হয়ে গেল তালদীঘির এদিকেই—অন্ধকার হবার দেরি নেই, কোথায় বা সঞ্চয়পুর, কোথায় বা কি ?

মনে ভারি ভয় হ'ল। কি করি এখন ? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধ বিক্রির দরুণ অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলাম, কিছু না পারি, দৌড়তে তো পারব ? না-হয় ব্যাগটাই যাবে,—প্রাণ তো বাঁচবে।

ভয়ে ভয়ে দীঘির কাছাকাছি তো এলুম। বড় সেকেলে দীঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দুধারে বড় বড় তালগাছের সারি। তার ধার দিয়েই রাস্তা। দীঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করেছিলুম, দেখলুম সবই ভুয়ো। মানুষ মিথ্যে যে কেন এ-রকম ভয় দেখায় !

প্রকাণ্ড দীঘিটার পাড় ঘুরে যেমন তালবনের সারি ও দীঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেচি, সামনেই দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে একটা গ্রাম লি-লি করছে—নিশ্চয় ওটা সেই সঞ্চয়পুর। ·· বাঁচা গেল বাবা ! কি ভয়টাই দেখিয়েছিল লোকে ! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গরু বাছুর চরছে মাঠে—কেন এ সব জায়গায় বিপদ থাকবে ?

আমি এই রকম ভাবচি, এমন সময় তালপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা, সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশী বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোট একটা লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, "ঠাকুরমশ্যয় কোথায় যাবেন ?"

"যাব মাথমপুর…"

"মাথমপুর ! সে যে এখনও তিন ক্রোশ পথ…কাদের বাড়ী যাবেন ?"

"শচীশ কবিরাজের বাড়ী।"

"ঠাকুরমশায় কি কবিরাজমশায়ের গোমস্তা ?"

"গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।"

"এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন ?…মশাইয়ের নিজের বাড়ী কোথায় ?"

"আমি এদিকে কখনও আসিনি, কাউকে চিনিও নে। মাথমপুরেও নতুন যাচ্ছি…"

"সেখানেও কেউ তাহ'লে আপনাকে চেনে না ?"

"নাঃ, কে চিনবে ?"

আমার এই কথায়, আমার যেন মনে হ'ল বুড়ো একটু কি ভাবলে, তারপর আমায় বললে,

"কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি···রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবাড়া করে খাবেন···আসুন দয়া করে···"

আমি বৃদ্ধের কথায় ভারী সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই তো, সেকালের লোকেরা অন্য ধরণের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি। বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাঢ়-অঞ্চলের অজানা মেঠো পথ বেয়ে এই সুমুখ-আঁধার রাতে আমায় যেতেই তো হ'ত মাথমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে।

গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে বড় মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ী। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠ্‌তেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভালো লাগলো না; এর আমি কোন কারণ দিতে পারবো না,—কিন্তু এই কুকুরের চিৎকারে যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গলজনক অর্থ আছে—মঙ্গলসন্ধ্যায় কোন গৃহস্থবাড়ীতে আসি নি, যেন শ্মশানভূমিতে এসেচি···

বৃদ্ধের বাড়ী দেখে মনে হ'ল বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ীর উঠোনে সারি সারি তিনটে বড় বড় ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড় বড় আটচালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠরি!

আমার কথাটা ভালো করে বুঝতে গেলে এই কুঠরিটার কথা আর একটু ভালো করে শুনতে হবে। কুঠরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরাও বলা যায়, কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছন দিকের সঙ্গে সংলগ্ন; অথচ দোর বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ীর সঙ্গে এর সম্পর্ক চলে গিয়ে এটা ভেতরবাড়ীর একখানা ঘরের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হ'ল এই কুঠরিতে। কুঠরির একপাশে ছোট একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েচে। হাত-মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম করচি।

গৃহস্বামী এসে বললে, "ঠাকুরমশায় রান্না চাপান্, আর রাত করেন কেন?"

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি বাড়ীর বৌ ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকলো ও ঝাঁট দিতে লাগলো।

কুঠরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কুঠরিটার ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম বৌটি ঝাঁট দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। দু'তিন বার বেশ ভালো করে লক্ষ্য করে মনে হ'ল বৌটি ইচ্ছে করেই আমার দিকে অমন করে চাইচে।

আমি দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কি? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লীর গৃহস্থবধূ—এমন ব্যবহার তো ভালো নয়? কি হাঙ্গামায় আবার পড়ে যাবো রে বাবা। কর্ত্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করবো নাকি?

এমন সময় বৌটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেল। কিন্তু বোধ হয় পাঁচ মিনিট পরেই আবার এলো। দেখে মনে হ'ল সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবারও সে কুঠরির মধ্যে ঢুকে এটা ওটা সরাতে লাগলো এবং আমার দিকে চাইতে লাগলো, তারপর হঠাৎ রান্নাচালার দরজায় এসে চকিতদৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরও সরে এলো এবং নিচুস্বরে বললে, "ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে"—বলেই চট করে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

শুনে তো আর আমি নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইলো, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—আর সারা হাত-পা অবশ ও ঝিমঝিম করতে লাগলো। বলে কি! দিব্যি গেরস্তবাড়ী, গোলাপালা, ঘরদোর—ডাকাত কি রকম?

কিন্তু পালাবোই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েচে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকজনের সঙ্গে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে!

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচি একেবারে—হাতে পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারও শক্তি লোপ পেয়েচে। মিনিট পাঁচেক এমনি ভাবে কাটলো—এমন সময়ে দেখি সেই বৌটি আবার কি-একটা কাজে কুঠরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি কথা বলবার পূর্ব্বেই আমি বললুম, "তুমি যে হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলে দাও কোন্ পথে কি ভাবে পালাবো..."

বৌটি চাপা গলায় বললে, "সেই জন্যেই এলুম। সব দেখে এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা ঘাটি আগলে রেখেচে..."

আমি বললুম, "তবে উপায়!"

মেয়েটি বললে, "একটা মাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে এসেচি। আমি এ-বাড়ীতে আর ব্রহ্মহত্যা হ'তে দেব না—অনেক সহ্য করেচি, আর করবো না—দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আর একবার বাড়ীর মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।"

মিনিট পাঁচেক পরে বৌটি আবার এলো, চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে বললে, "শুনুন, আমার উপায়—এই কথা ক'টা মনে রাখুন। মনে যদি রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারবো।—আমার নাম বামা, আমি এ-বাড়ীর মেজবৌ, আমার বাপের বাড়ীর গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্দ্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমরা দুই বোন, আমার দিদির নাম ক্ষান্তমণি, বিয়ে হয়েচে সামন্তপুর-তেওটা, বর্দ্ধমান জেলা। শ্বশুরের নাম দুর্ল্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা, জ্যাঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই—"

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে—যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এতে কি হবে? বৌটি কিন্তু এক একবার বাড়ীর মধ্যে যায়, আবার অল্প দু'মিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দিয়ে যায়—"মনে আছে তো? জ্যাঠামশায়ের নাম কি?"

আমি বললুম, "হরিদাস মজুমদার…"

"না—না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার…আমার দিদির নাম কি ? শ্বশুরবাড়ী কোন্ গাঁয়ে ?…"

"কান্তমণি। শ্বশুরবাড়ী হ'ল—শ্বশুরবাড়ী…"

"আপনি সব মাটি করলেন দেখচি! সামন্তপুর-তেওটা, বলুন…"

"সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু দাস—দুর্ল্লভরাম দাস…"

অবশেষে মিনিট দশ-বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

বৌটি বললে, "রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোন ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ীর নাম-ধাম যখন জানা হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেচি। এখন শুহুন,—খাওয়া-দাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ীর পরিচয় দিয়ে বলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ, আমার নাম বলে জিগ্যেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েচে কোথায়, জানো নাকি ? গলা যেন না কাঁপে, কোনরকম সন্দেহ যেন না হয়…আমি চললুম, আবার আসবো আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে ; কিন্তু দেরি করবেন না বেশি, বিপদ কখন হয় বলা তো যায় না।

রান্না-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হ'ল। রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে এসেচে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পর নিজের কুঠুরিতে বসেচি, আর আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ীর সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে, আমার গলাটি কাটবার জন্যে।

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এলো। বললে, "কি ঠাকুরমশায়, আহারাদি হ'ল ? এখন দিব্যি করে শুয়ে পড়ুন। মশারীটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি ; রাত হয়েচে আর দেরি করবেন না…"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, একটা কথা বলি…আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য, বাড়ী কুসুমপুর, থানা রায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা—এ দিকেই কোথায় বিয়ে হয়েচে। তারাও জাতে তোমাদের বারুই কিনা—তাই হয়তো চিনলেও চিনতে পারো। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্ল্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিল মেয়েটির শ্বশুর-বাড়ী খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে…তা যখন এলুমই এ দেশে…"

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, "কুসুম-পুরের হরিদাস মজুমদার ? বামা ?…আপনি তাদের চিনলেন কি করে ?"

বামার কথা স্মরণ করে গলা না কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, "আমি যে তাদের গুরুবংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কিনা ?"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, "বসুন, আমি আসচি…"

আমি একটা কুঠরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনও কিছু যায় নি। আর এরা যে গুরুদেবকেই রেহাই দেবে তা কে বলেচে ?

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এলো ; পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন ষণ্ডামার্ক গোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—সম্ভবতঃ বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, "এই যে বামা, ঠাকুরমশায়। আমারই মেজছেলের সঙ্গে···এই আমার মেজ ছেলে শম্ভু···গড় করো সব, গড় করো···মেজবৌমা, দেখ তো, চিনতে পারো এঁকে ?

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেল বটে।

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা! আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়লো।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেল। খাবার জল দেবার ছুতো করে এসে বামা আমায় আশ্বাস দিয়ে গেল। বললে, "বিপদ কেটে গিয়েছে ; আমার চোখে না পড়লে সর্ব্বনাশ হ'ত, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হ'ত। অনেক হয়েছে,—এই কুঠরিতে,—এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা···

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, "পুলিস কি গাঁয়ের লোক কিছু টের পায় না, —কিছু বলে না ?"

"কে কি বলবে! এ ফাঁসুড়ে ডাকাতের গাঁ। সবাই এ-রকম : আগে জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিতেন ? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে—এ পাপ-ভিটেয় বাস করলে তার অকল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কি করবে ? মাথার ওপর শ্বশুরমশায় রয়েচেন—পুরনো ডাকাত, দাদারা রয়েচে···আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর ভয় নেই···"

সকাল হ'ল। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু-প্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, "তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্ব্বাদ করি চিরসুখী হও মা···"

বামার মতো বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়ে নি। কতকাল হয়ে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লীবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

বামাচরণের জন্মের সময় নকীপুরের যদু চক্কোত্তি বলেছিলেন, "এ ছেলে একদিন রাজা হবে।"

যদু চক্কোত্তি এ অঞ্চলের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিষী, তার কথার দাম আছে। কিন্তু বামাচরণের জন্মদিনটির পরে বহু বছর কেটে গিয়েচে, রাজা হওয়া তো দূরের কথা, রাজসভার একজন ভালোগোছের প্রহরী হবার লক্ষণও তো বামাচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

অল্পবয়সে বামাচরণ তার মামার বাড়ী থেকে স্কুলে পড়তো। ফোর্থক্লাসে ওঠবার সময়ে ফেল করে সে লেখাপড়া দিলে ছেড়ে। বললে, "ছোট ছোট ছেলেরা উঠবে নিচে থেকে আমার ক্লাসে—তাদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা করে।"

সুতরাং বামাচরণের লেখাপড়া হ'ল না। মামারা বললে, "লেখাপড়া যদি না করো বাপু, তবে এখানে বসে বসে অন্নধ্বংস করে আর কি করবে, বাড়ী চলে যাও।"

বাড়ী এসে যখন সে বসলো, তখন তার বয়েস চৌদ্দ-পনরো বছর। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, সেখান থেকে চাকরির চেষ্টা করা চলে না।

এই সময়ে তার এক ভগ্নীপতি তাদের বাড়ীতে এলেন কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে। তিনি পশ্চিমে কোথায় রেলে চাকরি করেন, বামাচরণকে উপদেশ দিয়ে গেলেন—টেলিগ্রাফি শিখতে। তা হ'লে রেলের চাকরি হবার সম্ভাবনা আছে! কলকাতা থেকে তিনি বামাচরণকে একটা ঢেকিকলও আনিয়ে দিয়ে গেলেন, আর টেলিগ্রাম শেখবার একখানা বই।

বামাচরণ সর্ব্বদা গম্ভীর চালে থাকতো, সমবয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশলে তার মান যাবে। আর একটা মজা ছিল তার, সে তাদের নানারকম বৈষয়িক উপদেশ দিত।

যেমন হয়তো ছেলের দল ওদের বাড়ীর সামনে কয়েতবেলের গাছে উঠে মহা হৈ-চৈ করচে, ও এসে গম্ভীর মুখে বললে, "এই সব, নাম—গাছ থেকে নাম।"

বামাচরণ বললে, "কয়েতবেল তো খাচ্ছিস, এদিকে ঘরে যে অনেকের চাল নেই, সে খোঁজ রাখিস? শুধু কয়েতবেলে কি আর পেট ভরবে? যা, হাতে দু'পয়সা রোজগার হয় তার চেষ্টা করগে যা।"

বামাচরণের বিজ্ঞ ধরণের কথাবার্ত্তায় বেশ কাজ হ'ল। পাড়াগাঁ জায়গা, সকলেরই অবস্থা অল্পবিস্তর খারাপ, প্রত্যেক ছেলেই জানে যে তার বাপ-মার অবস্থা ভালো নয়। অতএব বামাচরণের কথায় অনেকেরই মনের মধ্যে কোথায় ঘা লাগলো—তারা মাথা নিচু করে যে যার বাড়ী চলে গেল।

এই সময়ে ওর ভগ্নীপতি এসে ওকে ঢেঁকিকল দিয়ে গেলেন।

গ্রামের ছেলেরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতো, বামাচরণ দিনরাত গম্ভীর মুখে ওদের বাড়ীর পশ্চিমের ঘরে বসে ঢেঁকিকলটাতে টরে-টক্কা অভ্যাস করচে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, দোল নেই, রাস নেই, শনিবার-রবিবার নেই। কি সে অধ্যবসায়! দ্রোণাচার্য্যের কাছে ধনুর্ব্বিদ্যা শিখতে অর্জ্জুনও বোধ হয় এত অধ্যবসায়, এত মনোযোগে দেখান নি—তা তিনি মল্লভূমিতে কাঠের বিবিধ পাখী বিদ্ধ করে যতই নাম করুন গিয়ে। বছর খানেক টেলিগ্রাফ শেখবার পর বামাচরণ রেলে চাকরির চেষ্টা করলে; কিন্তু অদৃষ্টের দোষে কোথাও কিছু হ'ল না। গাঁয়ের ছেলেদের সে বলতো, "জানিস, ই-আর-আর-রেলের টি-আই সাহেব আমার দরখাস্তের জবাব দিয়েচে? তার নিজের হাতের সই আছে।"

ছেলেদের মধ্যে দু-একজন সম্ভ্রমের সঙ্গে জিগ্যেস করতো, "কি লিখেছে বামাচরণ-দা ?

"লিখেছে, এখন চাকরি হবে না, পোস্ট খালি নেই। খালি হলে জানাবে। দাঁড়া..."

তারপর সে পশ্চিমের কোঠায় তার ঘর থেকে একখানা লম্বা খাম নিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা ইংরেজি লেখা কাগজ বার করে সকলের সামনে বাতাসে দুবার উঁচু করে উড়িয়ে বলতো, "এই ছাখ্।"

কিন্তু এত করেও কিছু হ'ল না, মাসের পর মাস গেল, টি-আই সাহেবের সে চিঠি আর পৌঁছুলো না।

হঠাৎ মেঘ-ভাঙা আকাশে একদিন চাঁদ উঠলো। বামাচরণের পিতা ছিলেন সেকালের ফৌজদারী কাছারীর নাজির। যখন তিনি মেহেরপুরে, সে সময়ে বমপাশ সাহেব মেহেরপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সাহেব নাজিরমহাশয়কে খুবই খাতির করতো, ভালো বাসতো।

বামাচরণের বাবা বৃদ্ধবয়সে পেন্‌সনভোগী অবস্থায় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে সমবেত বৃদ্ধ-মণ্ডলীর কাছে চাকরি জীবনের গল্প করতে করতে বলতেন, "বম্‌পাশ সাহেবকে তো আমিই কাজ শিখিয়েছি, ছোকরা সিভিলিয়ান, নতুন বিলেত থেকে এসেছে তখন—ট্রেজারি অফিসের হিসেব রাখতে রাখতে জান বেরিয়ে যেতো। আমায় বলতো, 'শোন নাজির, এ আমার পোষাবে না, গাঁজা-আফিমের হিসেব রাখতে আর ওজন করতে করতে প্রাণ বেরুলো।' কত কষ্টে বুঝিয়ে সাহেবকে শান্ত করতুম।"

সে গ্রামে গবর্ণমেণ্টের চাকরি বামাচরণের বাবা ছাড়া কেউ করে নি—সবাই হাঁ করে থাকতো ; পেন্‌সনও ভোগ করচেন তিনি আজ বাইশ-তেইশ বছর কি তারও বেশি।

বামাচরণের বয়স যখন আঠারো-উনিশ বছর, তখন বামাচরণের বাবা গ্রামে বসে 'হিতবাদী' কাগজে দেখলেন বম্‌পাশ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসেছে।

তিনি গেলেন কলকাতায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। বম্‌পাশ সাহেবও আর ছোকরা নেই, পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়েছে। পুরনো নাজিরকে চিনতে পারলে, জিজ্ঞেস করলে, "আমি তোমার কি উপকার করতে পারি, নাজির ?"

এক কথায় বামাচরণের চাকরি ঠিক হয়ে গেল। খুলনায় সার্ভে ক্যাম্প পড়েচে, জমি জরীপ হচ্ছে। বামাচরণের বাবা একগাল হেসে সকলকে কথাটা জানালেন। বামাচরণের বাড়ীতে সত্য-নারায়ণের সিন্নি দেওয়া হ'ল।

গাঁয়ের প্রতিবেশীরা যখন প্রসাদ খাচ্ছে ভেতরের ঘরের বারান্দায় বসে, তখন বামাচরণের বাবা সবিস্তারে তাদের সামনে তাঁর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন ; "সাহেব বললে, নাজির, তোমার ছেলে যদি এনট্রান্স পাস করতো তবে আমি ওকে সাবডেপুট্রি করে দিয়ে যেতাম আজ।"

বামাচরণ চাকরি করতে গেল, সঙ্গে তার বৃদ্ধ পিতা গেলেন। কারণ বামাচরণের মা বললেন, ছেলেকে অত দূর দেশে একলা তিনি পাঠাতে পারবেন না।

আবার সেই অদৃষ্ট এসে বাধা দিলে। মাস দুইয়ের মধ্যে বামাচরণের বাবা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এলেন। শোনা গেল বামাচরণ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সেখানে নাকি থাকার কষ্ট, নদীর জল লোনা, কাছেই সুন্দরবন, সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়, জঙ্গল থেকে কাঠ ভেঙে এনে রান্না করতে হয়। সেখানে কি ওই কচি ছেলে থাকতে পারে ?

বামাচরণের বাবা বললেন, "কোন ভয় নেই। আমি আবার যাচ্ছি সাহেবের কাছে, আর একটা ভালো জায়গায় চাকরি যাতে হয়।"

কিন্তু এবার সাহেব বেজায় চটে গিয়েচে দেখা গেল, না জানিয়ে চাকরি ছেড়ে আসাতে। সাহেবের আরদালি বললে, সাহেবের এখন দেখা করবার সময় হবে না।

বামাচরণের বাবা এতটা ভাবেন নি, তিনি হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু সেই যে তাঁর মন কেমন ভেঙে গেল, এরপর আর বেশীদিন বাঁচেন নি।

ক্রমে দিন চলে গেল। বামাচরণেরও বয়স হয়ে উঠলো। বাবা বেঁচে থাকতেই তার বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, দু' একটি ছেলেপুলেও হ'ল।

গ্রামের যে সব ছোট ছোট ছেলেদের বামাচরণ গম্ভীর মুখে উপদেশ দিয়ে বেড়াতো, তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিদেশে বেরিয়ে ভালো লেখা-পড়া শিখেচে, দু' একজন ভালো চাকরিও পেয়েচে। বাপের পেন্‌সনের টাকায় সংসার একরকম চলতো, বাপের মৃত্যুর পর বড় সংসার ঘাড়ে পড়াতে বামাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলে।

নিজের ছেলে-মেয়ে দু'তিনটি, এক বিধবা ভগ্নী বাড়ীতে, তারও দু'তিনটি ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধা মা,—অনেকগুলি পুষ্যি খেতে, চলে কিসে এতগুলি প্রাণীর ?

* * *

এই সব কথাই সে ভাবছিল আজ নদীর ধারে বড়-ভাঙনের চট্‌কা গাছতলায় মাছ ধরতে বসে। বেলা পড়ে এসেচে, কচুরিপানার দামগুলো উজান মুখে চলেচে,—বোধ হয় জোয়ার এলো।

সামনের চট্‌কা গাছটায় রোদ রাঙা হয়ে আসচে। রোজ এইখানটিতে বামাচরণ মাছ ধরতে আসে। তাদের গ্রাম থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে নদীর বড় বাঁকের মুখে, জায়গাটা চারিদিকে নির্জ্জন।

এখন তার মনে হয় খুলনার চাকরিটা ছেড়েও এসেচে আজ চৌদ্দ-পনরো বছর হবে।

হঠাৎ নদীর উঁচু পাড়ের দিকে তার নজর পড়লো ;—ওটা কি ?

পাড়টা সেখানে খুব উঁচু ও খাড়া—হাত ত্রিশ-চল্লিশ উঁচু সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে। পাড়ের খানিকটা ভেঙে পড়েচে বোধ হয় দু'একদিন হ'ল। সেই পাড়ের গায়ে একটা বড় কলসী পাড় ভাঙার দরুন বেরিয়ে পড়েচে—অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। বাকি অর্দ্ধেকটা মাটির মধ্যে পোঁতা।

বামাচরণের চট করে মনে পড়ে গেল, সে গ্রামের বুড়োদের মুখে শুনেচে এই বাঁকের মুখে আগে—বহুকাল আগে, খুব সমৃদ্ধ গোয়ালাদের গ্রাম ছিল, অনেক লোকের বাস ছিল। কলসীটা জমির ওপর থেকে হাত চার-পাঁচ নিচে পোঁতা অবস্থায় রয়েচে। সেকালে লোকে কলসী করে টাকা পুঁতে রেখে দিত—এ নিশ্চয়ই টাকার কলসী।

বামাচরণ এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে আর কেউ কাছাকাছি আছে কিনা। স্থানটা নির্জ্জন, অন্য লোক এদিকে আসে না। কলসীটা আর কেউ দেখে নি নিশ্চয়ই। তা ছাড়া মোটে কাল রাত্রে এই পাড় ভেঙেচে, কে আর লক্ষ্য করেচে একটা কানাভাঙা কলসী? কে ই তার পর এসেচে এদিকে?

অবশ্য নৌকো থেকে দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু জেলে-ডিঙি এতদূরে আসে না, গাঁ থেকে ওই কদমতলা পর্য্যন্ত তাদের দৌড়। এতদূরে কেউ কোমড়-জাল পাতে না।

বামাচরণ সেখানে আর দাঁড়ালে না, ছিপ গুটিয়ে উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। তাকে এখানে কেউ না দেখে ফেলে।

বাড়ীতে এসে সে ভাবতে বসলো। এখন সে কি করবে? আজ রাত্রেই অবশ্য কলসীটা তুলে আনতেই হবে। কিন্তু একা সে কি করে পারবে? জমির ওপর থেকে খোঁড়া অসম্ভব। যদি শাবলের ঘায়ে কলসীটা নদীগর্ভে পড়ে যায়, তা হ'লে স্রোতের মুখে হয়তো কোথায় ভেসে চলে যাবে, নয়তো ডুবে যাবে।

তা নয়, নিচে থেকে মই লাগিয়ে উঠতে হবে কলসী পর্য্যন্ত, তার পর সন্তর্পণে খুঁড়ে কলসী বার করতে হবে। তাতে অন্ততঃ দুজন লোকের দরকার; মই নিচে থেকে একজন ধরে থাকা চাই, কলসী নামাবার সময়েও সাহায্য পাওয়া দরকার।

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে বামাচরণ বড় ছেলে নিতাইকে সঙ্গে নেওয়া ঠিক করলে। নিতাই এই বারো বছরে পড়েছে, গ্রাম্য স্কুলে পড়ে, খেলা-ধুলায় খুব পটু আর সাহসীও বটে। বামাচরণ ছেলেকে বললে, "তোর মাকে বলিস নে, রাত্তিরে যাবি আমার সঙ্গে একটা জায়গায়।"

পিতাপুত্রে মই, শাবল, একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে রাত দুপুরের পরে নদীর ধারে চটকা গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো।

বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করচে বামাচরণের, কি জানি কি হয়!

বামাচরণের ছেলে কিছুই জানে না কি ব্যাপার. বাবার কথায় সে এসেচে। কেন এসেচে তার বাবা তাকে বলে নি। কিন্তু সে জিনিসটা খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই জেলেরা কোথাও জলের ভেতর বাঁশের ঘুনিতে বড় মাছ জিইয়ে রেখেচে—সেই মাছ চুরি করতে তার বাবা তাকে সঙ্গে করে এনেচে। কিন্তু মই কি হবে?

জায়গাটা দেখেও সে অবাক্ হয়ে গেল। বাবাকে বললে, "বাবা, এতদূরে তো জেলেরা কোমড় ফেলে না? এ তো চটকাতলার বাঁক..."

তার বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "জেলেদের সঙ্গে আমাদের কি দরকার? নে, মইটা এখানে বেশ্ করে লাগা..."

অতিকষ্টে বামাচরণ মই বেয়ে উপরে উঠলো। নিতাই খুব অবাক্ হয়ে গিয়েচে—পাড়ের ওপর মই দিয়ে উঠে কি হবে, কি আছে ওখানে? সে একটু হতাশও যে না হয়েচে—এমন নয়। বড় মাছ নয়, তাহ'লে হয়তো বাবা কোনো ওষুধের শেকড় কি মুথোঘাসের শেকড় তুলতে এসেচে। অনেক সময় রাত্রেই ওষুধের গাছ তুলতে হয়, সে জানে।

তার ভয়ও হচ্ছিল, চারিদিকে অন্ধকার, নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে ডাঙায় ছোট ছোট ঢেউ লেগে। এখানে ভূতের উপদ্রবের কথা অনেকে বলে, শ্মশান এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। নিতাইয়ের গা-টা ছমছম করে উঠলো।

তার বাবা ওপরে গিয়ে পাহাড়ের গা খুঁড়তে লাগলো। সে নিচে থেকে অন্ধকারে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না বাবা কি খুঁজচে। একবার সে বললে, "কি বাবা, মুথোর শেকড়?"

বামাচরণ চাপাগলায় বললে, "আঃ, চুপ কর্ না! মই ধরে থাক্, তোর সে কথায় দরকার কি?"

নিতাই চুপ করে রইলো, কিন্তু ওষুধ খুঁড়তেও কি এত সময় লাগে? সে অন্ধকারের মধ্যে মইয়ের নীচে একা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করছিল, বাবার ভয়ে কিছু বলতেও পারছে না।

অবশেষে অতি কষ্টে ভারী ও কালো একটা কলসী নিয়ে বামাচরণ মই থেকে নামলো। নিতাই অবাক্ হয়ে বললে, "কি বাবা এতে?"

"চুপ কর্ না, কেবল চেঁচামেচি! তোর সব কথায় কি দরকার? শাবল আর মইটা নিতে পারবি একলা?"

কেউ না দেখে এজন্যে বামাচরণ বাঁশবনের পথ দিয়ে চললো। বেশী রাত্রে গ্রামে চৌকিদার পাহারা দিতে বার হয়, কি জানি যদি সে এ অবস্থায় হঠাৎ চৌকিদারের সামনেই পড়ে যায়?

বামাচরণের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করচে। কলসীটা বেজায় ভারী। নিশ্চয়ই কোনো ভারী জিনিসে ভর্ত্তি! কলসীর মুখটা একখানা পাথরের ছোট খুরি দিয়ে চাপা ছিল—বহুদিন মাটির মধ্যে থাকার দরুণ সেটা এমন দারুণ এঁটে গিয়েচে যে অস্ত্র দিয়ে চাড় না দিলে খোলা যাবে না।

বাড়ী পৌঁছেই বামাচরণ বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলে। স্ত্রীকে বললে, "একটা আলো নিয়ে এসো তো?"

ওর আর বিলম্ব সইচে না। এখুনি সে কলসীর মুখ খুলে দেখবে।

নিতাইয়ের মা একটা কাচ-ভাঙা সেকেলে হিঙ্কসের লণ্ঠন নিয়ে উঁচু করে ধরলে। বিস্ময়ের সুরে বললে, "কলসীটাতে কি? মড়ার কলসীর মতো দেখতে,—ওটাকে আনলে কোথা থেকে গো?"

অধীর কৌতূহলে ও আগ্রহে বামাচরণ শাবলের এক ঘা দিয়ে কলসীটা ফাটিয়ে ফেললে—

সঙ্গে সঙ্গে কালো আলকাতরার মতো কি একটা দুর্গন্ধ পদার্থ মেঝেময় ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

নিতাইয়ের মা অবাক্. স্বামী পাগল হয়ে গেল নাকি পয়সার দুর্ভাবনায় এতদিন পরে ?

"রাতদুপুরে কিসের একটা কলসী কোথা থেকে উঠিয়ে এনে কি কাণ্ড বাধালে দেখো তো ?"

বামাচরণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এত কষ্ট তবে সব বৃথা! রুপোর গুঁড়োও এতটুকু নেই কলসীটাতে। কোথায় এক কলসী টাকা বা মোহর—আর তার বদলে—এগুলো কি কালো কালো ? অদৃষ্ট একেই বলে।

সারারাত্রি বামাচরণের ঘুম হ'ল না। সত্যিই তার অদৃষ্ট ভালো নয়। এমন জায়গায় পোঁতা কলসী পেয়েও তার মধ্যে থেকে বেরোয় কালো আলকাতরা! না হ'লে বম্‌পাশ সাহেবের দেওয়া এমন চাকরি সে ছেড়ে দিয়ে আসে ? পেয়ে হারানোই তার অদৃষ্ট।

পরদিন সকালে লোকজনকে আলকাতরার মতো জিনিসটা দেখাতে কেউ কিছু বলতে পারে না। অবশেষে মামুদপুরের বাজারের বুড়ো কবিরাজমশায় দেখে বললেন, "এ পুরনো ঘি। বহুকালের পুরনো ঘি। কতটা আছে ? এর দাম খুব। বিক্রি করবে ? কলকাতায় বৌবাজারের সেনেদের দোকানে পেলেই নেবে।"

বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে বামাচরণ কলকাতায় এলো।

বৌবাজারের সেনেদের মস্ত কবিরাজী দোকান, সারা ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কারবার। ঘি দেখে তারা বললে, "হ্যাঁ, জিনিসটা খুবই ভালো, অন্ততঃ দুশো বছরের পুরোনো। তোমাদের ঘরে ছিল ?"

বামাচরণ সংক্ষেপে কলসী-প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করলে। তারপর দরদস্তুর চললো, ওরা সাত টাকার বেশী দর দিতে রাজী নয়, তারপর উঠলো দশ টাকায়, তার বেশী কিছুতেই নয়। বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে না আনলে কিন্তু বামাচরণ দু'টাকা সেরেই জিনিসটা দিয়ে ফেলতো।

একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন; তিনি উঠে এসে বুড়ো কবিরাজকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আমি খয়রাগড়ের রাজার ম্যানেজার। আমি আপনাদের কথাবার্তা এতক্ষণ শুনছিলাম—রাজার মায়ের বয়স হয়েচে, হাঁপকাশের অসুখ। এই পুরোনো ঘি কিনতেই আমি এদের দোকানে এসেছিলাম। এত বছরের পুরানো ঘি কলকাতায় কোন দোকানে নেই। আমি আপনাদের জিনিস নেবো। একশো টাকা করে সেরের দাম দেবো আমি। ওজন করুন মাল।"

এ কলসীতে মোট সাড়ে বারো সের ঘি ছিল। কিন্তু আদত কলসীটাতে বোধ হয় আরও বেশী ছিল, কিন্তু সেটা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। বাকিটা ওরা নতুন কলসীতে পুরে এনেছিল।

ঘি বিক্রি করে মোট পাওয়া গেল সাড়ে বারশো টাকা।

যদু চক্কোত্তি জ্যোতিষী ছিল বড়, সে মিথ্যে বলে নি—এখন তো বামাচরণের অনন্তকাল পড়ে রয়েচে। রাজা হওয়ার আশ্চর্য্যটা কি ?

বেশী দিনের কথা নয়, গত ফাল্গুন মাসের কথা। দোলের ছুটিতে গালুডি বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে সিংভূম জেলার এই অঞ্চলে আমি অনেকবার গিয়েচি এবং এখানে আমার কয়েকটি বন্ধু বাড়ীও করেচেন, ছুটি-ছাটাতে গিয়ে কিছুদিন যাপন করবার জন্যে।

গালুডি ক্ষুদ্র গ্রাম, এ থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে দূরে সব দিকেই পাহাড়ের শ্রেণী ও জঙ্গল। দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখার ওপারে সিদ্ধেশ্বর ও ধনঝরি শৈলমালা, তার ওদিকে তামাপাহাড় নামে একটি অনুচ্চ পাহাড়; এখানে কয়েক বৎসর পূর্বে একটা তামার খনি ছিল, কোম্পানী ফেল হয়ে যাওয়াতে ঘর, বাড়ী, কারখানা, চিমনি, ম্যানেজারের বাংলো সবই পড়ে আছে, মানুষ জন নেই। জায়গাটার নাম রাখা মাইন্‌স্। এই নামে একটা ছোট রেলস্টেশনও আছে দেড় মাইল দূরে। রাখা মাইন্‌স্ এবং তার আশেপাশে ঘন জঙ্গল ও পাহাড়, মাঝে সাঁওতালী বন্য গ্রাম। এই সব বনে হস্তী আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে, ভাল্লুক তো আছেই। এই জঙ্গলে যখন-তখন চলাফেরা করা বিপজ্জনক, বন্দুক না নিয়ে কখনও যাওয়া উচিত নয়।

এই পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে একটা ভগ্নপ্রায় খড়ের বাংলোতে এক মাদ্রাজী কবিরাজ থাকতেন, তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছিল। তাঁর মুখে গল্প শুনেচি—কিছুদিন আগে দুই বুনো হাতীর লড়াই হয়েছিল পুরোনো কারখানার কাছে। দুদিন ধরে লড়াই হয়, শেষকালে একটা হাতী মারা যায়। বেশী রাত্রে তাঁর বাংলোর বারান্দায় বাঘ ডাকে, সম্পূর্ণ দিনের আলো না ফুটলে তিনি কখনো বাংলোর বারান্দার দিকের দোর খোলেন না।

আমি ইতিপূর্বে অনেকবার যখন গালুডি গিয়েচি, তখন রাখা মাইন্‌স্ ও তার আশেপাশের বনে বেড়াতে গিয়েচি একা একা। একা যাওয়ার কারণ প্রথমতঃ তো ওসব বনের মধ্যে স্বাস্থ্যান্বেষী অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত শৌখিন কলকাতার বাবুরা পায়ে হেঁটে যেতে রাজী হ'ন না, দ্বিতীয়তঃ গভীর বনের মধ্যে বেড়ানোর শখও সবার থাকে না—এতে তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না অবশ্য। অনেকবার বেড়িয়ে বনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয় তখন লোকে স্বভাবতই সেখানে একটু অসতর্ক হয়ে পড়ে। আমিও তাই হয়েছিলাম; ওদেশে বনে বেড়াতে হ'লে সাধারণতঃ সকালের দিকে যাওয়াই নিয়ম, বেলা দু'টো তিনটের পর অর্থাৎ পড়ন্ত বেলার দিকে বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে লোকালয়ের দিকে আসাই ভালো।

প্রথম প্রথম এ-নিয়ম খুবই মেনে এসেচি। একজন করে সাঁওতাল গাইড্ সঙ্গে না নিয়ে বনে যেতাম না। একবার সিদ্ধেশ্বরডুংরি বলে প্রায় পনরো শ' ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলাম, সেবারও সঙ্গে ছিল একজন সাঁওতাল ছোকরা। পাহাড়ের ওপর অনেক উঁচুতে বুনো হাতী চারা কেঁদগাছ ভেঙে দিয়েচে সেই পথপ্রদর্শক সাঁওতাল ছোকরা আমায় দেখায়। চীহড় ফল,—এক রকম বুনো সীমের মত ফল, তার বীজ পুড়িয়ে খেতে

ঠিক গোল আলুর মতো—সে-ই পুড়িয়ে খাইয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গুহা দেখিয়ে বলেছিল, এ গুহা এখান থেকে সুবর্ণরেখার ওপার পর্য্যন্ত চলে গিয়েচে।

এ-সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। যাঁরা ঘন অরণ্যানী, নির্জ্জন শৈলমালার সৌন্দর্য ভালবাসেন তাঁদের এ সব স্থানে আসা দরকার। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষীণকায়া পার্ব্বত্য নদী—হয়তো হাঁটুখানেক জল ঝিরঝির করে বইচে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে। দুধারেই জনহীন বনভূমি, কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল, ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, কত বিচিত্র বন্যপুষ্প, বন্য শেফালির বন। বার বার যাতায়াত করতে করতে ভয় ভেঙে গেল। যখন নিজের চোখে কখনও ভাল্লুক দেখলাম না, বা বুনো হাতীর তাড়া সহ্য করতে হ'ল না, তখন মনে হ'ল অনর্থক কেন একজন গাইড্ নিয়ে গিয়ে পয়সা খরচ করা। যেতে হয় একাই যাবো।

অর্থব্যয় ছাড়া গাইড্ নিয়ে ঘোরার অন্য অসুবিধাও ছিল। ধরুন, এক জায়গায় চমৎকার বন্য-পুষ্পের শোভা, পাহাড়ের নীল চূড়া সুনীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, নিকটেই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য ঝর্ণার মৃদু কলধ্বনি, বনস্পতিদের শাখায় শাখায় বন্য পাখীর কূজন,—আমার মনে হ'ল এখানে অদূরবর্ত্তী শিলাখণ্ডে পিয়াল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি, আপন মনে প্রকৃতির এই নিরালা রাজ্যে বসে বনবিহগ-কাকলী শুনি; কিন্তু গাইড্ দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে দেবে না, বলবে, "চলো বাবুজী, চলো, এখনও অনেক পথ বাকি!"—তা ছাড়া সঙ্গে লোক থাকলে মনের সে শান্ত, সমাহিত ভাবও আসে না।

এই সব কারণে ইদানীং একাই বেড়াতে যেতাম বনের মধ্যে। কিন্তু যে ঘটনার কথা এখানে বলবো, তার পূর্ব্বে সুবর্ণরেখার ওপারে দু'তিন মাইল ছাড়া একা খুব বেশী দূরে যাই নি, বড় জোর গিয়েচি সিদ্ধেশ্বর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ পর্য্যন্ত। গিয়েচি, আবার বেলা পড়বার অনেক আগেই সুবর্ণরেখার তীরে ফিরে এসেচি।

দোলের ছুটিতে এবার গালুডি গিয়ে দেখি অপূর্ব্ব নির্ম্মেঘ নীল আকাশ। বনে বনে শাল-মঞ্জরীর সুগন্ধ, নব বসন্তে নতুন কচি-পাতা-ওঠা শাল, কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া গাছে গাছে কুঁড়ি দেখা দিয়েচে। বসন্তের বন্যা এসেচে পাহাড়ী ঝর্ণার মতো নেমে—বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র সজ্জায় বনে বনে।

একজন বৃদ্ধ সাঁওতালের মুখে শুনেছিলাম পাঁচ মাইল দূরে বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছোটখাট জলপ্রপাত আছে—জায়গাটার নাম নিশিঝর্ণা। সেখানে নাকি বন আরও ঘন, পথে এক জায়গায় পুরোনো আমলের একটা দেউল আছে ইত্যাদি। জায়গাটা দেখবার খুব ইচ্ছে হ'ল। দোলের আগের দিন বেলা দশটার মধ্যে কিছু খেয়ে নিয়ে জায়গাটার উদ্দেশ্যে বার হয়ে পড়লাম।

শীঘ্রই সুবর্ণরেখা পার হয়ে গিয়ে রাখা মাইন্‌স্-এর পথ ধরলাম। মুসাবনী রোড্ যেখানে রাখা মাইন্‌স্-এর চার নম্বর শ্যাফ্‌টের গভীর বনের মধ্যে গালুডির পাকা রাস্তার সঙ্গে মিশেচে—সেখানে পৌঁছতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। তারপর বাঁধা সড়ক ছেড়ে

দিয়ে বাঁ দিকে কুলামাড়ো বলে একটা ক্ষুদ্র বন্যগ্রাম পার হয়ে পায়ে-চলা সুঁড়িপথ ধরে ধন্‌ঝরি পাহাড়ের নিচেকার ঘন বনের মধ্যে ঢুকলাম। পথ যে আমার একেবারে অপরিচিত তা নয়, আর বেশীদূর অগ্রসর না হ'লেও কুলামাড়ো গ্রামে সাঁওতালী উৎসবে সাঁওতালী নৃত্য দেখতে এর আগেও একবার এসেচি। সুতরাং আমার মনে দ্বিধা বা ভয় থাকবার কথা নয়, ছিলও না।

কুলামাড়ো পেছনে ফেলে চলেচি, আমার ডাইনে ধন্‌ঝরি পাহাড় সরু বন্য পথের সমান্তরাল ভাবে যেন বরাবর চলেচে উত্তর-দক্ষিণ কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের দিকে। বন ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে তা বেশ লক্ষ্য করচি। কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিক থেকেও আর একটা শৈলশ্রেণী যেন ক্রমশঃ ধন্‌ঝরির গায়ে মেশবার চেষ্টা করচে। যে অরণ্যাবৃত উপত্যকা দিয়ে আমি চলেচি সেটা যেন ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসচে। আমার জানা ছিল এই পথটা বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় ধন্‌ঝরি পাহাড় পার হয়ে ওপারে চলে গিয়ে আবার মুসাবনী রোডের সঙ্গে মিশেচে। সুতরাং মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। জানি, যেতে যেতে আপনা-আপনি মুসাবনী রোডে পড়বোই। নিশিঝর্ণা কোথায় আমার জানা ছিল না; আমি বনের মধ্যে যেতে যেতে কান খাড়া করে আছি কোথায় ঝর্ণার শব্দ পাওয়া যায়। এক জায়গায় সত্যিই শব্দ পাওয়া গেল জলের, সুঁড়িপথটা ছেড়ে নিবিড়তর বনের মধ্যে ঢুকে দেখি একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী উপলরাশির উপর দিয়ে বয়ে চলেচে; তার দু'ধারে এক প্রকাণ্ড বন্য গাছ—অজস্র বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে। স্থানটি যেমন সুন্দর তেমনি স্নিগ্ধ, কতক্ষণ বসে রইলাম একটা শিলাখণ্ডে, উঠতে যেন ইচ্ছে করে না।

কিন্তু এই বনে থাকা তখন যে উচিত ছিল না, তা তখন বুঝি নি। প্রথমতঃ তো বনের ও সব নিভৃত স্থানে—বিশেষ করে যেখানে জল থাকে, সেখানে বাঘ থাকা বিচিত্র নয়, দ্বিতীয়তঃ বেলা গেল, পথ তখনও কত বাকি সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না—অথবা ধারণা থাকলেও ভুল ধারণা ছিল। যখন আবার সুঁড়িপথটায় উঠলাম তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে।

বনের এই অংশের শোভা অবর্ণনীয়। প্রথম বসন্তে কত কি বনের ফুল গাছের মাথা আলো করে রেখেচে, ধন্‌ঝরির নীল সানুদেশ এক দিকে খাড়া হয়ে উঠেচে ডাইনে, শালমঞ্জরীর সুবাসে উপত্যকার বাতাস নিবিড় হয়ে উঠেচে, বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে গন্ধটি যেন আরও বাড়চে; কতক্ষণ অন্যমনে চলেছি, সুঁড়িপথটাও কখন হারিয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখি আমার সামনেই ধন্‌ঝরি পাহাড়ের খুব উঁচু একটি অংশ, সেখানে পাহাড় টপ্‌কে ওপারে যাওয়ার কোন উপায় নেই—পথও নেই। স্থানটি সম্পূর্ণ জনমানবহীন। সেই কুলামাড়ো গ্রাম ছাড়িয়ে এসে আর লোকালয় চোখে পড়ে নি। বেলাও পড়েচে, একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তা ছাড়া সুঁড়িপথটাই বা গেল কোথায়? বনের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পথ খুঁজতে গিয়ে আরও গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

এ দিকে সূর্য্য হেলে পড়েচে। এ বনের মধ্যে আর বেশিক্ষণ দেরি করা উচিত হবে না।

ভাবলাম, আর নিশিঝর্ণা দেখে দরকার নেই, এবার যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরি। কিন্তু কোথায় সে পথ? ক্রমে এমন সব জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখান দিয়ে আসবার সময় আসিনি তা বেশ বুঝলাম। বনের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া খুব সহজ, বিশেষ করে এ ধরনের নিবিড় বনের মধ্যে। কিন্তু আমি জানি ধন্‌ঝরি উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের দিকে বিস্তৃত, বিশেষতঃ সূর্য্য যখন এখনও আকাশে দেখা যাচ্ছে, তখন দিক ভুলের সম্ভাবনা অন্ততঃ নেই—এই একটা ভরসা ছিল মনে। কিন্তু ভরসা ভরসাই রয়ে গেল সেই পর্য্যন্ত, কোনও কাজে এলো না। সূর্য্য ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেল। ছায়া ঘনিয়ে এলো বনে। যদিও সামনে জ্যোৎস্না রাত্রি, তবুও এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা রাত্রি কাটানোর সম্ভাবনায় বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠলাম না।

হঠাৎ মনে হ'ল ধন্‌ঝরি পাহাড়ের ওপারেই তো মুসাবনী রোড। পাহাডটা যদি কোনও রকমে টপকাতে পারি, এখনও রাত হয় নি, লোকালয়ে পৌছতে পারবো। নতুবা ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে যতই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরবো ততই সম্পূর্ণরূপে পথভ্রান্ত হয়ে পড়তে হবে। একটা জায়গায় মনে হ'ল যেন ধন্‌ঝরি একটু নিচু হয়েচে। এই ধরণের নিচু খাঁজ দিয়েই আমার জানা পায়ে-চলার সুঁড়িপথটা গেছে—ঘন চুলের মধ্যে চেরা সিঁথির মতো; পার্ব্বত্য পথের কোন চিহ্নই দেখছি না কোন দিকে, তবুও এই অপেক্ষাকৃত নিচু থাক টপকে ধন্‌ঝরির ওপারে যাওয়া খুব কঠিন হবে না মনে হয়।

জুতো খুলে হাতে নিলাম। পাহাড়ের কিছুদূর উঠে গিয়ে দেখি নিচে বনের মধ্যে যত অন্ধকার ওপর ততটা নয়। জ্যোৎস্না উঠলো, জ্যোৎস্না ফুটবে ভালো। প্রথম খানিকটা উঠেই মনে হ'ল ভুল জায়গা দিয়ে পাহাড় পার হচ্ছি, এখান দিয়ে কখনও কেউ পাহাড় পার হয়নি—যেমন বড় বড পাথরের চাঁই, তেমনি কাঁটা গাছ সর্ব্বত্র। খালি পায়ে ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে চলতে বিষম কষ্ট, অথচ জুতো পায়ে দেওয়াও চলে না।

পাহাড়ের ওপরে খানিকটা উঠে গেলাম দিব্যি। তারপরে এক জায়গায় গিয়ে দেখি সামনে একেবারে খাড়াই—দুরারোহ পাহাড দেওয়ালের মতো উঠেচে। বড় বড় গাছের শেকড় ঝুলচে, যেন জলের তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে পড়েচে। আমি শিক্ষিত পর্ব্বতারোহণ-কারী নই, সেই খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে ওঠা আমার পক্ষে তাই সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এদিক ওদিক চেয়ে দেখি একদিকে একটা মসৃণ প্রকাণ্ড শিলা আড়ভাবে শোয়ানো, সেখানা উচ্চতায় আন্দাজ কুড়ি-বাইশ হাত এবং চওড়ায় ত্রিশ-বত্রিশ হাত হবে। এ ধরণের পাথরকে এদেশে 'রাগ্‌' বলে। 'রাগ্‌' পার হওয়া বিপদ্‌জনক, কারণ হাত-পা দিয়ে ধরবার এতে কিছু থাকে না। তবে এখানা অন্ততঃ ৬০° ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে বলে ভরসা হ'ল; এই একমাত্র পথে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠা চলবে এখন।

জুতো যখন পায়ে নেই এক রকম করে চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে 'রাগ' পার হয়ে ওপরে উঠলাম। তারপরে ওঠার বিশেষ কষ্ট নেই, শুধু অর্জ্জুন আর শুভ্র নিষ্পত্র শিববৃক্ষের জঙ্গল, বাঁকাভাবে চাঁদের আলো এসে শিববৃক্ষের দুধের মতো সাদা ধবধবে গুঁড়ির গায়ে

পড়েচে। কারণ তখন প্রদোষের ঈষৎ অন্ধকার কেটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেচে। এক জায়গায় ওপর দিকে মনে হল যেন গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কৌতূহল হ'ল অত্যন্ত, আপনি আপনি গাছে কি করে আগুন লাগবে? ওপরে উঠে গিয়ে দেখি সত্যিই এক জায়গায় একটা মোটা শেকড়ের গা দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে—তবে কি ভাবে শেকড়ে আগুন লাগলো তা আজও বলতে পারি না।

তখন আমি অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েচি, নিম্নের উপত্যকার গাছপালার মাথা কোঁকড়া-চুল কাফ্রিদের মাথার মতো দেখাচ্ছে; চাঁদের আলো বনের নিবিড় অন্ধকার উপত্যকার মধ্যে এতটুকু ঢোকে নি, ওপর থেকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে চারিদিকে ধন্ঝরির বিভিন্ন চূড়ার বনরাজির মাথায় মাথায় শুভ্র ঢেউ। সে জনমানবহীন শৈলমালার ঊর্দ্ধ সানুতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত শুক্লা চতুর্দ্দশী রাত্রির শোভা যে দেখে নি তাকে বলে বোঝানো যাবে না সে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার! একা যেন আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে কোন দেবলোকে বিচরণশীল আত্মা; আমার চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য দূর থেকে সুদূরে প্রসারিত, কোনো পার্থিব চক্ষু কোনোদিন তা দর্শন করেনি। কিন্তু সেখান থেকে আমার মনে হ'ল আমি সম্পূর্ণ ভুল করেচি, যে দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠেচি সেখান দিয়ে পাহাড় টপকাবার উপায় নেই—যতই উঠি ততই দেখি আমার চোখের সামনে অর্জ্জুন ও শিববৃক্ষের সাদা সাদা সোজা গুঁড়িগুলো থাকে থাকে উঠে যেন স্বর্গে উঠেচে। অর্থাৎ পাহাড়ের শিখর দেশের তখনও পর্য্যন্ত কোনো পাত্তাই নেই। তাছাড়া ক্লান্তও খুব হয়ে পড়েচি। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে যেন ঢেঁকির পাড় পড়চে অতিরিক্তি শ্রমের ফলে। এই বন ভেঙে অতখানি উঠে ওপারের ঢালু দিয়ে নামতে পারবো বলে মনে হ'ল না—তার চেয়ে যে পথে উঠেচি হাত-পা ভেঙে মরার চেয়ে নিম্ন উপত্যকায় নেমে জ্যোৎস্নার আলোয় আবার না হয় পথ খুঁজি।

বিপদ এলো এতক্ষণে এই নামবার সময়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে; একেবারে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে হ'ল প্রায়। দুর্ঘটনা যখন আসে তখন এমনি অতর্কিতে আসে।

যতটা উঠেছিলাম জ্যোৎস্নার আলোতে একরকম করে নেমে এসে সেই 'রাগ' খানার কাছে পৌঁছলাম। 'রাগ' পার হয়ে নেমে গেলে উপত্যকা আর বেশী নিচে নয়।

'রাগ' বেয়েই নামতে হবে, কারণ অন্য দিকে নামবার কোন উপায় নেই। অথচ 'রাগ' এমন মসৃণ যে হাত পায়ে আঁকড়াবার কিছু নেই—এ ধরণের পাথর বেয়ে ওঠা বরং সহজ, কিন্তু নামা অত্যন্ত কঠিন। তাড়াতাড়িতে আর একটা ভুল করলাম, উপুড় হয়ে না নেমে চিৎ হয়ে নামতে গেলাম। যাই হোক্, খানিকটা তো নামলাম দিব্যি, তারপর পাথরখানার উপর দিকের যে প্রান্ত হাত দিয়ে ধরেচি সেটা ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সড়্ সড়্ করে খানিকটা নামলাম। তারপর পাথরের গায়ে এক জায়গায় একরাশ শুকনো পাতা জমে আছে, সেখানটিতে পাথরের কোন খাঁজ আছে ভেবে যেমন পা নামিয়ে দিয়েচি অমনি শুকনো পাতার রাশ হুড় হুড় করে সরে গেল—সেই ঝোঁকে আমিও খানিকটা গড়িয়ে পড়লাম। অথচ পায়ে আটকাবার কোন খাঁজ বা উঁচু-নিচু জায়গা কিছুই পেলাম না।

তখন আমার অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেচে। কোথাও কিছু ধরবার নেই –স্লেটের মতো মসৃণ পাথরখানার কোন জায়গায়। আমি চিৎ হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় তার ওপর শুয়ে আছি এবং আঙুল টিপে বা সামান্য কিছু ধরে আছি, সেটা ছেড়ে দিলেই নিচের দিকে গড়িয়ে পাথরের নুড়ির স্তূপের ওপর গিয়ে পড়বো। সে পাথরের স্তূপ অন্ততঃ ত্রিশ ফুট নিচে, তার ওপড় পড়লে তীক্ষ্ণ ধারালো অসমান প্রস্তরখণ্ডে বিষম আহত হ'তে হবে। তারপর হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকলে এ জনশূন্য পাহাড়ের ওপরে কে-ই-বা উদ্ধার করচে ? এ অবস্থায় মৃত্যু ঘটা বিচিত্র কি ?

যখন আমি বুঝলুম আমি খুব বিপদগ্রস্ত—তখন হাত-পায়ে যেন আর বল নেই। আঙুলে টিপে ধরব কি, আঙুলই অবশ হয়ে আসচে। এভাবে আর কিছুক্ষণ কাটলেই গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবো এবং সাংঘাতিক আহত হ'ব।—তখন মনে হ'ল ওঠবার সময় পাথরখানার এ অংশ দিয়ে উঠি নি, কোণ ঘেঁষে উঠেছিলাম। সেখানে নিচে ছোটবড় অসমান শিলাখণ্ডের ধাপ-মতো ছিল, তখন দিনের আলো ছিল বলে দেখে শুনে ওঠবার সুবিধা ছিল, এখন রাত্রে বিশেষ করে ওপরের দিক থেকে নামবার সময় অতটা বুঝতে পারি নি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে চাইলাম, জলে ডোবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোন আশ্রয় খোঁজে, তেমনি। হঠাৎ নজরে পড়লো হাত খানেক দূরে একটা অর্জ্জুন গাছের মোটা শেকড় ওপরের একখানা শিলাখণ্ডের ফাটল থেকে বার হয়ে ঝুলচে। মরীয়ার মতো সাহসে ঝোঁক দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেই শেকড়টি আঁকড়ে ধরতে গেলাম এবং ধরেও ফেললাম। এতে নিজেকে আরও বিপন্ন করেছিলাম—কারণ শেকড় হাতের নাগালে না এলে টাল খেয়ে পড়ে গিয়ে সজোরে নিচের প্রস্তররাশির উপর পড়ে চূর্ণ হয়ে যেতাম—ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়লে হয় তো চোট খেয়ে বেঁচে যেতাম, এতে কিন্তু বাঁচবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

'রাগ' থেকে শেকড় ধরে নেমে এসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঝাল বেরুচ্ছে বলে মনে হ'ল!—নিশ্চিন্ত দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে যেমন হয় মানুষের। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করে নিয়ে হাত-পায়ের অবশ ভাবটা কাটিয়ে আবার নামতে আরম্ভ করলাম এবং পনরো মিনিটের মধ্যেই ধন্‌ঝরির উপত্যকার সমতল ভূমিতে পা দিলাম।

তখন আমার মনে সাহস বেড়ে গিয়েচে। গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সমতল ভূমিতে কোন বিপদই আর আমার কাছে বিপদ নয়। তখন রাত আন্দাজ দশটা হবে মনে হ'ল। জ্যোৎস্না খুব ফুটেচে, বনের মধ্যে আগের মতো অত অন্ধকার নেই। প্রথমে সেই পার্ব্বত্য নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম তার জলের কলধ্বনি শুনে। জল পান করে ও মাথায় মুখে জল দিয়ে শরীর ও মন সুস্থ হ'ল। মনে তখন ভয় বা উদ্বেগ আদৌ নেই। সুতরাং ধীর মস্তিষ্ক নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সেই সুঁড়িপথটা প্রায় আধঘণ্টা পরে বার করলাম।

কুলামাড়ো যখন এসে পৌঁছেচি তখন রাত বারোটার কম নয়। গ্রাম নিষুতি হয়ে গেছে বহুক্ষণ; আমায় দেখে গ্রাম্য কুকুরের দল মহা ঘেউ ঘেউ শুরু করলে। একটা ঘরের দাওয়ায় লোকেরা শুয়েছিল, কুকুরের ডাক শুনে তারা জাগলো। আমায় দেখে তারা খুব আশ্চর্য্য

হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় বনের মধ্যে যেতে দেখেছিল ছুপুরের পরে—বললে, "খুব বেঁচে গিয়েছিস বাবু। শঙ্খচূড় সাপের সামনে পড়লে আর বাঁচতিস্ না। ধন্‌ঝরির বনে বড্ড শঙ্খচুড় সাপের ভয়।"

রাতটা সে গ্রামে কাটিয়ে সকালের দিকে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডিতে ফিরে এলাম।

গঙ্গাধরের বিপদ্

অনেকদিন আগেকার কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে সময় মসলাপোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো একখানা মসলার দোকান।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলি জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেক দিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। দোকান-ঘরের ভাড়া ছু-মাসের বাকি, মহাজনদের দেনা ঘাড়ে —ছুপুর বেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যের সময় গোমস্তা ভাড়া নিতে আসবে বলে শাসিয়ে গিয়েচে। কি বলা যায় তাকে!

এক পুরোনো পরিচিত মহাজনের কথা মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েচে, শোধও করেচে, কিন্তু সুদের হার বড় বেশী বলে ইদানীং বছর কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায় নি।

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হ'ল। সুদ বেশি বলে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যের মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হনহন করে হেঁটে আসচে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বললে, "এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা···"

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো গাছ-পালার বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জ্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েচে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হ'ল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এলো। ওই গাছগুলোর তলায়—সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নিচু করে হিন্দীতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বললে, "বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?"

গঙ্গাধর আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কি মাল ?"

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে, "এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিস ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন…"

ঝুপ্সি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা ব'ললে, "জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেব !"

গঙ্গাধর চমকে উঠলো।

সে কখনো ও ব্যবসা করে নি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কি সর্ব্বনেশে জিনিস ! ভালো লোকের পাল্লায় সে পড়েচে ! না—সে কিনবে'না।

লোকটা সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। অনুনয়ের সুরে বলে, "বাবু, আপনি নিন। আপনার ভালো হবে। সিকি কড়িতে দেবো… আমার মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিসের ভয় তো আছে ? কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে ; সেই হয়েচে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিসের ভয় হ'ল যে কেন বাবু তা বুঝিনে। আগে যারা এ-ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্ছি, তারা আমার দিকে চেয়েও দেখচে না।…আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন পরে দামদস্তুর হবে…"

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজলো। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষ রাতারাতি বড় লোক হয়েচে বটে। বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয় ? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল আবার ? পাছে কেউ শোনে এই ভয়ে বেশী জোরে ডাকতেও পারলে না। চাপা গলায় বাঙালী-হিন্দীতে ডাকলে, "কোথায় গিয়া, ও খাঁসাহেব ?"

এদিকে ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁসাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বললে, "জলদি চলো, অনেক দূর যানে হোগা।"

কি একটা যেন ঢাকবার জন্যে লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। "আমার সঙ্গে এসো, মাল দেখাবো।"

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেক দূর গেল। যে সময়ের কথা বলচি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকো কাদার ওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেক দূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁসাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বললে, "আমায় দেখতে পাচ্ছ তো ?…"

"কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনো হয়নি যে এই সন্ধ্যে-বেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।"

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ডেরা কোথায়, খাঁসাহেব?"

লোকটা চকিতে পেছনে ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কেন, সে তোমার কি দরকার? পুলিসে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভালো হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে,—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?"

লোকটার চোখের চাউনি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করলো; খুব ভালো দেখা যায় না, কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠলো। না, তার সঙ্গে টাকা রয়েচে—এ-অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যেবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে? লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বিশেষতঃ, সে যে ভয় পেয়েচে এটা না-দেখানোই ভালো। দেখালে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না। ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূর গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে গুদামঘরের আশেপাশে সর্ব্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হ'লেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়; সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হ'ল গুদামঘরটা পুরোনো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে জায়গায় জায়গায়, চালের খোলা উড়ে গিয়েচে মাঝে মাঝে, সামনের দোরটা উই-ধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।...

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হ'ল। কেন সে এখানে এলো এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একা মানুষে আসে, বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে করে? সে আসতো না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙাল দেশ থেকে নতুন আসে নি। ওই লোকটির কথার সুরে কি জাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে ছাড়ায়। একথা এখন তার মনে হ'ল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁসাহেবের মূর্ত্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুলো। কোথাও যে চলে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। পাকা আর ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁসাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকলে। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে আসতে বললে তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিমঝিম করচে, বুক টিপটিপ করচে। এই অন্ধকার গুদাম-

ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানতো যে তার কাছে টাকা আছে, অনুসন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা? গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে, দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মতো গঙ্গাধর গুদামঘরের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা! গুদামের সর্ব্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্ব্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপ্‌সা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁতসেতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকে নি।

এদিকে আবার খাঁসাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ··মিনিট দুই হবে, কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা···আবার সেই ভয়টা হ'ল। কেমন এক ধরনের ভয়···যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই বা কি রকম ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট-দুই পরেই খাঁসাহেব—এই তো আধ-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।···

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললে খাঁসাহেব। বললে, "তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথা বলচি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বললাম, তা দেখতে পেয়েচ। শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বললাম পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে কেন?"

বাঃ রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচাকা হয়ে গিয়েছে, মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই কোথায় শাবল?"···

কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁসাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়চে···সব যেন ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে··· খাঁসাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে। কিন্তু পেরে উঠচে না···সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল···এক···দুই···তিন···চার···

আর কোথায় খাঁসাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিশিয়ে গিয়েচে···একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপ্‌টা এলো কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্ত্তরবে চীৎকার করে গুদামঘরের স্যাঁতসেতে মেঝের ওপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায় নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্য্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারতো না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজে খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটনা ঘটেছিল সেটা বললে। খোদাদাদ খাঁ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "সাহ্‌জী, ও হ'ল আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনেরো আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে যড় ছিল কোথায় সে মাল রাখতো কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে খুন হয়। কে বা কেন খুন করলে জানা যায় নি, কেউ ধরা পড়ে নি। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্য্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয় আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রি করবার জন্যে, ওর পুরোনো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা।…তা বাবু, সে গুদামঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?"

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেতো না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়লো, পুরোনো ভাঙা গুদামঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য এতদিনেও কি বোঝে নি সে মারা গিয়েচে?…কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।

রাজপুত্র

কাঞ্চীর রাজপুত্র এবার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। রাজ্যময় ধুমধাম পড়ে গেছে। কাঞ্চীর উত্তর প্রান্তে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুমন্দির। পুরোহিত গেছেন সেখানকার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য আনতে, লোক পাঠান হয়েচে প্রয়াগতীর্থ থেকে জল আনবার জন্যে। সেই জলে স্নান করিয়ে বিষ্ণুর পূজা-নির্ম্মাল্য তাঁর কপালে ঠেকিয়ে রাজপুত্রকে পুরনারীরা বরণ করবেন।

রাজা বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করেচেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। কোশলরাজের দূত কি এক প্রস্তাব নিয়ে এসেচে, রাজা তাই আজ সারাদিন ধরে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন—

শরীর ও মন দুইই-বড় ক্লান্ত। এমন সময় রাজকুমার কক্ষে ঢুকে পিতাকে প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা বললেন, "চন্দ্রসেন, তোমার কিছু বলবার আছে ?"

রাজপুত্র বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "বাবা, গত বছর যখন গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসি তখন আপনি বলেছিলেন আমায় কিছুদিন দেশভ্রমণে যাবার অনুমতি দেবেন। আপনার অসুখের জন্যে এতদিন কোন কথা বলি নি। আমি এইবার সে বিষয়ে অনুমতি চাই।"

মহারাজা বিস্মিতস্বরে বললেন, "কি বিষয়ে অনুমতি চাই বলো ?"

"আমি দেশভ্রমণে যেতে চাই বাবা।"

"তুমি জানো তোমার যৌবরাজ্যের অভিষেকের সব আয়োজন করা হয়েচে।"

"সেই জন্যেই তো আরও বেশি করে যেতে চাই, বাবা। আমি কাঞ্চী ছাড়া জীবনে কখনও কিছু দেখলুম না, কিছু জানলুম না,—কানে শুনেচি উত্তরে হিমবান পর্ব্বত আছে, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, পশ্চিমে সিন্ধুনদ আছে—কাঞ্চী ছাড়া আরও কত রাজদেশ আছে, কিন্তু উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে আমি চোখ থেকেও অন্ধ। যার জীবনে কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাকে দিয়ে দেশ-শাসন কি করে হবে! আমায় যেতে দিন বাবা!"

এর দুদিন পরে রাজ্যের লোক সবিস্ময়ে শুনলে রাজকুমার চন্দ্রসেনের অভিষেক-উৎসব সম্প্রতি স্থগিত থাকলো—কারণ তিনি চলেছেন বিদেশ ভ্রমণে—একা, সঙ্গে তিনি কাউকে নিতে রাজী নন।

সত্যই রাজকুমার কাউকে সঙ্গে নেন্ নি।

আজ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চন্দ্রসেন তাঁর প্রিয় সাদা ঘোড়াটিতে চড়ে একা পথ চলেচেন। আর সঙ্গে থাকবার মধ্যে বাঁদিকে খাপে-ঝোলানো পিতৃদত্ত তলোয়ারখানি। আর আছে চোখে অসীম তৃষ্ণা, বুকে অদম্য সাহস ও নির্ভীকতা। কাঞ্চী রাজ্যের সীমা ছাড়িয়েও দু'-দিনের পথ চলে এসেছেন, কত গ্রাম, মাঠ, বন, নদী পার হয়ে চলেচেন—সবই অচেনা, এ তাঁর নিজের রাজ্য কাঞ্চী নয়, এখানে তিনি একজন অজানা পথিক মাত্র।

তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। এক নদীর ধারে তাঁর ঘোড়া এসে পৌঁছুলো তাঁকে নিয়ে। প্রকাণ্ড নদী—বৈকালের রাঙা আলোয় ওপারের বনরেখা অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে। অতবড় নদী কি করে পার হবেন, রাজকুমার চিন্তায় পড়লেন। কোনোদিকে মানুষের বাসের চিহ্ন নেই—সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ধূসর হয়ে এলো। বিজন নদী—তীরের ছন্নছাড়া চেহারাটা সুমুখ-আঁধার রাতে গাঢ় ছায়ায় যেন আরও বেশি ছন্নছাড়া হয়ে ফুটে উঠলো।

ওপারে বহু দূরে একটা পাহাড়—নীল চূড়া একটু একটু চোখে পড়ে। রাজকুমার চেয়ে থাকতে থাকতে পাহাড়ের ওপর থেকে আগুনের রাঙা একটা হল্‌কা হঠাৎ আকাশের পানে লক্ লক্ করে জ্বলে উঠেই দপ্ করে নিবে গেল। রাজপুত্র অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েই আছেন এমন সময় একটা প্রকাণ্ড বাজপক্ষী সন্ধ্যার আকাশে ডানা মেলে নদীর উজান দিক থেকে উড়ে এসে তাঁর মাথার ওপর তিন চার বার চক্রাকারে ঘুরে আবার কোন্‌দিকে অদৃশ্য হোল।

রাজকুমারের নির্ভীক মনও একটুখানি কেঁপে উঠলো। তিনি জানতেন তাঁদের বংশে কারুর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর মাথার ওপর গৃধ্রজাতীয় পাখী তিনবার ওড়ে—কেউ কেউ বলেচেন, বিশেষ করে শাকুন-শাস্ত্রবিৎ কোন গণৎকার সেবার বলেছিলেন যে, এই গৃধ্র তাঁদের পূর্ব্ব-পুরুষদের হাতে অন্যায়ভাবে অবিচারে নিহত কোনো শত্রুর আত্মা—বহুকাল ধরে সে পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যায় নিজ শত্রুর বংশধরের মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস। কোথা থেকে আসে, কোথায় আবার উড়ে চলে যায়—কেউ বলতে পারে না।

রাতের সঙ্গে সঙ্গে এল হাড়কাঁপুনে ধারালো শীত। একটা বড় গাছও কোথাও নেই যার তলায় আশ্রয় নিতে পারেন। অবশেষে একটা মাটির ঢিপির পেছনে ঘোড়া থেকে নেমে রাজপুত্র নিজের আসন বিছালেন—সেখানটাতে হাওয়া বেশি লাগে না—শুক্‌নো লতাকাঠি কুড়িয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে সে রাত্রের মতো তিনি সেখানেই রইলেন। উপায় কি ?

গভীর রাত্রে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেল। বহুদূরে যেন কাদের আর্ত্তনাদ—মৃত্যু-পথের পথিকদের অন্তিম চীৎকারের মতো করুণ। রাজপুত্র নিজের অলক্ষিতে একবার শিউরে উঠলেন। শয্যার পাশের আগুন নিবে গিয়েচে, উঠে ভালো করে আগুন জ্বাললেন। সারা-রাত্রির মধ্যে ঘুম আর এলো না কিন্তু।

ভোরের দিকে একটা ডিঙি পাওয়া গেল। তাতে পার হয়ে রাজকুমার ওপারে গিয়ে উঠলেন। ডিঙির মাঝি আধ-পাগল এবং বোধ হয় কানে আদৌ শুনতে পায় না। রাজ-কুমারের প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে পারলে না।

প্রথমে একটা মরুভূমির মতো মাঠ—ঘাস, খড়, গাছপালা কিছুই নেই—কটা-রঙের বালির পাহাড় এখানে-ওখানে। অনেক দূরে গিয়ে একটা জনপদ। কিন্তু কেমন একটা নিরানন্দ ভাব চারদিকে। পথ দিয়ে পথিক চলে না, দোকান-পসারে খদ্দের নেই, নদীর ঘাটে স্নানার্থীর দল নেই, মাঠে চাষারা চাষ করে না—যেন কেমন একটা বিষাদ ও অমঙ্গলের ছায়া চারিদিকে।

রাজকুমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়েছিলেন। নিকটেই একটি গৃহস্থের বাড়ী। সেখানে গিয়ে আশ্রয় চাইতেই তারা খুব যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিলে। অনেকদিন পরে রাজকুমার ভালো খাবার খেলেন, ভালো বিছানায় বিশ্রাম করতে পেলেন, মানুষের সঙ্গ অনেক দিন পরে বড় প্রিয় মনে হ'ল। কয়েকদিন সেখানে রয়ে গেলেন তিনি। গৃহস্থের একটি ছোট মেয়ে ও ছোট ছেলের সঙ্গে রাজকুমারের বড় ভাব হ'ল। তারা তাঁকে ফুল তুলে মালা গেঁথে দেয়, দুপুরে তাঁর কাছে বসে গল্প শোনে, তাদের শত আব্‌দার প্রতিদিন তাঁকে সহ্য করতে হয়। ছোট ছেলেটির উপদ্রবের তো আর অন্ত নেই।

অল্পদিনের মধ্যে রাজকুমার সে বাড়ীর সবারই তো বটেই, গ্রামেরও সকল লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন। এত সুন্দর মুখশ্রী, এমন সুন্দর কান্তি, এমন মিষ্টি স্বভাবের মানুষ তারা কখনও দেখি নি। রাজকুমারের আসল পরিচয় কেউ জানে নি। তিনি

কাউকে সে সব কথা বলেন নি—সবাই ভাবে তিনি একজন গৃহহীন পথিক—হয়তো তাঁর কেউ কোথাও নেই। এতে সবারই স্নেহ তাঁর ওপর আরও বেড়ে যায়, কিসে তিনি সুখে থাকবেন কিসে আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ প্রবাস-কষ্ট তাঁর কমবে—সবারই এ চেষ্টা।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এমন সুন্দর চেহারার ছেলে, নিশ্চয়ই কোন বড় ঘরের হবে। গ্রামের যিনি মণ্ডল, তাঁর এক মেয়ে পরমাসুন্দরী—সবাই বলে ওই ছেলেই এ মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। বিধাতা ওর জন্যেই যেন এ দেবতার মতো সৌম্যকান্তি ছেলেটিকে কোথা থেকে জুটিয়ে এনেচেন। মণ্ডলগৃহিণীও রাজকুমারকে একদিন দূর থেকে দেখে এত পছন্দ করলেন যে, তিনি স্বামীকে জানিয়ে দিলেন—যদি ঐ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় ভালোই—নইলে মেয়ে চিরকুমারী থাকুক, তাঁর আপত্তি নেই।

রাজকুমার কিন্তু কিছুতেই তেমন আমোদ পান না। তাঁর মনে কি একটা বিপদের ছায়া সকল আনন্দকে ম্লান করে রাখে। একবার ভাবেন হয়তো বাপ-মাকে অনেকদিন দেখেন নি বলে এমন হয়—কিন্তু তাঁর মন বলে তা নয়, তা নয়,—ওসব সামান্য সুখ-দুঃখের ব্যাপারও নয়—এ এমন একটা কিছু, যার কারণ আরও গভীর, জীবন-মরণ নিয়ে এর কারবার।

ক্রমে এলো সে মাসের কৃষ্ণপক্ষ। রাজকুমার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন বাড়ীতে সবারই চোখে জল—গ্রামসুদ্ধ লোক সকলে বিষণ্ণ, নিরানন্দ। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না, কারণ জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাওয়া যায় না। সবাই কিসের ভয়ে জুজু হয়ে আছে যেন।

অবশেষে রাজকুমার কথাটা শুনলেন। এখান থেকে এক যোজন দূরে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ওপর রাজগুরু এক কাপালিকের সাধন-পীঠ। প্রতি অমাবস্যায় সেখানে নরবলির জন্য প্রতি গ্রাম থেকে পালাক্রমে একটি তরুণ বয়স্ক লোক পাঠানো চাই-ই। রাজার হুকুম। এবার এ গ্রামের পালা।

শোনা মাত্র রাজকুমার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললেন। তাঁর পিতৃদত্ত তূণের তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ফলা-পরানো যে বাণ তা কি শুধু নিরীহ পশুপক্ষী শিকারের জন্যে?

"ক্ষতি হতে ত্রাণ করে এই সে কারণ—মহান ক্ষাত্রিয় নাম বিদিত জগতে।"—অস্ত্রগুরুর সে উপদেশ রাজকুমার কি ভুলে গিয়েচেন এত শীগ্‌গির!

অমাবস্যার দিন মণ্ডলের বাড়ীতে পাশার সাহায্যে নির্দ্ধারিত হবে এবার কে গ্রাম থেকে যাবে। রাজকুমার এ কথা শুনলেন। অমাবস্যার পূর্ব্বদিন গভীর রাত্রের অন্ধকারে তিনি চুপি চুপি শয্যাত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন—কেউ জানে না। সকালে উঠে তাঁকে আর কেউ দেখতে পেলে না।

মণ্ডলের বাড়ীতে পাশার মজ্‌লিসে যার নাম উঠল সে এক গৃহস্থের একমাত্র পুত্র। সবাই চোখের জলে ভেসে তাকে বিদায় দিলে। তার বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চললো কাপালিকের কাছে—যদি হাতে-পায়ে ধরে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে এই দুরাশায়।

গৃধ্রকূট পর্ব্বতের পাদদেশে গিয়ে তারা যা দেখলে, তাতে তারা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। বড় জামগাছটার তলায় দুটো মৃতদেহ: একটা তাদের গ্রামের সেই

তরুণ অতিথির, আর একটা কাপালিকের—দেখে মনে হয় দুজনেই পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করেচে। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ সবাই ছুটে এলো দেখতে। যে নিজের প্রাণ দিয়ে তাদের চিরকালের জন্তে বিপদমুক্ত করে গেল—রাজার ভয়ে গোপনে চোখের জলে ভেসে তার শেষ সৎকার সম্পন্ন করলে।

রাজকুমারের সত্যিকার পরিচয় সে দেশের লোক তখনো জানে নি।

চাউল

মানভূমের টাঁড় ও জঙ্গল জায়গা। একটু দূরে বড় পাহাড়শ্রেণী, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বসন্তকালের শেষ, পলাশ ফুল বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে, নাকটিটাঁড়ের উঁচু ডাঙা জমি থেকে যতদূর দেখা যায়, শুধু রক্তপলাশের বন দূরে নীল শৈলমালার কোল ছুঁয়েছে।

জঙ্গল দেখতে এসেচি এদিকে, কাছেই রাস্তার ধারে পলাশবনের প্রান্তে ডাকবাংলোতে থাকি, জঙ্গলের কাঠে কেমন আয় হবে তাই দেখে বেড়াই। একদিন সন্ধ্যের আগে নাকটিটাঁড়ের বন দেখে ফিরচি, পথের ধারে একটা হরিতকী গাছের তলায় একটি লোক ও একটি ছোট মেয়ে বসে পুঁটুলি খুলে কি খাচ্ছে। জনহীন পথিপার্শ্ব, কেউ কোনদিকে নেই—সন্ধ্যেরও আর অল্পই বিলম্ব, সামনে বাঘমুণ্ডীর বনময় পথ, এমন সময় লোকটা কি করে জানবার আগ্রহে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল কিছু পাকা, কিছু কাঁচা। পুঁটুলির মধ্যে খানদুই ছেঁড়া নেকড়া, একখানা কাঁথা আর কিছু মকাই—সের দুই হবে, একটা খালি চায়ের কিংবা বিস্কুটের টিন। বোধ হয় সেটাই তৈজসপত্রের অভাব পূর্ণ করচে সব দিক দিয়ে। সঙ্গের মেয়েটির বয়স চার কি পাঁচ। পরণে ছোট্ট একটু ময়লা নেকড়া মেয়েটার, কোমরে ঘুন্সী।

আমি বললাম, "কোথায় যাবে হে, বাড়ী কোথায় ?"

লোকটি মানভূমি বাংলায় বললে, "তোড়াং হে···টুকু আগুন আছে ?"

"দেশলাই ? আছে, দিচ্ছি।···তোড়াং কতদূর এখান থেকে ?"

"টুকু দূর আছে বটে। পাঁচ কোশ হবেক।"

"কোথা থেকে আসা হচ্ছে এমন সন্ধ্যেবেলা ?"

"হেই সেই পুরুলিয়া থিকে।···আগুন দাও বাবু। শোরিল একেবারে কাবু হয়ে গিয়েছে। হেই মেয়েটার মা মরে গেল ওর দু'বছর বয়সে। ওকে রেখে জঙ্গলে কাঠের কাম করতে যাইতে পারি নাই—তাই পুরুলিয়া গেঁইছিলি। ভিক্ষা মাঙি দু'বছর র'ইয়েছিলি।"

লোকটির কথাবার্ত্তার ধরণ আমাকে আকৃষ্ট করলে। ডাক-বাংলোতে সন্ধ্যার সময় ফিরেই বা কি হবে এখন ? সেখানেও সঙ্গিহীন ঘর-দোর। তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক্ এর সঙ্গে। কাছে একটা বড় পাথর পড়েছিল, সেটার ওপর বসে ওকে একটা বিড়ি দিলাম।

নিজেও একটা ধরালাম। লোকটার বাড়ী নাকি পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র বন্য গ্রামে, বাঘমুণ্ডী ও ঝাল্‌দা শৈলমালা ও অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন নিভৃত ছায়াগহন উপত্যকাভূমিতে, পলাশ, মহুয়া, বট, কেঁদ গাছের তলায়। ওর আর দুটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পরে এই মেয়েটি হয় এবং মেয়েটির বয়স যখন দু'বছর, তখন তার মাও হ'ল মৃত্যুপথযাত্রী। লোকটা জঙ্গলের কাঠ ভেঙে এনে চন্দনকিয়ারীর হাটে বিক্রি করতো এদেশের অনেক গ্রাম্যলোকের মতো। কিন্তু ঘরে কেউ নেই দু'বছরের মেয়েকে দেখবার, তাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ পাহাড়ে উঠে রৌদ্র ও বর্ষায় কি করে কাঠ ভাঙে? তাই ঘরে আগড় বন্ধ করে ও চলে গিয়েছিল অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় পুরুলিয়া শহরে।

আমি বললাম, "কাঠের কাজে আয় হ'ত কেমন?"

লোকটা বিড়িতে টান দিয়ে বললে, "বোঝা পিছু তিন আনা, চার আনা। জঙ্গলে ছাড় লিত দু'পয়সা। চাল সস্তা ছিলি। ইহিয়ে যেতো পেটের ভাত দু'জনার। তারপর বাবু মেয়্যাটা হোলেক্, ওর মা মর‍্যা গেলেক্। তখন কচি মেয়্যাটারে ফেলে জঙ্গলে যেতে মন নাই সরলেক্। বলি যাই পুরুলিয়া, ভারি শহর, পেটের ভাত দু'জনার হইয়ে যাবেক্।"

"পুরুলিয়া বড় জায়গা?"

"ওঃ বাবু, ইধার থিকে উধার যাওয়ার কূল-কিনারা দু'বছরে নাই পাইলেক্। ভারি শহর বাবু…" আমি ওকে আর একটা বিড়ি দিলাম। গল্প জমে উঠেচে। বললাম,—"তারপর…?"

তারপর পুরুলিয়া শহরে কি ভাবে গেল, তার গল্প করলে। ওদের পাশের গাঁয়ের একজন লোক পুরুলিয়া শহরে কি একটা কাজ করে, তার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়েছে, তখন এক বড়লোকের বাড়ীর ফটকে মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করতে দাঁড়ালো। তারা দুটি পয়সা দিলে, দু'পয়সার ছোলা কিনে বাপ-মেয়েতে রাত কাটিয়ে দিলে গাছতলায় শুয়ে। পুলিসে আবার শুতে দেয় না; অর্দ্ধেক রাত্রে এসে লণ্ঠনের আলো ফেলে বলে, "হিঁয়াসে হঠ্ যাও!" তার পরদিন আলাপী লোকের সন্ধান মিললো। গিয়ে দেখে দেশে সে লোকটা যত বড়াই করে, আসলে সে তত বড় নয়। সামান্য একটা দু-কামরা ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকে—তামাক মেখে বিক্রি করে মাথায় নিয়ে, কখনো জলের কুঁজো পাইকেরি দরে কিনে ফিরি করে খুচরো বেচে—এই সব উঞ্ছবৃত্তি। অথচ দেশে বলেছিল সে বড় সাহেবের আরদালি।

যাহোক্, অনেক বলা-কওয়াতে সে জায়গা একটু দিলে—ঘরের বাইরের দাওয়ার একপাশে শুয়ে থাকতে হবে, তবে নিজের এনে খাওয়া-দাওয়া, তার ভার সে নেবে না। বছর দুই সেখানেই থেকে চলেছিল যা হয় একরকম—তারপর এই অকাল পড়লো, চালের দাম চড়লো—শহরে চালের দাম হ'ল আঠারো টাকা। ভিক্ষে আর তেমন লোকে দিতে চায় না—তাও হয়তো চলতো যা হয় করে, কিন্তু যাদের বাড়ীতে থাকা তারা গোলমাল করতে লাগলো। তারা আর জায়গা দিতে চায় না, বলে, "আমাদের লোক আসবে, বাড়ী ছেড়ে

দাও।" রোজ গোলমাল করে, তাই আজ তিন দিন শহর থেকে বেরিয়ে জন্মভূমি তোড়াং গ্রামে চলেচে।

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ খালি বিস্কুটের টিন হাতে করে বাজাছিল।

ওর দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা বললে, "এর নাম রৈখেছে থুপী।"

আমি বাপের মনে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম, "থুপী? বেশ নাম।"

বাপ সগর্ব্বে বললে, "হাঁ থুপী।" তারপর আমায় বললে, "বাবু, তামাক কিনবার পয়সা দিবেন ছুটি?"

আমি পয়সা সামান্যই নিয়ে বেড়াতে বার হয়েচি, জঙ্গলের পথে পয়সা কি করবো? ওকে দুটি মাত্র পয়সা দিতে পারলাম। থুপী কি একটা বললে ওর বাবাকে, বাবা তাকে কাঁধে নিয়ে চললো। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম—

রাস্তা যেখানে উঁচু হয়ে ওদিকের সব দৃশ্য ঢেকে দিয়েচে, সেখানে ওর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে পুঁটুলি বগলে ও চলেচে - সেদিকেই অস্তদিগন্ত ও সূর্য্যাস্ত, রঙীন আকাশের পটে ওর মূর্ত্তি দেখাচ্ছে ছবির মতো, কারণ আগেই বলেছি রাস্তা উঁচু হওয়ার দরুণ সেখানে আর কিছু দেখা যায় না, রাস্তাই সেখানে চক্রবালরেখার সৃষ্টি করেচে।

মনে মনে ভাবলাম, ওর কোথাও অন্ন নেই, গৃহ নেই—পাঁচ বছরের মেয়েকে কত স্নেহে কাঁধে তুলে ও যে চললো গ্রামের দিকে, সেখানে অন্ন কি জুটবে এ দুর্দ্দিনে,—যদি পুরুলিয়া শহরে না জুটে থাকে? কোন্ বৃথা আশার আকর্ষণ ওকে নিয়ে চলেচে গ্রামের মুখে? তার পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।...

এ হ'ল গত মাসের কথা। তখনও চাল ছিল ষোল টাকা আঠারো টাকা মণ, ক্রমে তাই দাঁড়ালো বত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা। এই সময় একবার কার্য্য উপলক্ষে বিহার থেকে আমায় যেতে হ'ল বাংলাদেশে, পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলায়। মানুষের এমন কষ্ট কখনো চোখে দেখি নি—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হবে।

যে আত্মীয়ের বাড়ী ছিলাম তাদের বাড়ীতে সন্ধ্যা থেকে কত রাত পর্য্যন্ত শীর্ণ বুভুক্ষু, কঙ্কালসার বালকবালিকা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় কালো হাঁড়ি উঁচু করে তুলে দেখিয়ে বলচে,—"একটু ফেন দিন মা, একটু ফেন!" অনাহারে মৃত্যুর কত মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনে এলাম সারা পথ কুমিল্লা থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত—স্টীমারে, ট্রেনে।

বিহারে এসে দেখি এখানেও তাই। বহেরাগোড়া স্কুলের বোর্ডিঙে ড্রেন দিয়ে যে ভাতের ফেন গড়িয়ে পড়ে তাই ধরে খাবার জন্যে একপাল বুভুক্ষু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাঁড়ি হাতে দুবেলা বসে থাকে—তারই জন্যে কি কাড়াকাড়ি।

হেডমাস্টার বললেন, "এই গ্রামের ডোম আর কাহারদের ছেলেমেয়ে এখানেই পড়ে আছে ভাতের ফেনের জন্যে—সকাল থেকে এসে জোটে আর সারাদিন থাকে, রাত ন'টা পর্যন্ত। সামান্য দুটো ভাতের জন্যে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে।"

পুরুলিয়া থেকে আদ্রা যাচ্ছি, প্ল্যাটফর্মের খাবারের দোকানে খাবার খেয়ে পাতা ফেলে

দিয়েচে লোকে—তাই চেটে চেটে খাচ্ছে উলঙ্গ, কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলেরা—অথচ সে পাতায় কিছুই নেই! কি চাটছে তারাই জানে!

এই অবস্থার মধ্যে ভাদ্রমাসের শেষে আমি এলাম এমন একটা জায়গায়, যেখানে অনেক লোক খাটচে একজন বড় কণ্ট্রাক্টারের অধীনে ডিনামাইট্ দিয়ে পাথর ফাটানো কাজে। জঙ্গলের মধ্যে পাথর ফাটিয়ে এরা টাটায় চালান দিচ্ছে, স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে নতুন ইজারা নেওয়া পাথর খাদান।

একদিন সেখানকার ছোট্ট ডাক্তারখানাটার সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। ডাক্তারখানাটার সংকীর্ণ বারান্দাতে একজন কুলি শুয়ে আছে। পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—ব্যাণ্ডেজ ভিজে রক্ত দরদরিয়ে পড়ে সিমেণ্টের রোয়াক ভিজিয়ে দিয়েচে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েচে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এমন মাঝে মাঝে এক আধটা হচ্ছেই। ব্লাস্টিং করতে গিয়ে পাথর ছুটে লেগে মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েচে। সেলাই করে দিয়েচি, এখন টাটানগর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স্ আসচে।"

ভিড় একটু সরিয়ে কাছে গিয়ে দেখি একটা পাঁচ-ছ' বছরের মেয়ে ওর কাছে একটু দূরে বসে—কিন্তু সে কাঁদেও না, কিছুই না—নির্ব্বিকার ভাবে বসে একটা খড় তুলে মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে।

আমি তাকে দেখেই চিনলাম—আটমাস পূর্ব্বে মানভূমের বন্য অঞ্চলে দৃষ্ট সেই ক্ষুদ্র বালিকা থুপী!

আহত কুলির মুখ ভাল করে দেখে চিনলাম—এ সেই থুপীর বাবা, যে সগর্ব্বে বলেছিল, "এর নাম রেখেচি থুপী।"

আশেপাশের দু'একজনকে জিগ্যেস করলাম, "এ কোথা থেকে এসেছিলো জানো?"

একজন বললে, মানভূম জিলা থেকে আজ্ঞে!"

"কি গাঁ?"

"তোড়াং।"

"ওর কোনো আপনার লোক এখানে নেই?"

"কে থাকবেক্ আজ্ঞে—ওর ওই বিটি ছানাটা আছে। কত কত ধুর থিক্যা এথেনে কাজ করতে এসেচে, চাল দেয় সেই জন্যে আজ্ঞে।"

"কোম্পানী কত করে চাল দেয়?"

"হপ্তায় পাঁচ সের মাথাপিছু।"

সুতরাং থুপীর বাপের ইতিহাস আমি অনেকটা অনুমান করে নিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখলে বাড়ী ভেঙেচুরে গিয়েচে, চাল মেলে না, মিললেও ওর সামর্থ্যের বাইরের জিনিস তা কেনা। মকাই ও বির্রি কলাই, তারপরে বুনো কচু ও ভুঁই-কুমড়োর মূল খেয়ে যতদিন চলবার চললো—কারণ ঠিক এই ইতিহাস আমি বিভিন্ন অঞ্চলগুলি থেকে আগত

প্রত্যেক কুলির মুখেই শুনেচি—শেষে এখানে ও এসে পড়লো মজুরি, বিশেষ করে চাল পাওয়ার লোভে। পয়সা দিলেও গ্রামে আজকাল চাল মিলচে না, আমি সেদিন বহেরাগোড়া অঞ্চলে দেখে এসেছি।

এ্যাম্বুলেন্স্ গাড়ী এলো। ধরাধরি করে থুপীর বাবাকে গাড়ীতে ওঠানো হল—সে কেবল-মাত্র একবার যন্ত্রণাসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া অত আদরের অত গর্ব্বের বস্তু থুপীর নামও করলে না, তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

ডাক্তার বললেন, "টাটা এখান থেকে সাতাশ মাইল রাস্তা। ঝাঁকুনিতেই বোধ হয় মারা যাবে—বিশেষ করে রক্ত বন্ধ হল না যখন এখনো।"

দুধারে শালবনের মধ্যবর্ত্তী রাঙা মরুম মাটির সোজা রাস্তা বেয়ে এ্যাম্বুলেন্সের মোটর ছুটল থুপীর বাবাকে নিয়ে—পুনরায় অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে, পুনরায় পশ্চিমের আকাশ লক্ষ্য করে জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে। অতি সাধের অনাথা থুপীকে কার কাছে রেখে চললো সে হিসেব নেবার অবসর তখন তার নেই।

হীরামানিক জ্বলে



হীরামানিক জ্বলে

ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর।

একটি নদীও আছে গ্রামের উত্তর প্রান্তে। মহকুমা থেকে বারো তের মাইল, রেল স্টেশন থেকেও সাত আট মাইল।

গ্রামের মুস্তফি বংশ এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, এখন তাঁদের অবস্থা আগের মত না থাকলেও আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে তাঁরাই এখনও পর্য্যন্ত বড়লোক বলে গণ্য, যদিও ভাঙা পূজোর দালানে আগের মত জাঁকজমকে এখন আর পূজো হয় না—প্রকাণ্ড বাড়ীর যে মহলগুলোর ছাদ ধসে পড়েছে গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে, সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না, বাড়ীর মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় কেরানী পাত্রদের সঙ্গে—অর্থের এতই অভাব।

সুশীল এই বংশের ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করে বাড়ী বসে আছে—বড় বংশের ছেলে, তার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনো চাকুরি করেন নি, সুতরাং বাড়ী বসেই বাপের অন্ন ধ্বংস করুক এই ছিল বাড়ীর সকলেরই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়।

সুশীল তাই করে আসছে অবিশ্যি।

সুন্দরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস খুব বেশি নেই—আগে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস ছিল, তাদের সবাই এখন বিদেশে চাকুরি করে—বড় বড় বাড়ী জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

মুস্তফিদের প্রকাণ্ড ভদ্রাসনের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে তাঁদের দৌহিত্র রায় বংশ বাস করে। পূর্ব্বে যখন মুস্তফিদের সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল তখন বিদেশ থেকে কুলগৌরব-সম্পন্ন রায়দের আনিয়ে কন্যাদান করে জমি দিয়ে এখানেই বাস করিয়েছিলেন এঁরা।

কালের বিপর্য্যয়ে সেই রায় বংশের ছেলেরা এখন সুশিক্ষিত ও প্রায় সকলেই বিদেশে ভাল চাকুরি করে। নগদ টাকার মুখ দেখতে পায়—বাড়ী কেউ বড় একটা আসে না—যখন আসে তখন খুব বড়-মানুষি চাল দেখিয়ে যায়। পদে পদে মাতুল বংশের ওপর টেক্কা দিয়ে চলাই যেন তাদের দু-একমাস-স্থায়ী পল্লীবাসের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।

আশ্বিন মাস। পূজোর বেশী দিন দেরি নেই।

অঘোর রায়ের বড় ছেলে অবনী সস্ত্রীক বাড়ী এসেছে। শোনা যাচ্ছে, দুর্গোৎসব না করলেও অবনী এবার ধুমধামে নাকি কালী পূজো করবে। অবনী সরকারী দপ্তরে ভাল চাকুরি করে। অবনীর বাবা অঘোর রায় ছেলের কাছেই বিদেশে থাকেন। তিনি এ সময় বাড়ী আসেন নি, তাঁর মেজ ছেলে অখিলের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন। অখিল যেন কোথাকার সাবডেপুটি—পনেরো দিন ছুটি নিয়ে স্ত্রীপুত্র ও বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছে।

সুশীল অবনীদের বৈঠকখানায় বসে এদের চালবাজির কথা শুনছিল অনেকক্ষণ থেকে।

অবনী বললে—মামা, তোমাদের বড় শতরঞ্জি আছে ?

—একখানা দালানজোড়া শতরঞ্জি ছিল জানি—কিন্তু সেটা ছিঁড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়।

—ছেঁড়া শতরঞ্জি আমার চলবে না। তাহলে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ভাল একখানি বড় শতরঞ্জি কিনে আনি, বন্ধুবান্ধব পাঁচজনে আসবে, তাদের সামনে বার করার উপযুক্ত হওয়া চাই তো!—বড় আলো আছে ?

—বাতির ঝাড় ছিল, এক-এক থাকে কাঁচ খুলে গিয়েছে—তাতে চলে তো নিও।

—তোমাদের তাতেই কাজ চলে ?

—কেন চলবে না ? দেখায় খুব ভাল। তা ছাড়া দুর্গোৎসবের কাজ দিনমানেই বেশি —রাত্রে আরতি হয়ে গেলেই আলোর কাজ তো মিটে গেল।

—আমার ডে-লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। কালীপুজোর রাতে আলোর ব্যবস্থা একটু ভালরকম থাকা দরকার। ইলেকট্রিক আলোয় বারো মাস বাস করা অভ্যেস, সত্যি, পাড়াগাঁয়ে এসে এমন অসুবিধে হয়!

বৃদ্ধ সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী তাঁর ছোট ছেলের একটা চাকুরির জন্যে অবনীর কাছে ক-দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটু—অবিশ্যি খুব সামান্যই একটু—ভরসা পেয়েছিলেন, তিনি অমনি বলে উঠলেন—তা অসুবিধে হবে না ? বলি তোমরা বাবাজী কি রকম জায়গায় থাকো, কি ধরনে থাকো—তা আমার জানা আছে তো! গঙ্গাচানের যোগে কলকাতা গেলেই তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠি, আর সে কী যত্ন! ওঃ, ইলেকটিরি আলো না হলে কি বাবাজী তোমাদের চলে ?

সুশীল কলকাতায় দু-একবার মাত্র গিয়েছে,—আধুনিক সভ্যতার যুগের বহু নতুন জিনিসই তার অপরিচিত—শিক্ষিত ও শহুরে বাবু অবনীর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে তাকে কথা বলতে হয়।

তবুও সে বললে—ডে-লাইটের্ চেয়ে কিন্তু ঝাড়-লণ্ঠন দেখায় ভাল—

অবনী হেসে গড়িয়ে পড়ে আর-কি!

—ওহে যে যুগে জমিদারপুত্রেরা নিষ্কর্মা বসে থাকত আর হাতিতে চড়ে জরদ্গবের মত ঘুরে বেড়াতো—ওসব চাল ছিল সেকালের। মডার্ন যুগে ও সব অচল, বুঝলে মামা ? এ হল প্রগতির যুগ—হাতির বদলে ইলেকট্রিক লাইট—সেকালকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে ?

বনেদি পুরোনো আমলের চালচলনে আবাল্য অভ্যস্ত সুশীল। বয়সে যুবক হলেও প্রাচীনের ভক্ত।

সে বললে—কেন, হাতি চড়াটা কী খারাপ দেখলে ?

—রামোঃ! জবড়জং ব্যাপার! হাতির মত মোটা জানোয়ারের ওপর বসে-থাকা পেট-মোটা নাদুস নুদুস—

সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী বললেন—গোবর-গণেশ—

—জমিদারের ছেলেরই শোভা পায়, কিন্তু কাজে যারা ব্যস্ত, সময় যাদের হাতে কম, দিনে যাদের ত্রিশ মাইল চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয় নিজের কাজে বা আপিসের কাজে—তাদের পক্ষে দরকার মোটর বাইক বা মোটরকার। স্মার্ট যারা—তাদের উপযুক্ত যানই হচ্ছে—

সুশীল প্রতিবাদ করে বললে—স্মার্ট কারা জানি নে; মোগল বাদশাদের সময় আকবর আওরঙ্গজেবের মত বীর হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত—তারা স্মার্ট হল না—হল তোমাদের কলকাতার আদ্দির-পাঞ্জাবি-পরা চশমা-চোখে ছোকরা বাবুর দল, যারা বাপের পয়সায় গড়ের মাঠে হাওয়া খায়—কিংবা শখে পড়ে দু-দশ কদম মোটর ড্রাইভ করে, তারা? অত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, তারা হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত, পুরুরাজ হাতির পিঠে চড়ে আলেকজাণ্ডারের গ্রীক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল—তারা স্মার্ট ছিল না, স্মার্ট হল সিনেমার ছোকরা অ্যাক্টরের দল?

সুশীল সেখান থেকে উঠে চলে এল। অবনীর ধরন-ধারণ তার ভাল লাগে নি—দূর সম্পর্কের মামাভাগ্নে, কোনকালের দৌহিত্র বংশের লোক, এই পর্য্যন্ত। এখন তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কী যোগ আছে?—কিছুই না। জমিদারের ছেলেদের ওপর অবনীর এ কটাক্ষ, সুশীলের মনে হল তাকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে।

তা করতে পারে—এরা এখন সব হঠাৎ-বড়লোকের দল, পুরনো বংশের ওপর ওদের রাগ থাকা অসম্ভব নয়।

সুশীল জমিদারপুত্রও বটে, নিষ্কর্ম্মাও বটে। বসে খেতে খেতে দিনকতক পরে পেটমোটা হয়েও উঠবে—এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ। অবনী তাকে লক্ষ্য করেই বলেছে নিশ্চয়ই।

বাড়ী এসে সুশীল জ্যাঠামশায়কে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা জ্যাঠামণি, আমাদের বংশে কখনো কেউ চাকরি করেছে?

জ্যাঠামশায় তারাকান্ত মুস্তফির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি পুজোর দালানের সঙ্গের ছোট কুঠরিতে সারাদিন বৈষয়িক কাগজপত্র দেখেন এবং মাঝে মাঝে গীতা পাঠ করেন। ঘরটার কুলুঙ্গিতে ও দেওয়ালের গায়ের তাকে গত পঞ্চাশ বছরের পুরনো পাঁজি সাজানো। তারাকান্ত বললেন—কেন বাবা সুশীল? এ বংশে কারো কোন ভাবনা ছিল যে চাকুরি করবে?

—ছেলেরা কী করত জ্যাঠামণি?

—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—তবে আজ-কাল বড় খারাপ সময় পড়েছে, জমিজমাও অনেক বেরিয়ে গেল—তাই যা-হয় একটু কষ্ট যাচ্ছে। কী আবার করবে কে? ওতে আমাদের মান যায়।

সুশীল কথাটা ভেবে দেখলে অবসর সময়ে। অবনীর কথাগুলো হিংসেতে ভরা ছিল এখন

দেখা যাচ্ছে। অবনীদের বাইরে বেরিয়ে চাকুরি না করলে চলে না—আর তাদের চিরকাল চলে আসছে বাড়ী বসে—এতে অবনীর হিংসের কথা বৈকি।

মামার বাড়ী খেয়ে চিরকাল ওরা মানুষ। আজ হঠাৎ বড়লোক হয়ে চাল দেওয়া কথা-বার্তায় সেই-মাতুল বংশকেই ছোট করতে চায়।

সুশীল এর প্রমাণ অন্য একদিক থেকে খুব শিগগিরই পেলে। মুস্তফিদের সাবেক পূজোর মণ্ডপে দুর্গোৎসব টিম্‌টিম্‌ করে সমাধা হল—লোকের পাতে ছেঁচড়া, কলাইয়ের ডাল, ক্ষেতের রাঙা নাগরা চালের ভাত, পুকুরের মাছ, জোলো দুধোলো দই ও চিনির ডেলা ঘোঙা মোণ্ডা খাইয়ে—কিন্তু অবনীদের বাড়ী যে কালীপূজো হল—সে একটা দেখবার জিনিস!

কালীপূজোর রাত্রে গাঁ-সুদ্ধ পোলাও মাংস, কলকাতা থেকে আনা দই রাবড়ি সন্দেশ খেলে। টিন-টিন দামী সিগারেট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিলি হ'ল, পরদিন দুপুরে যাত্রা ও ভাসানের রাত্রে প্রীতি সম্মেলনে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অবনীর এক বন্ধু আবার ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড দেখিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতাও করলে। গ্রামের লোক সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল। এ গাঁয়ে এমনটি আর কখনো হয় নি—কেউ দেখেনি। সকলের মুখে অবনীর সুখ্যাতি।

কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, যদি তারা সেই সঙ্গে অমনি মুস্তফি জমিদারদের ছোট করে না দিত।

—নাঃ, মুস্তফিরা কথনো এদের সঙ্গে দাঁড়ায়? বলে কিসে আর কিসে!

—যা বলেচ ভায়া! নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না—

—শুধু লম্বা লম্বা কথা আছে – আর কিছু নেই রে ভাই।

এ-ধরনের একটা কথা একদিন সুশীলের নিজের কানেই গেল। নিজেদের পুকুরের ঘাটে বসে সুশীল ছিপে মাছ ধরছে, গাঁয়ের ওর পরিচিত দুটি ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে পথ দিয়ে যাচ্ছেন। একজন বললেন—মুস্তফিদের ওপর এবার খুব একহাত নিয়েছে অবনী। অপর জন বললে—তার মানে মুস্তফিদের আর কিছু নেই। সব ছেলেগুলো বাড়ী বসে বসে খাবে, আজকালকার দিনে কি আর সেকেলে বনেদি চাল চলে? লেখাপড়া তো একটা ছেলেও ভাল করে শিখলে না—

—লেখাপড়া শিখেও তো ঐ সুশীলটা বাপের হোটেলে দিব্যি বসে খাচ্ছে—ওদের কখনো কিছু হবে না বলে দিলাম। যত সব আল্‌সে আর কুঁড়ে।

কথাটা সুশীলের মনে লাগল। এদিক থেকে সে কোনদিন নিজেকে বিচার করে দেখেনি। চিরকাল তো এইরকম হয়ে আসছে তাদের বংশে, এতদিন কেউ কিছু বলে নি, আজকাল বলে কেন তবে?

পাশের গ্রামে সুশীলের এক বন্ধু থাকত, সুশীল তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। ছেলেটির নাম প্রমথ, তার বাবা এক সময়ে মুস্তফিদের স্টেটের নায়েব ছিলেন, কিন্তু তারপর চাকুরি ছেড়ে মাল-চালানি ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন।

প্রমথ বেশ বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ যুবক। সে নিজের চেষ্টায় গ্রামে একটা নৈশ স্কুল করেছে, একটা দরিদ্র-ভাণ্ডার খুলেছে—তার পেছনে গ্রামের তরুণদের যে দলটি গড়ে উঠেছে—গ্রামের মঙ্গলের জন্যে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। সম্প্রতি প্রমথ বাবার আড়তে বেরুতে আরম্ভ করেছে।

সুশীল বললে—প্রমথ, আমাকে তোমাদের আড়তে কাজ শেখাবে?

প্রমথ আশ্চর্য্য হয়ে ওর দিকে চেয়ে বললে—কেন বল তো? হঠাৎ এ কথা কেন তোমার মুখে?

—বসে বসে চিরকাল বাপের ভাত খাব?

—তোমাদের বংশে কেউ কখনো অন্য কাজ করেনি, তাই বলছি। হঠাৎ এ মতিবুদ্ধি ঘটল কেন তোমার?

—সে বলব পরে। আপাতত একটা হিল্লে করে দাও তো!

—ওর মধ্যে কঠিন আর কি। যে দিন ইচ্ছে এসো, বাবার কাছে নিয়ে যাব।

মাসখানেক ধরে সুশীল ওদের আড়তে বেরুতে লাগল, কিন্তু ক্রমশ সে দেখলে, ভুষি মাল চালানির কাজের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ নেই। তার বাবা ছেলেকে আড়তে যোগ দিতে বাধা দেন নি, বরং বলেছিলেন ব্যবসার কাজে যদি কিছু টাকা দরকার হয়, তাও তিনি দেবেন।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আড়তের কাজ কি রকম হচ্ছে?

সুশীল বললে—ও ভাল লাগে না, তার চেয়ে বরং ডাক্তারি পড়ি।

—তোমার ইচ্ছে। তাহলে কলকাতায় গিয়ে দেখেশুনে এস।

কলকাতায় এসে সুশীল দেখলে, ডাক্তারি স্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় এখন নয়। ওদের বছর আরম্ভ হয় জুলাই মাসে—তার এখনও তিন চার মাস দেরি। সুশীলের এক মামা খিদিরপুরে বাসা করে থাকতেন, তাঁর বাসাতেই সুশীল এসে উঠেছিল—তাঁরই পরামর্শে সে দু-একটা আপিসে কাজের চেষ্টা করতে লাগল।

দিন-পনরো অনেক আপিসে ঘোরাফেরা করেও সে কোথাও কোন কাজের সুবিধে করতে পারলে না—এদিকে টাকা এল ফুরিয়ে। মামার বাসায় খাবার খরচ লাগত না অবিশ্যি, কিন্তু হাত খরচের জন্যে রোজ একটি টাকা দরকার। বাবার কাছে সে চাইবে না—নগদ টাকার সেখানে বড় টানাটানি, সে জানে। একটা কিছু না করে এবার বাড়ী ফিরবার ইচ্ছে নেই তার। অথচ করাই বা যায় কী? সন্ধ্যার দিকে গড়ের মাঠে বসে রোজ ভাবে।

সুশীল সেদিন গড়ের মাঠের একটা নির্জ্জন জায়গায় বসে ছিল চুপ করে। বড্ড গরম পড়ে গিয়েছে—খিদিরপুরে তার মামার বাসাটিও ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের চিৎকার ও উপদ্রবে সদা সরগরম—সেখানে গিয়ে একটা ঘরে তিন-চারটি আট দশ বছরের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে হবে। সুশীলের ভাল লাগে না আদৌ। তাদের অবস্থা এখন খারাপ হতে পারে, কিন্তু দেশের বাড়ীতে জায়গার কোন অভাব নেই।

ওপরে নিচে বড় বড় ঘর আছে—লম্বা লম্বা দালান, বারান্দা—পুকুরের ধারের দিকে বাইরের মহলে এত বড় একটা রোয়াক আছে যে, সেখানে অনায়াসে একটা যাত্রার আসর হতে পারে।

এমন সব জ্যোৎস্না রাতে কতদিন সে পুকুরের ধারে ওই রোয়াকটায় একা বসে কাটিয়েছে। পুকুরের ওপারে নারিকেল গাছের সারি, তার পেছনে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চুড়োটা, সামনের দিকে ওর ঠাকুরদাদার আমলের পুরনো বৈঠকখানা। এ বৈঠকখানায় এখন আর কেউ বসে না—কাঠ ও বিচুলি, শুকনো তেঁতুল, ভুষি, খুঁটে ইত্যাদি রাখা হয় বর্ষাকালে।

মাঝে-মাঝে সাপ বেরোয় এখানে।

সেবার ভাদ্রমাসে তালনবমীর ব্রতের ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে পুজোর দালানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শোনা গেল পুকুর-পাড়ের পুরনো বৈঠকখানার দিক থেকে।

সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, হরি চাকর বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকেছিল বিচালি পাড়বার জন্যে—সে সময় কি সাপে তাকে কামড়েছে।

হৈ-হৈ হল। লোকজন এসে সারা বৈঠকখানার মালামাল বার করে সাপের খোঁজ করতে লাগল। কিছু গেল না দেখা। হরি চাকর বললে সে সাপ দেখে নি, বিচুলির মধ্যে থেকে তাকে কামড়েছে।

ওঝার জন্যে রানীনগরে খবর গেল। রানীনগরের সাপের ওঝা তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত—তারা এসে ঝাড়ফুঁক করে হরিকে সে-যাত্রা বাঁচালে। লোকজনে খুঁজে সাপও বের করলে—প্রকাণ্ড খয়ে-গোখ্‌রো। হরি যে বেঁচে গেল, তার পুনর্জ্জন্ম বলতে হবে।

—বাবু, ম্যাচিস্ আছে—ম্যাচিস্?

সুশীল চমকে মাথা তুলে দেখলে, একটি কালোমত লোক। অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত অবাঙালী লোক বলেই সুশীলের ধারণা হল—কারণ তারাই সাধারণত দেশলাইকে 'ম্যাচিস্' বলে থাকে।

সুশীল ধূমপান করে না, সুতরাং সে দেশলাইও রাখে না। সে কথা লোকটাকে বলতে সে চলেই যাচ্ছিল—কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে যেন কি ভেবে ফিরে এল।

সুশীলের একটু ভয় হল। লোকটিকে এবার সে ভাল করে দেখে নিয়েছে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সবল, শক্ত-হাত-পা-ওয়ালা চেহারা—গুণ্ডা হওয়া বিচিত্র নয়। সুশীলের পকেটে বিশেষ কিছু নেই—টাকা-তিনেক মাত্র। সুশীল একটু সতর্ক হয়ে সরে বসল। লোকটা ওর কাছে এসে বিনীত সুরে বললে—বাবুজি, দু-আনা পয়সা হবে?

সুশীল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দুয়ানি পকেট থেকে বের করে লোকটার হাতে দিলে। তাই নিয়ে যদি খুশি হয়, হোক না। এখন ও চলে গেলে যে হয়!

চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ কিন্তু লোকটার মধ্যে দেখা গেল না। সে সুশীলের কাছেই এসে সকৃতজ্ঞ সুরে বললে—বহুৎ মেহেরবানি আপনার বাবু! আমার আজ খাওয়ার কিছু ছিল না—এই পয়সা নিয়ে হটেলে গিয়ে রোটি খাবো। বাবুজির ঘর কুথায়?

ভাল বিপদ দেখা যাচ্ছে! পয়সা পেয়ে তবুও নড়ে না যে! নিশ্চয় আরও কিছু পাবার মতলব আছে ওর মনে মনে। সুশীল চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, কাছাকাছি কেউ নেই। পকেটে টাকা তিনটে ছাড়া সোনার বোতামও আছে জামায়, হঠাৎ এখন মনে পড়লো।

ও উত্তর দিলে—কলকাতাতেই বাড়ী, বালিগঞ্জে। আমার কাকা পুলিসে কাজ করেন কিনা, এদিকে রোজ বেড়াতে আসেন মোটর নিয়ে। এতক্ষণে এলেন বলে, রেড রোডে মোটর রেখে এখানেই আসবেন। আমি এখানে থাকি রোজ, উনি জানেন।

—বেশ বাবু, আপনাকে দেখেই বড় ঘরানা বলে মনে হয়।

সুশীলের মনে কৌতূহল হওয়াতে সে বললে—তুমি কোথায় থাক?

—মেটেবুরুজে বাবুজি।

—কিছু করো নাকি?

—জাহাজে কাজ করতাম, এখন কাজ নেই। ঘুরি ফিরি কাজের খোঁজে। রোটির যোগাড় করতে হবে তো?

লোকটার সম্বন্ধে সুশীলের কৌতূহল আরো বেড়ে উঠল। তা ছাড়া লোকটার কথাবার্ত্তার ধরণে মনে হয় লোকটা খুব খারাপ ধরনের নয় হয়ত। সুশীল বললে—জাহাজে কতদিন খালাসিগিরি করছ?

—দশ বছরের কুছু ওপর হবে।

—কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছ?

—সব দেশে। যে দেশে বলবেন সে দেশে। জাপান লাইন, বিলেত লাইন, জাভা সুমাত্রার লাইন—এস্. এস্. পেনগুইন, এস্. এস্. গোলকুণ্ডা—এস্. এস্. নলডেরা, পিয়েনোর বড় জাহাজ নলডেরা, নাম শুনেছেন?

'পিয়েনো' কি জিনিস, পল্লীগ্রামের সুশীল তা বুঝতে পারলে না। না, ওসব নাম সে শোনে নি।

—তা বাবুজি, আপনার কাছে ছিপাবো না। সরাব পিয়ে পিয়ে কাজটা খারাবি হয়ে পড়ল, জাহাজ থেকে ডিস্‌চার্জ করে দিলে। এখন এই কোষ্টো যাচ্ছে, মুখ ফুটে কাউকে বলতে ভি পারি নি। কী করবো, নসিব বাবুজি!

—জাহাজে কাজ আবার পাবে না।

—পাবো বাবুজি, ডিস্‌চার্জ সাটিক্-ফিটিক্ ভাল আছে। সরাব-টরাবের কথা ওতে কুছু নেই। কাপ্তানটা ভাল লোক, তাকে কেঁদে গোড়-পাকড়ে বললাম—সাহেব আমার রোটি মেরো না। ওকথা লিখ না!

লোকটি আর একটু কাছে এসে ঘেঁষে বসল। বললে—আমার নসিব খারাপ বাবু—নয় তো আমায় আজ চাকরি করে খেতে হবে কেন? আজ তো আমি রাজা!

সুশীল মৃদু কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞাসা করলে—কি রকম?

লোকটি এদিক ওদিক চেয়ে স্বর নামিয়ে বললে—আজ আর বলব না। এইখানে কাল আপনি আসতে পারবেন ?

—কেন পারব না ?

—তাই আসবেন কাল। আচ্ছা বাবু, আপনি পুরানো লিখা পড়তে পারেন ?

সুশীল একটু আশ্চর্য্য হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কী লেখা ?

—সে কাল বাৎলাবো। আপনি কাল এখানে আসবেন, তবে, বেলা থাকতে আসবেন—সুরয ডুববার আগে।

মামার বাসায় এসে কৌতুহলে সুশীলের রাতে চোখে ঘুমই এল না। এক-একবার তার মনে হল, জাহাজী মাল্লা কত দূর কত দেশ ঘুরেছে, কোন এক আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা কি তাকে বলবে ? কোন নতুন দেশের কথা ? পুরনো লেখা কিসের ?…

ওর ছোট মামাতো ভাই সনৎ ওর পাশেই শোয়। গরমে তারও চোখে ঘুম নেই। খানিকটা উশখুশ করার পরে সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। বললে—দাদা চা খাবে ? চা করব ?

—এত রাত্তিরে চা কী রে ?

—কী করি বল। ঘুম আসছে না চোখে—খাও একটু চা।

সনৎ ছেলেটিকে সুশীল খুব পছন্দ করে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, লেখাপড়াতেও ভাল, ফুটবল খেলায় এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে, কলেজ টীমের বড়-বড় ম্যাচে খেলবার সময় ওকে ভিন্ন চলে না।

সনৎ-এর আর একটা গুণ, ভয় বলে কোন জিনিস নেই তার শরীরে। মনে হয় দুনিয়ার কোন কিছুকে সে গ্রাহ্য করে না। দু-বার এই স্বভাবের দোষে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, একবার খেলার মাঠে এক সার্জেণ্টের সঙ্গে মারামারি করে, নিজে তাতে মার খেয়েছিলও খুব—মার দিয়েছিলও। সেবার ওর বাবা টাকাকড়ি খরচ করে ওকে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনেন। আর একবার মাহেশের রথতলায় একটি মেয়েকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডার ছুরিতে প্রায় প্রাণ দিয়েছিল আর-কি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যুবকদল ওকে গুণ্ডাদের মাঝখান থেকে টেনে উদ্ধার করে আনে।

সুশীল বললে—সনৎ, কতদূর লেখা পড়া করবি ভাবছিস ?

—দেখি দাদা। বি. এস্‌-সি. পর্য্যন্ত পড়ে একটা কারখানায় ঢুকে কাজ শিখব। কল-কব্জার দিকে আমার ঝোঁক, সে তো তুমি জানোই—

—আমি যদি কোন ব্যবসায় নামি, আমার সঙ্গে থাকবি তুই ?

—নিশ্চয়ই থাকব। তুমি যেখানে থাকবে, যা করবে—আমি তাতে থাকি এ আমার বড় ইচ্ছে কিন্তু। কী ব্যবসা করবে ভাবছ দাদা ?

—আচ্ছা, কাউকে এখন এসব কিছু বলিস নে। তোকে আমি জানাবো ঠিক সময়ে। তোকে নইলে আমার চলবে না। চল্ আজ শুয়ে পড়ি—রাত দুটো বাজে—

পরদিন সুশীল গড়ের মাঠে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে একা বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল—তবুও লোকটির দেখা নেই।

অন্ধকার নামল। আসবে না সে লোক? হয়ত নয়। কি একটা বলবে ভেবেছিল কাল, রাতারাতি তার মন ঘুরে গেছে।

রাত আটটার সময় সুশীল উঠতে যাবে, এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখলে।

পরক্ষণেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লোকটা ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে।

—সেলাম, বাবুজি! মাপ করবেন, বড় দেরি হয়ে গেল। এই দেখুন—

লোকটার পায়ের ওপর দিয়ে ভারী একটা জিনিস চলে গিয়েছে যেন। সাদা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—কিন্তু ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে।

সুশীল বললে—এঃ, কী হয়েছে পায়ে?

—এই জন্যেই দেরি হয়ে গেল বাবুজি। বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আর একটা ভারি হাতে-ঠেলা গাড়ী পায়ের ওপর এসে পড়ল। দু-জন লোক ঠেলছিল, তাদের সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল আমার সঙ্গের লোকদের।

—বসো বসো। তোমার পায়ে দেখছি সাঙ্ঘাতিক লেগেছে! না এলেই পারতে!

—না এলে আপনি তো হারিয়ে যেতেন। আপনাকে আর পেতাম কোথায়? রিক্শা করে এসেছি বাবুজি, দাঁড়াতে পারছি নে!

লোকটা ঘাসের ওপর বসে পড়ল। বললে—আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাবুজি, আজ কোন কাজ হবে না।

লোকটা কথা বলবে, সুশীল শুনবে। এতে দিনের আলোর কী দরকার, সুশীল বুঝতে পারলে না। বললে—কী কথা বলবে বলেছিলে—বলে যাও না?

লোকটা ধীরে ধীরে চাপা গলায় অনেক কথা বললে—মোটামুটি তার বক্তব্য এই :—

তার বাড়ী আগে ছিল পশ্চিমে। কিন্তু অনেকদিন থেকে সে বাঙলা দেশে আছে এবং বাঙালী খালাসীদের সঙ্গে কাজ করে বাঙলা শিখেছে। লোকটা মুসলমান, ওর নাম জামাতুল্লা। একবার কয়েকজন তেলেগু লস্করের সঙ্গে সে একটা জাহাজে কাজ করে—ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে নারকোল-কুচি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত মাদ্রাজ থেকে। সেই সময় একবার তাদের জাহাজ ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অচল হয়ে পড়ে। সোরাবায়া থেকে তাদের কোম্পানির অন্য জাহাজ এসে তাদের জাহাজের মাল তুলে নিয়ে যাবার আগে সাতদিন ওরা সেইখানে পড়ে ছিল। একদিন সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে জাহাজসুদ্ধ লোকের কলেরা হল।

এইখানে সুশীল জিজ্ঞেস করলে—সবারই কলেরা হল?

—কেউ বাদ ছিল না বাবু। খাবার পাওয়া যেত না, পাহাড়ের একটা গর্ত্তে কাঁকড়া

পেয়ে সেদিন ওরা তাই ধরেছিল। ছোট-ছোট—লাল কাঁকড়া।

—তারপর ?

—দু-জন বাদে বাকি সব সেই রাত্রে মারা গেল। বাবুজী, সে রাতের কথা ভাবলে এখনও ভয় হয়। সতেরো জন দিশি লস্কর আর দু-জন ওলন্দাজ সাহেব—একজন মেট আর একজন ইঞ্জিনীয়ার— সেই রাত্রে সাবাড়। রইলাম বাকি কাপ্তান আর আমি।

তারপর জাহাজের কাপ্তান ওকে বললে—মড়াগুলো টান দিয়ে ফেলে দাও জলে—

ও বললে—আমি মুর্দ্দাফরাশ নই সাহেব, ও আমি ছোঁব না—

সাহেব ওকে গুলি করে মারতে এল। ও গিয়ে লুকোলো ডেকের ঢাকনি খুলে হোল্ডের মধ্যে। সেই রাত্রে কাপ্তান সাহেব খুব মদ খেয়ে চিৎকার করে গান গাইছে—ও সেই সময় জাহাজের বোট খুলে নিয়ে নামতে গেল।

ডেভিট থেকে বোট নামাবার শব্দে সাহেবের মদের নেশা ভাঙল না তাই নিস্তার--ডেকের ওপরে তখন দুটো মড়া পড়ে রয়েছে—মরণের বীজ জাহাজের সর্ব্বত্র ছড়ানো, ভয়ে ও কিছু খায় নি সকাল থেকে, পাছে কলেরা হয়। সুতরাং অনাহারে ও ভয়ে খানিকটা দুর্ব্বলও হয়ে পড়েছে।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছিল, দুপুরের দিকে ও লক্ষ্য করেছিল। সারা রাত নৌকো বাইবার পরে ভোরে এসে বোট ডাঙায় লাগল। ও নেমে দেখে ডাঙায় ভীষণ জঙ্গল—ওদেশের সব দ্বীপেই এ ধরনের জঙ্গল ও জানত। লোকজনের কোন চিহ্ন নেই কোনদিকে।

বোট ডাঙায় বেঁধে ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দু-দিন হাঁটলে, শুধু গাছের কচি পাতা আর এক ধরনের অম্ল-মধুর ফল খেয়ে। মানুষের বসতির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় এসে হঠাৎ একেবারে ও অবাক হয়ে গেল।

ওর সামনে প্রকাণ্ড বড় সিংহদরজা—কিন্তু বড় বড় লতাপাতা উঠে একেবারে ঢেকে ফেলে দিয়েছে। সিংহদরজার পর একটা বড় পাঁচিলের খানিকটা—আরও খানিক গিয়ে একটা বড় মন্দির, তার চুড়ো ভেঙে পড়েছে—মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বলে তার মনে হল। সে ভারতের লোক, হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি সে চেনে। এ ক্ষেত্রে হয়ত সে ঠিক চিনতে পারে নি—তবে তার ওইরকম বলেই মনে হয়েছিল।

অবাক হয়ে সে আরও ঘুরে ঘুরে দেখলে। জায়গাটা একটা বহুকালের পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপ মনে হল। কত মন্দির, কত ঘর, কত পাথরের সিংদরজা, গভীর বনের মধ্যে বড় বড় কাছির মত লতার নাগপাশ-বন্ধনে জড়িয়ে কত যুগ ধরে পড়ে আছে। ভীষণ বিষধর সাপের আড্ডা সর্ব্বত্র। একটা বড় ভাঙা মন্দিরে সে পাথরের প্রকাণ্ড বড় মূর্তি দেখেছিল—প্রায় আট দশ হাত উঁচু।

সন্ধ্যা আসবার আর বেশি দেরি নেই দেখে তার বড় ভয় হয়ে গেল। এ সব প্রাচীন কালের নগর শহর—জিন পরীর আড্ডা, তেলেগু লস্করেরা যাকে ওদের ভাষায় বলে 'বিম্মমুনি'।

বিষ্মুনি বড় ভয়ানক জিন, হিন্দুদের পুরোহিত মারা যাওয়ার পর বিষ্মুনি হয়। এই গহন অরণ্যের মধ্যে লোকহীন পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন নগরীর অলিতে গলিতে ঝোপেঝাপে ধূম্রবর্ণ, বিকটাকার, কত যুগের বুভুক্ষু বিষ্মুনির দল সন্ধ্যার অন্ধকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জাগ্রত হয়ে উঠে হাঁক পাড়ে—ম্যয় ভুখা হুঁ! তাদের হাতের নাগালে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? অতএব এখান থেকে পালানোই একমাত্র বাঁচবার পথ।

সুশীল এক মনে শুনছিল,—পালিয়ে গেলে কোথায়?

—সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার দু-দিন তিন দিন ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌঁছুলাম। জাহাজে উঠব এসে এই তখন খেয়াল।

—আবার সেই মড়া-ভর্ত্তি জাহাজে কেন?

—বুঝলেন না বাবুজি? যদি জাহাজে উঠি, তবে তো দেশে পৌঁছুবার ঠিকানা মেলে। নয়তো সেই জংলি মুলুকে যাবো কোথায়? চারিধারে সমুদ্র, যদি জাহাজ না পাই তবে সেই জংলি মুলুকে না খেয়ে মরতে হবে—নয়তো জংলি লোকেরা খুন করে ফেলবে। বাবুজি, তখন এমন ভয়, যে রাতে ঘুমুতে পারি নে। একদিন প্রকাণ্ড এক বনমানুষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম—নসিবের জোর খুব। অমন ধরনের জানোয়ার যে দুনিয়ায় আছে তা জানতাম না। গাছের ওপর একদল বনমানুষ ছিল—ধাড়িটা আমায় দেখতে পেলে না বাবুজি, দেখলে আর বাঁচতাম না।

সুশীল মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখলে। লোকটা মিথ্যা কথা বলচে না সত্যি বলচে, ওর এই বনমানুষের কথা তার একটা মস্ত বড় পরীক্ষা। সুশীল জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছিল, বাড়ীতে আগে নানা রকম পাখি, বেঁজি, খরগোশ, শজারু ও বাঁদর পুষত। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলত, 'মুস্তফিদের চিড়িয়াখানা'। এ সম্বন্ধে ইংরেজি বইও নিজের পয়সায় কিনেছিল।

ও বললে—কত বড় বনমানুষ?

—খুব বড় বাবুজি। ইন্দোরের পালোয়ান রামনকীব সিং-এর চেয়েও একটা বাচ্চার গায়ে জোর বেশি। নিজের আঁখ্‌সে দেখলাম।

—কী করে দেখলে?

—ডাল ফাঁড়লে হাত আর পা দিয়ে ধরে! আমার মাথার ওপর গাছপালার ডালগুলো তো বনমানুষে বিলকুল ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল।

—তবে তো তুমি সুমাত্রা দ্বীপে কিংবা বোর্নিওতে গিয়েছিলে কিংবা ওর কাছাকাছি কোন ছোট দ্বীপে। তুমি যে বনমানুষ বলছ—ও হচ্ছে ওরাং ওটাং—ও ছাড়া আর কোন বনমানুষ ও দেশে থাকবে না—

লোকটা হঠাৎ অত্যন্ত বিস্ময়ে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—দাঁড়ান—দাঁড়ান, বাবুজি, কী জায়গার নাম করলেন আপনি?

—সুমাত্রা আর বোর্নিও—

—ওঃ, বাবুজি, আপনি বহুৎ পড়ালিখা আদমি! এই নাম কতকাল শুনিনি জানেন? আজ দশ বারো বছর। শেষের নামটা—কী বললেন বাবুজি? বোনিও? ঠিক। সুলু সী'র নাম জাহাজী চার্টে দেখবেন। সুলু সী'র কাছাকাছি, এপার ওপার। কেন জানেন বাবুজি? এই নাম শুনলে আমার বহুত কথা মনে পড়ে যায়! তাজ্জব কথা! আজ দেখচেন আমায় এই গড়ের মাঠে বসে দু-একটা পয়সা ভিক্ষে করছি—কিন্তু আমি আজ—আচ্ছা, সে কথা এখন থাক।

—তারপর কী করলে বল না! জঙ্গল থেকে এসে উঠলে আবার জাহাজে?

—হ্যাঁ, উঠলাম। সেই কাপ্তান তখন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে নিজের কেবিনে চাবি দিয়ে ঘুমুচ্ছে—আমি আগে তো ভাবলাম মরে গিয়েছে। মড়াগুলো কতক কাপ্তান ফেলে দিয়েছে—কতক তখনও রয়েচে। ভীষণ বদ গন্ধ—আর সেই গরম! আমি জাহাজের কিছু খেতে পারিনে কলেরার ভয়ে। ডাঙায় গিয়ে মাছ ধরতাম—আর কচ্ছপ।

—কাপ্তেন বেঁচে ছিল?

—বেঁচে ছিল, কিন্তু বেচারির মগজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তখনকার দিনে বেতার ছিল না, আমাদের জাহাজে যে অমন হয়ে গেল, সে খবর কোথাও দেওয়া যায় নি। ওসব দিকের সমুদ্রে জাহাজ বেশি চলাচল করে না—জাহাজের লাইন নয়। এগারো দিন পরে সৌরাবায়া থেকে জাহাজ যাচ্ছিল পাসারাপং,—তারা আমাদের আগুন দেখে এসে জাহাজে তুলে নিয়ে বাঁচায়।

—কিসের আগুন?

—ডুবো পাহাড়ের খানিকটা ভাঁটার সময় বেরিয়ে থাকত। পাটের থলে জ্বালিয়ে সেখানে রোজ আগুন করতাম—অন্য জাহাজের যদি চোখে পড়ে। তাতেই তো বেঁচে গেলাম।

এ পর্য্যন্ত শুনে সুশীল বুঝতে পারলে না লোকটার ভাগ্য কিসে ফিরেছিল। তবে লোকটা যে মিথ্যা কথা বলছে না, ওর কথার ধরন থেকে সুশীলের তা মনে হল। কিন্তু এইবার লোকটা যে কাহিনী বললে, তা শেষ পর্য্যন্ত শুনে সুশীল বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল—অল্পক্ষণের জন্য সারা গড়ের মাঠ, এমন কি বিরাট কলকাতা শহরটাই যেন তার সমস্ত আলোর মালা নিয়ে তার চোখের সামনে থেকে গেল বেমালুম মুছে—বহু দূরের কোন বিপদসঙ্কুল নীল সমুদ্রে সে একা পাড়ি জমিয়েছে বহুকালের লুকোনো হীরে-মানিক-মুক্তোর সন্ধানে—পৃথিবীর কত পর্ব্বতে, কন্দরে, মরুতে, অরণ্যে অজানা স্বর্ণরাশি মানুষের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—বেরিয়ে পড়তে হবে সেই লুকোনো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে—পুরুষ যদি হও! নয় তো আপিসের দোরে দোরে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মত ঘুরে ঘুরে সেলাম বাজিয়ে চাকুরির সন্ধান করে বেড়ানোই যার একমাত্র লক্ষ্য তার ভাগ্যে—নৈব চ, নৈব চ!

এই খালাসীটা হয়ত লেখাপড়া শেখে নি, হয়ত মার্জ্জিত নয়—কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে এসেছে, দুনিয়ার বড় বড় নগর বন্দর, বড় বড় দ্বীপ দেখতে কিছু বাকি

রাখে নি—এ একটা পুরুষ মানুষ বটে—কত বিপদে পড়েছে, কত বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে !

বিপদের নামে ত্রিশ হাত পেছিয়ে থাকে যারা, গা বাঁচিয়ে চলবার ঝোঁক যাদের সারা জীবন ধরে, তাদের দ্বারা না ঘুচবে অপরের দুঃখ, না ঘুচবে তাদের নিজেদের দুঃখ। লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে—তাদের তিনি কৃপা করেন যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরাম-প্রিয়তাকে তুচ্ছ বোধ করে।

জাহাজ সৌরাবায়া এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু-জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল! সত্যিই ক্লান্তিতে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়, অখাদ্য ভক্ষণে ওদের শরীর ভেঙে পড়েছিল। দিন পনেরো হাসপাতালে শুয়ে থাকবার পরে ক্রমশ ওর শরীর ভাল হয়ে গেল—কাপ্তেনের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণও ক্রমে দূর হল।

ওদের জন্যে কিছু টাকা চাঁদা উঠেছিল, ও হাসপাতাল থেকে যেদিন বাইরে পা দিলে, সে দিন এক দয়াবতী মেমসাহেব ওকে টাকাটা দিয়ে গেলেন। দুঃস্থ নাগরিকদের থাকবার জন্যে গভর্মেণ্টের একটা বাড়ী আছে—সেখানে ওকে বিনি খরচায় থাকবার অনুমতি দেওয়া হল।

এই বাড়ীতে সে প্রায় দু-মাস ছিল, তারপর অন্য জাহাজে চাকরি নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে। তারপর পাঁচ-সাত বছর কেটে গেল। ও যেমন জাহাজে কাজ করে তেমনি করে যাচ্ছে। প্রাচ্য-দেশের বড় বড় বন্দরের মদের দোকান ও জুয়ার আড্ডার সঙ্গে তখন সে সুপরিচিত।

একবার তাদের জাহাজ ম্যানিলাতে থেমেছে। ও অন্যান্য লস্করদের সঙ্গে গিয়ে এক পরিচিত জুয়ার আড্ডায় উঠেছে—এমন সময়ে আড্ডাধারী এসে ওকে বললে—একবার এস তো! তোমাদের দেশের একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ও অবাক হয়ে বললে—আমাদের দেশের ?

আড্ডাধারী চীনাম্যান হেসে বললে—হ্যাঁ, ইণ্ডিয়ার। এতকাল দোকান করছি বন্দরে, ইণ্ডিয়ার মানুষ চিনিনে ?

ও আড্ডাধারীর পিছু পিছু গিয়ে দেখলে জুয়ার আড্ডার পেছনে একটা পায়রার খোপের মত ছোট্ট ভীষণ নোংরা ঘরে একজন লোক শুয়ে। লোকটার বয়স কত ঠিক বোঝবার জো নেই—চল্লিশও হতে পারে, আবার ষাটও হতে পারে। বিছানার সঙ্গে যেন সে মিশে গিয়েছে বহুদিন ধরে অসুখে ভুগে।

ওকে দেখে লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে তেলেগু ভাষায় বললে—দেশের লোককে দেখতে পাইনে। যখন হংকং হাসপাতালে ছিলাম, অনেক দেশের লোক দেখতাম সেখানে। বসো এখানে। আহা, ভারতের লোক তুমি ? মুসলমান ? তা কী ? এতদূর বিদেশে তুমি শুধু ভারতের লোক, যে দেশের মাটিতে আমার জন্ম, সেই একই দেশের মাটিতে তোমারও জন্ম। এখানে তুমি আমার ভাই।

ও রোগীর বিছানার পাশে বসল। সেই অপরিচিত মুমূর্ষু স্বদেশবাসীকে দেখে ওর মনে একটা গভীর অনুকম্পা ও মমতা জেগে উঠল—যেন সত্যিই কতকালের আপনার জন।

রোগী বললে—আমার নাম নটরাজন, ত্রিবেন্দ্রাম শহর থেকে এগারো মাইল দূরে কেটিউপ্পা বলে ছোট্ট একটি গ্রামে আমার বাড়ী। কোচিন থেকে যে স্টীমলঞ্চ ছাড়ে ত্রিবেন্দ্রাম যাবার জন্যে, সে স্টীমার আমার গ্রামের ঘাট ছুঁয়ে যায়। বেউয়া কাপ্পিয়াম্ নদীর ধারে, চারিধারে ঘন বন আর ছোট ছোট পাহাড়—কেটিউপ্পা গ্রাম তুমি দেখ নি, বুঝতে পারবে না সে কী চমৎকার জায়গা! আমি অনেক দেশ বেড়িয়েছি পৃথিবীর, ভবঘুরে হয়ে চিরদিন কাটিয়ে দিলাম জীবনটা—কিন্তু আমি তোমায় বলছি শোন, ভারতবর্ষের মধ্যে তো বটেই, এমন কি পৃথিবীর মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর একটি অদ্ভুত সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার দেশের বর্ণনা শোনাবার জন্যে আজ তোমায় আমি ডাকি নি। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, কাল যে সূর্য্যোদয় উঠবে আকাশে, তা আমি চোখে বোধ হয় দেখতে পাব না—তুমি আমার দেশবাসী ভাই, একটা উপকার করবে আমার?

—কি বলুন? আপনি আমার চাচার বয়সী, কী হুকুম করবেন বলুন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব।

রোগীর পাণ্ডুর মুখ অল্পক্ষণের জন্যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—নিবু-নিবু প্রদীপের শিখার মত। ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—কথা দিলে? কিন্তু ভীষণ লোভ দমন করতে হবে ভাই!

—আল্লার নামে বলছি, যা করতে বলবেন, তাই করব।

—আমার মাথার বালিশের তলায় একটা চামড়ার ব্যাগ আছে, সেটা বার করে নাও। আমার মৃত্যুর পরে ব্যাগটা আমার গ্রামে আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবে।

ও রোগীর মাথাটা সন্তর্পণে একধারে সরিয়ে আস্তে আস্তে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ বার করলে। ব্যাগের মধ্যে কতকগুলো কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হল না ওর।

বৃদ্ধ নটরাজন বললে—তোমার কাছে আমি কোন কথা লুকোব না। ব্যাগটার মধ্যে একখানা ম্যাপ আছে—জীবনে অনেক সাহসের কাজ করেছি, অনেক বনে জঙ্গলে ঘুরেছি—অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। এই ম্যাপখানা এবং ব্যাগের মধ্যে যা যা আছে—তা আমি সৎপথে থেকে হস্তগত করি নি। সংক্ষেপে কথাটা বলে নি, কারণ বেশি বলবার আমার সময় বা শক্তি নেই। আজ বিশ বাইশ বছর আগে এই ব্যাগ আমার হস্তগত হয়। যে ম্যাপখানা এই ব্যাগের মধ্যে আছে—তার সাহায্যে যে-কোন লোক দুনিয়ায় মহা ধনী লোক হয়ে যেতে পারে। সুলু সী'র একটা খাড়ির ধারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন আমলের এক নগরের ভগ্নস্তূপ আছে। সেই নগর প্রাচীন যুগের এক হিন্দু রাজ্যের রাজধানী ছিল। তার এক জায়গায় প্রচুর ধনরত্ন লুকোনো আছে। যার কাছ থেকে এ ম্যাপ আমি পাই, সে আমারই বন্ধু, দু-জনে মিলে সুলু সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করেছি দশ বছর ধরে। সে জাতিতে মালয়, ম্যাপ তার তৈরি—সে নিজে ওই শহরের সন্ধান খুঁজে বার করেছিল। সেখানে

নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, সামান্য কিছু পাথর ছাড়া সে বেশি কোন জিনিস আনতে পারে নি সেখান থেকে। তার নিজের লেখা জাহাজের লগ্‌বুকের (Log Book) কয়েকখানা পাতা আমি মালয় ভাষা থেকে নিজের সুবিধার জন্যে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিই সৌরাবায়াতে এক গরীব মালয় স্কুল মাস্টারকে ধরে। সেই অনুবাদের কাগজখানাও এই ব্যাগের মধ্যে আছে। তারপর ম্যাপখানা হস্তগত করে আমি নিজে অনেক খোঁজাখুঁজি করি—কিন্তু সুলু সমুদ্রেরও ওদিকে বহুশত বসতিহীন ও বসতিযুক্ত ছোট ও বড় দ্বীপ—তাদের প্রত্যেকটিতে ভীষণ জঙ্গল। ম্যাপও যা আছে, তা খুব নিখুঁত নয়—মোটের ওপর সে দ্বীপ আমি বার করতে পারিনি। দেশের গ্রামে আমার ছেলে আছে, তাকে নিয়ে গিয়ে ম্যাপটা আর ব্যাগ দিও। এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে—আমার বোম্বেটে বন্ধু সেই প্রাচীন শহরে একটা জিনিস পায়। জিনিসটা একটা সীলমোহর বলেই মনে হয়। একখানা গোটা পদ্মরাগ মণির ওপর সীলমোহরটা খোদাই করা। সেটাও এর মধ্যে আছে। সেই মোহরের ওপরে যে অদ্ভুত চিহ্নটি আঁকা আছে—আমার বিশ্বাস ছিল, সেটা একটা বড় হদিস ওই প্রাচীন নগরীর রত্ন-ভাণ্ডারের। তাই ওখানা আমি কবচের মত গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছি এতদিন। কিন্তু আজ বুঝেছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। উনিশ বছর আগে গ্রাম থেকে যখন চলে আসি, তখন আমার ছেলে ছিল দু-বছরের—আর আমার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিনি এই উনিশ বছরের মধ্যে। বেঁচে থাকলে আজ সে একুশ-বাইশ বছরের যুবক। তার হাতে এগুলো সব দিয়ে বলে দিও, বাপের ছেলে যদি হয়, সে যেন খুঁজে বার করে সেই নগরী, তার বাপ যা পারেনি। আর আমার কিছু বলবার নেই। ব্যাগটা নাও হাতে তুলে।

রোগী এই পর্য্যন্ত বলে ক্লান্তিতে চোখ বুজলো। চীনা আড্ডাধারীর ইঙ্গিতে ও রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুশীল বললে—তারপর ?

—বাবুজি, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, নটরাজন বাঁচল কি মারা গেল সেদিকে কোন খেয়াল করিনি। আমার মাথা তখন ঘুরছে। ব্যাগ খুলে দেখলাম কতকগুলো পুরোনো কাগজপত্র ও ম্যাপখানা ছাড়া আর কিছুই নেই। পদ্মরাগ মণিটা নেড়ে-চেড়ে দেখে কিছু বুঝলাম না—ওসব জিনিসের আমরা কী বুঝি বলুন! কিন্তু তখন আমার আর একটা বড় কথা মনে হয়েছে। নটরাজন যখন ওর গল্প করছিল, আমার মনে পড়ল সাত বছর আগের সেই ঘটনা। জাহাজে সেই কলেরা হওয়া, আমার জাহাজ থেকে পালানো এবং বন জঙ্গলের মধ্যে সেই বিষ্ণুমুনির দেশের মধ্যে গিয়ে পড়া, বুঝলেন না বাবুজি ?

—খুব বুঝেচি, বলে যাও।

—আমার মনে হল, আমি সেখানেই গিয়ে পডেছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। সে পুরোনো শহর আমি দেখেছি, নটরাজন যা বের করতে পারে নি। আমি সেখানে একটা গোটা দিন কাটিয়েচি। এই জায়গা সুলু সী-র ধারে, তাও আমি জানি। যদিও ঠিক বলতে পারব না হয়ত—কিন্তু দূর থেকে দেখলে বোধ হয় চিনব।

—ত্রিবাঙ্কুরের সেই গাঁয়ে গেলে না?

লোকটা বললে, প্রথমে ওর লোভ হয়েছিল খুব। পদ্মরাগ মণিটার দাম যাচাই করে দেখা গেল প্রায় দেড় হাজার টাকা দাম সেটার। তা ছাড়া আরও লোভ হল, নটরাজনের ছেলেকে ম্যাপ দেবার কী দরকার? এই ম্যাপের সাহায্যে সে-ই তো জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারে। বিশেষ করে একবার যখন সেখানে সে গিয়েছিল। কিন্তু তিন চার দিন ভাবার পরে ওর মনে হল মরবার আগে বিশ্বাস করে নটরাজন ওর হাতে জিনিসগুলো সঁপে দিয়েছে তার ছেলেকে দেবার জন্যে। এখন যদি না দেয়, তবে নটরাজনের ভূত ওর পেছনে লেগে থাকবে, হয়ত বা মেরেও ফেলতে পারে। অতএব খানিকটা ইচ্ছা এবং খানিকটা অনিচ্ছাতে সেখানে যেত সে বাধ্যই হল। বড় মজার ব্যাপার ঘটল কিন্তু সেখানে।

সুশীল বললে—কি রকম?

—বাবুজি, অনেক কষ্ট করে বেউয়া কাপ্পিয়াম্ নদীর ধারে সেই কেটিউপ্পা গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম নটরাজন মিথ্যে বলে নি, নদীটা একেবারে ওদের গ্রামের নিচে দিয়েই গিয়েছে বটে। নিজের পকেট থেকে যাওয়ার খরচ করলাম। গাঁয়ে গিয়ে যাকেই জিজ্ঞেস করি, কেউ নটরাজনের ছেলের খোঁজ দিতে পারে না। নটরাজনের কথাই অনেকের মনে নেই। দু-একজন বুড়ো লোক বললে, নটরাজনকে তারা চিনত বটে—তবে অনেকদিন আগে সে নিরুদ্দেশে হয়ে যায়, তার স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে তারা জানে না।

—তারপর?

—মানে খানিকটা আনন্দ যে না হল তা নয়! ছেলেকে যদি সন্ধান না করতে পারি তবে আমার দোষ কী! তবুও একে ওকে জিগ্যেস করি। শেষকালে গাঁয়ের কাছারিতে কি ভেবে গিয়ে খোঁজ করলাম। তারা শুনে বললে, অনেকদিন আগে নটরাজনের জায়গা-জমি নীলাম করতে হয়েছিল খাজনা না দেওয়ার জন্যে। নীলামের নোটিশ তারা পাঠিয়েছিল ত্রিবেন্দ্রাম শহরে।

—পেলে খুঁজে?

—ঠিকানা তো খুঁজে বার করলাম। ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ী, নারকেল গাছের বাগান সামনে। শহরের মধ্যে বাড়ীটা নয়, শহর থেকে মাইল খানেক দূরে। অনেক ডাকাডাকির পরে এক বুড়ি এসে দোর খুলে দিলে। মাথার চুল সব সাদা হয়েছে, অথচ মুখ দেখে খুব বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না। বললে—কাকে চাও? আমি বললাম—নটরাজনের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বুড়ী আমার মুখের দিকে আবাক হয়ে চেয়ে বললে—ও নাম কোথায় শুনলে? ও নাম তো কেউ জানে না! আমি তখন সব কথা বুড়ীকে বললাম। শুনে বুড়ী কেঁদে ফেললে। বললে—আমার ছেলেও আজ নিরুদ্দেশ, তার বাপের মত সেও বেরিয়েছে—আজ তিন বছর হয়ে গেল! কোন খবর পাই নি।

—তুমি কী করলে?

—এই কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হল, বাবুজি। আমি সেখানে বুড়ীর বাড়ী সাত

আটদিন রইলাম। তাকে মা বলে ডাকি। বুড়ীও আমায় বড় যত্ন করতে লাগল। বুড়ী বড় গরীব—ভাড়াটে ঘরে থাকে। তার ছেলে স্কুলে পড়ত। সে রাঁধুনিগিরি করে ছেলের পড়ার খরচ ও নিজেদের খরচ চালাতো। এখনও সে নারকেল তেলের গুদামের শেঠজীদের বাড়ী রাঁধে। কোনরকমে একটা পেট চলে যায়। বুড়ীকে পদ্মরাগ মণিটা আমি দেখাইনি—

—এত কষ্ট করে গিয়ে ওটার বেলা ফাঁকি দিলে?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল, পদ্মরাগ মণির গায়ে একটা আঁক-জোক আছে—যা হদিস দেবে হীরেজহরতের—ওই হল ওখানা না দেওয়ার গোড়ার কথা। ভাবলাম কী জানেন? ভাবলাম এই, নটরাজনের ছেলে না-পাত্তা—বুড়ীর কাজ নয় ম্যাপ দেখে সুলু সী যাওয়া আর সেই দ্বীপের মধ্যে লুকোনো শহর খুঁজে বার করা। যদি ওকে দিই ওগুলো, এখানে পড়ে নষ্ট হবে। তার চেয়ে যদি আমি নিই, হয়ত চেষ্টা করলে একদিন না একদিন আমি সেখানে গিয়ে পৌছুতেও পারি। যদি হীরে জহরত পাই, বুড়ীকে আমি ভালভাবে খোরপোশ দিয়ে রাখব। কিন্তু যদি পদ্মরাগ মণিখানা দিয়ে দিই—তবে হদিসটা হাতছাড়া হয়ে গেল। বুড়ী এখুনি অপরকে মণি বিক্রী করবে। যে কিনবে, সে মণির গায়ে আঁকা সীলমোহরের কোন মানেই বুঝবে না। লোহার সিন্দুকে আটকা থাকবে জিনিসটা। তাতে কারো কোনো উপকার নেই। কী বলেন আপনি?

—তোমার যুক্তি মন্দ না। যদিও আমার মনে হয় জিনিসটা দেওয়াই তোমার উচিত ছিল। যাদের জিনিস, তারা সেটা নিয়ে যা খুশি করুক না কেন। তোমার ওপর শুধু পৌঁছে দেওয়ার ভার। সেটা তুমি রাখলে নিজের কাছে?

—হাঁ বাবুজি। এই দেখুন আমার কাছেই আছে। আসুন ওই আলোর কাছে।

সুশীল আলোর নিচে গিয়ে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর প্রসারিত করতলের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল। মস্ত একখানা পাথর, একটু চেপ্টা গড়নের, উজ্জ্বল লাল রঙের—তার ওপর খোদাই-কাজ করা।

সুশীল ওর হাত থেকে সীলমোহরটা নিয়ে দেখলে উল্টেপাল্টে। খোদাই কাজ করা এত বড় পাথর সে কখনও দেখে নি। বড় সাইজের একটা কলার লেবেঞ্চুসের মত। সীলমোহরের মধ্যে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল—বড় একটা ওঁকারের 'ওঁ'র লেজ জড়িয়ে জড়িয়ে পাকিয়েছে একটা বটগাছ কিংবা অন্য কোন গাছকে। তারপর সে আরও ভাল করে চেয়ে দেখলে—আসলে ওটা ওঁকার নয়, যদিও সেইরকম দেখাচ্ছে বটে। কোন নাগ-দেবতার মূর্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। ত্রিভুজাকৃতি কি একটা আঁকা রয়েছে ছবির বাঁ-দিকে। কোন নাম বা সন-তারিখ নেই।

লোকটা বললে—কিছু বুঝলেন বাবু?

—নাঃ, তবে হিন্দুর সঙ্গে এ জিনিসের সম্পর্ক আছে বলে মনে হল। দেড় হাজার টাকার জিনিসটা তুমি যে বড় বিক্রি করে ফেল নি এতদিন?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল এই খোদাই-করা আঁকজোকের মধ্যে আসল মালের হদিস পাওয়া যাবে—সেই লোভেই একে হাতছাড়া করে ফেলি নি।

—নটরাজনের স্ত্রী কোথায়?

—তাকে কেটিউপ্পা গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। মাসে মাসে টাকা পাঠাই। শহরে খরচ বেশি, গাঁয়ে খরচ কম। ঘর ভাড়া লাগে না। সেই সেদিনও পাঁচ টাকা তাকে পাঠিয়েছি। এখন চাকরি নেই—নিজের পেটই চলে না।

—কাগজপত্র আর ম্যাপগুলো?

—ওই নটরাজনের স্ত্রী—তাকে আমি মা বলি—সেখানে তার কাছেই আছে। সঙ্গে নিয়ে বেড়াইনে, বড্ড দামী ও দরকারী জিনিস—আমার কাছে থাকলে হারিয়ে যেতে পারে। সে বুড়ি তার বেতের পেঁটরায় তুলে রেখে দিয়েছে, যখন দরকার হবে, নিয়ে আসব গিয়ে।

—এসব আজ কত বছরের কথা হল?

—বেশি দিনের নয়। আজ দু-বছর আগে আমি নটরাজনের গাঁয়ে গিয়ে বুড়ীর সঙ্গে প্রথম দেখা করি।

—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোন। এই মানিকখানা বিক্রী করে ফেলে টাকাটা নট-রাজনের স্ত্রীকে দাওগে। তার জীবনটা একটু ভালভাবে কাটবে। দেড় হাজার টাকা হাতে পেলে সে খুব খুশি হবে। তাদেরই জিনিস ধর্মত দেখতে গেলে, তোমার নিজের কাছে রখা মানে চুরি করা।

—কিন্তু বাবু, তাহলে হদিস চলে গেল যে।

—যাবে না। প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচে ওটা তুলে নিলেই চলে। ওই ছবিটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। মানিকখানা যার জিনিস, তাকে দাও ফিরিয়ে। তুমি যখন মা বলে ডাকো, তখন তার আশীর্ব্বাদ তোমার বড় দরকার। মানিকখানা যদি বুড়ী বিক্রি করে, যে কিনবে সে ওর খোদাই ছবির কোন মানে করতে পারবে না, তার কোন কাজেই লাগবে না।

—বেশ বাবুজি, আপনিই কাজটা করিয়ে দিন না!

—কাল এটা সঙ্গে করে নিয়ে আমার সঙ্গে এখানে দেখা কোরো। আমার একটা জানাশুনো লোক আছে সে এইসব কাজ করে—তাকে দিয়ে করিয়ে দেব।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সুশীল মাঠ থেকে ফিরতে ফিরতে কত কথাই ভাবলে। তার মাথার মধ্যে যেন কেমন করছে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মত অদ্ভুত! এমন-ভাবে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে একজন মুসলমান লস্করের সঙ্গে দেখা হবে—সে তাকে এমন একটি আজগুবি গল্প বলে যাবে—এ কথনো সে ভেবেছিল? গল্পটা আগাগোড়া গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেও পারত সে, যদি ওই চুনির সীলমোহরখানা সে না দেখত নিজের চোখে।

লোকটার গল্প যে সত্যি, তা ঐ পাথরখানা থেকে বোঝা যাচ্ছে। সন তারিখ ও জায়গা

মিলিয়ে এমনভাবে সে গল্প বলে গেল—যা অবিশ্বাস করা শক্ত। সুশীল ওকে শেষের দিকে যে প্রশ্নটা করেছিল, অর্থাৎ কতদিন আগে বুড়ীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেটা শুধু সময় সম্বন্ধে তাকে জেরা করা মাত্র।

সুশীল বাড়ী গিয়ে সনৎকে বললে—এই কলকাতা শহরেই অনেক মজা ঘটে যায় দেখছি।

সনৎ বললে—কী দাদা?

—সে একটা অদ্ভুত গল্প। যদি বলবার দরকার বুঝি তবে বলব—

পরদিন গড়ের মাঠে আবার সে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে রইল। একটু পরে জামাতুল্লা খালাসী এসে ওর পাশে নিঃশব্দে বসে পড়ল। বললে—আমার কথা ভাবলেন বাবুজী?

—চল আমার সঙ্গে। একটা ছাঁচ তোমাকে করিয়ে দিই। এনেছ ওটা?

—হাঁ বাবুজী। দেখুন, আমি ভিক্ষে করে খাচ্ছি আজ দু-মাস, তবুও এত বড় দামী পাথরটা বিক্রি করি নি শুধু বড় একটা লাভের আশায়। কিন্তু যত দিন যাচ্চে, তত আমার মনে হচ্চে নসিব আমার খারাপ, নইলে সেই জায়গায় গিয়েও তো কিছু করতে—

—জামাতুল্লা, তুমি লেখাপড়া-জানা লোক না হলেও খুব বুদ্ধি আছে। একা তুমি কিছু করতে পারবে না তা বেশ বোঝ। এ কাজে টাকা চাই, লোক চাই, জাহাজ চাই। অনেক টাকার খেলা সে সব। তোমার অত টাকা নেই। মিছে কেন নটরাজনের স্ত্রীর পাওনা জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করবে?

দু-একদিনের মধ্যে প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচটা হয়ে গেল। সুশীল প্রাচীন ধনী বংশের সন্তান, ওর যে ছাঁচ গড়িয়ে দিলে, সে ভাবলে ওদের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি এটা। ফেরত দেওয়ার সময় সে বললে—এটা আমার এক বন্ধুকে একবার দেখতে দেবে?

—কেন বল তো?

—আমার সে বন্ধু মিউজিয়মে কাজ করে। পণ্ডিত লোক। যদি গভর্মেণ্টের তরফ থেকে এটা কিনে নেওয়া হয় তাই বলছি।

—তাকে তোমার স্টুডিওতে কাল নিয়ে এসো।

পরদিন জামাতুল্লাকে নিয়ে সুশীল বন্ধুর স্টুডিওতে গিয়ে দেখলে একটি সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন।

বন্ধুটি বলে উঠল—এই যে এস সুশীল, ইনি এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন—আলাপ করিয়ে দিই—ডাঃ রজনীকান্ত বসু এম. এ. পি. এইচ. ডি.—মিউজিয়মে সম্প্রতি চাকুরিতে ঢুকেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ বসু পদ্মরাগের সীলমোহরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠে বললেন—এ জিনিসটা আপনি পেলেন কোথায়?

সুশীলের আর্টিস্ট বন্ধু বললে—ওটা ওদের বংশের জিনিস। ওরা পল্লীগ্রামের প্রাচীন ধনী বংশ।

ডাঃ বসু সন্দিগ্ধ মুখে বললেন—কিন্তু এ তো তা নয়! এ যে বহু পুরোনো জিনিস! এ আপনারা পেয়েছিলেন কোথায় তার ইতিহাস কিছু জানেন? যদি বলতে বাধা না থাকে—

সুশীল বললে—না ডাঃ বসু, আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। আপনি কী আন্দাজ করছেন?

ডাঃ বসু বললেন—দেখুন, সীলমোহরের ওপর এ চিহ্ন আমি নিজে কখনো দেখি নি—তবে এই ধরনের পাথরের ওপর সীলমোহর ওঁকারভাটে পাওয়া গিয়েছে। ফরাসী ইন্দোচীনের জঙ্গলের মধ্যে বহু পুরোনো নগরের ধ্বংসস্তূপে। এর সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েছে মোটামুটি খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। আমাদের মিউজিয়ামেও আছে—কাল যাবেন, দেখাবো। কিন্তু আপনার এটা আরো পুরোনো, আমি একে নির্ভয়ে নবম শতাব্দীতে ফেলে দিতে পারি—কিংবা তারও আগে।

সুশীল বললে—আপনার তাই মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। নইলে বলতাম না। আর সেইজন্যেই আপনাকে জিগ্যেস করছি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষে এটা পেলেন কি করে? এ হল সমুদ্রপারের জিনিস। বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে আমগাছের ছায়ায় শান্ত ও নিরীহ জিনিস নিয়ে কারবার—কিন্তু এ সীলমোহরের পেছনে রয়েছে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার দুর্দান্ত সাহস, দুর্জ্জয় বিক্রম, যুদ্ধ, রক্তপাত—ভারতবাসী যেদিন সমুদ্রের ওপারে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেই সব দিনের ইতিহাস এ সীলমোহরের সঙ্গে জড়ানো। তাই বলছি, এটা আপনারা পেলেন কী করে?

ওখান থেকে বার হয়ে আসবার সময়ে সুশীলের মনে টাকার স্বপ্ন ছিল না।

ছিল যে সুদূরের, দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্ন—জামাতুল্লা খালাসীর অত বড় পদ্মরাগ মণিখানার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না।

সে এমন এক দিনের স্বপ্ন—যা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে, তরুণদের প্রাণে নতুন আশা, উৎসাহ ও আনন্দের সংবাদ আনে বয়ে—

তবু তা সুশীলের মনে যে ছবি জাগালে তা আদৌ স্পষ্ট নয়—সবই আবছায়া, সবই ধোঁয়া-ধোঁয়া। সুশীল ইতিহাসের ছাত্র নয়। ডাঃ বসুর শেষ কথা-কটির সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক শক্তি মেশানো ছিল—তার চোখের সামনে প্রাচীন কালের সুদীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে তলোয়ার হাতে বর্ম্মে চর্ম্মে সুসজ্জিত বীরের দল সারি সারি চলেছে, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না—অজানা সমুদ্রপথে তাদের বিজয় অভিযান নব উপনিবেশের ইতিহাস সৃষ্টি করে ভাবীকালের অসহায় ও অকর্ম্মণ্য সন্তানদের শিরায় শিরায় নতুন রক্তের আলোড়ন এনে দেয়!

কোথায় সে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, পুরোনো জমিদার-ঘরের বিলাসপুষ্ট আয়েসী ছেলেটি সেজে—তাদেরই পূর্ব্বপুরুষ একদিন যে অসি হাতে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—তাদেরই স্বজাতি, স্বদেশবাসী—আর সে থাকবে দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে ; তেলে জলে, দাদখানি চালের ভাত আর মাছের ঝোলে, কোনরকমে পৈতৃক বাঙালী প্রাণটুকু বজায় রেখে চলবে টায় টায় !

চিরকাল হয়ত এমনি কেটে যাবে তার।

প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করে, পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টেনে আর পাল-পার্ব্বণে গ্রাম্য লোকজনের পাতে দই মোণ্ডা দিয়ে হাততালি অর্জ্জন করবার প্রাণপণ চেষ্টায় মশগুল হয়ে।

তার পর আছে মামলা মোকর্দ্দমার তদারক করতে কোর্টে ছুটোছুটি—ডিক্রি, নালিশ, কিস্তীবন্দী, সইমোহরের নকল, সমন জারি—উঃ! ভাবলে তার গা কেমন করে। প্রাচীন ধনী বংশের লাল খেরো-বাঁধানো রোকড় ও খতিয়ানের চাপে সে নিজের যৌবন ও জীবনকে একদম পিষে মেরে ফেলে শেষের দিকে যখন মহকুমার হাসপাতালে একটি মাত্র রোগী থাকবার স্থানের টাকা জেলাবোর্ডের হাতে দেবে স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি-রক্ষা কল্পে—তখন হয়ত সে পাবে রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর খেতাব।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, এই তো জীবনের পরম সার্থকতা সে পেয়ে গেছে।

না দেখবে দুনিয়া—না দেখবে জীবন, ঠুলিপরা বলদের মত ঘানিগাছের চারিধারে ঘুরেই জীবন কাটাবে।

রাত্রে সে সনৎকে ডেকে বললে সনৎ, তোর সাহস আছে ?

—কেন দাদা ?

—আমি যদি বিদেশে বেরুই, আমার সঙ্গে যাবি ?

—এখুনি—যদি নিয়ে যাও!

—অনেক দূর হলেও ?

—যেখানে বল।

—বাড়ীর জন্য মন কেমন করবে না ?

—আমি পুরুষ মানুষ না দাদা ? ও কথাই ওঠে না!

—আমি এমনি জিগ্যেস করছি—

পরদিন সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়ল পুরোনো দিনের বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। যে সব কথা সে জানত না, কোনদিন শোনে নি—ডাঃ বসুর কথায় তার ইচ্ছে গেল সেগুলো জানবার ও পড়বার।

বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনী, চম্পা রাজ্যের কথা—সুদূর সমুদ্রপারের ভারতীয় উপনিবেশ চম্পা। ভারতবাসী অসির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ দিয়ে যে দেশের মাটি-পাথরের গায়ে নাগ-রাজ বাসুকী, শিব-পার্ব্বতী ও বিষ্ণুমূর্ত্তি অমর করে রেখেছে।

জামাতুল্লা খালাসীকে সে একশোবার ধন্যবাদ জানালো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়তে পড়তে।

সে তো এক পাড়াগাঁয়ে অলস জীবন যাপন করছিল—

কোনদিন এসব কথা সে জানতেও পারত না—এত বড় ছবি তার মনে কোনদিন জাগতও না—যদি দৈবক্রমে জামাতুল্লা খালাসী সেদিন তার পাশে এসে বসে দেশলাই না চাইত।

তুচ্ছ এক পয়সার দেশলাই।

পড়ার টেবিলে বসে বসেই সুশীলের হাসি পেল কথাটা ভেবে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বার হয়েই জামাতুল্লা খালাসীর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মাঠের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে আছে। সুশীলকে দেখে সে বললে—আসুন বাবু, কাল রাতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে!—আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে—

সুশীল বাধা দিয়ে বললে—কী—কী?

জামাতুল্লা বললে—সে এক আজগুবি কাণ্ড বাবু—

—কী রকম ব্যাপার?

—আপনার সেই বন্ধুর বাড়ী থেকে পাথরখানা নিয়ে কাল ফিরছি বাবু, মেটেবুরুজের কাছে ছোটমোল্লাখালি বলে যে বস্তি—ওই বস্তির কাছে আমার এক দোস্ত থাকে। ভাবলাম, চা খেয়ে যাই। সেখানে একেবারে মানুষ নেই—ফাঁকা মাঠ, সিকিমাইল দূরে ছোটমোল্লা-খালি বস্তি। হঠাৎ বাবু আমার মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কে যেন আমার গলা দু হাত দিয়ে চেপে ধরে আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে—আমি তো চেঁচিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম—কিন্তু পড়ে গেলাম চিৎপাত হয়ে মাঠের মধ্যে- পেছনে সে সময় পায়ের শব্দ শুনলাম যেন—

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে—পাথরখানা আছে তো?

—শুনুন বাবু, তারপর। আমি এমন কাণ্ড কখনো দেখিনি। চিৎপাত হয়ে পড়ে আর জ্ঞান নেই। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমার চারিপাশে দু-তিন জন লোক দাঁড়িয়ে, তারা কেউ পানি এনে আমার চোখে মুখে দিচ্ছে, কেউ গামছা নেড়ে বাতাস করছে। আমার দোস্তর নাম বলতে তারা আমায় ছোটমোল্লাখালি নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে যখন আমার হুঁশ বেশ ভাল ফিরে এল, আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি পাথরখানা নেই।

—বল কী? নেই! গেল সেখানা!

—শুনুন বাবু আজগুবি কাণ্ড! পাথর নেই দেখে তো আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দোস্তর বাড়ী তো শোরগোর পড়ে গেল। কত লোক দেখতে এল—আমার দোস্ত কতবার মুখে চোখে পানি দিয়ে ডাক্তার ডেকে আমায় চাঙ্গা করলে। আমি সেই রাত্রেই বাড়ী চলে গেলাম—

—তারপর?

—বাবু আপনি বলুন একটা কথা। আমি কাল আপনার দোস্তর কাছে দেখাতে গিয়েছিলাম কী নিয়ে? যে ছাঁচ তৈরি হয়েছিল তাই নিয়ে—না আসল পাথরখানা নিয়ে? আপনার ওই যে দোস্ত খুব এলেমদার লোক, তার কাছে?

—ও, ডাঃ বসুর কাছে তুমি তো আসল পাথরখানা নিয়ে গেছলে।

—ছাঁচখানা নিয়ে যাই নি ঠিক তো? কিন্তু বাবু বাড়ী ফিরে দেখি আসল পাথরখানা পকেটে রয়েছে, ছাঁচখানা নেই।

সুশীল হো-হো করে হেসে বললে—এ কোন আজগুবি কাণ্ড হল না জামাতুল্লা। তুমি দু-খানাই নিয়ে গেছলে। যে তোমার গলা টিপেছিল সে ছাঁচখানাকে ভুল করে নিয়ে গেছে—আসলখানা তোমার পকেটেই রয়ে গিয়েছিল। কোন্ পকেটে কোন্‌টা রেখেছিলে মনে আছে?

—বাবু আমি ছাঁচটা নিয়েই যাই নি—

—আমি বলছি শোন। তুমি ভুলে দুটোই নিয়ে গেছলে। কিন্তু এ থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। কেউ আমাদের পাথরের খবর পেয়েছে—কলকাতা গুণ্ডা বদমাইশের জায়গা—আমরা ক-দিন ধরে এখানে পাথরের কথা বলেছি, তত সাবধান হইনি। এখানেও শুনতে পারে, সেদিন ডাঃ বসুর ওখানে দুটো আরদালি দাঁড়িয়ে ছিল—আমার সন্দেহ হয় তাদের মধ্যে কেউ শুনতে পারে। যাক্, ভালই হয়েছে যে আসলখানা চুরি যায় নি! আজ তোমার সঙ্গে নেই তো সেখানা?

—না বাবু। আমি কি আর তেমনি উজবুক?

—লোক লেগেছে আমাদের পেছনে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।

জামাতুল্লা হেসে বললে—বাবু, লোক লেগে আমায় হঠাৎ কিছু করতে পারবে না। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি—কত বদমাইশ লোকের সঙ্গে কতবার কারবার করেছি। এই হাত-দুটো যে দেখছেন—এ দুটো ঠিক থাকলে এর সামনে কেউ এগুতে পারবে না জানবেন খোদার দোওয়ায়।

সুশীল একবার চারদিকে চেয়ে দেখলে—কোনদিকে কোন লোক নেই। সঙ্গীকে চুপি-চুপি বললে—এসব কথা এখন নয়। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

—কোথায় বাবুজি?

—আমার বাসায়। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে সব কথা হবে এখন।

জামাতুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সুশীল তাদের বাসায় এল। আসার পথে কোন কিছু অঘটন ঘটে নি দেখে সুশীলের মন থেকে ভয় ও বিপদাশঙ্কা অনেকখানিই চলে গেল। জামাতুল্লাকে কিছু খেতে দিয়ে ও তার জন্যে বাইরের ঘরের কোণে বিছানা করে দিলে।

জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, বিছানা কেন?

—রাত্রে এখানে তোমায় রাখব। যেতে দেব না মেটেবুরুজে। সাবধানের মার নেই। খিদিরপুরের মাঠ থেকে মেটেবুরুজ পর্য্যন্ত জায়গা বড্ড নির্জ্জন—গুণ্ডা বদমাইশের

আড্ডা। রাত্রে সে পথে গেলে বিপদ আছে। তোমার যত সাহসই থাকুক—রাত্রে যাওয়া হবে না।

সুশীলের এ সতর্কতার জন্যে জামাতুল্লাকে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকতে হয়েছিল।

রাত্রে আহারাদির পরে সুশীল জামাতুল্লাকে বললে—আমার মতলব তোমাকে বলব বলেই তোমায় ডেকেছি। আমার মনে হয়েছে আমরা—যে করেই হোক—চল সেই বনের মধ্যে প্রাচীন নগরের সন্ধানে বেরুই। টাকাকড়ির সন্ধান আমি করছি নে—পাই ভালো, তা আমি একা নেব না—নটরাজনের স্ত্রীর শেষ দিনগুলো যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটে তার ব্যবস্থা করব তা দিয়ে। তারপরে তুমি আছ, আমি আছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার ঘরে খাবার ভাবনা নেই।

জামাতুল্লা খালাসী ঘাড় নেড়ে বললে—সে আমি আগেই জানি বাবু—আপনি রইস্ আদমি—মানুষ দেখেই চিনতে পারি। নইলে আপনাকে এত বিশ্বাস করতাম না। বড় ঘরানা আপনারা, আপনাদের নজর হবে বড়।

—তা ছাড়া কী জানো জামাতুল্লা? এই বয়স হচ্ছে বিদেশ বেড়ানোর সময়। চিরকাল বাড়ী বসে থাকব যদি, তবে দুনিয়া দেখব কবে?…তোমার সাহস আছে আমায় সেখানে নিয়ে যাবার তো?

—এ বাবুজি সাহসের কথা নয়। জাহাজ চালানো বিদ্যের কথা—কৌশলের কথা। সিঙ্গাপুরে আমার এক দোস্ত আছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সে স্লুলু সীতে জাহাজ চালিয়েছে অনেক দিন—আপনার কাছে ছিপাবো না, বোম্বেটের কাজ করত সে। এখন বড্ড কড়া শাসন, ওলন্দাজ সরকার আর আমাদের ইংরেজ সরকারের। মানোয়ারী জাহাজ সর্ব্বদা ঘুরছে। বোম্বেটে জাহাজ ধরতে পারলেই ধরে নিয়ে আসবে—আর গুলি করবে। সেজন্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকান করে বসে আছে সিঙ্গাপুরে। তাকে সঙ্গে নিতে হবে।

—তাহলে কী রকম ব্যবস্থা করবে যাবার?

—আপনি টাকা কত নিতে পারবেন বলুন।

—শ-পাঁচেক। তার বেশি এক পয়সা নয়।

—তাও নেবেন না। আপনি আমার দোস্ত—দুশো নিয়ে চলুন। আমি পাথর বিক্রি করে ফেলি—সেই টাকায় চালাবো।

—সে টাকা তোমায় আমি নিতে দেব না জামাতুল্লা। নটরাজনের স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সে পাথর নিয়ে আমাদের ফল ভাল হবে না। নটরাজন স্বর্গ থেকে দেখবে আর অভিশাপ দেবে।

—এইজন্যেই তো বলি, রইস্ আদমির বুদ্ধি আর আমাদের বুদ্ধি! আপনি যা বলবেন বাবুজি।

অনেক রাত হয়েছিল। জামাতুল্লার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিয়ে সুশীল নিজে শোবার

জন্যে চলে গেল বটে—কিন্তু তার সারা রাত ঘুম এল না চোখে। এবার কী ক্ষণে সে বাড়ী থেকে বার হয়েছিল! সাগর-পারের যাত্রী হয়ে যদি সেই অজানা দ্বীপে অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন যুগের হিন্দু-কীর্ত্তি শুধু চোখের দেখা দেখে আসতে পারে—তবেই সে জীবন সার্থক বিবেচনা করবে। চম্পারাজ্যের মত সেখানেও আর এক হিন্দু উপনিবেশ ছিল নিশ্চয়ই—মহাকালের চক্রনেমির আবর্ত্তনে অরণ্য গ্রাস করেছে সে নগরী—তবুও ভারতের সন্তান সে, প্রাচীন যুগের সেই পুণ্যভূমির পবিত্র ধূলি স্পর্শ করে সে ধন্য হতে চায়।

অর্থের জন্যে সে যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে উঠে সুশীল জামাতুল্লাকে চা ও খাবার খেতে দিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে বসেছে—এমন সময় কাগজওয়ালা খবরের কাগজ দিয়ে গেল; সুশীল কাগজ খুলে সংবাদ-গুলোর ওপর সাধারণভাবে চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত সুরে বলে উঠল—জামাতুল্লা, আরে, তোমাদের মেটেবুরুজে খুন!…

জামাতুল্লা চা খেতে খেতে চমকে উঠে বললে—কোথায় বাবু, কোথায়?

—দু নম্বর মফিজুল সর্দ্দারের লেন, একটা কুঠুরিতে নূর মহম্মদ নামে একটা লোককে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—

সুশীল কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলে জামাতুল্লা তালপাতার মত কাঁপছে—অতি কষ্টে সে সুশীলকে জিজ্ঞেস করলে—কী নাম লোকটির বাবুজি?

—নূর মহম্মদ—

জামাতুল্লা চা ফেলে উঠে এসে সুশীলের হাত ধরে বললে—আপনি আমার সবচেয়ে বড় দোস্ত—কাল এখানে রেখে আপনি আমার জান বাঁচিয়েছেন! নূর মহম্মদ আমার ঘরেই থাকে। এক বিছানাতে দুজনে শুই—কাল আমি থাকলে আমাকেই মারত, আমি ভেবে ভুল করে ও বেচারিকে খুন করে গিয়েছে—

সুশীল বলে—তুমি এখুনি বাড়ী যাও—সেই জিনিসটা—

—না বাবু, সে আমি অন্য জায়গায় রেখেছি—সেখান থেকে কেউ সেটা বের করতে পারবে না।

সুশীল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—তবুও একবার যাও—

—সেটা নিয়ে বাবুজি আপনাদের বাড়ীতে রেখে দিন আপনি—মেহেরবানি করে যদি রেখে দেন!

—নিশ্চয়ই রাখব। তুমি একা যেও না—চল আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আমার ভাই সনৎকে সঙ্গে নেব।

পাথরখানা এনেই সুশীল কয়েকদিনের মধ্যে তার আর-একখানা ছাঁচ করিয়ে নিয়ে সেখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এল। ওসব জিনিস সঙ্গে রাখলেই যত গোলমাল।

কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখবার কয়েকদিন পরেও ঘটে গেল এক বিপদ।

সুশীল তখন হাজার দুই টাকার ব্যবস্থা একরকম করে ফেলেছে। তার কাকাই টাকাটা

তাকে দেবেন—তবে সে বলেছে ব্যবসার জন্যেই ওটা দরকার—বিদেশে যাওয়ার কথা শুনলে কেউ উৎসাহ দিত না। ওর সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যেতে রাজী, সনৎ একথা জানিয়েছে।

সুশীল বৌবাজার দিয়ে গিয়ে জামাতুল্লাকে ট্রামে দিয়ে এল। ট্রাম পরবর্ত্তী থামবার জায়গায় যাবার পূর্ব্বেই ট্রামে এক শোরগোল উঠল।

জামাতুল্লা ট্রামের বেঞ্চিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের একজন লোক নেমে গেল—নেমে যাবার সময় একবার যেন তার হাতখানা জামাতুল্লার পিঠের দিকে ঠেকাল—অন্তত জামাতুল্লার তাই মনে হল। পরক্ষণেই জামাতুল্লা রক্তাক্ত দেহে চিৎপাত ট্রামের মেঝেতে।

লোকজন হৈ-হৈ—পুলিস! পুলিস! সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে নামিয়ে ফেললে।

শেষে দেখা গেল ওর বিশেষ কিছু লাগে নি এবারও। একখানা ধারালো ছুরি দিয়ে বোধহয় আততায়ী কোমরের থলে কাটতে চেষ্টা করেছিল। ছুরিখানা দৈবাৎ তলপেটের পাশের দিকে লেগে খানিকটা অগভীর রেখা সৃষ্টি করে লম্বালম্বিভাবে কেটে গিয়েছে।

এই ঘটনার ঠিক সাতদিন পরে সুশীল, সনৎ ও জামাতুল্লা তিনজনে একখানা রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়ে বসল—আপাতত সিঙ্গাপুর এবং সেখান থেকে ব্যাটেভিয়া যাবে এই হল উদ্দেশ্য ওদের।

মাস দুই পরের কথা। সকালবেলা।

সুশীল সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একটি ছোট শিখ হোটেলের একটা ঘরে বসে সনৎকে বলছিল—আমরা এখানে এসে ভাল করলাম কি মন্দ করলাম এখনও বুঝি নি সনৎ। জামাতুল্লার বোম্বেটে বন্ধু তো দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোক—ও হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। ওকে কি খুব বিশ্বাস করা উচিত হল?

—বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী দাদা? ও ছাড়া সুলু সমুদ্রে জাহাজ চালাবে কে? তবে আমার মনে হয় যখন আমাদের কাছে এমন কোন মূল্যবান জিনিস নেই—তখন সে অনর্থক মানুষ খুনের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে যাবে কেন?

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা তার বোম্বেটে বন্ধু মিঃ ইয়ার হোসেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ইয়ার হোসেন ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটা চুল-ছাঁটা দোকান করে ভাড়াটে চীনে নাপিত দিয়ে চুল ছাঁটায়—রোজগার মন্দ হয় না। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়স হবে, রোগা চেহারা—চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভালমানুষ ও নিরীহ ধরনের বলে মনে হয়—পরনে সাহেবী পোশাক। লোকটা ভারতীয় নয়, মালয়ও নয়—কোন্ দেশের লোক তা কখনো বলে নি। তবে তার কথাবার্ত্তা থেকে মনে হয় ভারতের ওপর টানটা তার বেশি। কথাবার্ত্তা বলে ইংরাজিতে, নয়ত মালয় ভাষায়। তার ভাঙা ইংরেজি জামাতুল্লা বেশ বোঝে।

এ ধরনের লোকের সঙ্গে কখনো সুশীল বা সনৎএর পরিচয় ঘটে নি ইতিপূর্ব্বে। বাইরে মোটামুটি ভদ্রলোক, এমন কি বেশ নিরীহ প্রকৃতির প্রৌঢ় ভদ্রলোক—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইয়ার হোসেন দুর্দ্দান্ত দস্যু। মুহূর্ত্তের মনোমালিন্যের ফলে যারা বন্ধুর বুকে অতর্কিতে তীক্ষ্ণধার কিরীচ বসিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না—এ সেই জাতীয় লোক।

ইয়ার হোসেন ঘরে ঢুকে বললে—বসে আছেন? আমায় আর দুশো টাকা দিতে হবে—দরকার রয়েছে।

সুশীল জামাতুল্লার মুখের দিকে চাইলে অতি অল্পক্ষণের জন্যে। জামাতুল্লা চোখের ইঙ্গিতে তাকে বলে দিলে ইয়ার হোসেনকে যেন সে প্রত্যাখ্যান না করে।

—কত টাকা বললেন মিঃ হোসেন?

—দুশো কি আড়াইশো—

—বেশ, নেবেন। সেদিন নিয়েছেন একশো—

ইয়ার হোসেন যেন খানিকটা উদ্ধত স্বরে বললে—নিয়েছি তো কী হবে? তোড়জোড় করতেই সব টাকা যাচ্ছে—

—জাহাজের কী হল? চার্টার করবেন?

—জাহাজ চার্টার করবার টাকা কোথায়? কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা বলি। আপনারা সে বিন্ধমুনির দেশে যেতে চাইছেন কেন? টাকা-কড়ি হীরে-জহরত সেখানে সত্যি আছে?

—কী করে বলি সাহেব! তবে, তোমার কাছে লুকুব না। খুব বড় রত্নভাণ্ডার সেখানে লুকোনো আছে এই আমাদের বিশ্বাস। ওই মণির ওপর আঁকজোক আছে—ওটাই তার হদিস—অন্তত নটরাজন তাই বলেছিল।

—আমি চেষ্টা করে দেখব—কিন্তু আমার ভাগ ঠিক তিন ভাগের এক ভাগ চাই। ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেই বিপদ ঘটবে। এই হাতে অনেক মানুষ খুন করেছি, সে কথা কে না জানে? মানুষ মারা যা, আমার কাছে পাখি মারাও তা।

সুশীলের গা যেন শিউরে উঠল। কাজের খাতিরে এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আজ তাকে মিশতে হচ্ছে—ভাগ্য কী জানি কোন্ পথ তাকে নির্দ্দেশ করছে! মুখে বললে—না সাহেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—ফাঁকে তুমি পড়বে না।

ইয়ার হোসেন বললে—একটা গল্প বলি শোন তবে। একবার আমার জাহাজে ছ-সাতজন মাল্লা মদ খেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। তাদের দলে একজন সর্দ্দার ছিল, সে এসে আমায় জানালে, এই-এই শর্ত্তে আমি রাজী না হলে তারা আমার হাত পা বাঁধবে—মেরে ফেলতেও পারে। আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়ে শর্ত্তে সই করে দিলাম। তারপর ইঞ্জিন রুমের বড় কর্ম্মচারীকে ডেকে বললাম—জাহাজে কয়লা দিয়েই স্টীম বন্ধ করে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখবে।

ইঞ্জিনিয়ার বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কেন কাপ্তেন সাহেব—এ তো বড় বিপজ্জনক ব্যাপার—সেই ভীষণ উত্তাপে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখব?

সে বেচারি আমার মতলব কিছু বুঝলে না। আমি সেই বিদ্রোহী সর্দ্দারকে আর তার চারজন অনুচরকে বললাম ফার্নেসে কয়লা দিতে। এদিকে ইঞ্জিন-রুমে টেলিগ্রাফে ইঞ্জিনিয়ারকে পুরোদমে স্টীম দিতে বলেই ওরা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে পুলি ঘুরিয়ে জাহাজ প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি কোণ করে স্টারবোর্ডের দিকে কাত করে ফেললাম। টাল সামলাতে না পেরে ওরা হঠাৎ গিয়ে পড়ল খোলা ফার্নেসের মুখে। লোক ঠিক করা ছিল, তক্ষুণি তারা ওদের ফার্নেসের আগুনে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে ফার্নেসের দরজা ঘটাং করে বন্ধ করে দিলে।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে বললে—তারপর ?

—তার পর ? তারপর দু-দিন পরে কতকগুলো আধপোড়া হাড় পোড়া কয়লার ছাইয়ের সঙ্গে ফার্নেস-সাফ-করা কুলি সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। . মিউটিনির শেষ হয়ে গেল।

—কেউ টের পেলে না ?

—সবগুলো বদমাইশ যখন ও পথে গেল—তখন বাকিগুলো আপনা-আপনিই চুপ করে গেল। ভালমানুষির দিন চলে গিয়েছে জানবেন। নিষ্ঠুর হতে হবে, নির্ম্মম হতে হবে—তবে মানুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

সুশীল বুঝল না এমন নিরীহ ভাল মানুষটির আড়ালে কী করে এমন দৃঢ় ও নির্ম্মম চরিত্র লুকোনো থাকতে পারে।

—আর একটা কথা—অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে আপনাদের ?

—কিছু না, একটি করে অটোম্যাটিক আছে দু-জনের—তার কার্টিজ নেই।

—রাইফেল নেই ?

—ভারত থেকে রাইফেল কেনা ? মিঃ হোসেন, এবার আপনি হাসালেন।

ইয়ার হোসেন দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা বড় রিভলভার নিয়ে এসে সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—পছন্দ হয় ?

—ওঃ, এ তো চমৎকার জিনিস।

—এই কিনব তিনটি তিনজনের, আর একটা পুরোনো মেশিনগান—

—মেশিনগান কী হবে !

—অনেক দরকার আছে।

সুশীল ও সনৎ দু-জনেই দেখলে সে অনেক রকম জানে শোনে। জাহাজ চালানোর যন্ত্রাদি কিনবার সময়—তার যে কিছু কিছু বিজ্ঞানের জ্ঞানও আছে—এ পরিচয়ও পাওয়া গেল। চাল-চলনে, ধরন-ধারণে—সে সর্ব্বদাই মনে করিয়ে দেয় যে সে সাধারণ নয়।

সুশীল জামাতুল্লাকে বললে—তুমি বলেছিলে দুশো টাকা হলেই হবে—তো এখন দেখছি পাঁচশো টাকাই মিঃ হোসেন নিয়ে নিলে নানা ছুতো করে ; হাতে কিন্তু এক পয়সাও রইল না—

—কোন ভয় নেই বাবুজি, আমি যখন আছি। ও তেমন লোক নয়।

—লোক নয় কী রকম? ভয়ানক লোক, আমরা বুঝেছি। ও দরকার মনে করলে তোমার মত পুরোনো বন্ধুর গলা কাটতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

—বাবুজি দেখছি ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

—তা একটু পেতে হয়েছে। টাকাটা ও মেরে দেবে না তো? তুমি হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে ওর পেছনে।

—বাবুজি আমি হাজার পেছনে থেকেও কিছু করতে পারব না—ও যদি ইচ্ছে করে তবে সিঙ্গাপুর থেকে আজই পালিয়ে যেতে পারে—কেউ পাত্তাই পাবে না। ইয়ার হোসেন ছাঁচটার কথা জিগ্যেস করছিল—

—তুমি কী বললে?

—বললাম, বাবুর কাছে আছে।

—মতলব কী?

—না বাবু খারাপ কিছু নয়—ও একবার দেখতে চায়।

—ওঃ, ভাগ্যিস আসল পদ্মরাগখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়! নইলে, সেই পাথর নিয়ে কলকাতাতেই খুন হয়ে গেল মেটেবুরুজে, এখানে আনলে সে পাথর আমরা হাতে রাখতে পারতাম না!

জামাতুল্লা গলার স্বর নিচু করে বললে—বাবুজি, এখানেও লোক পেছন নিয়েছে।

সুশীল ও সনৎ একযোগে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কী রকম!

—এখন বলব না, আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন। সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে দিন দুপুরে মানুষের বুকে ছুরি বসায়—পরে শুনবেন।

সিঙ্গাপুরে যেদিকে বড় ডক তৈরি হয়েছে, ওর কাছে অনেক দূর পর্য্যন্ত সামরিক ঘাঁটি। সাধারণ লোককে সে সব রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। জামাতুল্লাকে পথ-প্রদর্শকরূপে নিয়ে দু'জনে সেই দিকে বেড়াতে বেরুল। সমুদ্রের নীল দিগন্ত-প্রসারী রূপ এখান থেকে যেমন দেখায়, এমন আর কোথাও থেকে নয়। দুপুরের কাছাকাছি সময়টা প্রখর রৌদ্র-কিরণে সমুদ্র-জল ইস্পাতের ছুরির মত ঝক্‌ঝক্ করছে। দু-খানা মানোয়ারী জাহাজ বন্দর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

একজন চীনেম্যান এসে ওদের পিজিন ইংলিশে বললে—টী, স্যর, টী?

—নো টী।

—নো টী স্যর? মাই হাউস হিয়ার স্যর, ভেরি গুড হোম-মেড টী স্যর!

সনৎ বললে—চল দাদা, চল জামাতুল্লা, একটু চা খেয়ে আসি।

সবাই মিলে রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা চীনা বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে একটা অ্যাসবেস্টস-এর ঢেউ-খেলানো পাত দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট বাড়ীতে এল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাঁশের টেবিল পাতা আছে বারান্দায়। তিনজনে সেখানে বসে দূরে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছে—এমন সময় চীনেম্যানটি চা নিয়ে এল। ওরা চা খাচ্ছে, সে লোকটা আবার কিছু কেক নিয়ে এসে ওদের

সামনে রাখলে। ওদের বললে—তোমরা কোথায় যাবে?

সুশীল বললে—বেড়াতে এসেছি।

—কোথা থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—ভেরি গুড। চমৎকার জায়গা সিঙ্গাপুর।—এখান থেকে আর কোথাও যাবে নাকি?

—না, আর কোথাও যাব না।

—ভাল কিউরিও কিনবে?

—কী জিনিস?

—এস না ঘরের মধ্যে।

—ওরা তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বুদ্ধের মূর্তি, মালা, ড্রাগনের মূর্তি, পোর্সিলেনের পেটমোটা চীনে ম্যাণ্ডারিনের মূর্তি—ইত্যাদি সাধারণ শৌখিন জিনিস আলমারিতে সাজানো—ওরা হাতে করে দেখছে, এমন সময় সনৎ একটা জিনিস হাতে নিয়ে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল:

—দাদা ভ্যাখো!

সুশীল ও জামাতুল্লা দু-জনেই চেয়ে দেখলে, একখানা জেড্ পাথরে তৈরি ছুরির গায়ে কি আঁক-জোঁক কাটা। ভাল করে দু-জনেই দেখলে অবিকল সেই আঁক-জোঁক, নটরাজনের পদ্মরাগ মণির গায়ে যে আঁক-জোঁক ছিল।

ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল।

সুশীল বললে—এ ছুরিখানার দাম কত?

—দু ডলার, মিস্টার।

—এ ছুরি তুমি কোথায় পেলে?

—দেখি ছুরিখানা? ও, এ আমি একজন মালয়ের কাছে কিনেছিলাম।

—এখানেই?

—হ্যাঁ, একজন মাল্লা ছিল সে।

—কোথা থেকে সে ছুরিখানা পেয়েছিল তা কিছু বলে নি?

—না মিস্টার। তবে ছুরিখানা সে ভয়ে পড়ে বিক্রী করে। সে বলেছিল দু-তুবার সে প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে যায়, এ ছুরিখানার জন্যে। তার পেছনে লোক লেগেছিল। লুকিয়ে আমার কাছে বিক্রী করে। কেউ জানে না যে এখানা আমার কাছে আছে।

—আমরা এখানা নেব।

—ওখানা বিক্রী হবে না।

—আমরা তিন ডলার দেব।

—নিয়ে বিপদে পড়বে তোমরা। ও নিও না।

—তোমার দোকানের জিনিস বিক্রী করতে আপত্তি কী?

—আমি আমার খরিদ্দারকে বিপদে ফেলতে চাইনে। শোন মিস্টার, আমি জানি ও ছুরি তুমি কেন নিতে চাইছ। ওই আঁক-জোঁকগুলোর জন্মে—ঠিক কি না? প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে অনেকে জানে ওই আঁকগুলো কোথাকার এক গুপ্ত নগর আর তার ধনভাণ্ডারের হদিস। সকলে জানে না বটে, তবে পুরোনো লোক কেউ কেউ জানে। অনেক পুরোনো জেড্ পাথরের আংটিতে ওই আঁক-জোঁক আমি দেখেছি। ও নিয়ে একটা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়ের বাইরে আর কারো কাছে এই আঁক-জোঁকওয়ালা আংটি কি ছুরি কি কিরীচ দেখলে তারা তার পেছনে লেগে গুপ্তহত্যা পর্য্যন্ত করে ফেলে—তবে তাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে, জিনিসটাকে হস্তগত করা।

—কেন?

—পাছে অন্য কেউ ওই আঁক-জোকের হদিস পেয়ে সেই প্রাচীন নগর আর তার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার আবিষ্কার করে ফেলে। ওরা নিজেরা যখন বের করতে পারলে না—তখন আর কাউকে ওরা খোঁজ করতেও দেবে না। ও চিহ্নের জিনিস কাছে রাখা মানে প্রাণ হাতে করে বেড়ানো। কিন্তু আমার মনে হয় কী জান, মিস্টার? ওরকম নগর কোথাও নেই। ও একটা মিথ্যা প্রবাদের মত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেউ দেখেছে এ পর্য্যন্ত বলতে পার? কেউ বলতে পারে সে দেখেছে? কেউ সন্ধান দিতে পারে? ও একটা ভুয়ো গল্প।

চা খেয়ে বাইরে এসে তিনজনে সমুদ্রের দিকে চলল।

চীনেম্যানটি পিছন থেকে ডেকে বললে—ওদিকে যেও না মিস্টার, সামরিক সীমানা—যাওয়া নিষেধ। সমুদ্রের ধারে এদিকে বসবার জায়গা নেই।

একটু নির্জ্জন স্থানে গিয়ে সুশীল বলাল—জামাতুল্লা, শুনলে সব কথা? এখনো কি তোমার মনে হয় সে নগর আছে কোথাও? আমরা আলেয়ার পেছনে ছুটছি নে? নটরাজনের গল্প ভুয়ো নয়?

জামাতুল্লা বললে—তবে পদ্মরাগ মণি এল কোথা থেকে?

—আমি তোমায় বলছি নটরাজনের কাহিনী আগাগোড়া বানানো গল্প। পদ্মরাগ মণি-খানা সে কোনপ্রকার অসৎ উপায়ে হস্তগত করে—যার উপরে প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী ঐ চিহ্নটি আঁকা ছিল। এ ছাড়া ওর কোন মানে নেই।

জামাতুল্লার মুখচোখের ভাব হঠাৎ যেন বদলে গেল—কত বৎসর পূর্ব্বের এক স্বপ্নভরা দিন, এক আতঙ্কভরা কৃষ্ণা-রজনীর স্মৃতি তার মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে। সে বললে—কিন্তু বাবুজি, নটরাজন হয়ত দেখেনি, আমি তা দেখেছি। ভীষণ বনের মধ্যে অন্ধকার রাত কাটিয়েছি। আমি কারো কথা শুনিনে।

—খুব সাবধান জামাতুল্লা, আমাদের প্রাণের দাম এক কানা-কড়িও না—যদি একথা কোন রকমে প্রকাশ হয় যে আমরা ওই আঁক-জোঁক-পড়া পাথরের ছাঁচে যার নিশানা সেই নগর খুঁজতে বেরিয়েছি।

—ঠিক বাবুজি। সে কথা আমারও মনে হয়েছে। এই সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে পথে-পথে রাত্রের অন্ধকারে খুন হয়। ভারি সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। ইয়ার হোসেনকে সাবধান করে দিতে হবে। মুশ্‌কিল হয়েছে লোকটা মাতাল, মদ খেয়ে কোন কথা প্রকাশ করে না ফেলে। চল, যাওয়া যাক্।

তিনজনে সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বাসার দিকে রওনা হল।

পরদিন ইয়ার হোসেন এসে ওদের বাসায় খুব সকালেই উপস্থিত হল। সনৎ তখন উঠেছিল। চায়ের জন্যে স্টোভ ধরিয়েছে—ইয়ার হোসেনকে দেখে বললে—আসুন মিঃ হোসেন, ঠিক সময়েই এসেছেন—চা তৈরি।

ইয়ার হোসেন রুক্ষ প্রকৃতির লোক। বলে উঠল—চা খাবার জন্যে ঠিক আসি নি। আরো দুশো টাকা চাই।

হঠাৎ সনৎএর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আরও দুশো! তাহলে তো আমাদের হাতে রইল না কিছু!

—তা আমি কী জানি? এ কাজে এসেছেন যখন তখন পয়সার জন্যে হঠলে চলবে না। নয়তো বলুন ছেড়ে দিই।

—না না, দাঁড়ান। আমি দাদা ও জামাতুল্লাকে ডাকি।

সুশীল শুনে বললে—তাই তো, ব্যাপার কী? চল, দেখি ব্যাপার কী।

ইয়ার হোসেন বাইরে বসে আছে। সুশীল গিয়ে বললে—গুড মর্নিং মিঃ হোসেন। কী মনে করে এত সকালে?

—সব ঠিক। আজ রাত্রে রওনা হতে হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে বলে উঠল—কী রকম?

ইয়ার হোসেন গম্ভীর মুখে বললে—সব ঠিক। তার আগে সেই ছাঁচখানা একবার দেখি—এখুনি। আর দুশো টাকা—এখুনি।

সুশীলের ইঙ্গিতে সনৎ বাক্স খুলে প্যারিস-প্লাস্টারের ছাঁচ ওর হাতে দিলে। ইয়ার হোসেন ছাঁচখানা উল্টে-পাল্টে দেখে শুনে বললে—নাও। এ-সব বুজরুকি—অন্য কিছুই না। কিছুই হবে না হয়ত।—টাকা?

সুশীল বললে—টাকা রয়েছে জামাতুল্লার কাছে। সে আসুক।

—কোথায় সে?

—তা তো জানিনে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছে।

—আচ্ছা, আমি বসি।

—এখন কী ঠিক করলেন বলুন মিঃ হোসেন।

—এখান থেকে ডাচ্ স্টীমার 'বেন্দা' ছাড়ছে আজ রাত দশটায়। আমাদের নামতে হবে সাঙ্গাপান বন্দরে—সুলু সমুদ্রের ধারে। সাঙ্গাপান মশলার বড় আড়ত—সেখান থেকে চীনে জাঙ্ক্ ভাড়া করে যাব।

—এসব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ডাচ্ স্টীমারে উঠতে দেবে ? মেশিন গান কিনেছেন নাকি ?

—সব ঠিক আছে। আপনি শুধু দেখুন ইয়ার হোসেন কী করতে পারে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। জামাতুল্লা আর ফেরে না। সুশীল ও সনৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কাল বিকেলের সেই চীনাম্যানের কথা বার বার মনে পড়ছিল ওদের। কথাটা ইয়ার হোসেনকে বলা ঠিক হবে না হয়ত—ভেবেই ওরা বললে না। কিন্তু জামাতুল্লা সব জেনে-শুনে একা বেরুল কোথায় ?

বেলা প্রায় দশটা। এমন সময় জামাতুল্লা ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে হাজির হল। ওর মুখের চেহারা দেখে তিনজনেই একসঙ্গে বললে—কী হল তোমার ?

জামাতুল্লা ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—কিছুই না।

—কিন্তু তোমার চেহারা দেখে—

—এই রোদে—

সুশীল বললে—জামাতুল্লা, মিঃ হোসেন আরো দুশো টাকা চান।

—ও! তা দিন বাবু। এই নিন চাবি।

—উনি বলছেন আজ রাত্রে আমাদের রওনা হতে হবে।

জামাতুল্লা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—টাকাটা দিয়ে দিন ওঁকে আগে।

টাকা নিয়ে ইয়ার হোসেন বিদায় নেবার পর-মুহূর্তেই জামাতুল্লা নিম্নস্বরে বললে—বড় বেঁচে গিয়েছি! ডকের পাশে যে গলি আছে ওখানে দু-জন মালয় গুণ্ডা আমাকে আক্রমণ করেছিল। দুজন দুদিক থেকে কিরীচ হাতে। ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিত আর-একটু হলে। আমি প্রাণপণে ছুটে বেঁচেছি। তোমরা অত ছুটতে পারতে না, মারা পড়তে ওদের হাতে। কালকের সেই চীনেম্যানের কথাই ঠিক। আমরা খুব বিপন্ন এখানে। বাড়ী থেকে কোথাও বেরিও না। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে ওর কথা শুনছিল। কথা শেষ হলে সনৎ তাকে চা ও টোস্টা খেতে দিয়ে বললে—কিছু বলি নি আমরা। ও আজই যেতে বলছে—শুনেছ তো ?

—যাতে হয় আজই আমাদের পালাতে হবে। এখন প্রাণ নিয়ে জাহাজে উঠতে পারলে বাঁচি!

—বল কী জামাতুল্লা ? এত ভয় নেই। চীনেম্যানটার বাজে গল্পটা দেখছি তোমার মনে বড় দাগ কেটে দিয়েছে।

—বাবুজি, মেটেবুরুজের মাঠে খুনের কথাটা ভেবে দেখুন। সে পাথরখানার জন্যে নয়—আঁকজোঁকের জন্যে। এখন আমার তাই মনে হচ্ছে। অসাবধান হবেন না আজ দিনমানটা। জাহাজে উঠলে কতকটা বিপদ কাটে বটে।

সেদিন বিকেলে ইয়ার হোসেনের লোক আবার এল। একটা শীলমোহর-করা চিঠি সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—এর উত্তর এখুনি চাই। সুশীল চিঠিখানা পড়ে দেখলে, আজ কিভাবে কোথা থেকে রওনা হতে হবে, সেই ব্যবস্থা চিঠিতে লেখা। ইয়ার হোসেন অন্য

পথ দিয়ে যাবে। ওদের যেন চেনে না, এভাবে। জাহাজে না উঠে এদের তিনজনের সঙ্গে সে কথাবার্ত্তা বলবে না।

সুশীল চিঠির উত্তর দিয়ে দিলে। জামাতুল্লা বললে—আমাদের জিনিসপত্র যদি কিনতে হয়, এই সময় কিনে নিয়ে আসি—চলুন।

ওরা বেরিয়ে এল বাসা থেকে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের বড় বাজারে জিনিসপত্র কিনবে এই ওদের ইচ্ছা। জামাতুল্লা বললে—বাবু, কিছু ভাল জিনিস খেয়ে নেওয়া যাক। জানেন, কোন অজানা রাস্তায় অনেক দূর যেতে হলে, ভাল খেয়ে নিতে হয়। অনেকদিন হয়ত ভাল খাবার অদৃষ্টে জুটবে না।

একটা শিখ রেস্টুরেণ্টে ওরা গিয়ে বসল। মাংস, কাটলেট, চা, টোস্ট ইত্যাদি আনিয়ে খাওয়া শুরু করেছে, এমন সময় একজন ইউরোপীয়-পোশাক-পরা মালয় এসে ওদের টেবিলে বসে বিনীতভাবে বললে—সে কি তাদের সঙ্গে বসে খেতে পারে?

সুশীল বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

সে আর কোন কথা না বলে খাবার আনিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে খেতে লাগল। তারপর আবার ওদের দিকে চেয়ে বললে—আপনারা ভারতীয়?

সুশীল ভদ্রভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—এখানে এসেছেন বেড়াতে, না?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগছে সিঙ্গাপুর?

—বেশ জায়গা।

—এখান থেকে দেশে ফিরছেন বোধহয়?

—তাই ইচ্ছে আছে।

—আপনারা তিনজনে বুঝি এসেছেন?

—না, আমরা এখানে এক হোটেলে থাকি—আলাপ হয়ে গিয়েছে।

—বেশ, বেশ।

—তারপর আবার বললে, আপনারা কোন্ হোটেলে উঠেছেন জানতে পারি কি? আমাদের একজন ভারতীয় বন্ধুর একটা ভাল হোটেল আছে, সেখানে খাবার-পত্র সস্তা। ঘরদোরও ভাল। যদি আপনাদের দরকার হয়—

সনৎ হঠাৎ বলে উঠল—না, ধন্যবাদ। আমরা আজই চলে যাচ্ছি।

সুশীল টেবিলের তলা দিয়ে সনৎকে এক রামচিমটি কাটলে। মালয় লোকটার চোখে-মুখে একটা কৌতুহলের ভাব জাগল। সেটা গোপন করে সে বললে—ও! আজই যাবেন? কিন্তু ভারতের জাহাজ তো আজ ছাড়বে না?

সুশীল বললে—না, আমরা রেলে উঠে যাচ্ছি কুয়ালালামপুর।

—ও, কুয়ালালামপুর? দেখে আসুন, বেশ শহর।

আরও কিছুক্ষণ পরে লোকটা বিল চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সুশীল রাগের সঙ্গে সনৎএর দিকে চেয়ে বললে—ছি, ছি, এত নির্ব্বোধ তুমি ? ও-কথা কেন বলতে গেলে ?

সনৎ অপ্রতিভ মুখে বললে—আমি ভাবলাম ওতেই আপদ বিদেয় হয়ে যাবে। অত জিজ্ঞেস করার ওর দরকার কী ? আমরা যদি না যাই, তোর তাতে কিরে বাপু ?

—তা নয়। কে কী মতলব নিয়ে কথা বলে, দরকার কী ওদের সঙ্গে সব কথা বলার ?

জামাতুল্লা বললে—ঠিক কথা বলেছেন বাবুজি।

সন্ধ্যার কিছু আগে ওরা রেস্ট্রেণ্ট থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে দু-একটা জিনিস কেনবার জন্যে বাজারের দিকে চলেছে—এমন সময় জামাতুল্লা নিচু গলায় চুপি চুপি বললে—ওই দেখুন সেই লোকটা !

সুশীল ও সনৎ চেয়ে দেখলে, সেই মালয় লোকটা একটা দোকানে কি একটা জিনিস কিনছে। ওদের দিকে পিছন ফিরে।

সুশীল বললে—চল আমরা এখান থেকে চলে যাই—মোড়ের দোকানে জিনিস কিনি গে।

জিনিস কিনতে একটু রাত হয়ে গেল। ওরা বড় রাস্তা বেয়ে অনেকটা এসে ওদের হোটেল যে গলিটার মধ্যে সে গলিটাতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় কি একটা ভারি জিনিস সুশীলের ঠিক বাঁ হাতের দেয়ালে জোরে এসে লেগে ঠিকরে পড়ল সামনে রাস্তার ওপরে।

ওরা চমকে উঠল। জামাতুল্লা পথের ওপর থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে—সর্ব্বনাশ !

ওরা দুজনে নিচু হয়ে জিনিসটা দেখতে গেল—কিন্তু জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, ছুটে আসুন, এখানে আর দাঁড়াবেন না বলছি !

দুজনে জামাতুল্লার পিছনে পিছনে দ্রুতপদে চলতে চলতে বললে—কী, কী হয়েছে ? কী জিনিস ওটা ?

মিনিট পাঁচ ছয় ছুটবার পর নির্জ্জন গলিটার শেষ প্রান্তে ওদের হোটেলটা দেখা গেল। জামাতুল্লা হাঁই ছেড়ে বললে—যাক খুব বেঁচে যাওয়া গিয়েছে ! এখানা মালয় দেশের ছুঁড়ে-মারা ছুরি ! ওরা দশ বিশ গজ তফাত থেকে এই ছুরি ছুঁড়ে লোকের গলা দুখানা করে কেটে দিতে পারে। আমাদের তাগ্ করেই ছুরিখানা ছুঁড়েছিল—কিন্তু অন্ধকারে ঠিক লাগেনি। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে, যে ছুঁড়েছে তার আর-একখানা ছুরি ছুঁড়তেই বা কতক্ষণ ?

সনৎ সেই ভারি ছোরাখানা হাতে করে বললে—ওঃ, এ গলায় লাগলে পাঁঠা কাটার মত মুণ্ডু কেটে ছট্‌কে পড়ত ! কানের পাশ দিয়ে তীর গিয়েছে !

সুশীল বললে—এ সেই গুপ্ত সম্প্রদায়ের লোকের কাজ। আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।

জামাতুল্লা বললে—লোক লেগেছে, তবে আমাদের বাসাটা এখনও বার করতে পারে নি। আমি বলি নি যে এখানে আমরা বিপন্ন। আমার না বলবার কারণ আছে।

রাতে ডাচ্ স্টীমার 'বেন্দা' ছাড়ল। ইয়ার হোসেন বড় বড় কেরোসিন কাঠের প্যাকবাক্স ওঠালে গোটাকতক জাহাজে—তাদের বাইরে বিলিতি বিয়ার মদের বিজ্ঞাপন মারা। ওঠাবার সময় অবিশ্যি কোন হাঙ্গামা হল না—কিন্তু সুশীল ও সনৎএর ভয় তাতে একেবারে দূর হয় নি। সিঙ্গাপুরের বন্দর ও প্রকাণ্ড নৌ-ঘাঁটি ধীরে ধীরে দিকচক্রবালে মিলিয়ে গেল—অকূল জলরাশি আলোকোৎক্ষেপী ঢেউয়ে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

চারদিনের দিন সকালে জাহাজ এসে সাঙ্গাপান পৌছল। এখানে এসে ওরা নেমে একটা চীনা হোটেলে আশ্রয় নিলে।

সাঙ্গাপান মশলার খুব বড় আড়ত, কতকগুলো নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, নদীর সেই মোহানাতেই বন্দর অবস্থিত—যেমন আমাদের দেশের চট্টগ্রাম।

ইয়ার হোসেন বাংলা জানে না, উর্দু বা হিন্দুস্থানীও ভুলে গিয়েছে—ও জামাতুল্লার সঙ্গে কথা বলে পিজিন ইংলিশে ও মালয় ভাষায়। বললে—জামাতুল্লা, এবার তুমি তোমার সেই দ্বীপে নিয়ে যেতে পারবে তো?

—পারব বলে মনে হচ্ছে। তবে এখনও ঠিক জানি নে—

সুশীল বললে—শুনুন মিঃ হোসেন। যখন আমার সঙ্গে জামাতুল্লার দেখা হয় গ্রামে, ও বলেছিল ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজের একটা দ্বীপে ওর জাহাজ নারকেলের ছোবড়া ও কুচি বোঝাই করতে গিয়ে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়। কেমন, তাই তো জামাতুল্লা? রাস্তার কথাটা একবার ভাল করে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

—ঠিক বাবুজি—

—তারপর বলে যাও—

—তারপর আমরা সাতদিন সেইখানে থাকি।

ইয়ার হোসেন বললে—সেখানে থাকি মানে কী বুঝিয়ে বল। দ্বীপে, না সমুদ্রে?

—না সাহেব, দ্বীপে তো নয়—আমরা যাচ্ছিলাম এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে। মাঝ-দরিয়ায় এ কাণ্ড ঘটে। তারপর সোরাবায়া থেকে জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে।

—কতদিন পরে উদ্ধার করে?

—আট দশ দিন কি ওই রকম।

সুশীল বললে—আগে বলেছিল সাতদিন।

—বাবু, ঠিক মনে নেই। অনেক দিনের কথা। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে। সেই সময় সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে সব কলেরা হয়ে মারা গেল—বাকি ছিলাম কাপ্তান আর আমি। দ্বীপ ছিল নিকটেই—যেখানে ডুবো পাহাড়ে আমাদের জাহাজে ধাক্কা খেয়েছিল, সেখান থেকে ডাঙা নজরে পড়ে। জাহাজের রশির দু রশি কী তিন রশি তফাতে। দ্বীপ

দেখলে আমি চিনতে পারব—তার ধারে একটা পাহাড়, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝর্না পড়েছে সমুদ্রে। বড় বড় পাথর পড়ে আছে, পাথরগুলো সাদা রঙের।

সুশীল হেসে বললে—তোমার সেই বিষ্ণমুনির দ্বীপ?

জামাতুল্লা গম্ভীর মুখে বললে—হাসবেন না বাবুজি। এসব কাজে নেমে এ দেশের সব দেবতাকে মানতে হবে। না মানলে বিপদ হতে কতক্ষণ? আমি খুব ভাল করেই তা জানি।

ইয়ার হোসেন বললে—বুঝলাম, ও সব এখন রাখো। সাঙ্গাপান থেকে কোন্ দিকে যেতে হবে, কত দূরে? একটা আন্দাজ দাও—একটা নটিক্যাল চার্ট করে নেওয়া যাক।

—আমরা সাঙ্গাপান থেকেই রওয়ানা হয়ে যাই পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে—আন্দাজ দুশো মাইল—সেখান থেকে পূর্ব্বে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যাই আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল। এইখানে সেই ডুবো পাহাড়ের জায়গাটা—যতদূর আমার মনে হচ্ছে—

ইয়ার হোসেন অসহিষ্ণুভাবে বললে—যতদূর মনে হলে তো হবে না! আমাদের সেদিকে যেতে হবে যে। সুলু সমুদ্রের সর্ব্বত্র তো ঘুরে বেড়াতে পারা যাবে না। আচ্ছা তুমি সে দ্বীপ কতদূর থেকে চিনতে পারবে? নেমে, না জাহাজে বসে?

—জাহাজে বসে চিনতে পারব ওই সাদা পাথরের পাহাড় আর ঝর্না দেখে।

—কত সাদা পাথরের পাহাড় থাকে—

—না সাহেব, তা নয়। সে পাথরের পাহাড়ের গড়ন অন্য রকম। দেখলেই চিনব।

ইয়ার হোসেন আর সুশীল দুজনে মিলে মোটামুটি ম্যাপ এঁকে নিয়ে সেদিন রাত্রে আর একবার মিলিয়ে নিলে জামাতুল্লার বর্ণনার সঙ্গে। চীনা জাঙ্ক্ ভাড়া করা হল। দু-মাসের মত চাল, আটা, চা, চিনি বোঝাই করে নেওয়া হল জাঙ্কে—আর রইল বিয়ারের কাঠের বাক্সভর্ত্তি অস্ত্রশস্ত্র মেসিন গান।

ইয়ার হোসেন প্রস্তাব করলে—এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ রাত্রেই যাওয়া যাক—শত্রু লাগতে পারে—

জামাতুল্লা বললে—সে কথা ঠিক। কিন্তু রাত্রে হারবার-মাস্টার জাহাজ কি নৌকো ছাড়তে দেবে না, পোর্ট পুলিসে ধরবে। এসব জায়গায় এই নিয়ম। বোম্বেটে ডাকাতের আড্ডা কিনা সুলু সী! কড়া নিয়ম সব।

—তবে?

—কাল সকালে চলুন সাহেব—

ইয়ার হোসেন দ্বিধার সঙ্গে এ প্রস্তাবে মত দিলে। সুশীলকে ডেকে বললে—রাতের অন্ধকারে যাওয়া ভাল ছিল। দিনের আলোয় সকলের মনে কৌতূহল জাগিয়ে যাওয়া ভাল না। যাই হোক, উপায় কী?

সকাল আটটার পরে সাঙ্গাপান থেকে ওদের নৌকো ছাড়ল। মাত্র দেড় টনের চীনা জাঙ্ক্—সমুদ্রে মোচার খোলার মত। কিন্তু জামাতুল্লা বললে—জাঙ্ক্ হঠাৎ ডোবে না,

এসব তুফানসঙ্কুল সমুদ্রে পাড়ি দিতে চীনা জাঙ্ক-এর মত জিনিস নেই।

জাহাজ ছেড়ে অনেক দূর এল, ক্রমে চারিধারে শুধু সমুদ্রের নীল জলরাশি।

জামাতুল্লা নাবিক ও কর্ণধার—কিন্তু যে বৃদ্ধ চীনাম্যান জাঙ্কের সারেং সেও দেখা গেল বেশ জাহাজ চালাতে জানে। দুদিন জাহাজ চলবার পরে জামাতুল্লার সঙ্গে চীনা সারেং-এর ঝগড়া বেধে গেল।

ইয়ার হোসেন বললে—চেঁচামেচি কেন? কী হয়েছে?

চীনা সারেং বললে—জামাতুল্লা সাহেব জাহাজ চালাতে জানে না—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—

জামাতুল্লা বললে—বিশ্বাস করবেন না ওর কথা! ও লোকটা একেবারে বাজে।

ইয়ার হোসেন ও সুশীল পরামর্শ করে জামাতুল্লার ওপরই কিন্তু জাহাজচালানোর ভার দিলে। একদিন সন্ধ্যার সময় দূরে ডাঙা ও আলোর সারি দেখা গেল।

চীনা সারেং ছুটে গিয়ে বললে—ওহে, বড় যে জাহাজ চালাচ্ছ—ও ডাঙা আর আলো কোথাকার? এদিকে এত বড় ডাঙা কিসের?

জামাতুল্লাও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। চার্ট অনুসারে ওখানে আলো আর ডাঙা দেখবার কথা নয়। চীনা সারেং ইয়ার হোসেনকে আর সুশীলকে ডেকে বললে—ওকে বলতে বলুন স্যর, ও আলো আর ডাঙা কিসের?

জামাতুল্লাকে মাথা চুলকোতে দেখে চীনা সারেং বিজয়গর্ব্বে বললে—আমি বলে দিচ্ছি স্যর—সাণ্ডা প্রণালীর মুখে পিয়েরপং বন্দরের আলো—তার মানে বুঝেছেন? আমরা আমাদের যাবার রাস্তা থেকে একশো মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে হঠে এসেছি—এই রকম করে জাহাজ চালালে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে আমাদের আর বেশি দেরি থাকবে না স্যর!

চীনা সারেং সেদিন থেকে হল কাপ্তেন।

সুশীল বললে—রাগ কোরো না জামাতুল্লা। তুমি অনেকদিন এ কাজ করো নি, ভুলে গিয়েছ হে।

জামাতুল্লা বললে—তা নয় বাবুজি। আমি ভুলি নি জাহাজ চালানো। আমার চার্ট ঠিক ছিল, আমার মনে হয় কি গোলমাল হয়েছে বা চার্টে ভুল করে রেখেছে।

আরো তিনদিন পরে বিকেলের দিকে চীনা কাপ্তেন বললে—পারা নামছে স্যর, দড়িদড়া সামলে আর জিনিস সামলে আপনারা খোলের মধ্যে নেমে যান—ঝড় উঠবে।

তিন ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ ঝড় এল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে। দড়িদড়া ছিঁড়ে পাল উড়িয়ে নিয়ে যায়—জামাতুল্লা চিৎকার করে বললে—সব খোলের মধ্যে যান—ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠেছে—

জাঙ্কের ডেকের ওপর বড় বড় ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়ে—ক্ষুদ্র দেড় টনের জাঙ্ক্‌খানা যে কোন মুহূর্ত্তে ভেঙেচুরে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দেবে মনে হল সবারই—কিন্তু দু-তিন বার জাঙ্ক্‌খানা ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল—নাকানি-চুবুনি খেয়েও আবার সমুদ্রের ওপর ঠেলে ওঠে। সাবাস মোচার খোলা!

হঠাৎ চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে উঠল—সামনে পাহাড়—সামলাও—

জামাতুল্লা হালে ছিল, ডাইনে সজোরে হাল মারতেই কান ঘেঁষে কতকগুলো বজ্‌বজে সমুদ্রের ফেনা ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেল, ফেনাগুলোর মাঝে কালো রঙের কি একটা টানা রেখা যেন ফেনারাশিকে দুভাগে চিরে দিয়েছে। ডুবো পাহাড়!

ঝড়ের শব্দে কে কী বলে শোনা যায় না—তবুও সুশীল শুনলে, চীনা কাপ্তেন চিৎকার করছে—খুব বাঁচা গিয়েছে! আর একটু হলেই সব শেষ হত আমাদের!

ইয়ার হোসেন ও সুশীল বাইরে একচমক দেখতে পেলে—জলের মধ্যে মরণের ফাঁদ পাতাই বটে! সাক্ষাৎ মরণের ফাঁদ!

জামাতুল্লা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হালি ধরে আছে। একটু আল্‌গা হলেই এই ভীষণ জায়গায় জাঙ্ক্‌ বানচাল হয়ে ধাক্কা মারবে গিয়ে বাঁ দিকের ডুবো পাহাড়ে। খানিকটা পরে জামাতুল্লার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ভয়ে—একি! দু-দিকেই যে ডুবো পাহাড়!—ডাইনে আর বাঁয়ে!

চীনা কাপ্তেনকে হেঁকে বললে—কোথা দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছ গাধার বাচ্চা! পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে যে! মারবে এবার—

ঝড়ের তুফানের মধ্যে চীনা কাপ্তেনের কথাগুলো অট্টহাস্যের মত শোনা গেল। কী যে সে বললে, জামাতুল্লা বুঝতে পারল না।—কিন্তু যারই ভুল হোক, জাহাজ বাঁচাতে হবে।

সে সমানে পিছনে চেয়ে দেখলে—পাহাড়ের কালো রেখা অতিকায় শুশুকের শিরদাঁড়ার মত জলের ওপর স্পষ্ট জেগে, মাস্তুলের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা সারেং সব পাল গুটিয়ে ফেলেছে—কেবল মাঝের বড় মাস্তুলে ষোল ফুট চওড়া বড় পালখানা ঝড়ের মুখে ছিঁড়ে ফালি-ফালি হয়ে অসংখ্য সাদা নিশানের মত উড়ছে। সে দেখলে নিশানগুলোর জন্যে জাহাজখানা এদিকে ওদিকে হেলছে ঘুরছে। চক্ষের নিমেষে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে পালের মোটা শনের কাছি কাটতে লাগল। একবার করে খানিকটা কাটে, আবার ছুটে গিয়ে হাল টিপে ধরে।

অমানুষিক সাহস ও দৃঢ়তা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাঁচ ছ-মিনিটের মধ্যে সে অত বড় মোটা রশিটা কেটে ফেললে। ফেলতেই দড়িদড়া ঢিলে পড়ে পাল সড়াং করে অনেকখানি নেমে এল।

চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে বললে—কে রশি কাটলে?

—আমি।

—খুব ভাল কাজ করেছ! এবার সামলাও ঠ্যালা! যদি জানো না কোন কিছু, তবে সবতাতেই সর্দারি করতে আসো কেন?

চীনা কাপ্তেন মিথ্যে বলে নি। জামাতুল্লা সভয়ে দেখলে পালে ঢিল পড়াতে জাঙ্ক্‌ এবার জগদ্দল পাথরের মত ভারি হয়ে পড়েছে যেন। পিছন থেকে বাতাস ঠেলা মেরেও তাকে নড়াতে পারছে না—সুতরাং দু-দিকের মরণ ফাঁদকে অতিক্রম করে বাহির সমুদ্রে পড়তে এর

অনেক সময় লেগে যাবে—ইতিমধ্যে বাতাস দিক পরিবর্তন করলেই—বিষম বিপদ।

ইয়ার হোসেন পাকা লোক। সে বুঝেছিল কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। মাথা বার করে বললে—কী হল আবার? জাঙ্ক্ নড়ে না যে!

চীনা সারেং বললে—নড়বে কী স্যর—নড়বার পথ কি আর রেখেছে জামাতুল্লা? এবার বাঁচাতে পারলাম না বোধ হয়!

কিন্তু সুখের বিষয় আধঘণ্টার মধ্যে ভয় কেটে গেল। বাতাস পিছন হতেই বয়ে চলল একটানা—এবং আধঘণ্টার মধ্যে জাঙ্ক্‌কে ডুবো পাহাড়ের ফাঁদ পার করে বাহির সমুদ্রে তাড়িয়ে দিলে।

জামাতুল্লা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

চীনা কাপ্তেন টিটকিরি দিয়ে বললে—বাঁচলে সবাই আজ নিতান্ত বরাতের জোরে! তোমার হাতের গুণে নয়, মনে রেখো।

সমুদ্র শান্ত, জ্যোৎস্না উঠেছে—সুশীলদের দল খোলের ঢাকনি খুলে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার মধ্যে দূরে কি একটা বিরাট কালো জিনিস দেখা গেল—জল থেকে উঁচু হয়ে আছে মাথা তুলে।

ইয়ার হোসেন বললে—কী ওটা?

সুশীল জিনিসটা প্রথমে দেখতে পেলে না—তারপর দেখে বিস্মিত হল—অস্পষ্ট কুয়াশা-মাখা জ্যোৎস্নালোকে কিছু ভাল দেখা যায় না—তবুও একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত আকাশের গায়ে কী ওটা জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে?

সনৎও সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

একমাত্র জামাতুল্লা দু-চোখ বিস্ফারিত করে জিনিসটার দিকে চেয়ে ছিল।

ইয়ার হোসেন কথার উত্তর না পেয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, জামাতুল্লা তাকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ডেকের সম্মুখভাগে এগিয়ে এসে কালো জিনিসটা ভাল করে দেখতে লাগল।

চীনা সারেং টিট্‌কিরি দেওয়ার সুরে বললে—দেখছ কী, ওটা ডুবো পাহাড়—বুড়ো বয়সে চোখে ভাল দেখতে পাইনে—তবুও বলছি—

সুশীল বললে—জলের উপর জেগে রয়েছে যে! ডুবো পাহাড় কী করে হল?

চীনা সারেং বললে—ও পাহাড়ের চুড়োটা মাত্র জেগে আছে জলের ওপর, স্যর। প্রকাণ্ড ডুবো পাহাড় ওটা—

জামাতুল্লা এইবার সুশীলকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে—সারেং ঠিক বলেছে। এতক্ষণ পরে আমি চিনেছি, এই সেই পাহাড় বাবুজি—এই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েই—

সুশীল অবিশ্বাসের সুরে বললে—চিনলে কী করে?

—আমি এতক্ষণ তাই চেয়ে দেখছিলাম—এবার আমার কোন সন্দেহ নেই—ওই ডুবো পাহাড়ের এক জায়গায় দক্ষিণ কোণে একটা শুয়োরের মুখের মত ছুঁচলো গড়ন দেখেছেন কি? আসুন আমি দেখাচ্ছি—এতকাল আমার মনে ছিল না, কিন্তু এবার দেখেই মনে পড়েছে।

—ইয়ার হোসেনকে বলি?

—কিন্তু ওই হলদেমুখো চীনাটাকে কিছু বলবেন না, বাবুজি। ওটাকে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না—আপনি বলুন হোসেন সাহেবকে—

—যদি ও-ই সেই ডুবো পাহাড়টা হয়, তবে তো ওখান থেকে জমি দেখা যাবে, আর সেই সাদা পাথরের পাহাড়টা—

—সে হল তিন রশি চার রশি তফাতে বাবুজি—চাঁদনি রাতে সাদা পাথরের পাহাড় অত দূর থেকে ভাল দেখা যাবে না। সকাল হোক—

চীনা সারেং চিৎকার করে উঠল—হাল সামলাবে না গল্প করে সময় কাটাবে—ডুবো পাহাড় সামনে, সে খেয়াল আছে?

জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে—আঃ, হলদেমুখো ভূতটা বড্ড জ্বালালে দেখছি—দাঁড়ান বাবুজি—আপনি হোসেন সাহেবকে বলুন, আমি দেখি ওদিকে কি বলে—

সুশীল হাসতে হাসতে বললে—তুমি যাই বলো, ও কিন্তু খুব পাকা জাহাজী—এসব অঞ্চল দেখছি ওর নখদর্পণে—ওস্তাদ জাহাজী—এ বিষয়ে ভুল নেই—

কিছু পরে চীনা সারেং তার নাবিকগিরির সুদক্ষতার এমন একটি প্রমাণ দিলে যাতে জামাতুল্লাকে পর্য্যন্ত তারিফ করতে হল। জামাতুল্লার হাল পরিচালনায় জাঙ্ক্ যখন ডুবো পাহাড়ের একদিক দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে তখন চীনা সারেং হুকুম দিলে—সামনে এগোও—পাশ কাটাবার চেষ্টা করছ কেন?

—সামনে এগিয়ে ধাক্কা খাবে নাকি?

—এই বিদ্যে নিয়ে মাঝিগিরি করতে এসেছে সুলু সীতে? নিজের দেশে নদী খালে ডোঙা চালাও গে যাও গিয়ে! ওই পাহাড়ের দু-পাশের ভীষণ চাপা স্রোতের মুখে পড়ে জাঙ্ক্ পাহাড়ের গায়ে সজোরে ধাক্কা মারবে—সে খেয়াল আছে? তোমার হালের সাধ্যি হবে না সে স্রোতের বেগ সামলানো—দেখছ না জল কী রকম ঘুরছে?

জামাতুল্লা তখনও ইতস্তত করছে দেখে চীনা সারেং হেঁকে বললে—জামাতুল্লা এবার সবাইকে মারবে স্যার—ওকে বুঝিয়ে বলুন, একবার ওর হাত থেকে ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন—এবার বোধ হয় আর রক্ষে হয় না—

সুশীল আর ইয়ার হোসেন জামাতুল্লাকে বললে—ও যা বলছে তাই কর না জামাতুল্লা—

—ও কী বলছে তা আপনারা খেয়াল করছেন না? ও বলছে ওই ডুবো পাহাড়ের দিকে সোজাসুজি হাল চালাতে—মরব তো তা-হলে—

চীনা সারেং জামাতুল্লার কথা শুনতে পেয়ে বললে—চালিয়ে দেখই না কী করি। মরণের অত ভয় করলে মাল্লাগিরি করা চলে না সাহেব—

জামাতুল্লা চোখ পাকিয়ে বললে—হুঁশিয়ার! আমি আর যাই হই—মরণের ভয় করি তা তুমি বলতে পারবে না, হলদেমুখো বাঁদর—

সুশীল ধমক দিয়ে বললে—ও কী হচ্ছে জামাতুল্লা? এ সময়ে ঝগড়া বিবাদ করে লাভ কী? সারেং যা বলছে তাই কর—

জামাতুল্লা হাতের চাকা ঘোরাতেই জাঙ্ক্ পাহাড়ের একেবারে বিশ গজের মধ্যে এসে পড়ল—ঠিক একেবারে সামনা-সামনি—সবাই দুরু-দুরু বক্ষে চেয়ে আছে, সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর ঘাঁটি, এ থেকে কী করে চীনা জাঙ্ক্ বাঁচবে কেউ বুঝছে না—দেখতে দেখতে বিশ গজের ব্যবধান ঘুচে গেল—দশ গজ—

আর বুঝি জাঙ্ক্ রক্ষা হয় না—মতলব কী চীনাটার?—সবাই বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে আছে বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে সবারই—হঠাৎ সারেং ক্ষিপ্রহস্তে প্রকাণ্ড একটা জাহাজী কাছি সুকৌশলে সামনের দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—ডাইনে হাল মার—

সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে গেল যা ইয়ার হোসেন ও জামাতুল্লা তাদের জাহাজী মাল্লা-জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো দেখে নি। জাহাজ ডানদিকে ঘুরে পাহাড়ের গুঁড়িটা পেরিয়ে যেতেই সারেং-এর কাছি গিয়ে পাহাড়ের সরু অংশটা জড়িয়ে ধরল এবং পেছন দিক দিয়ে ঘড়-ঘড় করে নোঙর পড়ার শব্দে সবাই বুঝল বড় সী-অ্যাঙ্কর অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে ফেলার বড় নোঙর তার সুদৃঢ় আঁকশির মুখ দিয়ে সমুদ্রের তলায় পাথর ও মাটি আঁকড়ে ধরলেই জাহাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

বোঁ করে অত বড় জাঙ্ক্‌খানা ডিঙি নৌকোর মত ঘুরে গেল আর পরক্ষণেই স্থির, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাহাড় থেকে তিন-চার গজের মধ্যে। জাঙ্ক্ আর পাহাড়ের মধ্যে কেবল একফালি সরু সাগর-জল, একটা বড় হাঙর তার মধ্যে কষ্টে সাঁতার দিতে পারে!

ইয়ার হোসেন বলে উঠল—সাবাস সারেং!

সুশীল ও সনৎ নিশ্বাস ফেলে বললে—খুব বাঁচিয়েছে বটে—

জামাতুল্লা চুপ করে রইল।

চীনা সারেং হলদে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—বিদেশী লোক এখানে জাহাজ চালাতে পারে না, স্যার! জামাতুল্লা মাল্লাগিরি যা জানে, তা খাটে চাটগাঁয়ের বন্দরে—এ সব সে জায়গা নয়—এখানে জাহাজ চালাতে হলে পেটে বিদ্যে চাই অনেকখানি—

ইয়ার হোসেন বললে—এখন কী করা যাবে বলো। জাহাজ তো আটকে গেল।

সারেং ওদের অভয় দিয়ে বললে—জাঙ্ক্ আটকায় নি। জোয়ার এলেই সকালে জাঙ্ক্ ছাড়া নিরাপদ।

সকলে দুরু-দুরু বক্ষে সকালের প্রতীক্ষায় রইল। সুশীল আর জামাতুল্লা ভাল করে ঘুমুতেই পারলে না। খুব ভোরে উঠে জামাতুল্লাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে সুশীল বললে—এস, চেয়ে দেখ—চল বাইরে—

জামাতুল্লা বাইরে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে—ওই সেই সাদা পাহাড় আর সেই

দ্বীপ! আমি কাল রাত্রেই বুঝেছিলাম বাবুজি, কাউকে বলিনি—

—কেন ?

—কী জানি বাবুজি, চীনা সারেংটাকে আর এই হোসেন সাহেবকে আমার তেমন যেন বিশ্বাস হয় না, খোদার দিব্যি বলছি—ওদের সামনে মুখ খোলে না আমার। হোসেন সাহেব আস্ত গুণ্ডালোক, বাধ্য হয়ে ওর সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে ওর নাম শুনে সবাই ভয় পায়।

—সে কথা আর এখন ভেবে লাভ কী বলো! ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে যখন। ইয়ার হোসেনকে বলি কথাটা।

ইয়ার হোসেন সব শুনে জামাতুল্লাকে ডেকে বললে—কোন সন্দেহ নেই তোমার? এই দ্বীপ ঠিক?

—ঠিক।

—আমরা নেমে কিন্তু জাঙ্ক্ ছেড়ে দেব—ঠিক করে ছাখ এখনও।

সুশীল ও জামাতুল্লা আশ্চর্য্য হয়ে বললে—জাঙ্ক্ ছেড়ে দেবেন কেন?

—আমি ওদের অন্য এক গল্প বলেছি। আমি বলেছি জঙ্গলে মাঠের ইজারা নিয়েছি ডাচ্ গবর্মেণ্টের কাছে—এখানে আমরা এখন থাকব কিছুদিন। ওদের বলতে চাই নে—চীনেরা লোক বড় ভাল নয়—

দুপুরের পর জালি বোটে জিনিসপত্র ও দুটি ছোট ছোট তাঁবু সমেত ওদের সকলকে অদূরবর্ত্তী দ্বীপের শিলাবৃত তীরভূমিতে নামিয়ে জাঙ্কের সারেং তার ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুশীল ইয়ার হোসেনকে বললে—ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপ তো এটা? ডাচ্ গবর্মেণ্টের কোন অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু—

—সে সব বড় হাঙ্গামা। ডাচ্ গবর্মেণ্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে তাহলে; কেস যাচ্ছি আমরা—ও দ্বীপে কতদিন আমরা থাকব! হয়ত আমাদের সঙ্গে পুলিস পাহারা থাকত—সব মাটি হত।

জামাতুল্লা দ্বীপের মাটিতে নেমে কেমন যেন স্বপ্নমুগ্ধের মত চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। এতকাল পরে সে যে এখানে আসবে তা মেটেবুরুজের মাল্লাপাড়ার হোটেলে সান্‌কিতে ভাত খেতে বসে কখনও কি ভেবেছিল? সে ভেবেছিল তার দুঃসাহসের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে! সেই বিদ্ধমুনির দ্বীপ আবার!

সুশীল ভাবছিল, কী অদ্ভুত যোগাযোগ! বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে জমিদারের ছেলে সে চিরকাল বসেই খাবে পায়ের ওপর পা দিয়ে, নির্ব্বিঘ্নে জমিজমার খাজনা শোধ, দুপুরে লম্বা ঘুম দেবে, বিকেলে দুপুরে মাছ ধরবে, সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় পৈতৃক তাকিয়া হেলান দিয়ে তাস দাবা খেলবে, রাত্রে পিঠে-পায়েস খেয়ে আবার ঘুম দেবে—এই সনাতন জীবনযাত্রা-প্রণালীর কোন ব্যতিক্রম হয়নি তার পিতৃপিতামহের বেলায়।—তার বেলাতেও সে ধারা অক্ষুণ্ণই থাকত যদি

দৈবক্রমে সেদিন গড়ের মাঠে জামাতুল্লা খালাসী তার কাছে 'ম্যাচিস্' চাইতে না আসত। কত সামান্য ঘটনা থেকে যে জীবনের কত বৃহৎ ও গুরুতর পরিবর্ত্তন শুরু হয়!

সুশীল ও সনৎ দ্বীপের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ঘন বনানী এ পর্য্যন্ত তারা কোথাও দেখে নি—রীতিমত ট্রপিক্যাল অরণ্য যাকে বলে, তা এতদিন সুশীল ছবিতেই দেখে এসেছে এবং ইংরেজি ভ্রমণের বইয়ে তার বর্ণনাই পড়ে এসেছে—এতকাল পরে তা সে দেখল। জলের ধার থেকেই অপরিচিত গাছপালার নিবিড় বন আরম্ভ হয়েছে—বনস্পতি-মাতার বড় বড় গাছের গায়ে অর্কিডের ফুলগুলি সুগন্ধে প্রভাতের বাতাস মাতিয়েছে—মোটা মোটা লতা দুলছে এ গাছ থেকে ও গাছে। কত রঙের প্রজাপতি উড়ছে—সামনে সুনীল সমুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ তীরভূমিতে এসে সজোরে ধাক্কা মারছে, একেবারে খোলা জলরাশি থৈ-থৈ করছে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত, একটা ব্রেকওয়াটার পর্য্যন্ত নেই কোথাও—যদি কেউ জলে পড়ে, তবে হাঙরের আহার্য্য হবে এ জানা কথা—এসব সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি, সুশীল আগেই শুনেছে। বনের মধ্যে অনেক জায়গায় এখনও অন্ধকার কাটে নি—কারণ প্রভাতের রৌদ্র তার মধ্যে এখনও অনেক জায়গাতেই ঢোকে নি—দেখে বোধ হয়, দুপুরেও ঢোকে কি না সন্দেহ।

ইয়ার হোসেন দেখে শুনে বললে—এ যে ভীষণ জঙ্গল দেখছি—। জামাতুল্লা বললে—আগে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়েও যেন জঙ্গল বেশি হয়েছে।

সুশীল জানতে চাইলে এ দ্বীপে লোক আছে কি না। ইয়ার হোসেন বললে—ম্যাপে তো কিছু দেয় না—এ দ্বীপের কিছুই দেখিনে ম্যাপে—কী জামাতুল্লা, তুমি কী দেখেছিলে?

—কোথাও কিছু নেই।

—বেশ ভাল জানো?

—আমার যাওয়ার পথে অন্তত তো কিছু দেখি নি—

—এখান থেকে তোমার সে নগর কতদূর হবে আন্দাজ?

—তিন চার দিনের পথ।

—এত কেন হবে? এ দ্বীপের প্রস্থ তো খুব বেশি হবার কথা নয়!

সুশীল বললে—কত বলে আন্দাজ করছেন, মিঃ হোসেন?

—ত্রিশ মাইলের মধ্যে। তবে একটা কথা, এই জঙ্গল ঠেলে যাওয়ার পথ এগোবে না বেশি। অনেক জায়গায় পথ কেটে করে নিয়ে তবে এগুতে হবে। তিন দিন লাগা বিচিত্র নয়।

সেদিন তাঁবু খাটিয়ে দুপুরে বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে দ্বীপের মধ্যে ঢোকবার জন্যে ইয়ার হোসেন সবাইকে তৈরী হতে বললে। মালয় কুলি ওরা এনেছিল সাতজন, জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—এরা সবাই ইয়ার হোসেনের হাতের লোক এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ওদের গতিক বড় সুবিধের বলে মনে হয়নি সুশীলের ও সনৎএর গোড়া থেকেই। দেখে মনে হয় সিঙ্গাপুরে এরা চুরি ডাকাতি ও রাহাজানি করে চালিয়ে এসেছে এতদিন। যেমন

দুশমনের মত চেহারা, তেমনি ধূর্ত্ত দৃষ্টি এদের চোখে। ইয়ার হোসেনের কথায় এরা ওঠে বসে। জামাতুল্লা এদের বিশ্বাস করত না। কিন্তু উপায় কী, ইয়ার হোসেনকে যখন দলে নিতে হয়েছে, তখন এদেরও রাখতে হবে।

দুদিন সমুদ্রের ধারে তাঁবু ফেলে থাকবার পরে সকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সুশীল সনৎ এমন জঙ্গল কখনও দেখে নি। গাছপালা যে এত সবুজ, এত নিবিড়, এত অফুরন্ত হতে পারে—বাংলা দেশের ছেলে হয়েও এরা এ জিনিসটা এই প্রথম দেখলে। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে মাঝে-মাঝে এক-একটা ছোট নদী বা খাড়ি—তার পাশে যেন গাছপালা ও বনঝোপের সবুজ পর্ব্বত—কত ধরনের অর্কিড, কত ধরনের লতা, কত অদ্ভুত ও বিচিত্র ফুল।

একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বন কাটতে কাটতে ওরা মোটে মাইল-তিনেক এগিয়ে যেতে সক্ষম হল।

সন্ধ্যার দিকে ইয়ার হোসেন বললে—এখানে আজ তাঁবু ফেলা যাক।

কিন্তু তাঁবু ফেলবে কোথায়? সুশীল চারদিকে চেয়ে দেখলে ভয়ানক ঘন জঙ্গলের মধ্যে বড়-বড় দোলানো লতার তলায় ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর রাত্রে বাস করতে হবে। আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতায় এরা দেখেছে এখানকার জঙ্গলে তিনরকম জীব যেখানে সেখানে বাস করে—যে তিনটিই মানুষের শত্রু। প্রথম, বড়-বড় রক্ত-শোষক জোঁক; দ্বিতীয়, বিষধর সর্প; তৃতীয়, মৌমাছি। এই তিনটি শত্রুর কোনটাই কম নয়—যে-কোনটার আক্রমণ মানুষের জীবন বিপন্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট।

কোন রকমে তাঁবু খাটানো হল।

ঘুমের মধ্যে কখন ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল—ট্রপিক্যাল অরণ্যের এ অঞ্চলে বৃষ্টি লেগেই আছে, এমন দিন নেই যে বৃষ্টি হয় না। ঘুমের মধ্যে সুশীল দেখলে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে কখন বৃষ্টির জলের ধারা গড়িয়ে এসে ওদের বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে কোথায় এক গুরুগম্ভীর নিনাদ শোনা গেল—সমস্ত অরণ্য যেন কেঁপে উঠল।

সনৎ চমকে উঠে বললে—কে ডাকে দাদা?

অন্য তাঁবু থেকে ইয়ার হোসেন বলে উঠল—ও কিসের ডাক?

কেউ কিছু জানে না। না জামাতুল্লা না ইয়ার হোসেন—কেবল ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর বললে—ওটা বুনো হাতির ডাক হুজুর।

আর একজন অনুচর প্রতিবাদ করে বললে—ওটা গণ্ডারের ডাক।

কিছুমাত্র মীমাংসা হল না এবং আবার সেই ডাক, সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক জানোয়ারের ভীষণ গর্জ্জন। সেটা শুনে অবশ্য সকলেই বুঝতে পারলে—বাঘের গর্জ্জন।

এরই ফাঁকে আবার বন-মোরগও ডেকে উঠল। সময়ে এক-পাল বন্য কুকুরের ডাকও।

সনৎ বললে—ও দাদা, এ যে ঘুমুতে দেয় না দেখছি—

সুশীল উত্তর দিলে—কানে আঙুল দিয়ে থাক—

ইয়ার হোসেন বললে—রাইফেল নিয়ে বসে থাকতে হবে—কেউ ঘুমিও না—

এটা নিতান্ত প্রথম দিন বলে এদের ভয় ছিল বেশি, দু-একদিনের মধ্যে জন্তু জানোয়ারের আওয়াজ গা-সওয়া হয়ে গেল। নিবিড় ট্রপিক্যাল জঙ্গলের মধ্যে প্রতি রাত্রেই নানা বন্য জানোয়ারের বিচিত্র আওয়াজ—আওয়াজ যা করে, তাঁবুর আশে-পাশেই করে—কিন্তু তাঁবুর লোককে আক্রমণ করে না।

সুশীল দু-দিন ঘুমোতে পারে নি—কিন্তু তিন রাত্রির পরে সে বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারলে।

জঙ্গলের কূল-কিনারা নেই—ওরা পাঁচদিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেও কোন কিছুই দেখতে পেলে না সেখানে—ওই বন আর বন।

সূর্য্যের আলো না দেখে সুশীল তো হাঁপিয়ে উঠল। এ জঙ্গলে সূর্য্যের আলো আদৌ পড়ে না।

আগে দেশে থাকতে সে দু-একখানা ভ্রমণের বইতে পড়েছিল যে মেক্সিকোতে, মালয়ে, আফ্রিকায় এমন ধরনের বন আছে, যেখানে কখনো সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। কথাটা আলঙ্কারিকের অত্যুক্তি হিসেবেই সে ধরে নিয়েছিল, আজ সে সত্যই প্রত্যক্ষ করলে এমন বন, যা চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পড়ন্ত বেলায় কেবল সু-উচ্চ বনস্পতিরাজির শীর্ষদেশ অস্তমান সূর্য্যের রাঙা আলোয় রঞ্জিত হয় মাত্র। ক্বচিৎ নিবিড় লতাঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো চাঁদের আলো সামান্য-মাত্র পড়ে, নতুবা সকল সময়েই গোধূলি দিনমানে। চিরগোধূলির জগৎ এটা যেন।

একদিন সনৎ পড়ে গেল বিপদে।

তাঁবু থেকে বন্দুক হাতে শিকার করতে বার হয়ে সে একটা গাছের ডালে এক ভীষণ অজগর সাপ দেখে সেটাকে গুলি করলে। সাপটা দুলতে দুলতে গাছের ডাল থেকে পাক ছাড়িয়ে ঝুপ্ করে একবোঝা মোটা দড়াদড়ির মত নিচে পড়ে গেল।

সনৎ সেটার কাছে গিয়ে দেখলে অজগরের মাথাটা গুলির ঘায়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার ল্যাজটা হঠাৎ এসে সনৎএর পা দু-খানা জড়িয়ে ধরে শক্ত কাঠ হয়ে গেল। সরীসৃপের হিমশীতল স্পর্শ সনতের স্নায়ুগুলোকে যেন অবশ করে দিলে, নিজের পা দু-খানাকে সে আর মোটেই নাড়তে পারলে না—হাতদুটোকে যখন কষ্টে নাড়ালে তখন লোহার শেকলের মত নাগপাশের শক্ত বাঁধনে তার পদদ্বয় গতিশক্তিহীন।

অজগর তো মরে কাঠ হয়ে গেল, কিন্তু সনৎ চেষ্টা করেও কিছুতেই নাগপাশ থেকে পা ছাড়াতে পারলে না। পা যেন ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে, এমন কি সনৎএর মনে হল আর কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে সে চিরদিনের মত চলৎশক্তি হারাবে। এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, বেলা ক্রমশ পড়ে আসছে—এরই মধ্যে গোধূলি গিয়ে যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে বনে। কিছুক্ষণ পরে দিক ঠিক করে তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরও কিছুক্ষণ কাটল, শেয়ালের দল বনের মধ্যে ডেকে উঠল—একটু পরেই বন্য হস্তীর

বৃংহিত অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলবে, হায়েনার অট্টহাসিতে বুকের রক্ত শুকিয়ে দেবে।

সনৎ সবই বুঝছে—কিন্তু কোন উপায় নেই। বন্দুকটার আওয়াজ করলে তাঁবুর লোক-দের তার সন্ধান দেওয়া চলত বটে—কিন্তু বন্দুকে গুলি নেই। শেষ ছুটো টোটা অজগরের দিকে সে ছুঁড়েছে।

তিমিরময়ী রাত্রি নামল।

অসহায় অবস্থায় চুপ করে কাত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। প্রথমটা তার মনে খুব ভয় হল—কিন্তু মরীয়ার সাহসে সাহসী হয়ে শেষ পর্য্যন্ত সে চুপ করে শুয়েই রইল। মৃত অজগরটাকে অন্ধকারে আর দেখা যায় না—কিন্তু তার হিম-শীতল আলিঙ্গন প্রতি-মুহূর্তে সনৎকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল যে প্রাণের বদলে সে প্রাণই নিতে চায়।

সারারাত্রি এভাবে কাটলে বোধ হয় সনৎ সে যাত্রা ফিরত না—কিন্তু অনেক রাত্রে হঠাৎ সনৎএর তন্দ্রা গেল ছুটে। অনেক লোক আলো নিয়ে এসে ডাকাডাকি করছে। ইয়ার হোসেনের গলা শোনা গেল—হালু-উ-উ—মিঃ রায়—

সনৎএর সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গিয়েছিল—সে গলা দিয়ে স্বর উচ্চারণ করতে পারলে না। কিন্তু ইয়ার হোসেনের টর্চ্চের আলো এসে পড়ল ওর ওপরে। সবাই এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। পাশের মৃত অজগর দেখে ওরা আগে ভেবেছিল সর্পের বেষ্টনে সনৎও প্রাণ হারিয়েছে—তারপর ওকে হাত নাড়তে দেখে বুঝলে ও মরে নি।

তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করতে সনৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ইয়ার হোসেন সেদিন ওদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল।

জামাতুল্লাকে বললে—কই, তোমার সে মন্দিরের বা শহরের ধ্বংসাবশেষ তো দেখি নে কোনদিকে।

জামাতুল্লা বললে—আমি তো আর মেপে রাখি নি মশাই ক-পা গেলে শহর পাওয়া যাবে—সবাই মিলে খুঁজে দেখতে হবে।

সুশীল একটা নক্সা দেখিয়ে বললে—এ ক-দিনে যতটা এসেছি, জঙ্গলের একটা খসড়া ম্যাপ তৈরি করে রেখেছি। এই দেখে আমরা যে-যে পথে এসেছি দেখতে হবে, সে পথে আর যাব না।

আবার ওদের দল বেরিয়ে পড়ল—ছু-দিন পরে সমুদ্র-কল্লোল শুনে বনঝোপের আড়াল থেকে বার হয়ে ওরা দেখলে—সামনেই বিরাট সমুদ্র।

সনৎ চিৎকার করে উঠল—আলাট্টা! আলাট্টা!

সুশীল বললে—তোমার এ চিৎকার সাজে না সনৎ। তুমি জেনোফনের বর্ণিত গ্রীক সৈন্য নাও, সমুদ্রের ধারে তোমার বাড়ী নয়—

ইয়ার হোসেন বললে—ব্যাপার কী? আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারছিনে—

সনৎ বললে—জেনোফন বলে একজন প্রাচীন যুগের গ্রীক লেখক—নিজেও তিনি একজন সৈনিক—পারস্য দেশের অভিযান শেষ করে ফিরবার সমস্ত দুঃখ-কষ্টটা 'দশ সহস্রের

প্রত্যাবর্তন' বলে একখানা বইয়ে লিখে রেখে গিয়েছেন—তাই ও বলছে—

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—ও!

জামাতুল্লা বললে—আমার একটা পরামর্শ শোন। কম্পাসে দিক ঠিক করে চল এবার উত্তর মুখে যাই—ওদিকটা দেখে আসা যাক।

সকলেই এ কথায় সায় দিলে। সূর্য্যের মুখ না দেখে সকলেরই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ওরা প্রথম দিনেই সমুদ্রের বালির ওপরে অনেকগুলো বড়-বড় কচ্ছপ দেখতে পেলে। ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর ছুটে গিয়ে একটাকে উল্টে চিৎ করে দিলে, বাকিগুলো তাড়াতাড়ি গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মালয় দেশীয় দায়ের (মালয়েরা বলে 'বোলো') সাহায্যে কচ্ছপটাকে কাটা হল, মাংসটা ভাগ করে রান্না করে সকলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলে। ভাগ করার অর্থ এই যে ইয়ার হোসেনের দল ও জামাতুল্লার রান্না হত আলাদা, সুশীল ও সনৎ-এর আলাদা রান্না সনৎ নিজেই করত।

একদিন সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে কি একটা জানোয়ার দেখে সনৎ ছুটে এসে সবাইকে খবর দিলে।

সকলে গিয়ে দেখলে প্রকাণ্ড বড় শুয়োরের মত বড় একটা জানোয়ার বালির ওপর চুপ করে শুয়ে। তার থ্যাবড়া নাকের নিচে বড় বড় গোঁপ—মুখের দুদিকে দুটো বড়-বড় দাঁত।

ইয়ার হোসেন বললে—এ এক ধরনের সীল—সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে।

সীলের মূল্যবান চামড়ার লোভে সনৎ ওকে গুলি করতে উদ্যত হল।

ইয়ার হোসেন নিষেধ করে বললে—ওটা মেরো না—ও সীলকে বলে সী লায়ন, ও মারলে অলক্ষণ হয়।

পরদিন তাঁবু তুলে সকলে উত্তর দিকের জঙ্গল ভেদ করে রওনা হল।

উত্তর দিকের জঙ্গলে সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকটা গেল ওরা। এক গাছ থেকে আর এক গাছে বড়-বড় পুষ্পিত লতা সারা বন সুগন্ধে আমোদ করে ঝুলে পড়েছে—সুবৃহৎ লতা যেন অজগর সাপের নাগপাশে মহীরুহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে—রাশি রাশি বিচিত্র অর্কিড। বিচিত্র ও উজ্জ্বল বর্ণের পাখির দল ডালে ডালে—অদ্ভুত সৌন্দর্য্য বনের। সুশীল বললে—মিঃ হোসেন, ও কী লতা জানেন? যেমন সুন্দর ফুল—আর লতা দেখা যাচ্ছে না ফুলের ভারে—গন্ধও অদ্ভুত। ইয়ার হোসেন লতার নাম জানে না—তবে বললে, সিঙ্গাপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওরকম লতা সে দেখেছে।

সারা দ্বীপে গভীর বন। বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া কঠিন ও অনবরত গাছপালা কেটে যেতে হয় পথ করবার জন্যে—কাজেই ওরা সমুদ্রের ধার বেয়ে চলছিল। এক জায়গায় একটা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে বনের মধ্যে দিয়ে, নদী পার হয়ে যাওয়া কষ্টকর বলে ওরা বাধ্য হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নদী সরু হবার নাম নেই—অনেক দূরে বনের মধ্যে ঢুকে এখনও নদী বেশ গভীর।

সুশীল বললে—ওহে, নদীটা আমাদের দেশের বড় একটা খালের মত দেখছি। এ দ্বীপে এত বড় নদী আসছে কোথা থেকে ? তেমন বড় পাহাড় কোথায় ?

—নিশ্চয়ই বড় পাহাড় আছে বনের মধ্যে, সেইদিকেই তো যাচ্ছি—দেখা যাক—

আরও আধঘণ্টা সকলে মিলে গভীর জনহীন বনের মধ্যে দিয়ে চলল। বনের রাজ্য বটে এটা—সত্যিকার বন কাকে বলে এতদিন পরে প্রত্যক্ষ করল সুশীল সনৎ।

হঠাৎ এক জায়গায় একটা নাগকেশর গাছ দেখে সুশীল বলে উঠল—এই ছাখ একটা আশ্চর্য্য জিনিস। এই গাছ কোথাও এদিকে দেখা যায় না। নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে আমদানি এ গাছটা।

খুঁজতে খুঁজতে আশেপাশে আরও কয়েকটা নাগকেশর গাছ পাওয়া গেল। এই গভীর বনের মধ্যে নাগকেশর গাছ থাকার মানেই হচ্ছে এখানে কোন ভারতীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল পুরাকালে।

সনৎ বললে—কিন্তু এ গাছ তো খুব পুরোনো না, দেখেই মনে হচ্ছে। আট ন-শো বছরের নাগকেশর গাছ কি বাঁচে ?

—তা নয়। ঔপনিবেশিক ভারতীয়দের নিজেদের হাতে পোঁতা গাছের চারা এগুলো। বড় গাছগুলোর থেকে বীজ পড়ে পড়ে এগুলো জন্মেছে। এ গাছ অধস্তন চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষ আসল গাছের।

সেদিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সনৎ বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা কৃষ্ণপ্রস্তর-মূর্ত্তি দেখে চিৎকার করে সবাইকে এসে খবর দিলে। ওরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখলে গভীর জঙ্গলের লতাপাতার মধ্যে একটা পাষাণ-মূর্ত্তি—মূর্ত্তির মুণ্ড নেই, তবে হাত পা দেখে মনে হয় শিবমূর্ত্তি ছিল সেটা। দু-হাত উঁচু প্রস্তর-বেদীর ওপর মূর্ত্তিটা বসানো, এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে ডমরু, গলায় অক্ষমালা—এত দূর দেশে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির এই চিহ্ন দেখে সুশীল ও সনৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল—সেখান থেকে যেন সরে যেতে পারে না। এই দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুধর্ম্মের বাণী বহন করে এনেছিলেন একদিন এদেশে। সুলু সমুদ্রের ওই ডুবো পাহাড় অতিক্রম করতে চীনা জাহাজওয়ালা যে কৌশল দেখালে, এই কম্পাস ও ব্যারোমিটারের যুগের বহু বহু পূর্ব্বে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা সে কৌশল একদিন না যদি দেখাতে পারতেন—তবে নিশ্চয়ই এ দ্বীপে পদার্পণ তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। মনে মনে সুশীল তাঁদের প্রণতি জানালে। নমো নমঃ দিগ্বিজয়ী পূর্ব্বপুরুষগণ, আশীর্ব্বাদ কর—যে বল ও তেজ তোমাদের বাহুতে, যে দুর্দ্ধর্ষ অনমনীয়তা ছিল তোমাদের মনে, আজ তোমার অধঃপতিত দুর্ব্বল উত্তরপুরুষেরা যেন সেই বল ও তেজের আদর্শে আবার নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, সার্থক করতে পারে ভারতের নাম বিশ্বের দরবারে!

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেনও চমৎকৃত হল। এ বনেও একদিন মানুষ ছিল তাহলে! এই যে গভীর বন আজ শুধু অজগর আর ওরাং-ওটাংয়ের বিচরণক্ষেত্র, এখানে একদিন সভ্য মানুষের পদশব্দ ধ্বনিত হয়েছে, মন্দির গড়েছে, মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে—এ-ই সকলের চেয়ে

আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলে মনে হল ওদের কাছে।

জামাতুল্লাকে সুশীল বললে—কেমন, এসব দেখেছিলে বলে মনে হয়?

—এসব দেখি নি। তবে এতে বোঝা যাচ্ছে মানুষের বাসের নিকটে এসে পড়েছি।

—সে জায়গাটা কেমন?

—সে একটা শহর বাবুজি। তার বাইরে পাঁচিল ছিল একসময়ে। এখন পড়ে গিয়েছে।

—কম্পাস দেখে দিক ঠিক করেছিলে? ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড ঠিক করেছিলে?

—না বাবুজি, ওসব কিছু করি নি। কম্পাস ছিল না।

সকলের মনে আশার সঞ্চার হল যে এবার নিশ্চয়ই সে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি আসা গিয়েছে। কিন্তু তার পর তিনদিন কেটে গেল, চারদিন গেল, পাঁচদিন গেল—আবার সামনে সমুদ্রের পূর্ব্ব তীর, আবার সুনীল সুলু সী। কোথায় নগর, কোথায়ই বা কী। একখানা ইট বা পাথরও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কারো চোখে পড়ল না আর। আবার হতাশ হয়ে পড়ল সকলে। জামাতুল্লাকে ইয়ার হোসেন বললে—জামাতুল্লা সাহেব, স্বপ্ন দেখো নি তো হিন্দু-মন্দিরের আর শহরের? জামাতুল্লা গেল রেগে। ইয়ার হোসেনের অনুচরেরা নিজেদের মধ্যে কি বিড়-বিড় করতে লাগল।

সুশীল সনৎ ও জামাতুল্লাকে গোপনে ডেকে বললে—ইয়ার হোসেনের ওই লোকগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে যদি কিছু চিহ্ন না পাওয়া যায়—দেখছি ওগুলো ভারী বদমাইশ!

জামাতুল্লা বললে—ভাববেন না বাবুজি, আমি ছুরি চালাব, আপনাদের জন্যে প্রাণ দেব! ওরা কী করবে? কাঠের ভেলা তৈরি করে সুলু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাব—ওই হলদে-মুখো চীনে জাঙ্ক্‌ওয়ালা বড় বাহাদুরি করে গেল আপনাদের কাছে—দেখব ও কত বাহাদুর!

একদিন সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে সুশীল বনের মধ্যে পাখি শিকার করতে বেরুল বন্দুক নিয়ে। কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় দূর থেকে একটা লম্বা পাহাড়-মত দেখতে পেলে। আরও কাছে গিয়ে সে দেখলে পাহাড় ও তার মধ্যে একটা খাল, তাতে জল আছে—গভীর খাল। জলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। ভাল করে চেয়ে দেখে সে বুঝলে ওপারে ওটা পাহাড় নয়, একটা উঁচু পাঁচিল হতে পারে ওটা। খাল নয়, মানুষের হাতে কাটা পরিখা হয়ত। পাঁচিলের ওপর বড় বড় গাছ গজিয়েছে, মোটা মোটা শেকড় পাঁচিলের গা বেয়ে এসে মাটিতে নেমেছে—তাদের ডালপালার ফাঁক দিয়ে জায়গায় জায়গায় পাঁচিলের গায়ের বড়-বড় পাথরের চাঁইগুলো দেখা যাচ্ছে।

সুশীল আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

এই তবে সেই প্রাচীন নগরীর প্রাচীর ও পরিখা। এ বিষয়ে ভুল থাকতে পারে না—তবে, হয়ত সে উল্টোদিক থেকে এটাকে দেখছে। নগরীর সিংহদ্বার অন্যদিকে আছে কোথাও।

সে যখন সকলকে গিয়ে খবর দিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমগ্র বনভূমিকে আচ্ছন্ন করেছে। ইতিমধ্যেই ওরাং-ওটাং ও শৃগালের ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-একটা নিশাচর পাখি ছাড়া অন্য পাখির কূজন থেমে গিয়েছে। ডালপালার ফাঁকে ঊর্দ্ধে কৃষ্ণ আকাশে নক্ষত্রাদি দেখা দিয়েছে।

ইয়ার হোসেন বারণ করলে—এখন না, এ রাত্রিকালে তাঁবু ছেড়ে কোথাও যেও না, কাল সকালে দেখা যাবে।

সুশীলের আনা পাখি দিয়ে তাঁবুতে ভোজ হল রাত্রে।

জামাতুল্লা বললে—পাঁচিল যখন বেরিয়েছে—তখন আমায় মিথ্যেবাদী বলে বদনাম আর কেউ দিতে পারবে না।.

পরদিন সকলে গিয়ে দেখলে, সত্যই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার অস্তিত্ব ওদের সেখানে কোন প্রাচীন নগরীর অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজমান।

পরিখার জলে পদ্মফুল দেখে সুশীল ও সনৎ ভাবলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক যেন ঐ ফুল। আট শো বছর আগে যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ প্রথম পদ্মলতা এনে দুর্গ-পরিখার জলে পুঁতে দেয়, তারা আজ কোথায়? কিন্তু জলে একবার শেকড় গেড়ে যে পদ্মলতা বেঁচে উঠেছিল, সে বংশানুক্রমে আজও অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে এই গভীর অরণ্যের মধ্যে। ইয়ার হোসেনের আদেশে তার দুজন অনুচর জল মেপে দেখলে, এখানে পার হওয়া অসম্ভব। পরিখার জল বেশ গভীর। পরিখার এক বাহু ধরে এক দল ও অন্যদিকে অন্য বাহুর সন্ধানে অন্য দল বার হল।

শেষের দলে গেল সুশীল।

উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা প্রাচীর-পরিখার উত্তর দিকে আধ মাইল-টাক গিয়ে ওদের দল সবিস্ময়ে দেখলে প্রাচীরের এক স্থান ভগ্ন। মাঝখান বেয়ে বেশ একটা রাস্তা যেন ছিল সুপ্রাচীন কালে, এখন অবিচ্ছি ঘন বন। দেখে মনে হয় শত্রু দ্বারা দুর্গ বা নগর-প্রাচীর হয়ত এখানে ভগ্ন হয়ে থাকবে, নতুবা এর অন্য কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না।

দেখা গেল পরিখার সেইখানে প্রাচীন কালে বোধহয় কাঠের সেতু ছিল, এখন সেটা পড়েছে ভেঙে জলে। জলের গভীরতা সেখানে কম। কাঠের সেতু প্রথমে দেখা যায় নি। ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর প্রথমে জলের ধারে একটা শেকল দেখতে পায়। শেকলটা টেনে জলের মধ্য থেকে একখণ্ড লোহার পাত বেরুল। আন্দাজ করা কঠিন নয় যে এই লোহার পাত কাঠের চওড়া তক্তার গায়ে লাগানো ছিল। অনুমানটুকু ছাড়া কাঠের সেতুর অস্তিত্বের অন্য কোন নিদর্শন এতকাল পরে কিভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে!

ইয়ার হোসেন বললে—এখান দিয়ে পার হওয়া যাক—জল গভীর হবে না।

সুশীল সামান্য একটু আপত্তি করলে—অথচ কেন যে করলে তা সে নিজেই জানে না।

প্রথমে নামল ইয়ার হোসেন নিজে—তার পেছনে নামল সুশীল। হাত তিন চার মাত্র জলে যখন ওরা গিয়েছে তখন ওরা দেখলে সামনে জলের যা গভীরতা, তাতে আর অগ্রসর

হওয়া চলবে না। ঠিক সেই সময় ওদের নিকট থেকে হাত পাঁচ ছয় দূরে ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর—যে শিকল টেনে তুলেছিল জল থেকে—সে নামল, উদ্দেশ্য, ওদের পাশাপাশি সেও পরিখা পার হবে। কিন্তু পরক্ষণেই এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল।

সুশীল চোখের কোণ দিয়ে অল্পক্ষণের জন্যে দেখতে পেলে, লোকটার ছ-সাত হাত দূরে ছোট্ট কাঠের মত কালো কি একটা জিনিস যেন ভাসছে। দু-সেকেণ্ড মাত্র, পরেই হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে বিরাট জলোচ্ছ্বাস উঠল, একটা আর্ত্ত চিৎকার-ধ্বনি অল্পক্ষণের মধ্যে শোনা গেল···কিসের একটা প্রবল ঝাপটা এসে ওদের জলের ওপর কাত করে ফেললে··· ওদের দু-জনকে।

পরক্ষণেই ইয়ার হোসেনের সেই অনুচর অদৃশ্য।

কী হল ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারলে না—অবিশ্যি এক মিনিটও হয় নি—এর মধ্যে সব ঘটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় যারা ছিল তারা চেঁচিয়ে উঠল—শয়তান! শয়তান!

ইয়ার হোসেন আকুলভাবে চিৎকার করে বললে—ডাঙায় ওঠো—ডাঙায় ওঠো!

হতভম্ব সুশীল কাদা হাঁচড়ে মরি-বাঁচি ডাঙায় উঠল—পাশাপাশি ইয়ার হোসেন উঠল, জলে চেয়ে দেখলে জল কাদা-ঘোলা হয়েছে, ইয়ার হোসেনের অনুচর নিশ্চিহ্ন।

সুশীল ও ইয়ার হোসেন তখনও হাঁপাচ্ছে; সুশীলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে!

সে ভীত কণ্ঠে বললে—কী হল?

ইয়ার হোসেন বললে—আমাদের সাবধানে জলে নামা উচিত ছিল। এইসব প্রাচীন কালের জলাশয়ে কুমির থাকা সম্ভব, একথা ভুলে গিয়েছিলাম। খোঁজ সবাই—

কুমির! সুশীল অবাক হয়ে গেল। কে জানত নগরীর পরিখায় কুমির থাকতে পারে? দুর্গপরিখার প্রহরী এরা—হয়ত প্রাচীন দিনেই শত্রুরোধকল্পে জলের মধ্যে কুমির ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সুবিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এখনও তারা বাইরের লোকের অনধিকার প্রবেশে বাধাদান করছে।

খুঁজে কিছু হল না—জল কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্য অনুচরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। ইয়ার হোসেন বললে—আজ থামলে আমাদের চলবে না—এগোও। নগরের ফটক খোঁজো—

সুশীল বললে—জলের মধ্যে অজানা বিপদ। জল পার হওয়ার দরকার নেই—হেঁটে বা সাঁতরে। কোথাও সেতু আছে কি না দেখা যাক।

আবার উত্তর মুখে সকলে চলল। মাইল দুই সোজা চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—কারণ ভীষণ জঙ্গল কেটে কেটে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আগুন জ্বেলে তাঁবু ফেলে সেদিন সকলে সেখানে রাত্রি কাটাবার আয়োজন করলে। এমন সময় বহু দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল—তার উত্তরে ওরাও একটা আওয়াজ করলে। দুটি দলের মধ্যে যোগসূত্র রাখবার এক-

মাত্র উপায় এই বন্দুকের আওয়াজ—অনেক দূর থেকে দক্ষিণগামী দলের এ হল সঙ্কেতধ্বনি। পরদিন সকালে আরও এক মাইল গিয়ে প্রাচীরের উত্তর দিক থেকে পূর্ব্ব দিকে মুখ ফেরালে। অর্থাৎ এদিকে আর শহর নেই। প্রাচীর ধরে সবাই বাঁকতে গিয়ে দেখলে পরিখার এপারে অনেকগুলো স্তূপ, স্তূপের ওপর বিরাট জঙ্গল। বড় বড় পাথর গড়িয়ে এসে পড়েছে স্তূপ থেকে নিচে—সেগুলো বেশ চৌকশ করে কাটা। সম্ভবত স্তূপের ওপর কোন দুর্গ ছিল যা ঠিক নগর-প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণ পাহারা দিত।

পশ্চিম মুখে কতটা যেতে হবে কেউ জানে না, কারণ তারা দৈর্ঘ্য ধরে যাচ্ছে, না প্রস্থ ধরে যাচ্ছে তা জানবার সময় এখনও আসে নি। সেদিনও কেটে গেল বনের মধ্যে ; সন্ধ্যা নামল। সন্ধ্যায় যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, আওয়াজ খুব ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

সুশীল বললে—আমরা দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছি—প্রস্থ ধরে চলেছি। বুঝেছেন মিঃ হোসেন ?

—এবার বুঝলাম। ওদিকে যে দল গিয়েছে তারা ওদিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বন্দুক ছুঁড়ছে। অন্তত সাত মাইল দূর এখান থেকে।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যে নগরীর সিংহদ্বার পাওয়া গেল। সেখানটাতে পরিখার ওপর পাথরের সেতু। এপারে সেতু রক্ষার জন্যে দুর্গ ছিল, বর্ত্তমানে প্রকাণ্ড ভরা ঢিবি।

সকলে ব্যস্ত হয়ে সেতু পার হয়ে সিংহদ্বার লক্ষ্য করে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থেমে গেল।

সিংহদ্বারের খিলান ভেঙে পড়ত—যদি বট-জাতীয় কয়েকটি বৃক্ষের শিকড় আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে না জড়িয়ে ধরে রাখত। সিংহদ্বারের দুপাশে অদ্ভুত দুই প্রস্তর মূর্ত্তি—নাগরাজ বাসুকি ফণা তুলে আছে সামনে, পেছনে তিনমুখ-বিশিষ্ট কোন দেবতার মূর্ত্তি। সূর্য্যের আলো ওপরের বট-বৃক্ষের নিবিড় ডালপালা ভেদ করে মূর্ত্তি দুটির গায়ে বাঁকাভাবে এসে পড়েছে।

গম্ভীর শোভা। সুশীল শুধু নয়, দলের সকলেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল এই কারুকার্য্যময় সিংহদ্বার ও প্রাচীন যুগের শিল্পীর হাতের এই ভাস্কর্য্যের পানে।

সুশীল হাত জোড় করে প্রণাম করলে মূর্ত্তি দুটির উদ্দেশ্যে। সে পুরাতত্ত্ব বা দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হলেও আন্দাজ করলে এ দুটি তিন-মুখ-বিশিষ্ট শিবমূর্ত্তি।

সুলু সমুদ্রের এই জনহীন অরণ্যাবৃত দ্বীপে প্রাচীন ভারতের শক্তি ও তেজ একদিন এই দেবমূর্ত্তিকে স্থাপিত করেছিল। আজ ভারত অধঃপতিত,—দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। হে দেব, তোমার যে ভক্তগণ তোমাকে এখানে বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা আজ নেই—তাদের অযোগ্য বংশধরকে তুমি সেই শৌর্য্য ও সাহস ভিক্ষা দাও, তাদের বীরপুরুষদের বংশধর করে দাও, হে রুদ্রভৈরব!

ইয়ার হোসেন পর্য্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এই বিরাট ভাস্কর্য্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বললে—যদি আমার দিন আসে, এই মূর্ত্তি সিঙ্গাপুরের মিউজিয়মে দান করবার ইচ্ছে রইল—

সুশীল বললে—তা কখনো করবেন না মিঃ হোসেন, যেখানকার দেবতা সেইখানেই তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিন। অমঙ্গলকে ডেকে আনবেন না।

সিংহদ্বার অতিক্রম করে ওরা নগরীর মধ্যে ঢুকল। কিন্তু অল্প কিছুদূর গিয়েই দেখলে, এত দুর্ভেদ্য জঙ্গল যে দশ হাত এগিয়ে যাবার উপায় নেই বন না কাটলে। সিংহদ্বারের সামনেই নিশ্চয় প্রাচীন নগরের রাজপথ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে রাজপথের ওপরেই তিন চারশো বছরের পুরোনো বট-জাতীয় বৃক্ষ, বন্য রবার, বন্য ডুমুর গাছ। এইসব বড় গাছের নিচে আগাছা ও কাঁটালতার জঙ্গল। ওরাং-ওটাংও এই জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে পারে না—মানুষ কোন্ ছার।

ইয়ার হোসেনের হুকুমে মালয় অনুচরেরা 'বোলো' দিয়ে জঙ্গল কেটে কোন রকমে একটু সুঁড়িপথ বার করতে করতে সোজা চলল।

সুশীল বললে—এ জঙ্গল তো দেখছি নগরের বাইরে যেমন ছিল এখানেও তেমনি। কেবল এটা পাঁচিলের মধ্যে এই যা তফাত। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—দেখুন! দেখুন!

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল, সামনে প্রকাণ্ড একটা মন্দিরের চূড়া লতা ঝোপের আবরণ থেকে অনেক উঁচুতে মাথা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের কাছে যাবার কোন উপায় নেই—অনেক দূর থেকে বড় বড় দেওয়ালভাঙা পাথর ছড়িয়ে জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে অন্তত দেড়শো হাত পর্য্যন্ত।

ওরা ডিঙিয়ে লাফিয়ে কোন রকমে মন্দিরের সামনে বড় চত্বরের কাছে এল—কিন্তু সামনেই গোপুরমের মত উঁচু পাইলন টাওয়ার। তার সুবিশাল পাথরের খিলান ফেটে চৌচির হয়ে সিংহদ্বারের মতই আষ্টেপৃষ্ঠে বড় বড় শেকড় আর লতার বাঁধনে আজ কত যুগ যুগ ধরে ঝুলছে—তার ঠিকানা কারো কাছে নেই। গোপুরম ছাড়িয়ে মন্দিরের দেওয়াল, বিকটাকার দৈত্যের মুখের মত সারি সারি অনেকগুলো মুখ দেওয়ালের গায়ে বেরিয়ে আছে—সুশীল আঙুল দিয়ে ওদের দেখিয়ে বললে—দেখ কী চমৎকার কাজ। হয় পাথরের কড়ি নয়ত পয়োনালি, যাকে ইংরাজিতে বলে গর্গয়েল। অর্থাৎ বিকট জানোয়ারের মুখ বসানো নালি।

সকলেই অবাক হয়ে সেই কল্পনাসৃষ্ট ভীষণ মুখগুলোর দিকে চেয়ে রইল। সুন্দরকে গড়ে তোলে সেও যেমন কৌশলী শিল্পী, ভীষণকে যে রূপ দেয়, সে শিল্পীও ঠিক তত বড়। সুশীলের মনে পড়ল আনাতোল ফ্রাঁসের সেই গল্প, শয়তানকে এমন বিকট করে আঁকলে শিল্পী যে, রাতের অন্ধকারে শয়তান এসে শিল্পীকে জাগিয়ে জিগ্যেস করলে—তুমি আমাকে এর আগে কোথায় দেখেছিলে যে অমন করে এঁকেছ? শিল্পী বললে—আপনি কে?

শয়তান বললে—আমি লুসিফার। যাকে তোমরা বল শয়তান। ও নামটায় আমার ভয়ানক আপত্তি তা জানো? তুমি কী বিশ্রী করে এঁকেছ আমায়! আমি কি অত খারাপ দেখতে? দেখ না আমার দিকে চেয়ে!

শিল্পী দেখলে শয়তানের মূর্ত্তি দেখতে বেশ সুন্দর, তবে মুখশ্রী ঈষৎ বিষণ্ণ। ভয়ে ঠক্-ঠক্

করে কাঁপতে কাঁপতে বললে—আমায় মাপ করুন, আমি এর আগে দেখি নি আপনাকে। আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে। আমি ভুল শুধরে নেব—

শয়তান হাসতে হাসতে বললে—তাই শুধরে নাও গে যাও—নইলে তোমায় কান মলে দেব—

যাক। ওরা সবাই খিলানের তলা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মন্দিরের মধ্যেকার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। শুধু ভীষণ কাঁটাগাছ আর বেত, যা থেকে মলক্কা বেতের ছড়ি হয়।

সনৎ ছেলেমানুষ, ভাল বেত দেখে বলে উঠল—দাদা, একটা বেত কাটব?

ইয়ার হোসেন তাকে ধমক দিয়ে কি বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি সুন্দর পাখি এসে সামনের বন্য রবারের গাছের ডাল থেকে মন্দিরের ভাঙা পাথরের কার্নিসে বসল। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল পাখিটার দিকে। কী সুন্দর! দীর্ঘ পুচ্ছ ঝুলে পড়েছে কার্নিস থেকে প্রায় এক হাত—ময়ূরের পুচ্ছের মত। হলদে ও সাদা আঁখি পালকের গায়ে—পিঠের পালকগুলো ঈষৎ বেগুনি।

ইয়ার হোসেন বললে—টিকাটুরা, যাকে সাহেব লোক বলে বার্ড অব্ প্যারাডাইজ—খুব সুলক্ষণ।

সনৎ বললে—বাঃ, কী চমৎকার! এই সেই বিখ্যাত বার্ড অব্ প্যারাডাইজ! কত পড়েছি ছেলেবেলায় এদের কথা—

সুশীল বললে—সুলক্ষণ কুলক্ষণ দুরকমই দেখছি। কুমির নিলে একজনকে, আবার বার্ড অব্ প্যারাডাইজ দেখা গেল এটা সুলক্ষণ—

মন্দিরের বিভিন্ন কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরির দেওয়ালে সারবন্দী খোদাই কাজ। সুশীল একখানা পাথরের ইট মনোযোগের সঙ্গে দেখলে। একজন ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর পাশে বোধহয় গ্রহবিপ্র পাঁজি পড়ছেন। সামনে একসার লোক মাথা নিচু করে যেন রাজাকে অভিবাদন করছে। রাজার এক হাতে একটা কী পাখি—হয় পোষা শুক, নয়ত শিক্রে বাজ।

ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার! তার নিজের দেশের মানুষ একদিন কম্পাস-ব্যারোমিটারহীন যুগে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হিন্দুধর্ম্মের নিদর্শন রেখে গিয়েছিল, তাদের হাতে গড়া এই কীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে গর্ব্বে ও আনন্দে সুশীলের বুক দুলে উঠল। বীর তারা, দুর্ব্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরে নি, ধনুকে জ্যা রোপণ করে নি—সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে—এই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল মহাসাগর—হিন্দু-ধর্ম্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগ্বিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ-দেউল তুলেছে সপ্তসমুদ্র-পারে।

পরবর্ত্তী যুগের যারা স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে টোলের ভিটেয় বাঁশবনের অন্ধকারে বসে বলে গিয়েছিল—সমুদ্রে যেও না, গেলে জাতটি একেবারে যাবে, হিন্দুত্ব একেবারে লোপ পাবে, —তারা ছিল গৌরবময় যুগের বীর পূর্ব্বপুরুষদের অযোগ্য বংশধর, তাদের আয়ু দুর্ব্বল, মন দুর্ব্বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, কল্পনা স্থবির।

তারা হিন্দু নয়—হিন্দুর কঙ্কাল।

দুদিন ধরে ওরা বনের মধ্যে কত প্রাচীন দেওয়াল, ধ্বংসস্তূপ, দরজা, খিলান ইত্যাদি দেখে বেড়াল। জ্যোৎস্না রাত্রি, গভীর রাত্রে যখন ওরাং-ওটাংয়ের ডাকে চারিপাশের ঘন জঙ্গল মুখরিত হয়ে ওঠে, অজ্ঞাত নিশাচর পক্ষীর কুস্বর শোনা যায়, বন্য রবারের ডালপালায় বাদুড় ঝটাপটি করে, তখন এই প্রাচীন হিন্দু নগরীর ধ্বংসস্তূপে বসে সুশীল যেন মুহূর্তে কোন্ মায়ালোকে নীত হয়—অতীত শতাব্দীর হিন্দু সভ্যতার মায়ালোক—দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত কবি ও বীন্-বাজিয়ে যে মহাযুগের প্রতীক, হূনবিজেতা মহারথ স্কন্দগুপ্তের কোদণ্ড-টঙ্কারে যে যুগের আকাশ সন্ত্রস্ত।

সুশীল স্বপ্ন দেখে! সনৎকে বলে—বুঝলি সনৎ, জামাতুল্লাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ যে ও আমাদের এনেছে এখানে। এসব না দেখলে ভারতবর্ষের গৌরব কিছু বুঝতাম না!

সনৎ এ কথায় সায় দেয়। টাকার চেয়ে এর দাম বেশি।

ইয়ার হোসেন কিন্তু এসব বোঝে না। সে দিন-দিন উগ্র হয়ে উঠছে। এই নগরীর ধ্বংসস্তূপে প্রায় দশদিন কাটল। অথচ ধনভাণ্ডারের নামগন্ধও নেই, সন্ধানই মেলে না। জামাতুল্লাকে একদিন স্পষ্ট শাসালে—যদি টাকাকড়ির সন্ধান না মেলে তো তাকে এই জঙ্গলে টেনে আনবার মজা সে টের পাইয়ে দেবে।

জামাতুল্লা সুশীলকে গোপনে বললে—বাবুজি, ইয়ার হোসেন বদমাইস গুণ্ডা—ও না কী গোলমাল বাধায়!

সুশীল ও সনৎ সর্ব্বদা সজাগ হয়ে থাকে রাত্রে, কখন কী হয় বলা যায় না। ইয়ার হোসেনের সশস্ত্র অনুচরের দল দিন-দিন অসংযত হয়ে উঠছে।

একদিন জামাতুল্লা বনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় একটি বড় পাথরের থাম আবিষ্কার করলে। থামের মাথায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম তৈরি করা হয়েছে। সুশীলকে ডেকে নিয়ে গেল জামাতুল্লা, সুশীল এসব দেখে খুশি হল। সুশীল ও সনৎ দুজনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে থামটা দেখতে গেল।

সেখানে গিয়েই সুশীল দেখলে থামটার সামনে আড়ভাবে পড়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙ্—যেন একখানা চৌরশ করা শানের মেঝে। সুশীল ক্যামেরা এনেছে থামটার ফটো নেবে বলে, পাথরটা সরিয়ে না দিলে পদ্মটির ছবি নেওয়া সম্ভব নয়।

জামাতুল্লা বললে—পাথরখানা ধরাধরি করে এস সরাই—

সরাতে গিয়ে পাথরখানা যেই কাত অবস্থা থেকে সোজা হয়ে পড়ল, অমনি সনৎ চিৎকার করে বললে—দেখ, দেখ—

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, যেখানে পাথরটা ছিল, সেখানে একটা সুড়ঙ্গ যেন মাটির নিচে নেমে গিয়েছে। জামাতুল্লা ও সুশীল সুড়ঙ্গের ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সুড়ঙ্গটা হঠাৎ বেঁকে গিয়েছে, প্রথমটা সেজন্যে মনে হয় গর্ত্তটা নিতান্তই অগভীর।

সুশীল বললে—আমি নামব—

জামাতুল্লা বললে—তা কখনো করতে যাবেন না, বিপদে পড়বেন। কী আছে গর্তের মধ্যে কে জানে!

সুশীল বললে—নেমে দেখতেই হবে। আমি এখানে থাকি, তোমরা গিয়ে তাঁবু থেকে মোটা দড়ি হাত-চল্লিশ, টর্চ আর রিভলবার নিয়ে এস। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সব আনা হল। সুশীল জামাতুল্লা দুজনে সুড়ঙ্গের মধ্যে নামল। খানিক দূর নামলে ওরা। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, পনেরো ষোল ধাপ নেমেই কিন্তু দুজনে হতাশ হল দেখে, সামনে আর রাস্তা নেই। সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে একটা গাঁথা দেওয়ালের সামনে।

সুশীল বললে—এর মানে কী জামাতুল্লা সাহেব?

—বুঝলাম না বাবুজি। যদি যেতেই দেবে না, তবে সিঁড়ি গেঁথেছে কেন?

রাত হয়ে আসছে। ওরা দুজনে টর্চ ফেলে চারিদিক ভাল করে দেখতে লাগল। হঠাৎ সুশীল চেঁচিয়ে উঠে বললে—দেখ, দেখ! দুজনেই অবাক হয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে ওদের পরিচিত সেই চিহ্ন ক্ষোদা—পদ্মরাগ মণির ওপর যে-চিহ্ন ক্ষোদা ছিল। ভারতীয় স্বস্তিক চিহ্ন, প্রত্যেক বাহুর কোণে এক এক জানোয়ারের মূর্তি—সর্প, বাজপাখি, বাঘ ও কুমির।

—এই সেই আঁক-জোঁক বাবুজি! কিন্তু এর মানে কী, সিঁড়ি বন্ধ করলে কেন, বুঝলেন কিছু?

দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেল। সুশীল সামনে পাথরখানাতে হাত দিলে, বেশ মসৃণ; মাপ নিয়ে চৌরশ করে কেটে কে তৈরি করে রেখেছে।

কিছুই বোঝা গেল না—অবশেষে হতাশ হয়ে ওরা গর্ত থেকে উঠে পড়ে তাঁবুতে ফিরে এল সনৎকে নিয়ে। সেখানে কাউকে কিছু বললে না। পরদিন দুপুরবেলা সুশীল একা জায়গাটায় গেল। আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে নামল। ওর মনে একথা বিশেষভাবে জেগে ছিল, লোকে এইটুকু গর্তে ঢোকবার জন্যে এরকম সিঁড়ি গাঁথে না। এ সুড়ঙ্গ নিশ্চয় আরও অনেক বড়। কিন্তু তবে দশ ধাপ নেমেই পাথর দিয়ে এমন শক্ত করে বোজানো কেন?

এ গোলমেলে ব্যাপারের কোন মীমাংসা করা যাবে না দেখা যাচ্ছে। সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে সেই অদ্ভুত চিহ্নটি সুস্পষ্ট ক্ষোদাই করা আছে। এ চিহ্নই বা এখানে কেন? ভাল করে চেয়ে চিহ্নটি দেখতে দেখতে ওর চোখে পড়ল, যে পাথরের গায়ে চিহ্নটি ক্ষোদাই করা তার এক কোণের দিকে আর একটা কি ক্ষোদাই করা আছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার খুব না হলেও আলোও তেমন নয়। সুশীল টর্চ ফেলে ভাল করে দেখলে—চিহ্নটি আর কিছুই নয়, ঠিক যেন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখবার সামান্য খোল। খোলের চারিপাশে দুটি লতার আকারের বলয় কিংবা অন্য কোন অলঙ্কার পরস্পরযুক্ত। সুশীল কি মনে ভেবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের খোলে নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে দেখতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের পাথর যেন কলের দোরের মত সরে একটা মানুষ যাবার মত ফাঁক হয়ে গেল। সুশীল অবাক! এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত আলিবাবার গুহা!

সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে, সিঁড়ির পর সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে। সুশীল সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে উঁকি মেরে চাইলে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে। বহু যুগ আবদ্ধ দূষিত বাতাসের বিষাক্ত নিঃশ্বাস যেন ওর চোখে মুখে এসে লাগল। তখন কিন্তু সুশীলের মন আনন্দে কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বসে ভাববার সময় নেই। ও তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ নেমে গেল।

আবার সিঁড়ি বেঁকে গিয়েছে কিছুদূর গিয়ে। এবার আর সামনে পাথর নেই, সিঁড়ি এঁকে বেঁকে নেমে চলেছে। সুশীল একবার ভাবলে তার আর যাওয়া উচিত নয়। কতদূর সিঁড়ি নেমেছে এই ভীষণ অন্ধকূপের মধ্যে কে জানে? কিন্তু কৌতূহল সংবরণ করা ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। ও আরও অনেকখানি নিচে নেমে গিয়ে দেখলে এক জায়গায় সিঁড়ি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দেখলে, কোন দিকে কিছুই নেই—পাথর-বাঁধানো চাতাল বা মেঝের মত তলাটা সব শেষ, আর কিছু নেই। ইংরাজিতে যাকে বলে dead end, ও সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। সুশীল হতভম্ব হয়ে গেল।

যারা এ সিঁড়ি গেঁথেছিল তারা কী জন্যে এত সতর্কতার সঙ্গে এত কষ্ট করে সিঁড়ি গেঁথেছিল যদি সে সিঁড়ি কোথাও না পৌঁছে দেয়?

চাতালের দৈর্ঘ্য হাত-তিনেক, প্রস্থ হাত আড়াই। খুব একখানা বড় পাথরের দ্বারা যেন সমস্ত মেঝে বা চাতালটা বাঁধানো। তন্ন-তন্ন করে খুঁজে চাতালের কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সুশীল বাধ্য হয়ে বোকা বনে উঠে চলে এসে জামাতুল্লা ও সনৎকে বললে। ওরা পরদিন লুকিয়ে তিনজনে সেখানে গেল, সিঁড়ি দিয়ে নামলে। সামনে সেই চাতাল। সিঁড়ির শেষ।

জামাতুল্লা বললে—এ কী তামাশা আছে বাবুজি—আমি তো বেকুব বনে গেলাম!

তিন জনে মিলে নানাভাবে পাথরটা দেখলে, এখানে টিপলে ওখানে চাপ দিলে—হিমালয় পর্ব্বতের মতই অনড়। কোথাও কোন চিহ্ন নেই পাথরের গায়ে। মিনিট কুড়ি কেটে গেল। মিনিট কুড়ি সেই অন্ধকার ভূগর্ভে কাটানো বিপজ্জনকও বটে, অস্বস্তিকরও বটে।

সুশীল বললে—ওঠ সবাই, আর না এখানে।

হঠাৎ জামাতুল্লা বলে উঠল—বাবুজি, একটা কথা আমার মনে এসেছে।

দুজনেই বলে উঠল—কী? কী?

—গাঁতি দিয়ে এই পাথরখানা খুঁড়ে তুলে দেখলে হয়। কী বলেন?

তখন ওরাও ভাবলে এই সামান্য কথাটা। যে কথা, সেই কাজ। জামাতুল্লা লুকিয়ে তাঁবু থেকে গাঁতি নিয়ে এল। পাথর খুঁড়ে শাবলের চাড় দিয়ে তুলে ফেলে যা দেখলে তাতে ওরা যেমন আশ্চর্য হল তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবার সিঁড়ির ধাপ। কিন্তু দশ ধাপ নেমে গিয়ে সিঁড়ি বেঁকে গেল—আবার সামনে চৌরশ পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গ বোজানো। মাথার ওপরকার পাথরে পূর্ব্ববৎ চিহ্ন পাওয়া গেল। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে আবার সে পাথর ফাঁক হল। আবার সিঁড়ি। কিন্তু কিছুদূর নেমে আবার পাথর-বাঁধানো চাতাল—আবার সেই dead end—নির্দ্দেশহীন শূন্য।

অমানুষিক পরিশ্রম। আবার পাথর তুলে ফেলা হল—আবার সিঁড়ি। সুশীল বললে—যারা এ গোলকধাঁধা করেছিল, তারা খানিকদূর গিয়ে একবার একখানা পাথর সোজা করে পথ বুজিয়েছে, তার পরেরটা সিঁড়ির মত পেতে বুজিয়েছে—এই এদের কৌশল, বেশ বোঝা যাচ্ছে। জামাতুল্লা ওদের সতর্ক করে দিলে। বললে—বাবুজী, অনেকটা নিচে নেমে এসেছি। খারাপ গ্যাস থাকতে পারে, দম-বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারি সবাই। তাঁবুতেও সন্দেহ করবে। চলুন আজ ফিরি।

তাঁবুতে ফিরবার পথে জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, ইয়ার হোসেনকে এর খবর দেবেন না।

—কেন ?

—কী জানি কী আছে ওর মনে। যদি রত্নভাণ্ডারের সন্ধানই পাওয়া যায়, তবে ইয়ার হোসেন কী করবে বলা যায় না। ওর সঙ্গে লোক বেশি। প্রত্যেকে গুণ্ডা ও বদমাইস। মানুষ খুন করতে ওরা এতটুকু ভাববে না। ওদের কাছে মশা টিপে মারাও যা, মানুষ মারাও তাই।

ইয়ার হোসেনের মন যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। তাঁবুতে ফিরতে সে বললে—কোথায় ছিলে তোমরা ?

সুশীল বললে—ফটো নিচ্ছিলাম।

ইয়ার হোসেন হেসে বললে—ফটো নিয়ে কী হবে, যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা—তার সন্ধান কর।

ইয়ার হোসেনের জনৈক মালয় অনুচর সেদিন দুপুরে একটা পাথরের বৃষমূর্ত্তি কুড়িয়ে পেলে গভীর বনের মধ্যে। খুব ছোট, কিন্তু অতটুকু মূর্ত্তির মধ্যেও শিল্পীর শিল্পকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় বর্ত্তমান।

রাত্রে জ্যোৎস্না উঠল।

সুশীল তাঁবু থেকে একটু দূরে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসল। ভাবতে ভাল লাগে এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপময় রাজ্যের অতীত গৌরবের দিনের কাহিনী। রাত্রের যামঘোষী দুন্দুভি যেন বেজে উঠল—ধারাযন্ত্রে স্নান সমাপ্ত করে, কুঙ্কুমচন্দনলিপ্ত দেহে দিগ্বিজয়ী নৃপতি চলেছেন অন্তঃপুরের অভিমুখে। বারবিলাসিনীরা তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছে এইমাত্র—তারাও ফিরছে তাঁর পিছনে পিছনে, কারো হাতে রজত কলস, কারো হাতে স্ফটিক কলস…

আধো-অন্ধকারে কালো মত কে একটা মানুষ বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে সুশীলের দিকে ছুটে এল আততায়ীর মত—সুশীল চমকে উঠে একখানা পাথর ছুঁড়ে মারল। মানুষটা পড়েই জানোয়ারের মত বিকট চীৎকার করে উঠল—তারপর আবার উঠে আবার ছুটল ওর দিকে। সুশীল ছুট দিলে তাঁবুর দিকে।

ওর চিৎকার শুনে তাঁবু থেকে সনৎ বেরিয়ে এল। ধাবমান জিনিসটাকে সে গুলি করলে। সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দেখা গেল একটা ওরাং-ওটাং।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেন দু-জনে তিরস্কার করলে সুশীলকে।

এই বনে যেখানে-সেখানে একা যাওয়া উচিত নয়, তারা কতবার বলবে একথা ? কত জানা-অজানা বিপদ এখানে পদে পদে !

পরদিন ছুতো করে সুশীল ও জামাতুল্লা আবার বেরিয়ে গেল। বনের মধ্যে সেই গুহায়। সনৎকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। কেন না সকলে গেলে সন্দেহ করবে এরা।

আবার সেই পরিশ্রম। আরও দুধাপ সিঁড়ি ও দুটো চাতাল ওরা ডিঙিয়ে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন আর কাজ হয় না। আবার তার পরের দিন কাজ হল শুরু। এই-রকম আরও তিন চার দিন কেটে গেল।

একদিন সনৎ বললে—দাদা, তোমরা আর সেখানে দিনকতক যেও না।

সুশীল বললে—কেন ?

—ইয়ার হোসেন সন্দেহ করছে। সে রোজ বলে, এরা বনের মধ্যে কী করে। এত ফটো নেয় কিসের ?

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আর একদিনের কাজ বাকি। ওর শেষ না দেখে আমি আসতে পারছি নে।

—একা যাও—দু-জনে যেও না। জোট বেঁধে গেলেই সন্দেহ করবে। হাতিয়ার নিয়ে যেও।

—তুই তাঁবুতে থেকে নজর রাখিস ওদের ওপর। কাল খুব সকালে আমি বেরিয়ে যাব।

সুশীল তাই করলে। প্রায় ষাট ফুট নিচে তখন শেষ চাতাল পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেদিন দুপুর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে সে চাতালটা ভেঙে ফেললে।

তারপর যা দেখলে তাতে সুশীল একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ল।

সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে ক্ষুদ্র একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে।

কক্ষের মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য।

টর্চের আলোয় দেখা গেল কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি পাষাণবেদিকার ওপর এক পাষাণ নারীমূর্ত্তি—বিলাসবতী কোন নর্ত্তকী যেন নাচতে নাচতে হঠাৎ বিটঙ্কবেদিকার ওপর পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে কি দেখে।

একি !

এর জন্যে এত পরিশ্রম করে এরা এসব কাণ্ড করেছে !

সুশীল আরও অগ্রসর হয়ে দেখতে গেল।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। পাথরের বেদীর ওপর সেই চিহ্ন আবার খোদাই করা। ঘরের মধ্যে টর্চ ঘুরিয়ে দেখলে। তাকে ঘর বলা যেতে পারে, একটা বড় চৌবাচ্চাও বলা যেতে পারে। স্যাঁতসেতে ছাদ, স্যাঁতসেতে মেঝে—পাতাল-পুরীর এই নিভৃত অন্ধকার গহ্বরে এ প্রস্তরময়ী নারী-মূর্ত্তির রহস্য কে ভেদ করবে ?

কিন্তু কী অদ্ভুত মূর্ত্তি ! কটিতে চন্দ্রহার, গলদেশে মুক্তমালা, প্রকোষ্ঠে মণিবলয়। চোখের চাহনি সজীব বলে ভ্রম হয়।

সেদিনও ফিরে গেল। জামাতুল্লাকে পরদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল—তন্ন তন্ন করে চারিদিক খুঁজে দেখলে ঘরের, কোথাও কিছু নেই।

জামাতুল্লা বললে—কী মনে হয় বাবুজি ?

—তোমার কী মনে হয় ?

—এই সিঁড়ি আর চাতাল, চাতাল আর সিঁড়ি—ঘাট ফুট গেঁথে মাটির নিচে শেষে নাচনে-ওয়ালী পুতুল! ছোঃ বাবুজি—এর মধ্যে আর কিছু আছে।

—বেশ, কী আছে, বার কর। মাথা খাটাও।

—তা তো খাটাব—এদিকে ইয়ার হোসেনের দল যে ক্ষেপে উঠেছে। কাল ওরা কী বলেছে জানেন ?

—কী রকম ?

—আর দুদিন ওরা দেখবে—তারপর নাকি এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে। তা ছাড়া আর এক ব্যাপার। আপনাকেও ওরা সন্দেহ করে। বনের মধ্যে রোজ আপনি কী করেন! আমায় প্রায়ই জিগ্যেস করে।

—তুমি কী বল ?

—আমি বলি বাবুজি ফটো তোলে, ছবি আঁকে। তাতে ওরা আপনাকে ঠাট্টা করে। ওসব মেয়েলী কাজ।

—যারা এই নগর গড়েছিল, পুতুল তৈরি করেছিল, পাথরে ছবি এঁকেছিল—তারা পুরুষ মানুষ ছিল জামাতুল্লা। ইয়ার হোসেনের চেয়ে অনেক বড় পুরুষ ছিল—বলে দিও তাকে।

সুশীলকে রেখে জামাতুল্লা ফিরে যেতে চাইলে। নতুবা ইয়ার হোসেনের দল সন্দেহ করবে। যাবার সময় সুশীল বললে—কোন উপায়ে এখানে একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পার ? টর্চ জালিয়ে কতক্ষণ থাকা যায় ? আর কিছু না থাক সাপের ভয়ও তো আছে।

জামাতুল্লা বললে—আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি লণ্ঠন নিয়ে বাবুজি। আপনি ওপরে উঠে বসুন, এ পাতালের মধ্যে একা থাকবেন না—

সুশীল বললে—না, তুমি যাও—আমি এখানেই থাকব। পকেটে একটুকরো মোমবাতি এনেছি—তাই জ্বালাব।

একটুকরো বাতি জালিয়ে সুশীল ঘরটার মধ্যে বসে ভাবতে লাগল। বাইরে এত বড় রাজ্য যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, কোন জিনিস গোপন করবার জন্যেই তারা এই পাতালপুরী তৈরী করে-ছিল, এত কষ্ট স্বীকার করে নর্ত্তকী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

হঠাৎ নর্ত্তকী পুতুলটার দিকে ওর দৃষ্টি পড়তে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কী ব্যাপার এটা ?

এতক্ষণ মূর্ত্তিটার যতখানি তার দিকে ছিল, সেটা যেন সামান্য একটু পাক খেয়ে খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সুশীল চোখ মুছে আবার চাইলে।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। এই বাতিটার সামনে ছিল ওই পা-খানা—এখন পায়ের হাঁটুর পেছনের অংশ দেখা যায় কী করে? সে তো এতটুকু নড়ে নি নিজে, যেখানে—সেখানেই বসে আছে।

সুশীলের ভয় হল। শ্মশানপুরীর ভূগর্ভস্থ কক্ষ, কত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দৈত্যদানোর দল জমা হয়ে আছে এসব জায়গায়, কে বলতে পারে? কিসে মৃত্যু আর কিসে জীবন, এ বার্ত্তা পৌঁছে দেবার লোক নেই। সরে পড়াই ভাল।

এমন সময় ওপর থেকে লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল, পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে ঘরের মধ্যে ওপর থেকে উঁকি মেরে বললে—বাবুজি, ঠিক আছেন?

—তা আছি। ঘরের মধ্যে নামো তো জামাতুল্লা—

জামাতুল্লা ঘরের মেঝেতে নেমে ওর পাশে দাঁড়ালো। সুশীল ওকে মূর্ত্তির ব্যাপারটা দেখিয়ে বললে—এখন তুমি কী মনে কর?

—কিছু বুঝতে পারছি নে বাবুজি—খুব তাজ্জব কথা!

—তুমি থাক এখানে—বোস—

কিন্তু জামাতুল্লা দাঁড়াল না। দুজনে এখানে বসে থাকলে ইয়ার হোসেনের দলের সন্দেহ ঘোরালো রকম হয়ে উঠবে, সে থাকতে পারবে না। জামাতুল্লা চলে যাবার পর সুশীল অনেকক্ষণ মূর্ত্তিটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মূর্ত্তিটা এবার বেশ ঘুরে গিয়েছে, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ওর আগের ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে আসার পর থেকে, এখন ভয়ের চেয়ে কৌতূহল বেশি।

খুব একটু একটু করে ঘুরছে, ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চের মতই, মূর্ত্তির পদতলস্থ বিটঙ্কবেদিকা।

কেন? কী উদ্দেশ্যে? অতীত শতাব্দীগুলো মূক হয়ে রইল, এর জবাব মেলে না। বেলা গড়িয়ে এল, সুশীলের হাতঘড়িতে বাজে পাঁচটা।

হঠাৎ সুশীল চেয়ে দেখলে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

নর্ত্তকী-মূর্ত্তির সরু সরু আঙুলগুলির মধ্যে একটা আঙুল একটি মুদ্রা রচনা করার দরুন অন্য সব আঙুল থেকে পৃথক এবং একদিকে কী যেন নির্দ্দেশ করবার ভঙ্গিতে ছিল। এবার যেন সে আঙুলের ছায়া পড়েছে দেওয়ালের এক বিশেষ স্থানে।

এমন ভঙ্গিতে পড়েছে যেন মনে হয় মূর্ত্তিটি তর্জ্জনী-অঙ্গুলির দ্বারা ভিত্তিগাত্রের একটি স্থান নির্দ্দেশ করছে।

তখনি একটা কথা মনে হল সুশীলের। লণ্ঠনের আলোর দ্বারা এ ছায়া তৈরি হয়েছে, না কোন গুপ্ত ছিদ্রপথে দিবালোক প্রবেশ করেছে ঘরের মধ্যে?

তা-ই বলে মনে হয়, লণ্ঠনের আলোর কৃত্রিম ছায়া এ নয়। ও লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে দেখলে—তখন অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্যেও তর্জ্জনীর ছায়া ভিত্তিগাত্রে পড়ে একটা স্থান যেন নির্দ্দেশ করছে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে উঠে ও জায়গাটা দেখতে গেল।

দেওয়ালের সেই জায়গা একেবারে সমতল, চিহ্নহীন—চারিপাশের অংশের সঙ্গে পৃথক করে নেওয়ার মত কিছুই নেই সেখানে। তবুও সে নিরাশ না হয়ে দেওয়ালের সেই জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে দেখতে গেল।

হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল। ঠিক যেখানে আঙুলের অগ্রভাগ শেষ হয়েছে সেই স্থানের খানিকটা যেন বসে গেল—অর্থাৎ ঢুকে গেল ভেতরের দিকে। একটা শব্দ হল পেছনের দিকে—ও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে বিটঙ্কবেদিকার তলাটা যেন ঈষৎ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও ফিরে এসে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে, গোলাকার বেদিকাটি তার নর্ত্তকী-মূর্ত্তিটা-সুদ্ধ যেন একটা পাথরের ছিপি। বড় বোতলের মুখে যেমন কাঁচের স্টপার বা ছিপি থাকে, এ যেন পাষাণ-নির্ম্মিত বিরাট এক স্টপার। কিসের চাড় লেগে স্টপারের মুখ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও নর্ত্তকী-মূর্ত্তির পাদদেশে এবং গ্রীবায় দুই হাত দিয়ে মূর্ত্তিটাকে একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সেটা সবসুদ্ধ বেশ আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। কয়েকবার ঘুরবার পরে ক্রমেই তার তলার ফাঁক চওড়া হয়ে আসতে লাগল। কী কৌশলে প্রাচীন শিল্পী পাথরের উপরটাকে ঘূর্ণায়মান করে তৈরি করেছিল?

এই মূর্ত্তিসুদ্ধ বেদিকা টেনে তোলা তার একার সাধ্যে কুলুবে না। জামাতুল্লা ও সনৎ দু'জনকেই আনতে হবে কোন কৌশলে সঙ্গে করে, ইয়ার হোসেনের দলের অগোচরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার বিলম্ব নেই। বহু দিন-রাত্রির ছায়া অতীতের এ নিস্তব্ধ কক্ষে জীবনের সুখ ধ্বনিত করে নি, এখানে গভীর নিশীথ রাত্রির রহস্য হয়ত মানুষের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক হবে না, মানুষের জগতের বাইরে এরা।

সুশীল লণ্ঠন হাতে উঠে এল আঁধার পাতালপুরীর কক্ষ থেকে। তাঁবুতে ঢুকবার পথে ইয়ার হোসেন বড় ছুরি দিয়ে পাখির মাংস ছাড়াচ্ছে।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—কোথায় ছিলেন?

—ছবি আঁকতে, মিঃ হোসেন।

—লণ্ঠন কেন?

—পাছে রাত হয়ে যায় ফিরতে। বনের মধ্যে আলো থাকলে অনেক ভাল।

—এত ছবি এঁকে কী হয় বাবু?

—ভাল লাগে।

—আসল ব্যাপারের কী? জামাতুল্লা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। আমি ওকে মজা দেখিয়ে দেব!

—আমরা সকলেই চেষ্টা করছি! ব্যস্ত হবেন না মিঃ হোসেন—

—আমি আর পাঁচদিন দেখব। তারপর এখান থেকে চলে যাব—কিন্তু যাবার আগে জামাতুল্লাকে দেখিয়ে যাব সে কার সঙ্গে জুয়োচুরি করতে এসেছিল!

—জামাতুল্লার কী দোষ? আপনি বরং আমাকে দোষ দিতে পারেন—

—আরে আপনি তো ছবি-আঁকিয়ে পুরুষ মানুষ। এসব কাজ আপনার না।

সুশীল রাত্রে চুপি চুপি জামাতুল্লাদের নর্ত্তকী পুতুলের ঘটনা সব বললে। ওদের দু-জনকেই যেতে হবে, নতুবা ছিপি উঠবে না।

জামাতুল্লা বললে—কিন্তু আমাদের দু-জনের একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয় বাবুজি।

—কেন?

—জানেন না,—এর মধ্যে নানারকম ষড়যন্ত্র চলছে। ওরা আপনাদের চেয়ে আমাকেই দোষ দেবে বেশি। আপনাকে ওরা নিরীহ, গোবেচারি বলে ভাবে—

—সেটা অন্যায়।

—আপনারা ভাল মানুষ, আমার হাতের পুতুল—পুতুল যেমন নাচায়, তেমনি আপনারা আমার হাতে—

শেষের কথাটা শুনে সুশীলের আবার মনে পড়ল নর্ত্তকী-মূর্ত্তির কথা। কাল হয়ত বেরুনো যাবে না, ইয়ার হোসেনের কড়া নজরবন্দীর দরুন। আজই রাত্রে অন্য দল ঘুমুলে সেখানে গেলে ক্ষতি কী?

সনৎকে বললে—সনৎ, তৈরি হও। আজ রাত্রে হয় আমাদের জীবন, নয়তো আমাদের মরণ। পাতালপুরীর রহস্য আজ ভেদ করতেই হবে। আজ আঁধার রাত্রে চুপি চুপি বেরুবে আমার সঙ্গে—দিনের আলোয় সব ফাঁস হয়ে যাবে।

জামাতুল্লা বললে—কেউ টের না পায় বাবুজি, জুতো হাতে করে সব যাবেন কিন্তু।

আহারাদির পর্ব্ব মিটে গেল। দাবানল জ্বলে উঠেছে আজ ওদের মনে, বনের সাময়িক দাবানলকেও ছাপিয়ে তার শিখা সমস্ত মনের আকাশ ব্যেপে বেড়ে উঠল।

দুটো রাইফেল, একটা রিভলভার, একটা শাবল, একটা গাঁতি, খানিকটা দড়ি, চার-পাঁচটা মোমবাতি, কিছু খাবার জল, এক শিশি টিংচার আইডিন, খানকতক মোটা রুটি—তিনজনের মধ্যে এগুলো ভাগ করে নিয়ে রাত একটার পরে ওরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরুল।

ইয়ার হোসেনের একজন মালয় অনুচর উল্টোমুখে দাঁড়িয়ে 'বলো' (রামদাও) হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে এরা বুক ঘেঁষে চলে এল···সে লোকটা টের পেলে না।

সনৎ বললে—আমি সে পুতুলটা একবার দেখব—

অদ্ভুত রাত্রি! বনের মাথায় মাথায় অগণিত তারা, বহুকালের সুপ্ত নগরীর রহস্যে নিশীথ রাত্রির অন্ধকার যেন থম্‌-থম্‌ করছে, সমস্ত ধ্বংসস্তূপটি যেন মুহূর্ত্তে শহর হয়ে উঠতে পারে—ওর অগণিত নরনারী নিয়ে। লতাপাতা, ঝোপ-ঝাপ, মহীরুহের দল খাড়া হয়ে সেই পরম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অন্ধকারে একটা সর-সর শব্দ হতে লাগল সামনের মাটিতে।

সকলে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে টর্চ টিপলে—প্রকাণ্ড একটা

অজগর সাপ আস্তে আস্তে ওদের পাঁচ হাত তফাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলে পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল, সাপটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ওরা আবার চলল।

গহ্বরের মুখে ওরা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল, তিনজনে মিলে সেগুলো সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

সনৎ বললে—এ তো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি—

কিন্তু পাতালপুরীর কক্ষের সে নর্ত্তকী-মূর্ত্তিটা দেখে ওর মুখে কথা সরল না। শিল্পীর অদ্ভুত শিল্পকৌশলের সামনে ও যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

সুশীল বললে—শুধু এই মূর্ত্তিটি কিউরিও হিসেবে বিক্রী করলে দশহাজার টাকার যে-কোন বড় শহরের মিউজিয়ম কিনে নেবে—তবে, আমাদের দেশে নয়—ইউরোপে।

জামাতুল্লা বললে- ধরুন বাবুজি নাচনেওয়ালী পুতুলটা সবাই মিলে—পাক খাওয়াতে হবে একে বারকয়েক এখনও।

মিনিট দুই সবাই মিলে পাক দিয়ে মূর্ত্তিটাকে ঘোরালো যেমন স্টপার ঘোরায় বোতলের মুখে। তারপর সবাই সন্তর্পণে মূর্ত্তিটাকে ধরে উঠিয়ে নিলে। স্টপারের মতই সেটা খুলে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বিটঙ্কবেদীর নিচের অংশে বার হয়ে পড়ল গোলাকার একটা পাথরের চৌবাচ্চা। সুশীল উঁকি মেরে দেখে বললে—টর্চ ধর, খুব গভীর বলে মনে হচ্ছে—

টর্চ ধরে ওরা দেখলে চৌবাচ্চা অন্তত সাত ফুট গভীর। তার তলায় কী আছে ওপর থেকে ভাল দেখা যায় না।

সনৎ বললে—আমি লাফ দিয়ে পড়ব দাদা?

জামাতুল্লা বারণ করলে। এ সব পুরোনো কূপের মধ্যে বিষধর সর্প প্রায়ই বাসা বাঁধে, যাওয়া সমীচীন হবে না।

দু-একটা পাথর ছুঁড়ে মেরে ওরা দেখলে, কোন সাড়াশব্দ এল না আধ-অন্ধকার কূপের মধ্যে থেকে। তখন জামাতুল্লাই ঝুপ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ওর মধ্যে।

কিছুক্ষণ তার আর কোন সাড়া নেই।

সুশীল ও সনৎ অধীর কৌতূহলের সঙ্গে বলে উঠল—কী—কী—কী দেখলে?

তবুও জামাতুল্লার মুখে কথা নেই। সে যেন কি হাতড়ে বেড়াচ্ছে চৌবাচ্চার তলায়। একটু অদ্ভুতভাবে হাতড়াচ্ছে—একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছু হঠে আসছে।

সুশীল বললে—কী হল হে? পেলে কিছু দেখতে?

জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, এর মধ্যে কিছু নেই—

—কিছু নেই?

—না বাবুজি। একেবারে ফাঁকা—

—তবে তুমি ওর মধ্যে কী করছ জামাতুল্লা?

—এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। নেমে এসে দেখুন—

সুশীল ও সনৎ সন্তর্পণে একে-একে পাথরের চৌবাচ্চাটির মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। জামাতুল্লা দেখালে—এই দেখুন বাবুজি, এই লাইন ধরে একবার সামনে, একবার পিছনে গিয়ে দেখুন—তা হলেই বুঝতে পারবেন—

—সামনে পেছনে গিয়ে কী হবে?

সুশীল লক্ষ্য করে দেখলে চৌবাচ্চার ডানদিকের দেওয়ালে একটা কালো রেখা আছে, সেইটে ধরে যদি সামনে বা পেছনে যাওয়া যায় তবে চৌবাচ্চার তলাটা একবার নামে, একবার ওঠে। ছেলেদের 'see-saw' খেলার তক্তাটার মত।

সনৎ বললে—ব্যাপারটা কী?

সুশীল বললে—অর্থাৎ এটা যদি কোনরকমে ওঠানো যায়, তবে এর মধ্যে আরো কিছু রহস্য আছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

জামাতুল্লা বললে—বাবু, গাঁতি দিয়ে তলা ভেঙে ফেলতে পারি তো—অন্য কোন পথ যদি না পাওয়া যায়। কিন্তু আজ থাকলে হত না বাবুজি? বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ—সকাল হয়-হয়—

হঠাৎ সুশীল চৌবাচ্চার এক জায়গায় টর্চের আলো ফেলে বলে উঠল—এই ভাখ সেই চিহ্ন—

সনৎ ও জামাতুল্লা সবিস্ময়ে দেখলে, চৌবাচ্চার কালো রেখার ওপরে উত্তরদিকের কোণে, দু-খানা পাথরের সংযোগস্থলে তাদের অতিপরিচিত সেই চিহ্নটি আঁকা।

সুশীল বললে—হদিস পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে—

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ এই চিহ্নের ওপর টিপলেই চৌবাচ্চার তলার পাথরখানা একদিকে খুব বেশি কাত হয়ে, ভেতরে কি আছে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল। আজ থাক, চল।

জামাতুল্লাও তাতে মত দিলে। সবাই মিলে তাঁবুলে ফিরে এল যখন, তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্য 'বলো' হাতে তাঁবুর দ্বারে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। জামাতুল্লার ইঙ্গিতে সুশীল ও সনৎ উপুড় হয়ে পড়ে বুকে হেঁটে নিজেদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

জামাতুল্লা বললে—ঘুমিয়ে পড়ুন বাবুজিরা—কিন্তু বেশি বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুবেন না, আমি উঠিয়ে দেব সকালেই। নইলে ওরা সন্দেহ করবে।

সুশীল বললে—আমাদের অবর্ত্তমানে ওরা ঘরে ঢোকে নি এই রক্ষে—

সনৎ অবাক হয়ে বললে—কী করে জানলে দাদা?

—দেখবে? এই দেখ! তাঁবুর দোরে সাদা বালি ছড়ানো, যে-কেউ এলে পায়ের দাগ পড়ত। তা পড়ে নি।

ওরা যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

সুশীলকে কে বললে—আমার সঙ্গে আয়।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষের পিছু পিছু ও গভীর বনের কতদূর চলল। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্যগণ ঘোর তন্দ্রাভিভূত, উষার আলোকের ক্ষীণ আভাসও দেখা যায় না পূর্ব্ব দিগন্তে। বৃক্ষলতা স্তব্ধ, স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন। সারি সারি প্রাসাদ একদিকে, অন্যদিকে প্রশস্ত দীর্ঘিকার টলটলে নির্ম্মল জলরাশির বুকে পদ্ম ফুল ফুটে আছে। সেই গভীর বনে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে দেউলে দেউলে ত্রিমূর্ত্তি মহাদেবের পূজা হচ্ছে। সুগন্ধ দীপবর্ত্তিকার আলোকে মন্দিরাভ্যন্তর আলোকিত। প্রাসাদের বাতায়ন বলভিতে শুকসারী তন্দ্রামগ্ন।

সুশীল বললে—আমায় কোথা নিয়ে যাবেন ?

—সে কথা বলব না। ভয় পাবি—

—তবুও শুনি, বলুন—

—বহুদিনের বহু ধ্বংস, অভিশাপ, মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাসে এ পুরীর বাতাস বিষাক্ত। এখানে প্রবেশ করবার দুঃসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে।

—কী ?

—একজনের প্রাণ। সমুদ্রমেখলা এ দ্বীপের বহু শতাব্দীর গুপ্ত কথা ঘন বন ঢেকে রেখেছিল। ভারত মহাসমুদ্র স্বয়ং এর প্রহরী, দেখতে পাও না ?

—আজ্ঞে, তা দেখছি বটে।

—তবে সে রহস্য ভেদ করতে এসেছ কেন ?

—আপনি তো জানেন সব।

—সম্রাটের ঐশ্বর্য্য গুপ্ত আছে এর মধ্যে। কিন্তু সে পাবে না। যে অদৃশ্য আত্মারা তা পাহারা দিচ্ছে, তারা অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত হিংস্রুক। কাউকে তারা নিতে দেবে না। তবে তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করব না আমি—রহস্য নিয়ে যাও, অর্থ পাবে না। যা পাবে তা সামান্য। তারই জন্যে প্রাণ দিতে হবে।

—আপনি বিষ্ণুমুনি ?

—মূর্খ! আমি এই নগরীর অধিদেবতা। ধ্বংসস্তূপ পাহারা দিচ্ছি শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনেকদিন পরে তুমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছ—আটশ বছর আগে তোমাদের সাহসী পূর্ব্বপুরুষরা অস্ত্র হাতে এখানে এসে রাজ্যস্থাপন করেন। দুর্ব্বল হাতে তাঁরা খড়্গ ধরতেন না। তোমরা সে দেশ থেকেই এসেছ কি ? দেখলে চেনা যায় না কেন ?

—সেটা আমাদের অদৃষ্টের দোষ, আমাদের ভাগ্যলিপি।

তারপরেই সব অন্ধকার। সুশীল সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন চলেছে…চলেছে…মাথার ওপর কৃষ্ণা নিশীথিনীর জলজ্বলে নক্ষত্রভরা আকাশ।

পুরুষটি বললেন—সাহস আছে? তুমি ভারতবর্ষের সন্তান—

—নিশ্চয়ই, দেব।

নগরী বহুদিন মৃতা, কিন্তু বহু যুগের পুরাতন কৃষ্ণাগুরুর ধূপগন্ধে আমোদিত অরণ্যতরুর ছায়ায় ছায়ায় অজানা পথযাত্রার যেন শেষ নেই।

বিশাল পুরী, প্রেতপুরীর সমান নিস্তব্ধ। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষে, দামী নীলাংশুকের আস্তরণে ঢাকা স্বর্ণ-পর্য্যঙ্ক কোন অপরিচিতের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। সুশীলের বুক গুরুগুরু করে উঠল, গৃহের রত্নপ্রস্তরের ভিত্তিতে যেন অমঙ্গলের লেখা। ভবনদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে এখনি যেন কোন্ বিভীষণা অপদেবীর বিকট মূর্ত্তি!

পুরুষ বললেন—ঐ শোন—

সুশীল চমকে উঠল। যেন কোন নারীকণ্ঠের শোকার্ত্ত চিৎকারে নিশীথ নগরীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। সে নারীর কণ্ঠস্বরকে সে চেনে। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর। খুব নিকট-আত্মীয়ার বিলাপধ্বনি। সুশীলের বুক কেঁপে উঠল। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে কে ডাকলে—বাবুজি—বাবুজি—

তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ঘামে ভেসে গিয়েছে। জামাতুল্লা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। দিনের আলো ফুটছে তাঁবুর বাইরে।

জামাতুল্লা বললে—উঠুন বাবুজি।

সুশীল বিমূঢ়ের মত বললে—কেন?

—ভোর হয়েছে। ইয়ার হোসেনের লোক এখনও ওঠে নি—আমাদের কেউ কোন সন্দেহ না করে। সনৎবাবুকে ওঠাই—

একটু বেলা হলে ইয়ার হোসেন উঠে ওদের ডাকালে। বললে—পরশু এখান থেকে তাঁবু ওঠাতে হবে। জাঙ্ক্‌ওয়ালা চীনেম্যান এসে বসে আছে। ও আমার নিজের লোক। ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর থাকতে চাইছে না। এখানে আপনারা এলেন ফটো তুলতে আর ছবি আঁকতে। এত পয়সা খরচ এর জন্যে করি নি।

সুশীল বললে—যা ভাল বোঝেন মিঃ হোসেন।

সনৎ বললে—তাহলে দাদা, আমাদের সেই কাজটা এই দু-দিনের মধ্যে সারতে হবে—

ইয়ার হোসেন সন্দেহের সুরে বললে—কি কাজ?

সুশীল বললে—বনের মধ্যের একটা মন্দিরের গায়ে পাথরের ছবি আছে, সেটা আমি আঁকছি। সনৎ ফটো নিচ্ছে তার।

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে—ওই করতেই আপনারা এসেছিলেন আর কি! করুন যা হয় এই দু-দিন।

সনৎ বললে—তাহলে চল দাদা আমরা সকাল-সকাল খেয়ে রওনা হই।

ইয়ার হোসেনের অনুমতি পেয়ে ওদের সাহস বেড়ে গেল। দিন দুপুরেই ওরা দু-জন রওনা হয়ে গেল—শাবল, গাঁতি, টর্চ ওরা কিছুই আনে নি, সিঁড়ির মুখের প্রথম ধাপে

রেখে এসেছে। শুধু ক্যামেরা আর রিভলভার হাতে বেরিয়ে গেল।

জামাতুল্লা গোপনে বললে—আমি কোন ছুতোয় এর পরে যাব। একসঙ্গে সকলে গেলে চালাক ইয়ার হোসেন সন্দেহ করবে। আজ কাজ শেষ করতে হবে মনে থাকে যেন, হয় এস্‌পার নয় তো ওস্‌পার। আর সময় পাব না।

সনৎ বললে—মনে থাকে যেন এ-কথা। আজ আর ফিরব না শেষ না দেখে।

সুশীলের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল সনতের কথায়। সনতের মুখের দিকে ও চাইলে। কেন সনৎ হঠাৎ এ কথা বললে?

আবার সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রহস্যময় গহ্বরে সুশীল ও সনৎ এসে দাঁড়াল। আসবার সময় সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে ওরা গাঁতি ও টর্চ নিয়ে এসেছে। পাথরের নর্ত্তকী মূর্ত্তি দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় কাত করে রাখা হয়েছে। যেন জীবন্ত পরী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। সুশীল সেদিকে চেয়ে বললে—আর কিছু না পাই, এই পুতুলটা নিয়ে যাব। সব খরচ উঠে এসেও অনেক টাকা থাকবে—শুধু ওটা বিক্রী করলে।

তারপর দু-জনে নিচের পাথরের চৌবাচ্চাটাতে নামল।

সনৎ বললে—উত্তর কোণের গায়ে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ দাদা!

—এখন কিছু কোরো না, জামাতুল্লাকে আসতে দাও।

সনৎ ছেলেমানুষ, সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাংলা-দেশের পাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করে একদিন যে জীবনে এমন একটা রহস্যসঙ্কুল পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে, কবে সে এ কথা ভেবেছিল? সুশীল কিন্তু বসে বসে অন্য কথা ভাবছিল।

গত রাত্রের স্বপ্নের কথা তার স্পষ্ট মনে নেই, আবছাভাবে যতটুকু মনে আছে, সে যেন গত রাত্রে এক অদ্ভুত রহস্যপুরীর পথে পথে কার সঙ্গে অনির্দ্দেশ যাত্রায় বার হয়েছিল, কত কথা যেন সে বলেছিল, সব কথা মনে হয় না। তবুও যেন কি এক অমঙ্গলের বার্ত্তা সে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে, কী সে বার্ত্তা, কার সে অমঙ্গল কিছুই স্পষ্ট মনে নেই—অথচ সুশীলের মন ভার-ভার, আর যেন তার উৎসাহ নেই। এ কাজে ফিরবার পথও তো নেই।

ওপরের ঘর থেকে জামাতুল্লা উঁকি মেরে বললে—সব ঠিক।

—এসেছ?

—হাঁ বাবুজি। অনেকটা দড়ি এনেছি লুকিয়ে—

—নেমে পড়।

—আপনার ক্যামেরা এনেছেন?

—কেন বল তো?

—ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি দিতে হলে ক্যামেরাতে ফটো তুলে নিয়ে যেতে হবে—

—সব ঠিক আছে।

জামাতুল্লা ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার অল্পক্ষণ পরেই সনৎ হঠাৎ কি ভেবে দেওয়ালের উত্তর কোণের সে চিহ্নটা চেপে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চৌবাচ্চার তলা একদিকে কাত হয়ে উঠতেই ফাঁক দিয়ে সনৎ নিচের দিকে অতলস্পর্শ অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ল।

সুশীল ও জামাতুল্লা দুজনেই চমকে চিৎকার করে উঠল। অমন অতর্কিতভাবে সনৎ লাফ মারতে গেল কেন, ওরা ভেবে পেল না।

কিন্তু লাফ মারলে কোথায়?

জামাতুল্লা সভয়ে বললে—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বাবুজি!

তারপর ওরা দু-জনেই কিছু না ভেবেই পাথরের চৌবাচ্চার তলার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল।

ওরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে।

সনৎ অন্ধকারের ভেতর থেকেই বলে উঠল—দাদা, টর্চ জ্বালো আগে, জায়গাটা কি রকম দেখতে হবে—

ওরা টর্চ জ্বেলে চারদিক দেখে অবাক হয়ে গেল। ওরা একটা গোলাকার ঘরের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে—ঘরের দু-কোণে দুটো বড় পয়োনালীর মত কেন রয়েছে ওরা বুঝতে পারলে না। ছাদের যে জায়গায় কড়িকাঠের অগ্রভাগ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার কথা, সেখানে দুটো বড়-বড় পাথরের গাঁথুনি পয়োনালী, একটা এদিকে, আর একটা ওদিকে। সমস্ত ঘরটায় জলের দাগ, মেঝে ভয়ানক ভিজে ও স্যাঁৎসেঁতে, যেন কিছুক্ষণ আগে এ ঘরে অনেকখানি জল ছিল।

জামাতুল্লা বললে—এ ঘরে এত জল আসে কোথা থেকে বাবুজি?

সুশীল কিছু বলতে পারলে না; প্রকাণ্ড ঘর, অন্ধকারের মধ্যে ঘরের কোথায় কি আছে ভাল বোঝা যায় না।

সনৎ বললে—ঘরের কোণগুলো অন্ধকার দেখাচ্ছে, ওদিকে কী আছে দেখা যাক—

টর্চ ধরে তিন জনে ঘরের একদিকের কোণে গিয়ে দেখে অবাক চোখে চেয়ে রইল।

ঘরের কোণে বড়-বড় তামাঁর জালা বা ঘড়ার মত জিনিস, একটার ওপর আর একটা বসানো, ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু। সেদিকের দেওয়ালের গা দেখা যায় না—সমস্ত দেওয়াল ঘেঁষে সেই ধরনের রাশি-রাশি তামার জালা—ওরা এতক্ষণ ভাল করে দেখেনি, সেই তামার জালার রাশিই অন্ধকারে দেওয়ালের মত দেখাচ্ছিল।

জামাতুল্লা বললে—এগুলো কী বাবুজি?

সুশীল বললে—আমার মনে হয় এটাই ধনভাণ্ডার।

সনৎ বললে—আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি—

জামাতুল্লা হঠাৎ অন্য দেয়ালের দিকে গিয়ে বললে—এই দেখুন বাবুজি—

সেদিকে দেয়ালের গায়ে বড় বড় কুলুঙ্গির মত অসংখ্য গর্ত্ত। প্রত্যেকটার মধ্যে ছোট বড় কৌটোর মত কি সব জিনিস।

সুশীল বললে—যাতে তাতে হাত দিও না; এ সব পাতাল-ঘরে সাপ থাকা বিচিত্র নয়। এই ঘোর অন্ধকারে পাতালপুরী বিষাক্ত সাপের রাজ্য হওয়াই বেশি সম্ভব।

কিন্তু চারিদিকে ভাল করে টর্চ ফেলে দেখেও সাপের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনৎ ও জামাতুল্লা কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটো বার করে দেখলে। ভেতরে যা আছে তা দেখে ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল না। এ কি সম্ভব, এত বড় একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গুপ্ত ধনভাণ্ডারে এত কাণ্ড করে পাতালের মধ্যে ঘর খুঁড়ে তাতে পুরোনো হর্তুকি রাখা হবে?

ওদের হতভম্ব মুখের চেহারা দেখে সুশীল বললে—কী ওর মধ্যে?

সনৎ বললে—পুরোনো হর্তুকি দাদা—

—দূর পাগল—হর্তুকি কী রে?

—এই দেখ—

সুশীল গোল-গোল ছোট ফলের মত জিনিস হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বললে—আমি জানি নে এ কী জিনিস, কিন্তু যখন এত যত্ন করে একে রাখা হয়েছে, তখন এর দাম আছে। থলের মধ্যে নাও দু-এক বাক্স—

সব কৌটোগুলোর মধ্যে সেই পুরোনো হর্তুকি!

ওরা দস্তুরমত হতাশ হয়ে পড়ল। এত কষ্ট করে পুরোনো হর্তুকি সংগ্রহ করতে ওরা এত-দূর আসে নি।

হঠাৎ সুশীল বলে উঠল—আমার একটা কথা মনে হয়েছে—

সনৎ বললে—কী দাদা?

—এ জিনিস যাই হোক, এ-ই ছিল পুরোনো সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রা—কারেন্সি—এই আমার স্থির বিশ্বাস। সঙ্গে নাও কিছু পুরোনো হর্তুকি—

জামাতুল্লা অনেক কৌশল করে একটা তামার জালা পাড়লে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার ঢাকনি খোলা গেল না। জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে—এ কি রিবিট করে এঁটে দেওয়া বাবুজি? এ খুলবার হদিস পাচ্ছি নে যে—

টানাটানি করতে গিয়ে একটা ঢাকনি খটাং করে খুলে গেল।

সনৎ বললে—দেখো ওর মধ্যে থেকে আবার পুরোনো আমলকি না বার হয় দাদা—

কিন্তু জালাটা উপুড় করে ঢাললে তার মধ্যে থেকে বেরুলো রাশি রাশি নানা রঙবেরঙের পাথর। দামী জিনিস বলে মনে হয় না। সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে যে-কোন নদীর ধারে এমনি নুড়ি অনেক পাওয়া যায়।

জামাতুল্লা বললে—তোবা! তোবা! এসব কী চিজ্ বাবুজি?

কতকগুলো কৌটোর মধ্যে শনের মত সাদা জিনিসের গুলির মত। মনে হয় বহুকাল আগে শনের নুড়িগুলোতে কোন গন্ধদ্রব্য মাখানো ছিল—এখনও তার খুব মৃদু সুগন্ধ শনের নুড়িগুলোর গায়ে মাখানো।

সনৎ বললে—দাদা, এটা ভায়ের ওষুধ-বিষুদ রাখার ভাঁড়ার ছিল না তো?

জামাতুল্লা বললে—কী দাওয়াই আছে এর মধ্যে বাবুজি ?

—তা তুমি আমি কী জানি ? প্রাচীন যুগের লোকের কত অদ্ভুত ধারণা ছিল। হয়ত তাদের বিশ্বাস ছিল এই সবই অমর হওয়ার ওষুধ।

হঠাৎ সুশীল একটা জালার মুখ খুলে বলে উঠল—দেখি, বোধ হয় টাকা! জালা উপুড় করলে তার মধ্যে থেকে পড়ল একরাশ বড় বড় চাকতি, বড় বড় মেডেলের আকারের প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু।

সুশীল একখানা চাকতি হাতে করে বললে—সোনা বলে মনে হয় না ?

জামাতুল্লা বললে—আলবৎ সোনা—তবে টাকা বা মোহর নয়।

সুশীল বললে—কোন রকম ছাপ নেই। মুদ্রা করবার জন্যে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল—কিন্তু তারপর ছাপ এতে মারা হয় নি। এ অনেক আছে—

সনৎ বললে—সবরকম কিছু কিছু নাও দাদা—

জামাতুল্লা বললে—এ যদি সোনা হয়—এই এক জালার মধ্যেই লাখ টাকার সোনা—

সুশীল আর একটা জালা পেড়ে ঢাকনি খুলে উপুড় করে ঢাললে। তার মধ্যেও অবিকল অমনি ধাতব চাকতি—একই আকারের, একই মাপের।

জামাতুল্লা বললে—শোভানাল্লা! দু-লাখ হল—যদি আমরা দেখি সব জালাতেই এ-রকম—

এই সময় সুশীল প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল—শিগগির এদিকে এস—

ওরা গিয়ে দেখলে অন্ধকার ঘরের কোণে কতকগুলো মানুষের হাড়গোড়—ভাল করে টর্চ ফেলে দেখা গেল, দুটো নরকঙ্কাল!

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে নরকঙ্কাল দুটো যেন ওদের সমস্ত আশা ও চেষ্টাকে দাঁত বার করে উপহাস করছে। কাল রাত্রের স্বপ্নের কথা ওর মনে এল, মৃত্যুর চেয়ে মহা রহস্য জগতে কী আছে ? মূঢ় লোকে চারিপাশে মৃত্যু অহরহ দেখছে, অথচ ভাবে না কী গভীর রহস্যপুরীর দ্বারপাল-স্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের পথে মৃত্যু আছে দাঁড়িয়ে।…

নরকঙ্কালটি কী কথা না জানি বলত যদি এরা এদের মরণের ইতিহাস ব্যক্ত করতে পারত! সে হয়ত দুর্নিবার লোভ ও নৃশংস অর্থলিপ্সার ইতিহাস, হয়ত তা রক্তপাতের ইতিহাস, জীবন মরণ নিয়ে খেলার ইতিহাস, ভাই হয়ে ভায়ের বুকে ছুরি বসানোর ইতিহাস…

জামাতুল্লা কঙ্কালগুলো সরিয়ে রাখতে গিয়ে বললে—হাড় ভেঙে যাচ্ছে বাবুজি, বহুৎ পুরোনো আমলের হাড়গোড় এ সব। কমসে কম একশো দেড়শো বছরের পুরনো—কিন্তু দেখুন বাবুজি মজা, হাড়ের গায়ে এসব কী ?

ওরা হাতে করে নিয়ে দেখলে।

প্রায় এক ইঞ্চি করে লবণের স্তর শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে আছে কঙ্কালের ওপরে। সুশীল ভাল করে টর্চের আলো ফেলে বললে—চোখের কোটরগুলো নুনে বুজোনো—দ্যাখো চেয়ে!

এর যে কী কারণ ওরা কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

অন্ধকার পাতালপুরীর শহরে ওদের হাড়ে নুন মাখাতে এসেছিল কে ?

সে সময়ে সনৎ বললে—ছাখ দাদা, ছাখ জামাতুল্লা সাহেব—এটা কিসের দাগ ?

ওরা পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে সনৎ টর্চ ফেলে দেওয়ালের গায়ের একটা সাদা রেখার দিকে চেয়ে কথা বলছে। রেখাটা লম্বা অবস্থায় দেওয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টানা।

জামাতুল্লা বললে—এ দাগ নোনা জলের দাগ—খুব টাটকা দাগ।

সুশীল ও সনৎ হতভম্ব হয়ে বললে—তার মানে ? জল আসবে কোথা থেকে ?

জামাতুল্লা বললে—বড্ড অন্ধকার জায়গা, ভাল করে কিছুই তো মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একবার ভাল করে ঘরের চারিধারে দেখা দরকার। অজানা জায়গায় সাবধান থাকাই ভাল। এত স্যাঁতসেঁতে কেন ঘরটা, আমি অনেকক্ষণ থেকে তাই ভাবছি।

জামাতুল্লা ও সনৎ হাতড়ে হাতড়ে সোনার চাকৃতি বের করে থলের মধ্যে একরাশ পুরে ফেললে—পাথরের নুড়িও কিছু নিলে—বলা যায় না যদি এগুলো কোন দামী পাথর হয়ে পড়ে! বলা যায় কি! সনৎ ছেলেমানুষ, সে এত সোনার চাকতি দেখে কেমন দিশেহারা হয়ে গেল—উন্মত্তের মত আঁজলা ভরে চাকতি সংগ্রহ করে তার তামার জালার মধ্যে থেকে, আর থলের ভেতর পুরে নেয়। যেন এ আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প—কিংবা রূপকথার মায়াপুরী —পাতালপুরীর ধনভাণ্ডার! বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বেলা দশটা থেকে বিকেল ছ-টা এস্তক কলম পিষে সাঁইত্রিশ টাকা ন-আনা রোজগার করতে হয় সারা মাসে। সেই হল রূঢ় বাস্তব পৃথিবী—মানুষকে ঘা দিয়ে শক্ত করে দেয়। আর এখানে কী, না—হাতের আঁজলা ভরে যত ইচ্ছে সোনা নিয়ে যাও, হীরে নিয়ে যাও—এ আলাদা জগৎ—পৃথিবীর অর্থনৈতিক আইন-কানুনের বাইরে।

বহু প্রাচীন কালের মৃত সভ্যতা এখানে প্রাচীন দিনের সমস্ত বর্ব্বর প্রাচুর্য্য ও আদিম অর্থনীতি নিয়ে সমাধিগর্ভে বিস্মৃতির ঘুমে অচেতন—এ দিন বাতিল হয়ে গিয়েছে, এ সমাজ বাতিল হয়ে গিয়েছে—একে অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে দিনের আলোয় তুলে বিংশ শতাব্দীর জগতে আর অর্থ নৈতিক বিভ্রাট ঘটিও না।···

হঠাৎ কিসের শব্দে সুশীলের চিন্তার জাল ছিন্ন হল—বিরাট, উন্মত্ত, প্রচণ্ড শব্দ—যেন সমগ্র নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে ছুটে আসছে কোথা থেকে—কিংবা শিবের জটা থেকে যেন গঙ্গা ভীম ভৈরব বেগে ইন্দ্রের ঐরাবতকে ভাসিয়ে মর্ত্ত্যে অবতরণ করছেন।

জামাতুল্লার চিৎকার শোনা গেল সেই প্রলয়ের শব্দের মধ্যে—জল! জল! পালান—ওপরে উঠুন—

জামাতুল্লার কথা শেষ না হতে সুশীলের হাঁটু ছাপিয়ে কোমর পর্য্যন্ত জল উঠল—কোমর থেকে বুক লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে জামাতুল্লা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখুন বাবু!

সুশীল সবিস্ময়ে ও সভয়ে চেয়ে দেখলে ঘরের ছাদের কাছাকাছি সেই ছুটো পয়োনালা দিয়ে ভীষণ তোড়ে জল এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে। চক্ষের নিমেষে ওরা ইঁদুর-কলে আটকা

পড়ে জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মরবে।...কিন্তু উঠবে কোথায়! উঠবে কিসের সাহায্যে? এ ঘরে সিঁড়ি নেই আগেই দেখে এসেছে।

সুশীল চিৎকার করে বললে—সনৎ—সনৎ—ওপরে ওঠ—শিগ্‌গির—

সনৎ বললে—দাদা! তুমি আমার হাত ধর—হাত ধর—

তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল—পুরোনো রাজাদের পোষ-মানা বেতাল যেন কোথায় হা হা করে বিকট অট্টহাস্য করে উঠল—সম্মুখে মৃত্যু! উদ্ধার নেই! উদ্ধার নেই!

এ জলে সাঁতার দেওয়া যাবে না সুশীল জানে—এ মরণের ইঁদুরকল। বুক ছাপিয়ে জল তখন উঠে প্রায় নাকে ঠেকে-ঠেকে—

কে যে অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল—দাদা—দাদা—আমার হাত ধর—দাদা—

একজোড়া শক্ত বলিষ্ঠ হাত ওকে ওপরের দিকে তুললে টেনে। ঘন অন্ধকার। টর্চ কোথায় গিয়েছে সেই উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে। সুশীলের প্রায় জ্ঞান নেই। সে ডাকছে—কে? সনৎ?

কোন উত্তর নেই। কেউ কাছে নেই।

সুশীলের ভয় হল। সে চেঁচিয়ে ডাকলে—সনৎ! জামাতুল্লা!

তার পায়ের তলায় উন্মত্ত গর্জ্জনে যেন একটা পাহাড়ের মাথার হ্রদ খসে পড়েছে! উত্তর দেয় না কেউ—না সনৎ, না জামাতুল্লা।

প্রায় দশ মিনিট পরে জামাতুল্লা বললে—বাবু, জল্‌দি আমার হাত পাকড়ান—

—কেন?

—পাকড়ান হাত—উপরে উঠব—সাবধান।

—সনৎ, সনৎ কোথায়? তাকে রেখে এলে উপরে?

—জল্‌দি হাত পাকড়ান—হুঁ—

কত যুগ ধরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে সে ওঠা প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে—তারপর কতক্ষণ পরে পৃথিবীর ওপর এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা পাতালপুরীর গহ্বর থেকে! বনের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ঘনিয়ে এসেছে। সুশীল ব্যগ্রভাবে বললে—সনৎ কই? তাকে কোথায়—

জামাতুল্লা বিষাদ-মাখানো গম্ভীর সুরে বললে—সনৎবাবু নেই—আমাদের ভাগ্য বাবুজি—

সুশীল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বললে—নেই মানে?

—সনৎবাবু তো পাতালপুরী থেকে ওঠেন নি—তাঁকে খুঁজে পাই নি। আপনাকে তুলে ওপরে রেখে তাঁকে খুঁজতে যাব এমন সময় ঘরের মেঝে দুলে উঠে এঁটে গেল। তিনি থেকে গেলেন তলায়—আমরা রয়ে গেলাম ওপরে। তাঁকে খুঁজে পাই কোথায়?

—সেকি! তবে চল গিয়ে খুঁজে আনি!...

জামাতুল্লা বিষাদের হাসি হেসে বললে—বাবুজির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, এখন কিছু

বুঝবেন না। একটু ঠাণ্ডা হোন, সব বলছি। সনৎবাবুকে যদি পাওয়া যেত তবে আমি তাঁকে ছেড়ে আসতাম না।

—কেন? সনৎ কোথায়? হ্যাঁরে, আমি তোকে ছেড়ে বাড়ী গিয়ে মার কাছে, খুড়ীমার কাছে কী জবাব দেব?—কেন তুমি তাকে পাতালে ফেলে এলে?

জামাতুল্লা নিজের কপালে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—নসীব, বাবুজি—

উদ্‌ভ্রান্ত সুশীলের বিহ্বল মস্তিষ্কে ব্যাপারটা তখনও ঢোকে নি। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে দম বন্ধ হয়ে সনৎ ওপরে উঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারে নি। অন্ধকারের মধ্যে জামাতুল্লাও ওকে খুঁজে পায়নি। ওরই হাত ধরে টেনে তুলবার পরে ঘরের মেঝে এঁটে গিয়ে রত্নভাণ্ডারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ওই ঘরে ছাদ পর্য্যন্ত জল ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ—সেখানে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে?…

সুশীল ক্রমে সব বুঝলে ওপরে উঠে এসে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানোর পরে। একটা গভীর শোক ও হতাশায় সে একেবারে ডুবে যেত হয়ত, কিন্তু ঘটনাবলীর অদ্ভুতত্বে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কোথায় অন্ধকার পাতালপুরীতে পুরাকালের ধন-ভাণ্ডার, সে ধনভাণ্ডার অসাধারণ উপায়ে সুরক্ষিত…এমন কৌশলে, যা একালে হঠাৎ কেউ মাথায় আনতেই পারত না!

জামাতুল্লা বললে—পানি দেখে তখনি আমার সন্দেহ হয়েছে। আমি ভাবছি, এত নোনা পানি কেন ঘরের মধ্যে?

সুশীল বললে—আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল জামাতুল্লা। তাহলে সনৎ আজ এভাবে—

—তখন কী করে জানব বাবুজি? ঐ নালিদুটো গাঁথা আছে—ও দিয়ে জোয়ারের সময় সমুদ্দুরের নোনা পানি ঢোকে—দিনে একবার রাতে একবার। আমার কী মনে হয় জানেন বাবুজি, ওই দুটো নালি এমন ফন্দি করে গাঁথা হয়েছিল যে—

সুশীল বললে—আমার আর একটা কথা মনে হয়েছে জান? ওই দুটো নরকঙ্কাল যা দেখলে, আমাদেরই মত দুটো লোক কোন কালে ওই ঘরে ধনরত্ন চুরি করতে গিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরেছে। মূর্খের মত ঢুকেছে, জানত না। যেমন আমরা—সনৎ যেমন—

—কী জানত না?

—যে স্বয়ং ভারত মহাসমুদ্র প্রাচীন চম্পারাজ্যের রত্নভাণ্ডারের অদৃশ্য প্রহরী। কেউ কোনদিন সে ভাণ্ডার থেকে কিছু নিতে পারবে না, মানমন্দিরের রত্নশৈল তার একখানি সামান্য নুড়িও হারাবে না।—সুশীল বললে—কিন্তু জল যায় কোথায় জামাতুল্লা? এত জল? আমার কী মনে হয় জান—

—আমারও তা মনে হয়েছে। ওই ঘরের নিচে আর-একটা ঘর আছে, সেটা আসল ধনভাণ্ডার। বেশি জল বাধলে ঘরের মেঝে একদিকে চাল হয়ে পড়ে জলের চাপে—

সব জল ওপরের ঘর থেকে নিচের ঘরে চলে যায়।

সুশীল বললে—স্টীম পাম্প আনলেও তার জল শুকোনো যাবে না, কারণ—তাহলে গোটা ভারত মহাসাগরকেই স্টীম পাম্প দিয়ে তুলে ফেলতে হয়—ওর পেছনে রয়েছে গোটা ভারত সমুদ্র। সে জামাতুল্লার দিকে চেয়ে বিষাদের সুরে বললে—এই হল তোমার আসল বিষমুনি—সমুদ্র, বুঝলে জামাতুল্লা ?

ওরা সেই বনের গভীরতম প্রদেশের একটা পুরোনো মন্দির দেখলে। মন্দিরের মধ্যে এক বিরাট দেবমূর্ত্তি, সুশীলের মনে হল, সম্ভবত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

যুগযুগান্ত কেটে গেছে, মাথার ওপরকার আকাশে শত অরণ্যময়ূরীদের নর্ত্তন শেষ হয়ে আবার শুরু হয়েছে, রক্তাশোকতরুর তলে কত সুখসুষুপ্ত হংসমিথুনের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে—সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে ঘৃতপক্ক অমৃতচরুর চারু গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর কতদিন হয়েছে আমোদিত—কত উত্থান, কত পতনের মধ্যে দেবতা অবিচল দৃষ্টিতে বহুদূর অনন্তের দিকে চেয়ে আছেন, মুখে সুকুমার সব্যঙ্গ মৃদু চাপা হাসি—নিরুপাধি চেতনা যেন পাষাণে লীন, আত্মস্থ।

সুশীল সসম্ভ্রমে প্রণাম করল—দেবতা, সনৎ ছেলেমানুষ—ওকে তোমার পায়ে রেখে গেলুম—ক্ষমা কর তুমি ওকে!

* * *

সুশীল কলকাতায় ফিরেছে।

কারণ যা ঘটে গেল, তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ইয়ার হোসেন সন্দেহ করে নি। সনৎ একটা কূপের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছে শুনে ইয়ার হোসেন খুঁজে দেখবার আগ্রহও প্রকাশ করে নি। চীনা মাঝি জাঙ্ক্ নিয়ে এসেছিল—তারই জাঙ্কে সবাই ফিরল সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ান মেলবোট ধরে কলম্বো।

কলম্বোর এক জহুরীর দোকানে জামাতুল্লা সেই হর্তুকির মত জিনিস দেখাতেই বললে—এ খুব দামী জিনিস, ফসিল অ্যাম্বার—বহুকালের অ্যাম্বার কোন জায়গায় চাপা পড়ে ছিল।

দু-খানা পাথর দেখে বললে—আনকাট্ এমারেল্ড, খুব ভাল ওয়াটারের জিনিস হবে কাটলে। আন্নামালাইয়ের জহুরীরা এমারেল্ড কাটে, সেখানে গিয়ে কাটিয়ে নেবেন। দামে বিকোবে।

সবসুদ্ধ পাওয়া গেল প্রায় সত্তর হাজার টাকা। ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি না দিয়ে ওরা তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দশ হাজার টাকা পাঠালে—সেই মাদ্রাজী বিধবাকে পাঠালে বিশ হাজার—বাকি টাকা তিন ভাগ হল জামাতুল্লা, সনতের মা ও সুশীলের মধ্যে।

টাকার দিক থেকে এমন কিছু নয়, অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকখানি। কত রাত্রি গ্রামের বাড়ীতে নিশ্চিন্ত আরাম-শয়নে শুয়ে ওর মনে জাগে মহাসমুদ্র-পারের সেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের অরণ্যাবৃত ধ্বংসস্তূপ···সেই প্রশান্ত ও রহস্যময় বিষ্ণুমূর্ত্তি···হতভাগ্য সনতের শোচনীয় পরিণাম···অরণ্যমধ্যবর্ত্তী তাঁবুতে সে রাত্রির সেই অদ্ভুত স্বপ্ন। জীবনের গভীর রহস্যের কথা ভেবে তখন সে অবাক হয়ে যায়।

জামাতুল্লা নিজের ভাগের টাকা নিয়ে কোথায় চলে গেল, তার সঙ্গে আর সুশীলের দেখা হয়নি।

॥ কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা ॥

ভূত

কি বাদামই হোত শ্রীশ পরামানিকের বাগানে। রাস্তার ধারেই বড় বাগানটা। অনেক দিনের প্রাচীন গাছপালায় ভর্ত্তি। নিবিড় অন্ধকার বাগানের মধ্যে—দিনের বেলাতেই।

একটু দূরে আমাদের উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালা। রাখাল মাস্টারের স্কুল। একটা বড় তুঁত গাছ আছে স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেজন্যে আমরা বলি 'তুঁততলার স্কুল'।

দুজন মাস্টার আমাদের স্কুলে। একজন হলেন হীরালাল চক্রবর্ত্তী। স্কুলের পাশেই এঁর একটা হাঁড়ির দোকান আছে, তাই এঁর নাম 'হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার'।

মাস্টার তো নয়, সাক্ষাৎ যম। বেতের বহর দেখলে, পিলে চমকে যায় আমাদের। টিফিনের সময় মাস্টার মশায়েরা সব ঘুমুতেন। আমরা নিজের ইচ্ছে-মতো মাঠে-বাগানে বেড়িয়ে ঘণ্টাখানেক পরেও এসে হয়তো দেখি তখনও মাস্টার মশায়দের ঘুম ভাঙে নি। সুতরাং তখন আমাদের টিফিন শেষ হোল না—টিফিনের মানে হচ্ছে ছুটি মাস্টার মশায়দের, ঘুমুবার ছুটি।

সেদিনও এমনি হোল।

রেল লাইন আমাদের স্কুল থেকে অনেক দূরে। আমরা মাৎলার পুল বেড়িয়ে এলাম, রেল লাইন বেড়িয়ে এলাম—ঘণ্টাখানেক পরে এসেও দেখি এখনও হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের নাক ডাকচে।

নারাণ বল্লে—ওরে চুপ চুপ, চেঁচাস নি, চল ততক্ষণ পরামানিকদের বাগানে বাদাম খেয়ে আসি—

আমাদের দলে সবাই মত দিলে।

আমি বল্লাম—বাদাম পাড়া সোজা কথা ?

—তলায় কত পড়ে থাকে এ সময়—

—চল তো দেখি—

এইবার সবাই আমরা মিলে পরামানিকদের বাগানে ঢুকলাম পুলের তলার রাস্তা দিয়ে। দুপুর দুটো, রোদ ঝম্ ঝম্ করচে। শরৎকাল, রোদের তেজও খুব বেশি।

গত বর্ষায় আগাছার জঙ্গল ও কাঁটা ঝোপের বেজায় বৃদ্ধি হয়েচে বাগানের মধ্যে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি পথ। এখানে-ওখানে মোটা লতা গাছের ডাল থেকে নেমে নিচেকার ঝোপের মাথায় দুলচে। আমরা এ বাগানের সব অংশে যাই নি, মস্ত বড় বাগানটা। পাকা রাস্তা থেকে গিয়ে নদীর ধার পর্য্যন্ত লম্বা।

পেয়ারাও ছিল কোনো কোনো গাছে। কিন্তু অসময়ের পেয়ারা তেমন বড় হয় নি। ফল আরও যদি কোনো রকম কিছু থাকে, খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারের দিকে চলে গেলাম। বাদাম তো মিললোই না। যা বা পাওয়া গেল, ইট দিয়ে ছেঁচে তার শাঁস বের করবার

ধৈর্য্য আমার ছিল না। সুতরাং দলের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। নদীর দিকে বন বেজায় ঘন। এদিকে বড় একটা কেউ আসে না।

খস্ খস্ শব্দে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে শেয়াল চলে যাচ্চে। কুলো পাখি ডাকচে উঁচু তেঁতুল গাছের মাথায়। আমার যেন কেমন ভয় ভয় করচে।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা কানে হাত দিয়ে গায়—

ঠিক দুক্‌খুর বেলা—
ভূতে মারে ঢ্যালা—
ভূতের নাম রসি
হাঁটু গেড়ে বসি—

সঙ্গে সঙ্গে তারা অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এসব করলে নাকি ভূতের ভয় চলে যায়।

আমার সঙ্গে কেউ নেই—ঠিক দুপুর বেলাও বটে! মন্তরটা মুখে আউড়ে হাঁটু গেড়ে বসবো? কিন্তু ভূতের নাম রসি হোল কেন, শ্যামও হোতে পারতো, কালো হোতে পারতো, নিবারণ হোতেই বা আপত্তি কি ছিল?

একটা বাঁক ঘুরে বড় একটা বাঁশবন আর নিবিড় ঝোপ তার তলায়।

সেখানটায় গিয়ে আমার বুকের টিপ টিপ শব্দ যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

একটা আমড়া গাছের তলায় ঘন ঝোপের মধ্যে আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে আছে বরো বাগদিনী।

ভালো করে উঁকি মেরে দেখলাম। হ্যাঁ, ঠিক—বরো বাগদিনীই বটে, সর্ব্বনাশ!

সে যে মরে গিয়েছে!

বরো বাগদিনীর বাড়ী আমাদের গাঁয়ের গোঁসাই পাড়ায়। অশ্বত্থতলার মাঠে একখানা দোচালা কুঁড়ে ঘরে সে থাকতো, কেউ ছিল না তার। পাল মশায়ের বাড়ী ঝি-গিরি করতো অনেক দিন থেকে। তারপর তার জ্বর হয়, এই পর্য্যন্ত জানি। একদিন তাকে আর দেখা যায় না।

মাস দুই আগের কথা। একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল বাঁওড়ের ধারে বাঁশবনে—শেয়াল কুকুরে তাকে খেয়ে ফেলেছে অনেকটা। সেই রকমই কালো রোগা-মত দেহটা, বরো বাগদিনীর মতো। সকলে বল্লে, জ্বরের ঘোরে বাঁওড়ে জল তুলতে গিয়ে বরো গিয়েচে।

সেই বরো বাগদিনী আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে দিব্যি বসে!

আমি এক ছুটে বনবাগান ভেঙে দিলাম ছুট পাকা রাস্তার দিকে। যখন বাদামতলায় দলের মধ্যে এসে পৌঁছলাম তখন আমার গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

ছেলেরা বল্লে—কি হয়েছে রে? অমন কচ্ছিস কেন?

আমি বল্লাম—ভূত।

—কোথায় রে? সে কি? দূর—

—বরো বাগদিনী বসে আছে ঝোপের মধ্যে আমড়াতলায়—সেই নদীর ধারের দিকে। স্পষ্ট বসে আছে দেখলাম।

—সে কি রে? তা কখনো হয়?

—নিজের চোখে দেখলাম। একেবারে স্পষ্ট বরো বাগদিনী—

—দূর—চল তো যাই—দেখি কেমন? তোর মিথ্যে কথা—

সবাই মিলে যেতে উদ্যত হোল—কিন্তু সেই সময় দলের চাঁই নিমাই কলু বল্লে,—না ভাই। ওর কথায় বিশ্বাস করে অতদূর গিয়ে স্কুলে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। এতক্ষণ মাস্টারদের ঘুম ভেঙেচে। হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের বেতের বহর জানো তো! সে ঠ্যালা সামলাবে কে? আমি ভাই যাবো না—তোমরা যাও—ওর সব মিথ্যে কথা—

ছেলের দলের কৌতূহল মিটে গেল হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের বেতের বহর স্মরণ করে। একে একে সবাই স্কুলের দিকে চললো। আমিও চল্লাম।

আমরা গিয়ে দেখি মাস্টার মশায়দের ঘুম খানিক আগেই ভেঙেচে—ওঁদের গতিক দেখে মনে হোল। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার আমাদের শূন্য ক্লাস রুমের সামনে অধীরভাবে পায়চারি করছিলেন—আমাদের আসতে দেখে বলে উঠলেন—এই যে! খেলা ভাঙলো?

আমরাও বলতে পারতাম, আপনার ঘুম ভাঙলো?…কিন্তু সে কথা বলে কে? তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে আমরা তখন সবাই এতটুকু হয়ে গিয়েছি।

ক্লাসে ঢুকেই তিনি হাঁকলেন—রত্না! অর্থাৎ আমি। এগিয়ে গেলুম।

—কোথায় থাকা হয়েছিল?

আমি তখন নবমীর পাঁঠার মতো জড়সড় হয়ে কাঁপচি। এদিকে বরো বাগদিনী ওদিকে হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার। আমার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে উঠেচে! কিন্তু শেষ অস্ত্র ছিল আমার হাতে, তা ত্যাগ করলাম।

বল্লাম—পণ্ডিত মশাই, দেরি হয়ে গেল কেন ওরা জানে। এই সর্ব্ব পরামানিকের বাগানে বাদাম কুড়ুতে গিয়ে ভূত দেখেছিলাম—তাই—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের মুখে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক যুগপৎ ফুটে উঠলো। বল্লেন—ভূত? ভূত কি রে?

—আজ্ঞে, ভূত—সেই যারা—

—বুঝলাম বাঁদর। কোথায় ভূত? কি রকম ভূত?

সবিস্তারে বল্লাম। আমার সঙ্গীরা আমায় সমর্থন করলে। আমায় কি রকম হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে দেখেছিল, বল্লে সে কথা! হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার ডেকে বল্লেন—শুনচেন দাদা?

রাখাল মাস্টার তামাক খাওয়ার যোগাড় করছিলেন, বল্লেন—কি?

—ওই কি বলে শুনুন। রত্না নাকি এখুনি ভূত দেখে এসেচে সর্ব্ব পরামানিকের বাগানে।

—সর্ব্ব পরামানিক কে ?

—আরে, ওই শ্রীশ পরামানিকের বাবার নাম। ওদেরই বাগান।

আবার বর্ণনা করি সবিস্তারে।

রাখাল মাস্টার গোঁড়া ব্রাহ্মণ,—হাঁচি, টিকটিকি, জল-পড়া, তেল-পড়া সব বিশ্বাস করতেন। গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলেন—তা হবে না ? অপঘাত মৃত্যু—গতি হয় নি—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার একটু নাস্তিক প্রকৃতির লোক। অবিশ্বাসের সুর তখনও তাঁর কথার মধ্যে থেকে দূর হয় নি। তিনি বল্লেন—কিন্তু দাদা, এই দুপুর বেলা, ভূত থাকবে বাগানে বসে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে!

—তাতে কি ? তা থাকবে না ভূত এমন কিছু লেথাপড়া করে দিয়েচে নাকি ? তোমাদের আবার যত সব ইয়ে—

—আচ্ছা চলুন গিয়ে দেখে আসি।

ছেলেরা সবাই সমস্বরে চীৎকার করে সমর্থন করলে।

রাখাল মাস্টার বলেন,—হ্যাঁ, যত সব ইয়ে—ভূত তোমাদের জন্যে সেথানে এখনো বসে আছে কি না ? ওরা হোল কি বলে অশরীরী—মানে ওদের শরীর নেই—ওরা মানে বিশেষ অবস্থায়—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার বল্লেন—চলুন না দেখে আসি গিয়ে কি রকম কাণ্ডটা, যেতে দোষ কি ?

আমরা সকলেই তো এই চাই। এঁরা গেলে এখুনি ইস্কুলের ছুটি হবে এখন। সেদিকেই আমাদের ঝোঁকটা বেশি।

যাওয়া হোল সবাই মিলে।

হুড়মুড় করে ছেলের পাল চললো মাস্টারদের সঙ্গে।

আমি আগে আগে, ওরা আমাদের পেছনে।

সেই নিবিড় ঝোপটাতে আমি নিয়ে গেলাম ওদের সকলকে। যে-দৃশ্য চোথে পড়লো, তা কথনো ভুলবো না—এত বৎসর পরেও সে দৃশ্য আবার যেন চোথের সামনে দেখতে পাই এথনো!

সবাই মিলে ঝোপ-ঝাপ ভেঙে সেই আমড়াতলায় গিয়ে পৌঁছলাম।

যা দেখলাম, তা অবিকল এই।

আমড়াগাছের তলায় একটা ছেঁড়া, অতি-মলিন, অতি-দুর্গন্ধ কাঁথা পাতা, পাশে একটা ভাঁড়ে আধ ভাঁড়টাক জল। একরাশ আমড়ার থোসা ও আঁটি জড় হয়েচে পাশে—কতক টাটকা, কতক কিছু দিন আগে থাওয়া, একরাশ কাঁচা তেঁতুলের ছিবড়ে, পাকা চালতার ছিবড়ে—শুকনো।

ছিন্ন কাঁথার ওপর জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধা বরো বাগদিনী মরে পড়ে আছে। থানিকটা আগে মারা গিয়েচে।

এ সমস্যার কোনো মীমাংসা হয় নি।

আমরা হৈ হৈ করে বাইরে গিয়ে খবর দিলাম। গ্রাম্য চৌকিদার ও দফাদার দেখতে এল। কেন যে বরো বাগদিনী এই জঙ্গলে এসে লুকিয়ে ছিল নিজের ঘর ছেড়ে—এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! কেউ বল্লে, ওর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কেউ বল্লে, ভূতে পেয়েছিল।

কিন্তু বরো বাগদিনী মরেছে অনাহারের শীর্ণতায় ও সম্ভবত আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের ম্যালেরিয়ায় ভুগে। কেউ একটু জলও দেয় নি তার মুখে।

কে-ই বা দেবে এ জঙ্গলে? জানতোই বা কে?

বরো বাগদিনীর এ আত্মগোপনের রহস্য তার সঙ্গেই পরপারে চলে গেল।

এয়ার গান

হাবুল নাকি পাস করেছে ফার্স্ট হয়ে। কথাটা শুনে গর্ব্বে তার বুকটা তো ফুলে উঠলো দশ হাত। হাওয়ার ওপর ভর করে সে ফিরে এল বাড়ীতে ধীরে ধীরে। বিপুল আনন্দে সারা রাত্রি তার ভাল ঘুমই হল না। মাকে কথাটা বলতে মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, 'সুখী হও—বড় হও বাবা!'

সত্যি, তার এই দীর্ঘদিনের খাটুনি সার্থক হয়েচে। বাড়ীর লোকের চোখ এড়িয়ে কত রাত্রি জেগে সে বই পড়ে গেছে, তার পড়ার বই একাগ্রচিত্তে। আজ তার পরিণতি ওর প্রথম হওয়া। সকলে তো কথাটা শুনে বিশ্বাসই করতে চায় না। স্কুলের ছেলেরা তো প্রথমে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিল একেবারে। সারাদিন যে আড্ডা মেরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সে এত উন্নতি করলে কি করে? তবু হাবুল ফার্স্ট হল—

শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ঝির ঝির করে। হাবুলের ঘুম ভেঙে গেল; ধড়মড় করে উঠে বসলো। মনে পড়ল গতকালের ঘটনা—তার প্রথম হবার কথা। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। হাবুল গিয়ে দাঁড়াল তার ছোট-কাকার ঘরের দরজায়। ছোট কাকা তখন ঘুমুচ্চেন নাক ডাকিয়ে লেপের মধ্যে। হাবুল ডাকল, 'ছোট-কাকা—ছোট-কাকা!'

ছোটকাকার ঘুম ভাঙলো। তিনি দু-হাত দিয়ে চোখ রগড়ে উত্তর দিলেন, 'কি রে হাবুল!'

হাবুল বললে, 'কাকা, আমি ফার্স্ট হয়েচি।'

এমন সময় এই সকালে টুনু এসে হাজির হয়। সে হাবুলের কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদ করলে, 'কক্ষনো না ছোট-কাকা!'

হাবুল রুখে উঠলো, 'তুই জানিস টুনু!'

টুনুও দমে না একটুও, 'ইস। উনি আবার ফার্স্ট হবেন? তবে যদি টোকেন, সে-কথা আলাদা।'

হাবুলের রাগ চড়ে গেল। সে ঠাস করে টুনুর কচি গালে একটা চড় মেরে বললে, 'বাবা সাক্ষী। কাল রাত্রে হেডমাস্টার মশায় বললেন, জানিস সে-কথা? সকাল বেলা এসেচেন চালাকি কর্ত্তে।'

টুনু গালে হাত বুলোতে থাকে বেদনায়। ছোট-কাকা বললেন, 'ছিঃ, মারলি কেন রে ওকে?'

'দেখলে তো কি হিংসুটে!'

'এ রকম চড় তোমার গালেও পড়বে অথন।' কথার শেষে টুনু ছল্ ছল্ চক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর হাবুল বললে,—'ছোট-কাকা, তুমি বলেছিলে, ফার্স্ট হলে আমাকে একটা এয়ার গান কিনে দেবে।'

'ও!' এতক্ষণ পর ছোট-কাকার আট মাস আগেকার প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে গেল। বললেন, 'বেশ বেশ, কাল কিনে দেবো।'

'কাল না—আজই।'

ঠিক আট মাস আগে হাবুল একদিন ওর ক্লাসফ্রেণ্ড ভুলোদের বাড়ীতে দেখেছিল তার একটা এয়ার গান। হাবুলেরও একটা এয়ার গান কিনবার ভারি শখ হল। কথাটা তার ছোটকাকাকে বলতে তিনি বললেন, 'ফার্স্ট হলে এয়ার গান তোকে প্রাইজ দেবো।'

হাবুল উঠে-পড়ে লেগে গেল প্রথম হবার জন্যে এবং প্রথম হল যথাসময়ে।

সেদিনই সে একটা এয়ার গান কিনে আনলে। তারপর সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে এয়ার গান হাতে ঝুলিয়ে বাড়ীময় খুঁজতে লাগলো শিকার। কোথাও বসেছে একটা অসহায় চড়াই কিংবা পায়রা। তাকে লক্ষ্য করে এয়ার গানে আওয়াজ হল ফট ফট শব্দে। পাখী উড়ে পালালো অক্ষত শরীরে আর গুলি বেরিয়ে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে, পাখীর দশ হাত তফাৎ দিয়ে প্রায়।

হতাশ হয়ে ও ফিরে এল হাত-ঠিক করবার জন্যে, যাতে সে পুনরায় না লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘরের দরজার চৌকাঠে বসে, ও লক্ষ্য করলে দেওয়ালে টাঙানো একটা বিলিতি ক্যালেণ্ডারে ছবির মুখ। অনেকক্ষণ পর তার এয়ার গান থেকে শব্দ বেরুল ফট্ করে—গুলিও ছুটে চললো ছবিতে একটা ছেলের ঠিক মুখের পানে। তারপর আওয়াজ হল ঝন-ঝন-ঝন। ভয়ে হাবুলের মুখ হয়ে গেল পাংশু। সে দৌড়ে গেল। দেখলে মেঝেতে ছড়ান অগুনতি কাচের টুকরো। আস্তে আস্তে ক্যালেণ্ডারটা তুলে ধরতে দেখলে, দেওয়ালে কালী ঠাকুরের একখানা পট ফ্রেম দিয়ে মুড়ে কাচ দিয়ে ঢাকা। ছবিখানাকে ক্যালেণ্ডারটা ঢেকে ছিল এতক্ষণ। লোহার গুলির ঘায়ে ভঙ্গুর কাচই গেছে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে। বুকের ভেতরটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠলো আতঙ্কে। চোখের সামনে লক লক করতে লাগলো কালী ঠাকুরের দীর্ঘ জিভ। ভয়ে ও ভাবনায় সে মুষড়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে ফেললে কাচগুলো। মা জানলে তো এক্ষুনি রসাতল করে ফেলবেন।

তখন মধ্যাহ্ন প্রায়। হাবুল ধীরে ধীরে চলে গেল ছাতের 'চিলকুঠরি'র ভেতর। সেখান থেকে লক্ষ্য করলে পাশের বাড়ীর আঙ্গিনায়-বসা একটা কাককে। কাকও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালিয়ে গেল তাকে বিদ্রূপ করে হয়তো। হাজার হোক, কাক বড় ধূর্ত্ত প্রাণী।

নিচে যেতে হাবুলের আর সাহস হচ্চে না। টুপ করে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে একটা চটের উপর বসে থাকে জানলা দিয়ে দূরের পানে তাকিয়ে। কাক কিংবা পায়রা কিংবা চড়াই এলে, ও গুলি ছুঁড়ে মারবে তাকে। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ও সামনের বাড়ীর ট্রাঙ্কটাকে লক্ষ্য করে ফেলে। গুলির আঘাতে ট্রাঙ্কটাও বেজে ওঠে ঝন্-ঝন্-ঝন্।

মনে আবার আনন্দ ফিরে আসে। হ্যাঁ, হাত অনেকটা ভাল হয়েছে। আবার সে লক্ষ্য করে পাঁচিলের ওপরের একটা ফুল গাছের টবে। সেটায় আওয়াজ হয় খট করে।

আনন্দ ওর বেড়ে যায় চতুর্গুণ। বন্দুকটা নেড়েচেড়ে ভাল করে পরীক্ষা করে। হ্যাঁ, একদিন ও বড় বন্দুকও ছুঁড়তে পারবে নিশ্চয়। এই হল তার স্ূচনা। বড় হলে সে চলে যাবে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মঙ্গো পার্কের মত। অসংখ্য জন্তু-জানোয়ার শিকার করে, ও দেখাবে ওর শৌর্য্য-বিক্রম। বাঙালী ভীরু নয়—বীরের জাতি—ও তা প্রমাণ করবে। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ওর ফটো ছাপান হবে। ও দাঁড়িয়ে থাকবে হাফ্ প্যাণ্ট পরে বন্দুক হাতে, আর পায়ের কাছে পড়ে থাকবে বিরাটকায় হিংস্র জন্তুর নিহত দেহটা। পুলকে ওর হৃদয় ভরে গেল এখনই। কৃষ্ণ মহাদেশের গভীর অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসবে মানুষ-খাদক জাতি সভ্য মানুষের গন্ধে, ও তাদের দেখে ভয় পাবে না একটুও। বরং ওর বন্দুক ছুঁড়ে দেবে গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম। শিক্ষা হয়ে যাবে তাদের রীতিমত। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে কতকগুলো ইতস্ততঃ ভূমিতে। আর সবাই পালিয়ে যাবে এই আশ্চর্য্য কল দেখে। নিরীহ হাবুল এখনই যে নিষ্ঠুর শিকারী হয়ে উঠলো সম্পূর্ণরূপে! রক্ত-প্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠলো ওর ধমনীতে-ধমনীতে। ও পায়চারি করতে লাগলো ঘরের ভেতর এয়ার গানটা হাতে ঝুলিয়ে আফ্রিকার রোমাঞ্চকর এ্যাড্ভেঞ্চারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে। অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে ও ইতিহাসের পাতায়। নেপোলিয়ন কিংবা নেলসনের চেয়ে ও কোন অংশে হেয় নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন নাকি পেছনে হাত দিয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁর পাশ দিয়ে শন শন করে গুলি চলে গেলেও তিনি গ্রাহ্য করতেন না আদৌ। ঠিক সেই ভঙ্গিমায় সেই স্বর্গীয় বীরের অনুকরণে ও দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যে জানলার পানে মুখ করে।

কিন্তু ও কি? সামনের বাড়ীর ট্রাঙ্কের ওপর একটা বাঁদর যে? তাই এত কাক ডেকে উঠছে অবিশ্রান্ত, তাদের বিকট রব তার কানে যায় নি এতক্ষণ। কারণ সে কলকাতা ছেড়ে এযাবৎ আফ্রিকার গভীর অরণ্যে পড়ে ছিল শিকারের খোঁজে। ওর বুকের ভেতরটা যেন দুর দুর করে উঠলো। ও ওর বন্দুকটা একবার ভাল করে দেখে নিলে—বাঁদরটা বেশ বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট। আর ওদিকে বাঁদরটা ঝুপ করে হাবুলের ঘরের দরজার কাছে এসে উপস্থিত হল। বীর পুরুষের কাঁপনি শুরু হয়, রীতিমত হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে যায়,

নেলসনের ও নেপোলিয়নের মত। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বাঁদরটার পানে। ঘরের এক পাশে ছিল একছড়া বড় বড় চাঁপা কলা। বাঁদরটা একপা একপা করে এগিয়ে আসে সেই কলার দিকে—বাঁদর নাকি কলা খেতে বড় ভালবাসে। হাবুলের সামনে এই নিদারুণ ডাকাতি ঘটে যায়! সে আর দেখতে পারে না, মরীয়া হয়ে, তার সমস্ত শক্তি একত্র করে দাঁড়ায় কলা ও বাঁদরের মাঝখানে জন্তুটাকে এয়ার গান দিয়ে লক্ষ্য করে। এয়ার গানের ঘোড়া দিলে টিপে; কিন্তু তাতে গুলি পোরা ছিল না একটাও। সুতরাং বাঁদরের ক্ষতি হয় না আদৌ। পরন্তু তার রাগ বেড়ে যায় এই বাধা দেওয়ার জন্যে। সে ত্বরিতে এসে হাবুলের গালে মারে একটা বিরাশি সিক্কার চড়। বেচারার মাথা ঘুরতে থাকে বন বন করে। নেপোলিয়ন গালে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। এয়ার গান পড়ে থাকে তার পদতলে। বাঁদরটাও সুযোগ বুঝে এয়ার গানটা নিয়ে উধাও হয় পাশের নিমগাছের ডালে। হাবুলও প্রাণপণে চীৎকার করে ওঠে বাঁদরের এই বেয়াদপি দেখে। মনে পড়ে টুনুর গালের ব্যথা আর কালীর ছবির কাচ ভাঙার কথা।

তার চীৎকার শুনে ছুটে আসেন মা দাদা, ছোটকাকা, মায় টুনু। হৈচৈ পড়ে যায়, 'কি হয়েচে রে হাবুল? কি হয়েচে?'

নিরুত্তর হাবুল করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে পলাতক বাঁদরের পানে। টুনু তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ওই দেখ ছোট-কাকা, ছোড়দার এয়ার গান বাঁদরের হাতে।'

'কি ছেলে রে তুই? বাঁদরে তোর হাত থেকে এয়ার গানটা নিয়ে গেল? অমন খাসা জিনিসটা, ন-টাকা দশ আনা দাম!'

আর হাবুল?—সে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্ঠুর অপমানে ও পরাজয়ে হৃদয় ভারাক্রান্ত করে।

শুভ কামনা

১৯২৫ সালের কথা। ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সুধীরবাবুদের দোকানে যাই। সেখানে তখন প্রতি বিকালে একটি সাহিত্যিক আড্ডা হোত। আমি তখন নতুন সাহিত্যিক, 'প্রবাসী'তে কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছি মাত্র—এবং 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের খসড়া করচি। তাঁদের এই বৈকালিক আড্ডাটি আমার বড় ভাল লাগতো। কাজকর্মের অবসরের মাঝে মাঝে 'মৌচাক' আপিসে এসে এই আড্ডাতে যোগ দিতাম। ১৯২৯ সালে আমি কলকাতায় আবার ফিরে আসি, কয়েক বৎসর বিহার প্রবাসের পরে। ঐ বৎসরেই 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। ঐ সাল থেকে 'মৌচাক' আপিসে আমার যাওয়া আসা বাঁধা নিয়মে শুরু হয়ে গেল।

অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, মজলিসী ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে 'মৌচাক'-এর এ আড্ডা গমগম করতো। এইখানে বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুধীরবাবুর আদর আপ্যায়নে কত বর্ষার

বৈকাল ও শীতের সন্ধ্যায় চায়ের মজলিস এখানে সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠেচে। কত ঠোঙা ঠোঙা 'অবাক জলপান' ফেরিওয়ালার ঝুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাদল দিনে অতিথি সৎকারে সহযোগিতা করেচে; 'মৌচাক'-এর ইতিহাসের সঙ্গে সে সবের ইতিহাসও জড়ানো।

একদিন সুধীরবাবু বললেন—বিভূতিবাবু, মৌচাকের জন্যে লিখবেন?

আমি তো একপায়ে খাড়া। বললুম—নিশ্চয়ই।

—কি লিখবেন বলুন। ছেলেদের উপন্যাস দিন। কি বলেন?

এভাবে ছেলেদের জন্য লেখা উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়'-এর সূত্রপাত। সুধীরবাবুর উৎসাহ না পেলে হয়তো ও বই লেখাই হোত না।

আজকাল কলকাতা থেকে দূরে বাস করি। কিন্তু 'মৌচাক'-এর বৈকালিক আড্ডার আকর্ষণ এমন মোহ বিস্তার করেচে মনে, যে, কলকাতায় এলেই ওখানে না গিয়ে পারি না। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও যাওয়া চাই-ই। বন্ধুবর সরোজ রায়চৌধুরী আসে, মণীন্দ্র বসু আসে, সুধীরবাবু ও অপূর্ব্ব তো থাকেনই—অতীত দিনের আনন্দ মুহূর্ত্তগুলি আবার যেন সজীব হয়ে ওঠে। সে সব দিনের হারানো অনুভূতিগুলি আবার যেন ফিরে পাই। সেজন্যই 'মৌচাক' কাগজের ওপর আমার কেমন একটা ব্যক্তিগত টান আছে—এর ভালমন্দ ব্যক্তিগত লাভক্ষতির দৃষ্টি নিয়ে দেখি।

আমি জানি 'মৌচাক' শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্দ্ধন করে না। তাদের পিতামাতারও অবসর বিনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

চাঁইবাসায় একটি বন্ধু গভর্নমেণ্টের এনজিনিয়ার ও বিদ্বান ব্যক্তি। আমায় বললেন—এবার 'মৌচাক-এ হেম বাগচীর 'গরমেটো' কবিতা পড়েছেন?

আমি বললুম—এখনও পড়ি নি।

—পড়ে দেখবেন। চমৎকার রস আছে ওর মধ্যে। আজ দুপুরে মশগুল হয়ে ছিলাম 'মৌচাক'খানা নিয়ে।

এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। একটা মাত্র মনে হোল।

'মৌচাক'-এর লেখা যখন লিখতে বসি, তখন কল্পনা নেত্রে দেখি বহু ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও তাদের কর্ম্মক্লান্ত পিতাঠাকুরদের উৎসুক দৃষ্টি, সবাই যেন এই লেখার দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে—তবে অক্ষমতার জন্যে তাদের সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়তো সব সময় করে উঠতে পারি না—সে কথা আলাদা।